আল-হিদায়া

দ্বিতীয় খণ্ড

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী
ইব্ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র)

তরজমায়
মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-হিদায়া (দ্বিতীয় খণ্ড)
প্রকল্প (উন্নয়ন)

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ্

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪০৭
রবিউল আউয়াল ১৪২১
জুন ২০০০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৭৩
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৮৮
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984 - 06 - 0572 - X

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

বাঁধাই
আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ অংকন
জসিম উদ্দিন

মূল্য ঃ ২৭০.০০ টাকা মাত্র

AL-HIDAYA (2nd Volume) (A Commentary on the Islamic Laws) : Written by Shaikhul Islam Burhan Uddin Abul Hasan Ali Ibn Abu Bakar Al-Farganee Al-Marginanee (Rh.) in Arabic, translated into Bengali by Maulana Abu Taher Mesbah, Edited by the Al-Hidaya Editorial Board and Published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June- 2000

Price : Tk. 270·00 U S Dollar : 11·00

মহাপরিচালকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ৫১১ হিঃ মোতাবেক ১১১৭ খ্রিঃ আফগানিস্তানের মারগীনান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫৯৩ হিঃ মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। অসাধারণ প্রতিভাধর এই লেখক ছিলেন একাধারে হাফেজে কোরআন, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং নীতি শাস্ত্রবিদ। লেখকের সুদীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমের ফসল এই আল-হিদায়া।

আল-হিদায়া ইসলামী আইন শাস্ত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থখানিতে ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য ইমামদের মতামত দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন। হানাফী মাযহাবের রায় ও সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে এসবের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এমন সব অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করেছেন, যদ্দ্বারা হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং রায়সমূহই সঠিক, অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। গ্রন্থখানিতে কোথাও ইমাম আবু হানীফা (র), কোথাও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এবং কোথাও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সিদ্ধান্তকে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে আমরা এই গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। এবার এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। ভবিষ্যতে গ্রন্থখানির অবশিষ্টাংশের অনুবাদ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে আমি বিজ্ঞ অনুবাদক, প্রাজ্ঞ সম্পাদক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ গ্রন্থখানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ। এটিকে হানাফী ফিকাহর বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। ইমাম বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর (র) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে মুসলিম বিশ্বে আদৃত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আইনের নির্ভরযোগ্য পাঠ্য বই হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

আমাদের জানামতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ৩৬টি ভাষ্য, ৯টি টীকা ভাষ্য, ৫টি সার-সংক্ষেপ এবং ১৬টি পরিশিষ্ট রচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম আইন প্রণয়ন এবং আইন শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে জর্জ হ্যামিল্টন এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিশ্বের বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ১৯৯৮ সালে আমরা গ্রন্থটির ১ম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি অচিরেই এর অবশিষ্ট খণ্ডগুলোও সুধী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবো।

গ্রন্থটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টায় আমাদের কোনো প্রকার ত্রুটি ছিলো না। তবুও সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
মোহাম্মদ আব্দুর রব পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ	সদস্য সচিব

সূচিপত্র

		শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়	:	কিতাবুন্নিকাহ্	
	:	বিবাহ পর্ব	৩
		অনুচ্ছেদ : মাহ্রাম প্রসঙ্গ	৭
	:	মুতা বিবাহ বাতিল	১৫
অধ্যায়	:	ওয়ালী ও কুফু প্রসঙ্গে	১৯
		পরিচ্ছেদ : পাত্র-পাত্রীর কুফু	২৮
		পরিচ্ছেদ : ওকীলের মাধ্যমে বিবাহ	৩২
অধ্যায়	:	মাহর	৩৭
অধ্যায়	:	দাসের বিবাহ	৫৯
অধ্যায়	:	মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ	৬৯
অধ্যায়	:	পালা বন্টন	৭৫
অধ্যায়	:	স্তন্য পান	৭৭
		তালাক পর্ব	৮৩
অধ্যায়	:	সুন্নত পদ্ধতির তালাক	৮৫
অধ্যায়	:	তালাক প্রদান	৯৫
		অনুচ্ছেদ : তালাককে সময়ের সাথে সম্বন্ধকরণ প্রসঙ্গে	১০০
		অনুচ্ছেদ :	১০৪
		পরিচ্ছেদ : তুলনা দিয়ে তালাক দেওয়া	১০৭
		অনুচ্ছেদ : সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে	১১১
অধ্যায়	:	(স্ত্রীকে) তালাকের ক্ষমতা প্রদান	১১৭
		পরিচ্ছেদ : ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ	১১৯
		অনুচ্ছেদ : বিষয়টি হাতে অর্পণ সম্পর্কে	১২২
		পরিচ্ছেদ : ইচ্ছা প্রসংগ	১২৫

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
অধ্যায় :	শর্তযুক্ত তালাক	১৩৩
	অনুচ্ছেদ : ব্যতিক্রম জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ	১৪০
অধ্যায় :	রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক	১৪৩
অধ্যায় :	রাজা'আত	১৫১
	পরিচ্ছেদ : তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায়	১৫৭
অধ্যায় :	ঈলা	১৬১
অধ্যায় :	খোলা	১৬৭
অধ্যায় :	যিহার	১৭৭
	অনুচ্ছেদ : কাফফারা প্রসঙ্গে	১৮১
অধ্যায় :	লি'আন	১৯১
অধ্যায় :	পুরুষত্বহীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	১৯৭
অধ্যায় :	ইদ্দত	২০১
অধ্যায় :	নসব প্রমাণ প্রসঙ্গে	২১৫
অধ্যায় :	সন্তান প্রতিপালন এবং কে এর অধিক হকদার	২২১
	পরিচ্ছেদ :	২২৪
অধ্যায় :	ভরণ-পোষণ	২২৭
	অনুচ্ছেদ : বাসস্থানের ব্যবস্থা	২৩৩
	অনুচ্ছেদ :	২৪৫
অধ্যায় :	গোলাম আযাদ করা	২৪৯
	অনুচ্ছেদ	২৫৬
অধ্যায় :	এমন দাস প্রসঙ্গে যার কিছু অংশ আযাদ করা হয়	২৬১
অধ্যায় :	দুই গোলামের একটিকে আযাদ করা	২৭৫
অধ্যায় :	শর্তযুক্ত মুক্তি	২৮৩
অধ্যায় :	অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দান	২৮৭
অধ্যায় :	মুদাব্বার ঘোষণা	২৯১
অধ্যায় :	দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া	২৯৫
	কসম পর্ব	৩০৫
অধ্যায় :	কোন্ বাক্য কসম রূপে বিবেচ্য	৩০৭
	অনুচ্ছেদ : কাফফারা প্রসঙ্গে	৩১০

	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় :	প্রবেশ এবং বসবাস বিষয়ক কসম	৩১৩
অধ্যায় :	বের হওয়া অথবা আরোহণ করা সংক্রান্ত	৩১৬
অধ্যায় :	পানাহার সংক্রান্ত কসম	৩২১
অধ্যায় :	কথা বলা সম্পর্কিত ইয়ামীন	৩২৯
	অনুচ্ছেদ	৩৩২
অধ্যায় :	মুক্তিদান ও তালাক সংক্রান্ত ইয়ামীন	৩৩৪
অধ্যায় :	ক্রয়-বিক্রয় বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ে কসম	৩৩৮
অধ্যায় :	হজ্জ বা সালাত ও সিয়াম সংক্রান্ত ইয়ামীন	৩৪১
অধ্যায় :	বস্ত্র বা অলংকার পরিধান ও অন্যান্য বিষয়ে কসম	৩৪৩
অধ্যায় :	হত্যা, প্রহার ও অন্যান্য বিষয়ে কসম	৩৪৫
অধ্যায় :	ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত কসম	৩৪৬
	বিবিধ মাসআলা	৩৪৭
অধ্যায় :	হদ্দ (শাস্তি)	৩৫৩
	অনুচ্ছেদ : হদ্দ ও তা জারী করার বিবরণ	৩৫৬
	পরিচ্ছেদ : কোন্ সংগম হদ্দ ওয়াজিব করে আর কোন্টি করে না	৩৬০
	পরিচ্ছেদ : যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তা প্রত্যাহার	৩৬৯
	পরিচ্ছেদ : মদ্য পানের হদ্দ	৩৭৮
	পরিচ্ছেদ : অপবাদের হদ্দ	৩৮২
	অনুচ্ছেদ : সাধারণ শাস্তি বিধান	৩৯২
অধ্যায় :	চুরি অধ্যায়	৩৯৬
	পরিচ্ছেদ : যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে হবে না	৩৯৯
	অনুচ্ছেদ : সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	৪০৫
	অনুচ্ছেদ : হস্ত কর্তন এবং তা সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে	৪১০
	পরিচ্ছেদ : চুরিকৃত মালের পরিবর্তন সাধন	৪১৯
	পরিচ্ছেদ : রাহাজানি	৪২১
অধ্যায় :	জিহাদ	৪২৯
	পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি	৪৩০
	পরিচ্ছেদ : সন্ধি স্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়	৪৩৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	৪৩৭
পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল ও তা বন্টন	৪৪১
অনুচ্ছেদ : গনীমেতর মাল বন্টন পদ্ধতি	৪৫০
অনুচ্ছেদ : নফল বা হিসসার অতিরিক্ত প্রদান	৪৫৫
পরিচ্ছেদ : কাফিরদের দখল ও আধিপত্য বিস্তার	৪৫৭
পরিচ্ছেদ : নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি	৪৬২
পরিচ্ছেদ : উশর ও খারাজ প্রসঙ্গে	৪৬৯
পরিচ্ছেদ : জিযিয়া	৪৭৪
অনুচ্ছেদ	
পরিচ্ছেদ : মোরতাদের বিধানসমূহ	৪৮২
পরিচ্ছেদ : বিদ্রোহী দল প্রসঙ্গে	৪৯৪
অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া শিশু	৪৯৯
অধ্যায় : লোকতা বা কুড়ানো বস্তু প্রসঙ্গ	৫০৩
অধ্যায় : দাস-দাসীর পলায়ন	৫১১
অধ্যায় : নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ	৫১৬
অধ্যায় : অংশীদারিত্ব	৫২৩
অনুচ্ছেদ : অশুদ্ধ অংশীদারি সম্পর্কে	৫৩৮
ওয়াকফ অধ্যায় :	৫৪৩

كتاب النكاح

অধ্যায় ঃ কিতাবুন্নিকাহ্

অধ্যায় ঃ কিতাবুন্নিকাহ্

বিবাহ পর্ব

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অতীত বাচক দু'টি বাক্যের মাধ্যমে 'ঈজাব ও কবূল'[১]-এর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়।

কেননা যদিও এ বাক্য খবর প্রদানের জন্য গঠিত; কিন্তু প্রয়োজন নিরসনের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে (বর্তমানে) দু'জন-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

এমন দু'টি বাক্য যোগেও বিবাহ সংঘটিত হতে পারে, যার একটি হবে অতীত বাচক আর অন্যটি হবে ভবিষ্যৎ বাচক। যেমন এক পক্ষ বললো, আমাকে তুমি বিবাহ কর, আর অপর পক্ষ বললো, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম।

কেননা 'আমাকে বিবাহ কর' কথাটির মর্মার্থ হলো বিবাহের জন্য ওকিল নিয়োগ করা আর বিবাহের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমরা পরবর্তীতে তা বর্ণনা করব ইন্শাআল্লাহ্।

নিকাহ, বিবাহ, হেবা, মালিকানা ও দান সমার্থক শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নিকাহ ও বিবাহ ব্যতীত কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা, মালিকানা জাতীয় শব্দগুলো 'প্রকৃত' এবং 'রূপক' কোন অর্থেই বিবাহ বোঝায় না।

কেননা نكاح (বিবাহ) ও تزويج (বিবাহ) এর মর্মার্থ হলো (দু'টি সত্তার মাঝে) মিলন ও জোড় সৃষ্টি করা। অথচ মালিক ও মালিকানাধীন-এ দু'টি সত্তার মাঝে মিলনের (ও জোড়ের) ভাব মোটেই নেই।

আমাদের দলীল এই যে, মালিকানা 'যথা ক্ষেত্রে'[২] যৌন সম্ভোগের অধিকার লাভের কারণ হয় দেহের মালিকানার মাধ্যমে। আর বিবাহ দ্বারা তা-ই সাব্যস্ত হয়। কারণ বিদ্যমান থাকা রূপক অর্থ গ্রহণের একটি মাধ্যম।

১। ঈজাব অর্থ এক পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন এবং কবূল অর্থ অপর পক্ষ থেকে সম্মতি প্রদান।

২। 'যথা ক্ষেত্রে' বলার কারণ এই যে, পুরুষ দাস কিংবা পশুর মালিকানা দ্বারা যৌন সম্ভোগের অধিকার অর্জিত হয় না।

'বিক্রয়' শব্দ দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হবে।

এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা (মালিকানার সূত্রে) রূপক অর্থ গ্রহণের মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে।

বিশুদ্ধ মতে, ভাড়া শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না।

কেননা এটা যৌন সম্ভোগের মালিকানা লাভের কারণ নয়।

বৈধ করে দেওয়া এবং হালাল করে দেওয়া এবং ধার দেওয়া ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না।

এ মাত্র আমরা এর কারণ বলেছি।

তদ্রূপ 'অছিয়ত' শব্দ দ্বারা হবে না।

কেননা 'অছিয়ত' মৃত্যু-পরবর্তী মালিকানা সাব্যস্ত করে।

ইমাম কুদূরী বলেন, দু'জন প্রাপ্ত-বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বাধীন মুসলিম সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া মুসলমানদের বিবাহ সংঘটিত হতে পারে না। দু'জন পুরুষ হতে পারে আবার একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক হতে পারে। তারা সত্যনিষ্ঠ হোক কিংবা সত্যনিষ্ঠ না হোক কিংবা অপবাদ আরোপের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হোক।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখ যে, বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী হলো শর্ত, কেননা- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا نكاح إلا بشهود সাক্ষী ছাড়া বিবাহ নেই।

সাক্ষীর পরিবর্তে ঘোষণাকে শর্ত লাগানোর ব্যাপারে এ হাদীস ইমাম মালিক (র)-এর বিপক্ষে দলীল।

সাক্ষীর ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার শর্ত অপরিহার্য। কেননা গোলাম অধিকার বঞ্চিত হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্যের যোগ্যতা নেই।

প্রাপ্ত বয়স্কতা এবং সুস্থ্য মস্তিষ্কতা অপরিহার্য। কেননা এ দু'টি ছাড়া অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

মুসলমানদের বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীর মুসলমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী। কেননা মুসলমানের বিপক্ষে কাফিরের সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা নেই।[১]

সাক্ষীর পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে বিবাহ সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। এর দৃষ্টান্ত, ইনশাআল্লাহ্, তুমি শাহাদাত অধ্যায়ে জানতে পারবে।

সত্যনিষ্ঠতার শর্ত নেই। সুতরাং আমাদের মতে দু'জন ফাসেক ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) এতে ভিন্নমত পোষণ করেন।

---

১ কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا (আল্লাহ মু'মিনদের উপর কাফিরদের কোন ক্ষমতা দান করেননি)।

তাঁর দলীল এই যে, সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার একটি সম্মান বিশেষ। অথচ ফাসিক হলো অসম্মানযোগ্য।

আমাদের দলীল এই যে, ফাসিক ব্যক্তি অভিভাবকত্বের যোগ্য। সুতরাং সে সাক্ষ্য প্রদানেরও যোগ্য হবে।

এটা এজন্য যে, ইসলামের কারণে যখন তার নিজের উপর অভিভাবকত্ব রহিত করা হয়নি তখন অন্যের উপর তার অভিভাবকত্বের অধিকারও রহিত করা হবে না।[১] কেননা অন্যের উপর অভিভাবকত্ব, তার নিজের উপর অভিভাবকত্বের শ্রেণীভুক্ত।

আর এই জন্য যে, (বিচারক) নিয়োগ করার যোগ্যতা তার রয়েছে। সুতরাং সে নিজেও বিচারক হতে পারে। তেমনি সাক্ষীও।

তদ্রূপ অপবাদ আরোপের অপরাধে যে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (নিজের উপর এবং অন্যের উপর) অভিভাকত্বের অধিকারী।[২] সুতরাং 'বহনের' পর্যায়ে যে সাক্ষীর যোগ্য হবে, সে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত।

কেননা তার অপরাধের কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।[৩] আর (বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে) সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা না থাকার বিষয়টি গ্রাহ্য করা হবে না, যেমন, অন্ধদের এবং আকদে নিকাহ সম্পাদনকারী উভয়ের পুত্রদ্বয়ের সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে।

ইমাম কুদূরী বলেন, কোন মুসলমান যদি যিম্মী (কিতাবী) নারীকে দু'জন যিম্মীর সাক্ষীতে বিবাহ করে তাহলে তা জায়েয হবে।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহম্মদ ও ইমাম যুফার (র) বলেন, জায়েয হবে না।

কেননা বিবাহের ক্ষেত্রে (কবূল) শ্রবণের অর্থই হলো সাক্ষী আর মুসলমানের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার কাফিরের নেই। সুতরাং যেন তারা মুসলমানের কথা শোনেই নি।

ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর বক্তব্য এই যে, (স্ত্রীর উপর স্বামীর যৌন সম্ভোগের) মালিকানা সাব্যস্ত করার প্রেক্ষিতেই বিবাহে সাক্ষীর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা তা একটি সম্মানযোগ্য ও মূল্যবান অংগের উপর সাব্যস্ত হচ্ছে। মোহর ওয়াজিব হওয়ার প্রেক্ষিতে সাক্ষীর শর্ত আরোপিত হয়নি। কেননা অর্থ ধার্য হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্ত নেই। সুতরাং সাক্ষীদ্বয় যিম্মী স্ত্রীলোকটির প্রতি সাক্ষী হচ্ছে।

১। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির পাপাচার যদিও তার অভিভাবকত্বের অধিকার রহিত হওয়ার দাবী করে, যেমন শাফেয়ী (র) বলছেন, কিন্তু তার মুসলমান হওয়া উক্ত অধিকার রহিত করাকে নাকচ করে। সুতরাং উভয় অবস্থার বিপরীত দাবীর কারণে তা রহিত হবে না। বরং যেমন ছিল তেমনই বহাল থাকবে। আর আত্ম-অভিভাবকত্ব যখন বহাল থাকলো তখন অন্যের উপর অভিভাবকত্বও বহাল থাকবে।

২। অর্থাৎ সে সাক্ষ্য ধারণ করতে পারবে, কিন্তু যখন সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন হবে তখন সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না। আর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সাক্ষ্য ধারণের যোগ্যতাই যথেষ্ট। সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা জরুরী নয়।

৩। ইরশাদ হয়েছে وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।

পক্ষান্তরে যিম্মী সাক্ষী দু'জন যদি স্বামীর কথা শ্রবণ না করে থাকে তাহলে জায়েয হবে না। কেননা আক্‌দ উভয়ের কথা দ্বারা সংঘটিত হয় আর আক্‌দের জন্যই সাক্ষীর শর্ত রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার আদেশ করে আর সে (আদিষ্ট ব্যক্তি) পিতার উপস্থিতিতে তাদের দু'জন ব্যতীত একজন লোকের সাক্ষীতে ঐ মেয়েকে বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে।

কেননা তখন একই মজলিস হওয়ার কারণে পিতাকে প্রত্যক্ষ আক্‌দ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে। আর ওয়াকীল নিছক দূত ও বক্তব্য উচ্চারণকারী হয়ে যাবে। ফলে বিবাহদানকারী (দ্বিতীয়) সাক্ষী রূপে বিদ্যমান থাকবে। পক্ষান্তরে পিতা অনুপস্থিত থাকলে জায়েয হবে না। কেননা মজলিস ভিন্ন হওয়ার কারণে পিতাকে প্রত্যক্ষ আক্‌দ সম্পাদনকারী রূপে সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না।

এই প্রেক্ষিতে পিতা যদি তার সাবালিকা কন্যাকে একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ দান করে তাহলে কন্যা উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকলে বিবাহ জায়েয হবে। যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে জায়েয হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ মাহ্‌রাম প্রসংগ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিজ মাকে আর দাদী ও নানীদের বিবাহ করা জায়েয নয়

কেনেনা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং তোমাদের কন্যাগণকে।

আর দাদী-নানীগণও امهات এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অভিধানে ام বা মা এর অর্থ হলো মূল। অথবা দাদী ও নানীদের হারাম হওয়া ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আপন কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না।

প্রমাণ হলো, আমাদের উপরে বর্ণিত আয়াত। **আর আপন সন্তানের কন্যাকে বিবাহ করা যাবে না; যত অধঃস্তনই হোক।** এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আপন ভগ্নিকে এবং ভগ্নি-কন্যাদেরকে, তদ্রূপ ভ্রাতৃ-কন্যাদেরকে এবং ফুফু বা খালাকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা এরা যে হারাম তা উক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আর এদের মধ্যে শামিল হবে সর্বপ্রকার (আপন ও সৎ) ফুফু, সর্বপ্রকার খালা এবং সর্বপ্রকার ভ্রাতৃ-কন্যাগণ। কেননা বর্ণিত শব্দগুলোর মর্ম ব্যাপক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আপন স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা হালাল নয়, স্ত্রীর সংগে সহবাস হোক কিংবা না হোক।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সহবাসের শর্ত ছাড়াই وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ (তোমাদের জন্য হারাম) বলেছেন।

আর যে স্ত্রীর সংগে সহবাস হয়েছে, তার কন্যাকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা এ ক্ষেত্রে আয়াতে সহবাসের শর্ত উল্লেখিত হয়েছে। ঐ মেয়ে তার প্রতিপালনে থাকুক কিংবা অন্য কারো প্রতিপালনে থাকুক। কেননা প্রতিপালনের উল্লেখ প্রচলনের প্রেক্ষিতে হয়েছে। শর্তের প্রেক্ষিতে নয়। এ জন্যই হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু সহবাস না করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। [১]

১। অর্থাৎ সাধারণতঃ সৎ কন্যা সৎ পিতার আশ্রয় ও প্রতিপালনেই থাকে। এ হিসাবে কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হারাম হওয়ার জন্য সহবাস ও প্রতিপালন দু'টোই যদি শর্ত হতো তাহলে হালাল-এর বয়ানের ক্ষেত্রে উভয়টিকে শামিল করে এভাবে বলাই স্বাভাবিক ছিলো— যদি তোমরা স্ত্রীগণের সংগে সহবাস না করে থাকো এবং ঐ কন্যা তোমাদের প্রতিপালনে না থেকে থাকে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে প্রতিপালনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি, সেহেতু বোঝা গেলো যে, হারাম হওয়ার জন্য সহবাস হওয়া এবং হালাল হওয়ার জন্য সহবাস না হওয়া যথেষ্ট; প্রতিপালনের হওয়া না হওয়া শর্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আপন পিতার এবং নানা ও দাদার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ

—তোমাদের পিতারা যাদেরকে বিবাহ করেছে তাদের তোমরা বিবাহ করনা।

আর আপন পুত্রের কিংবা পুত্রের পুত্রদের স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

—এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম।

আর ঔরসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, পালক পুত্রের বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার জন্য; দুধ-পুত্রের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য নয়।

আর দুধ-মা ও দুধ-বোনকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

—তোমাদের যে মাতাগণ তোমাদের দুগ্ধ পান করিয়েছেন, তাদেরকে এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম।

এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

নসব (রক্ত সম্পর্ক) এর কারণে যা হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও তা হারাম।

আর দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে এবং সহবাসসহ মালিকানার মাধ্যমে একত্র করা যাবে না।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

—আর দুই বোনকে একত্র করা, (হারাম)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايجمعن ماءه فى رحم اختين

—যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন দুই বোনের 'রেহেমে' আপন বীর্য একত্র না করে।

যে দাসীর সংগে সহবাস করেছে, সে তার বোনকে যদি বিবাহ করে তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে।

কেননা যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকেই বিবাহ সংঘটিত হয়েছে এবং বৈধ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

বিবাহ যখন জায়েয হলো তখন দাসীর সংগে আর সহবাস করবেনা, স্ত্রীটির সংগে সহবাস না করে থাকলেও।

কেননা বিবাহিতা স্ত্রী (শরীয়তের) হুকুম হিসাবে 'সহবাসকৃতা'রূপে গণ্য।

আর এ বিবাহিতার সংগে সহবাস করতে পারবে না একত্রিতকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে। তবে যদি সহবাসকৃত বাঁদী নিজের উপর হারাম করে দেয় (বিক্রি কিংবা হেবা ইত্যাদি) কোন একটি 'সবব' গ্রহণের মাধ্যমে, তখনই বিবাহিতার সংগে সহবাস করতে পারবে। কেননা এ অবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে উভয়কে একত্র করা হয়নি।

আর যদি দাসীর সংগে সহবাস না করে থাকে তাহলে বিবাহিতার সংগে সহবাস করতে পারবে। কেননা এ ক্ষেত্রে উভয়কে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা হচ্ছে না। কেননা মালিকানাধীন দাসী (শরীয়তের) হুকুম হিসাবে সহবাসকৃতা রূপে গণ্য নয়।

যদি দুই বোনকে পৃথক দুই আকদের মাধ্যমে[১] বিবাহ করে, আর জানা না থাকে যে, কাকে প্রথমে বিবাহ করেছে তাহলে তাকে ও উভয় বোনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

কেননা দু'জনের একজনের বিবাহ তো সুনিশ্চিতরূপেই বাতিল, কিন্তু অগ্রাধিকার (জানা) না থাকার কারণে নির্ধারণের কোন উপায় নেই। তদ্রূপ অনির্ধারিতভাবে বিবাহ কার্যকর করারও কোন উপায় নেই। কেননা (এ বিবাহের) কোন সার্থকতা নেই। কিংবা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।[২] সুতরাং বিচ্ছেদ ঘটানোই হলো অনিবার্য।

আর উভয় স্ত্রী অর্ধেক মাহর পাবে।

কেননা মুলতঃ অর্ধেক মাহর তাদের প্রথম জনের প্রাপ্য হয়েছে, অথচ অজ্ঞতার কারণে অগ্রাধিকার সম্ভব নয়। সুতরাং তা উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে।

কারো কারো মতে উভয়ের প্রত্যেককে এ দাবী করতে হবে যে, সেই হলো প্রথমা। কিংবা (কে আসল) হকদার (তা) জানা না থাকার কারণে (মাহর ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপারে) সমঝোতায় আসতে হবে।

কোন নারীকে তার ফুফু কিংবা খালা কিংবা ভাইঝি কিংবা বোনঝি-এর সংগে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।

১। দুই আকদের কথা বলার কারণ এই যে, এক আকদের মাধ্যমে হলে উভয়ের বিবাহ অবধারিত রূপেই বাতিল হয়ে যাবে।

২। অর্থাৎ কাযী আদালতি রায়ের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করে দেবেন। কেননা কাযী যদি অনির্ধারিতভাবে এ রায় দেন যে, দু'বোনের যে কোন একজনের বিবাহ বহাল এবং অপর জনেরটা বাতিল। তাহলে স্বামীর দিক থেকে বিবাহের কোন সার্থকতা নেই। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্য ছিলো সহবাস ও সন্তান-উৎপাদন। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীর দিক থেকে ক্ষতি ও হয়রানি ছাড়া কিছু নেই। কেননা উভয়কে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها

—কোন নারীকে তার ফুফুর বিদ্যমানে কিংবা তার খালার বিদ্যমানে কিংবা তার ভাইঝির বিদ্যমানে কিংবা তার বোনঝির বিদ্যমানে বিবাহ করা যাবে না।

এ হাদীস হলো মশহূর পর্যায়ের। আর এ ধরনের হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহ্র হুকুমের উপর বৃদ্ধি করা যায়।

আর এমন দুই নারীকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না, যাদের একজনকে পুরুষ বলে ধরে নিলে তার পক্ষে অপর নারীকে বিবাহ করা জায়েয হয় না।

কেননা এমন দু'জনকে (বিবাহ বন্ধনে) একত্রকরণ বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। আর যে ধরনের আত্মীয়তার নিকাহ হারাম করা হয়েছে, তা হারাম করা হয়েছে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণে।

আর যদি উভয়ের মাঝে মাহরাম-সম্পর্ক দুগ্ধপানের কারণে হয়ে থাকে তাহলেও (উভয়কে বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা হারাম হবে। এর দলীল হলো ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

কোন নারীকে এবং তার পূর্ববর্তী স্বামীর (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে একত্র করায় কোন বাধা নেই।

কেননা উভয়ের মাঝে আত্মীয়তার কিংবা দুগ্ধ পানের কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম যুফার (র) এর মতে তা জায়েয নয়। কেননা পূর্ববর্তী স্বামীর কন্যাকে যদি পুরুষ ধরা হয় তাহলে তো তার পক্ষে পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, পিতার স্ত্রীকে যদি পুরুষ ধরা হয় তাহলে তার পক্ষে এই মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয। আর শর্ত এই যে, উভয় দিক থেকে পুরুষ সাব্যস্ত করার বেলায় বিবাহের অবৈধতা হতে হবে।

যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী লোকের সংগে যিনা করল, তার জন্য ঐ স্ত্রী লোকটির মা এবং তার কন্যা হারাম হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যিনা দ্বারা বৈবাহিক 'মাহরামিয়াত' সাব্যস্ত হয় না। কেননা মাহরামিয়াত একটি নিয়ামত বিশেষ। সুতরাং অবৈধ পথে তা অর্জিত হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, যৌন সংগম হলো সন্তানের মাধ্যমে (উভয়ের মাঝে) অংশত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ।[১]

এ কারণেই তো সন্তানকে পূর্ণরূপে উভয়ের প্রত্যেক্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। সুতরাং স্ত্রী লোকটির উর্ধ্বতন ও অধস্তনরা পুরুষটির উর্ধ্বতন ও অধঃস্তনদের ন্যায় হয়ে যাবে। অপর দিক থেকেও সেরূপ হবে। আর আপন দেহ-অংশকে যৌন সম্ভোগ করা হারাম, তবে শুধু বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যার সাথে সহবাস করা হয়েছে, (সম্ভোগ) জায়েয।[২]

১। অর্থাৎ উভয়ের দেহের অংশ সংমিশ্রিত হয়ে সন্তান জন্ম লাভ করে। সুতরাং সন্তানের মাধ্যমে একে অপরের অংশে পরিণত হয় এবং অভিন্ন দেহ সত্তার ন্যায় হয়ে যায়।

২। এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন এই যে, আপন দেহ অংশকে যৌন সম্ভোগ করা হারাম হিসাবে সহবাসকৃতা স্ত্রী লোকটিও তো তার জন্য হারাম হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা উভয়ের মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। উত্তর এই যে, সহবাসকৃতাকেও যদি হারাম সাব্যস্ত করা হয় তাহলে সন্তান জন্মের পর কোন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ফলে বিবাহের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে।

আর যৌন সম্ভোগ মূলতঃ সন্তান লাভের মাধ্যম হওয়ায় মাহরামিয়াতের কারণ হয়েছে, যিনা হওয়ার কারণে নয়।[১]

যদি কোন নারী কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ করে, তার জন্য ঐ স্ত্রী লোকের মা ও কন্যা হারাম হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হারাম হবে না। একই মতবিরোধ রয়েছে, যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ করে কিংবা স্ত্রীলোকটির লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় কিংবা স্ত্রী লোকটি তার পুরুষাংগের দিকে কাম-প্রবৃত্তির সাথে তাকায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত সহবাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। এ জন্যই এ দু'টির কারণে সিয়াম বা ইহরাম নষ্ট হয় না। এবং গোসলও ওয়াজিব হয় না; সুতরাং এ দু'টিকে সহবাসের হুকুমে মিলান যাবে না।

আমাদের দলীল এই যে, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত সহবাসের প্রতি আকৃষ্ট করে। সুতরাং সতর্কতার স্থানে একে সহবাসের স্থলবর্তী করা হবে। কাম প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শের লক্ষণ এই যে, পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয়। কিংবা উত্থান বৃদ্ধি পায়। এই বিশুদ্ধ মত।

আর ধর্তব্য হলো স্ত্রী লোকের লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরে তাকানো আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন সে হেলান দিয়ে থাকবে।

যদি স্পর্শ করার কারণে বীর্যস্খলন হয়ে যায় তাহলে কারো কারো মতে তা দ্বারা মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু শুদ্ধ মত এই যে, তা সাব্যস্ত করবে না। কেননা বীর্যস্খলন দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, এই স্পর্শ সহবাস পর্যন্ত নিয়ে যাবে না।

এরূপই হুকুম রয়েছে কোন নারীর গুহ্যদ্বারে সংগম করার ব্যাপারে।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বায়ন তালাক কিংবা রেজয়ী তালাক দেয় তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত সে ঐ স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি 'বায়ন' তালাকের কিংবা তিন তালাকের ইদ্দত হয় তাহলে জায়িয হবে।

কেননা বিবাহ সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে, ছিন্নকারী তালাক কার্যকরী করার প্রেক্ষিতে। এ কারণেই হারাম হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়া সত্বেও যদি কেউ বায়ন তালাক দেয়া স্ত্রীর সংগে সংগম করে তাহলে তার উপর যিনার হদ্দ ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল এই যে, প্রথমা স্ত্রীর বিবাহ এখনো বিদ্যমান, তার হুকুম আহকাম, যেমন খোর-পোষের অধিকার, গৃহের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া এবং সন্তানের পিতৃত্ব প্রমাণিত হওয়া বিদ্যমান থাকার কারণে।[২]

ইমাম শাফেয়ী (র) এর বক্তব্যের জওয়াব এই যে, কর্তনকারীর কার্যকারিতা বিলম্বিত হয়েছে। এ কারণেই কিছু বন্ধন বিদ্যমান বলেছে।

আর মুল (মবসূত) কিতাবের তালাক অধ্যায়ে 'হদ্দ' ওয়াজিব না হওয়ার ইংগিত রয়েছে। আর এর ইবারত মতে হদ্দ ওয়াজিব হবে। কেননা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে তার মালিকানা

১। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, বৈবাহিক মাহরামিয়াত যিনা দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে না, এর উত্তর দেয়া হল।

২। অর্থাৎ তালাকদাতা স্বামীর ঘর হতে বের হতে চাইলে বাধা দানের অধিকার এবং দুই বছরের মধ্যে সন্তান হলে তার সয্যায় তার ঔরষজাত সন্তান বলে স্বীকৃতি লাভ।

বিলুপ্ত হয়ে গেছে; সুতরাং যিনা সাব্যস্ত হবে। আর উপরোল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়নি। সুতরাং সে দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রকারী হবে।

মনিব তার দাসীকে এবং নারী তার দাসকে বিবাহ করতে পারে না।

কেননা শরীয়তে বিবাহকে অনুমোদন করাই হয়েছে এমন কিছু ফলাফল লাভের জন্য, যার মধ্যে বিবাহে আবদ্ধ পক্ষদ্বয় শরীক থাকে। অথচ মালিকানাধীন হওয়া মালিক হওয়ার পরিপন্থী। কাজেই বিবাহের ফলাফলের মধ্যে শরীকানারূপে সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব হবে না।

কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েয।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

আর যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সতী নারী (তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয)।

কিতাবী নারীদের মধ্যে স্বাধীন ও দাসীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। ইনশাআল্লাহ্ আমরা শীঘ্রই তার বর্ণনা দিব।

মাজূসী নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا اكلى ذبائحهم

তাদের প্রতি কিতাবীদের অনুরূপ আচরণ করো, তবে তাদের নারীদের বিবাহ করতে ও তাদের জবেহকৃত পশু ভক্ষণ করবেনা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর পৌত্তলিক নারীদের বিবাহ করা জায়িয নয়। কেননা ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

আর মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। **আর ছাবেঈ নারীদের বিবাহ করা জায়িয যদি তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে থাকে এবং কোন আসমানী কিতাব স্বীকার করে থাকে।** কেননা তারা কিতাবী সম্প্রদায়ভুক্ত।

আর যদি তারা তারকা পূজারী হয় এবং কোন আসমানী কিতাব ধারণ না করে তাহলে তাদের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েয নয়। কেননা তারা মুশরিক।

তাদের সম্পর্কে (ইমামগণের মধ্যে) যে মতপার্থক্য বর্ণিত, তার কারণ হলো তাদের ধর্মমত সম্পর্কে অস্পষ্টতা। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তাদের জবেহকৃত পশু সম্পর্কেও একই ধরনের বিবরণ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইহরাম বাঁধা পুরুষ ও নারী ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জায়েয নয়। মুহরিম অভিভাবক কর্তৃক তার অভিভাবকত্বাধীন মেয়েকে বিবাহ দানের ব্যাপারে অনুরূপ মতবিরোধ রয়েছে।

তাঁর দলীল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاينكح المحرم ولاينكح

মুহরিম বিবাহ করতে পারে না এবং বিবাহ দিতেও পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়মূনা (রা) কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র) বর্ণিত হাদীস এ (নিকাহ্ শব্দ-টি) সহবাসের অর্থে প্রযুক্ত।

দাসী মুসলিম হোক কিংবা কিতাবী হোক বিবাহ করা জায়েয রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে স্বাধীন পুরুষের জন্য কিতাবী দাসীকে বিবাহ করা জায়েয নয়।

কেননা, তার মতে দাসীদেরকে বিবাহ করার বৈধতা হলো অনিবার্যতা প্রসূত। কারণ এতে আপন দেহ অংশকে দাসত্বের সম্মুখীন করা হয়। আর মুসলিম দাসীকে বিবাহ করা দ্বারাই প্রয়োজন বিদূরিত হতে পারে। একারণেই (কুরআনে) স্বাধীন নারী বিবাহ করার সামর্থ্যকে দাসী বিবাহের পথে বাধা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আমাদের মতে দাসীদেরকে বিবাহ করার বৈধতা নিঃশর্ত। কেননা বৈধতাদানকারী আয়াতটি নিঃশর্ত। তাছাড়া দাসী বিবাহ করার মধ্যে স্বাধীন দেহ অংশ লাভ করা থেকে বিরত থাকা হচ্ছে, দেহ অংশকে দাস বানানো হচ্ছে না। আর তার তো মূল (দেহ অংশটুকুই) লাভ না করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং দেহ অংশের গুণ বিশেষ লাভ না করারও অধিকার রয়েছে।

স্বাধীন স্ত্রীর উপস্থিতিতে দাসীকে বিবাহ করতে পারবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاتنكح الأمة على الحرة

স্বাধীন স্ত্রীর বিদ্যমান অবস্থায় দাসী বিবাহ করা যাবে না। ব্যাপক ভিত্তিক হওয়ায় এ হাদীস দাসের জন্য তা জায়েয রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর বিপক্ষে দলীল এবং স্বাধীন স্ত্রীর সম্মতিক্রমে জায়েয রাখার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র)-এর পক্ষেও দলীল।

তাছাড়া এ কারণে যে, নেয়ামতকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তালাক অধ্যায়ে এটা আমরা প্রমাণ করবো যে, দাসত্বের কারণে একা অবস্থায় তো পাত্রীর হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে; কিন্তু (স্বাধীন নারীর সংগে) যুক্ত অবস্থায় সাব্যস্ত হবে না।

তবে দাসী (স্ত্রী হিসেবে) বিদ্যমান অবস্থায় স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وتنكح الحرة على الأمة

আর দাসী (স্ত্রীর) বিদ্যমান অবস্থায় স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা যাবে।

তাছাড়া দলীল এই যে, স্বাধীন নারী সর্বাবস্থায় হালাল। কেননা, স্বাধীনার ক্ষেত্রে নেয়ামতকে অর্ধেককারী নেই।

যদি স্বাধীন স্ত্রীর বায়েন তালাকের ইদ্দতের অবস্থায় কোন দাসীকে বিবাহ করে তবে তা জায়েয হবে না, ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মতে। আর সাহেবায়নের মতে, তা জায়েয রয়েছে। কেননা (তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কারণে) এটা স্বাধীন স্ত্রীর বর্তমানে বিবাহ নয়। আর সেটাই হলো হারাম। এজন্যই তো কেউ যদি কসম করে যে, এই স্ত্রীর বর্তমানে সে অন্য কোন বিবাহ করবেনা। (অতঃপর উক্ত স্ত্রীর বায়েন তালাকের ইদ্দতের সময় বিবাহ করে) তাহলে এই বিবাহের কারণে তার কসম ভংগ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, (খোরপোষে ও অন্যান্য) কিছু আহকাম বাকি থাকার কারণে স্বাধীন স্ত্রীর বিবাহ এক দিক থেকে এখনও বহাল রয়েছে। সুতরাং সতর্কতার অন্য দাসী বিবাহ করার নিষিদ্ধতা বহাল থাকবে। কসমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সেখানে উদ্দেশ্য হলো অন্যকে তার হিস্সার অংশীদার না করা। ১

স্বাধীন ব্যক্তির একই সংগে চারজন স্বাধীন নারী ও দাসীকে বিবাহ করার অধিকার রয়েছে। এর বেশি বিবাহ করার অধিকার নেই।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

তোমরা যতজন নারী তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর— দু'জন তিনজন এবং চারজন।

আর সংখ্যার প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ তার অতিরিক্ত সংখ্যাকে নিষিদ্ধ করে দেয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, একটির বেশী দাসী বিবাহ করা যাবে না। কেননা তার মতে দাসী বিবাহ হলো জরুরী ভিত্তিক। তার বিপক্ষে প্রমাণ হলো আমাদের পঠিত আয়াত। কেননা আয়াতের نِسَاءِ শব্দটি বিবাহিতা দাসীকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন- যিহার এর ক্ষেত্রে২।

আর দাসের জন্য দুইয়ের অধিক বিবাহ করা জায়েয নয়।

ইমাম মালিক (র) বলেন, তা জায়েয। কেননা তাঁর মতে বিবাহের ক্ষেত্রে দাস স্বাধীন ব্যক্তির সমতুল্য। এজন্যই সে মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারে।

আমাদের দলীল এই যে, দাসত্ব নেয়ামতকে অর্ধেকে নামিয়ে আনে। সুতরাং স্বাধীন হওয়ার মর্যাদা প্রকাশের জন্য দাসকে দু'টি এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে চারটি বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হবে।

অতঃপর স্বাধীন ব্যক্তি যদি চার স্ত্রীর একজনকে 'বায়ন' তালাক প্রদান করে তাহলে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে চতুর্থ বিবাহ করা তার জন্য জায়েয হবে না।

এতে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। এর নযীর হল বোনের ইদ্দতে অপর বোনকে বিবাহ করা। **জামেউস সসগীর প্রণেতা বলেন, যিনা দ্বারা গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করলে তা জায়েয হবে; তবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে তার সংগে সহবাস করবে না।**

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র) -এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত বিবাহ বাতিল হবে।

আর যদি গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসব সম্পন্ন হয়৩ তাহলে সকলের মতেই বিবাহ বাতিল হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, আসলে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো গর্ভের মর্যাদা রক্ষা করা। আর যিনা দ্বারা সৃষ্ট গর্ভও সম্মানিত। কেননা এর তো কোন অপরাধ নেই। আর এ কারণেই গর্ভপাত করা জায়েয নয়।

---

১ : অর্থাৎ তার রাত্রি যাপনের হিস্সায় অন্যকে ভাগ না দেয়া। আর ইদ্দতের সময় যেহেতু তার রাত্রি যাপনের হিস্সা নেই, সেহেতু ঐ সময় অন্যকে বিবাহ করার কারণে তার হিস্সায় ভাগ দেয়া সাব্যস্ত হয় না।

২ যিহার সংক্রান্ত আয়াতে نِسَاءِ লফযটি বর্ণিত হয়েছে আর তা সকলের মতে দাসীকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

৩ বিশুদ্ধ নসবের অর্থ হলো শরীয়াত স্বীকৃত কোন পুরুষের সংগে গর্ভস্থ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়া, [illegible] মৃত্যুজনিত স্বামীর ইদ্দতে থাকা, কিংবা স্ত্রী সন্দেহে সহবাসের কারণে গর্ভবতী হয়ে [illegible]

আবূ হানিফা ও মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, যিনা দ্বারা গর্ভবতী নারী ঐ সকল নারীর অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা নাছ (বা শরীয়তের বাণী) দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সহবাস হারাম হওয়ার কারণ হলো যাতে তার পানি অন্যের ফসল সিঞ্চিত না করে।

আর প্রমাণিত নসবের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো বীর্যের অধিকারী ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা আর যিনাকারীর কোন মর্যাদা নেই।

আর যদি কেউ যুদ্ধবন্দিনী কোন গর্ভবতীকে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ বাতিল। কেননা এর নসব প্রমাণিত।

যদি কেউ আপন উম্মে ওয়ালাদকে নিজের পক্ষ থেকে গর্ভবতী অবস্থায় বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ বাতিল।

কেননা সে তার মনিবের শয্যা সংগিনী। একারণেই (মনিবের পক্ষ হতে) দাবী উত্থান ছাড়াই মনিবের সংগে উক্ত দাসীর সন্তানের নসব (ও পিতৃ পরিচয়) সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি এই বিবাহকে শুদ্ধ বলা হয় তাহলে দু'টি শয্যাধিকার একত্রীকরণ হয়ে যাবে।

তবে যেহেতু উম্মে ওয়ালাদের গর্ভস্থ সন্তানের নসব সুদৃঢ় নয়; কেননা মনিব অস্বীকার করলে, 'লি'আন' ছাড়াই সন্তানের পিতৃ পরিচয় নাকচ হয়ে যায়; সুতরাং শয্যাধিকারের সংগে গর্ভসুঞ্চার যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা ধর্তব্য হবে না।

✓ **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ তার দাসীর সংগে সহবাসের পর যদি তাকে বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে।**

কেননা দাসী তার মনিবের (পূর্ণ) শয্যা সংগিনী নয়। একারণেই তো দাসী সন্তান প্রসবের মনিবের দাবী বা স্বীকৃতি ছাড়া সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয় না।

তবে মনিবের জন্য উচিত আপন বীর্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য দাসীর গর্ভবিমুক্তির বিষয়টি পর নিশ্চিত হওয়া।

বিবাহ যখন জায়েয তখন স্বামী গর্ভবিমুক্তির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বেই তার সংগে সহবাস করতে পারবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র) এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দাসীর গর্ভবিমুক্তির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তার সংগে স্বামীর সহবাস করা আমি পছন্দ করি না।

কেননা মনিবের বীর্য গর্ভে স্থিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা সমীচীন; যেমন ক্রয়কৃত দাসীর ক্ষেত্রে।

শায়খায়নের দলীল এই যে, বিবাহের বৈধতার সিদ্ধান্ত প্রদান গর্ভাশয় খালি থাকার আলামত। সুতরাং মুস্তাহাব রূপে কিংবা ওয়াজিব রূপে গর্ভবিমুক্তি থেকে নিশ্চিত হওয়ার আদেশ দেওয়া যাবে না, মুস্তাহাব হিসেবেও নয়, ওয়াজিব হিসেবেও নয়। ক্রয়কৃত দাসীর ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা গর্ভবতী অবস্থায় ক্রয় জায়েয রয়েছে।

তদ্রূপ যদি কোন নারীকে যিনা করতে দেখে অতঃপর তাকে বিবাহ করে তাহলে তার গর্ভবিমুক্তির বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তার সংগে সহবাস করা তার জন্য হালাল।

এটা শায়খায়নের মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, গর্ভবিমুক্তির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তার সংগে সহবাস করা আমি পছন্দ করি না। দলীল আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

✓ **মুতা বিবাহ বাতিল।**

মুতা বিবাহের অর্থ এই যে, পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে বললো, আমি এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে এত দিনের জন্য তোমাকে ভোগ করবো।

ইমাম মালিক (র) বলেন, এটা জায়েয রয়েছে। কেননা মুলতঃ এটা জায়েয ছিলো। সুতরাং 'রহিতকারী' সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত বৈধতা অব্যাহত থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, ছাহাবা কিরামের ইজমা এর মাধ্যমে, (মুতার বৈধতা) রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর একথা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ছাহাবা কিরামের মতো অনুকূলে স্বীয় মত প্রত্যাহার করেছেন। সুতরাং ইজমা প্রতিষ্ঠিত হল।

সাময়িক বিবাহ বাতিল।

যেমন কেউ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দশ দিনের জন্য বিবাহ করলো।

ইমাম যুফার (র) বলেন, বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে তা স্থায়ী হয়ে যাবে। কেননা ফাসিদ শর্তের কারণে বিবাহ বাতিল হয় না।

আমাদের দলীল এই যে 'বিবাহ' শব্দটি ব্যবহার করলেও এতে মূলতঃ মুত'আর মর্ম রয়েছে। আর মুয়ামেলার ব্যাপারে (শব্দের পরিবর্তে) অর্থের দিকই বিবেচ্য।

সময়সীমা দীর্ঘ হলো কি, সংক্ষিপ্ত হলো, তাতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা সময়সীমা সাব্যস্ত করাই মুত'আর দিক নির্দেশক আর তা এখানে পাওয়া গেছে।

যে ব্যক্তি একই আক্‌দে দু'জন নারীকে বিবাহ করলো অথচ তন্মধ্যে একজনকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল নয়, সেক্ষেত্রে যাকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল ছিঁলো তার বিবাহ শুদ্ধ হবে আর অপরজনের বিবাহ বাতিল হবে।

কেননা বিবাহ বাতিলকারী বিষয়টি তাদের একজনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। একই চুক্তিতে একজন স্বাধীন ও একজন দাসকে বিক্রি করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর এখানে গোলামকে ক্রয় করার ব্যাপার স্বাধীন ব্যক্তি কবুল করার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

আর যার বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে, সেই নির্ধারিত পুর্ণ মাহরের অধিকারী হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে। সাহেবায়েনের মতে উভয়ের উক্ত মাহর বন্টিত হবে 'মাহরে মিছল' অনুপাতে। এ মাসআলা মাবসূত কিতাব থেকে গৃহীত।

আর কোন স্ত্রীলোক যদি দাবী করে যে, অমুক তাকে বিবাহ করেছে, আর এর উপর সে সাক্ষ্য পেশ করে আর কাযী তাকে তার স্ত্রী বলে রায় দেন; কিন্তু বাস্তবে সে তাকে বিবাহ করেনি, তাহলে ঐ স্ত্রীলোক তার সংগে বসবাস করতে পারবে এবং তাকে সহবাসের সুযোগ দিতে পারবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম ইউসুফ (র)-এরও প্রথমে এ মত ছিল। আর তাঁর শেষ মত-এ হল ইমাম মোহাম্মদ (র)-এরও মত- এই যে, সে পুরুষের পক্ষে তার সংগে সহবাস করা জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এই মত। কেননা কাযী সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণে ভুল করেছেন। কারণ সাক্ষীরা (প্রকৃত পক্ষে) মিথ্যাবাদী। সুতরাং এটি এমন হয়ে গেল যেন কাযীর রায়ের পর যখন প্রকাশ পায় যে, সাক্ষীরা দাস বা কাফির ছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, কাযীর ধারণা মতে সাক্ষী সত্য। আর তাই হলো প্রমাণ। কেননা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন। সাক্ষীদের দাসত্ব ও কুফরী বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে সম্পর্কে অবগত হওয়া সহজ। আর সাক্ষী প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যখন ফায়সালা হলো এবং বিবাহকে অগ্রবর্তী করে নিয়ে আভ্যন্তরীণভাবে ফায়সালাটিকে কার্যকর করা সম্ভবপর তখন বিবাদ নিরসনের স্বার্থে ফায়সালা কার্যকর করা হবে। সূত্রহীন মালিকানার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সেক্ষেত্রে একাধিক কারণের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এখানে কার্যকর করা সম্ভব নয়। আল্লাহই অধিক অবগত।

بَابُ الاولياء والاكفاء
অধ্যায় ঃ ওয়ালী ও কুফু প্রসঙ্গে

অধ্যায় ঃ ওয়ালী ও কুফু প্রসঙ্গে

আযাদ, বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্কার বিবাহ তার সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয়, যদিও কোন ওয়ালী এ সংঘটন সম্পন্ন না করে। কুমারী হোক কিংবা অকুমারী হোক।

এ হল আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত—যাহিরের রিওয়ায়াত অনুযায়ী।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে অন্য এক মতে— ওলী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিবাহটি স্থগিত অবস্থায় সংঘটিত হবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নারীদের ভাষ্যে বিবাহ কোন পর্যায়েই সংঘটিত হবে না। কেননা বিবাহ হয়ে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আর বিবাহের ভার তাদের উপর ন্যস্ত করলে সে উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা ওলী অনুমোদনের মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে। আর জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, স্ত্রী লোকটি সম্পূর্ণ তার নিজ অধিকারের মধ্যে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। আর সে হল এর যোগ্য। কেননা, সে বিবেকবান ও ভাল-মন্দের পার্থক্য করায় সমর্থ।

এ কারণেই আর্থিক বিষয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা তার রয়েছে। আর স্বামী নির্বাচন করার অধিকার পাত্রীর রয়েছে।[১] আর ওলীর উপর বিবাহ সম্পাদনের মোতালেবা এজন্যই করা হয়, যাতে পাত্রীর প্রতি নির্লজ্জতা আরোপিত না হয়।

'যাহির রেওয়ায়াত' মতে কুফুর মধ্যে ও কুফু বহির্ভূত বিবাহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে 'কুফু' বহির্ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পন্নই হবে না। কেননা অনেক ঘটনা এমন হয়ে থাকে, যে সম্পর্কে বিবাহের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভবপর হয় না।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহম্মদ (র) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতের অনুকূলে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

সাবালক কুমারী নারীকে বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করার অধিকার ওয়ালীর নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একে নাবালিকার উপর কিয়াস করেন। এই কিয়াসের কারণ এই যে, কুমারী নারী অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বিবাহ বিষয়ে অজ্ঞ। এ কারণেই পিতা তার অনুমতি ছাড়াই তার মোহরের অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

আমাদের দলীল এই যে, সে স্বাধীন নারী। সুতরাং তার উপর অন্য কারো বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকতে পারে না। আর নাবালিকার উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকার

১। অর্থাৎ স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্মতি ও অসম্মতি প্রকাশের অধিকার তার রয়েছে।

কারণ হলো, তার বুদ্ধির অপরিপক্কতা। আর সাবালকত্ব দ্বারা তার বিবেক পূর্ণ হয়েছে। প্রমাণ এই যে, শরীয়তের নির্দেশাবলী তার প্রতি প্রযোজ্য। এর হুকুম ছেলের মত (যে, সাবালক হয়ে গেলে তার উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকে না।) আর আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থার অধিকারের ন্যায় হলো।

আর পিতা মোহরের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্মতি রয়েছে বিধায়। এজন্যই যদি সে নিষেধ করে তবে পিতা তা গ্রহণ করতে পারেন না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়ালী যদি সাবালিকা কুমারীর কাছে 'ইযিন' চায়, আর সে নীরব থাকে কিংবা হেসে দেয় তাহলে একে সম্মতি ধরা হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

البكر تستأمر في نفسها فان سكتت فقد رضيت

কুমারী নারীর কাছে তার ব্যাপারে সম্মতি চাইতে হবে। যদি সে নীরব থাকে তাহলে সে সম্মত আছে বলে ধরা হবে।

তাছাড়া (হাসি ও নীরবতার ক্ষেত্রে) সম্মতির দিকটি প্রবল। কেননা, সে আগ্রহ প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করে; প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে নয়। আর হাসি নীরবতার চেয়ে অধিক সম্মতি প্রকাশক। আর কান্নার অবস্থা এর বিপরীত। কেননা তা অপছন্দও অসন্তুষ্টির লক্ষণ।

আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি শ্রুত বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের ধরনে হেসে থাকে তাহলে সেটা সম্মতি বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি নিঃশব্দে হাসে তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ওয়ালী ছাড়া অন্য কেউ যদি এটা করে,

অর্থাৎ ওয়ালী ছাড়া যদি অন্য কেউ কিংবা নিকটতর ওয়ালীর পরিবর্তে দূরতর ওয়ালী সম্মতি চায় তাহলে কথায় না বললে সম্মতি বোঝা যাবে না।

কেননা এই নীরবতা তার কথার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়ার কারণে হতে পারে। সুতরাং তা সম্মতির পরিচায়ক রূপে গণ্য হবে না, হলেও তা সম্ভাবনা রূপে গণ্য হবে। আর এ ধরনের সম্মতি যে যথেষ্ট মনে করা হয়েছিলো প্রয়োজনের জন্য। আর ওয়ালী ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই।

যে সম্মতি চাইবে সে যদি ওয়ালীর প্রেরিত দূত হয় তাহলে এর হুকুম ভিন্ন। কেননা সে তো ওয়ালীর স্থলবর্তী।

সম্মতি চাওয়ার ব্যাপারে নাম এমনভাবে উল্লেখ করা উচিত, যাতে পরিচয় লাভ হয়।

যাতে সে পাত্রের ব্যাপারে আগ্রহ-অনাগ্রহ স্পষ্ট হয়ে যায়।

মাহরের পরিমাণ উল্লেখ করা শর্ত নয়।

এই বিশুদ্ধ মত, কেননা মোহর নির্ধারণ ছাড়াও বিবাহ শুদ্ধ।

আর যদি ওয়ালী তাকে বিবাহ দেয় আর সে খবর তার নিকট পৌছে এবং সে নীরব থাকে, তাহলে এ নীরবতার হুকুম সে অনুযায়ী হবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।[১]

১. অর্থাৎ সংবাদ দানকারী যদি ওয়ালী বা তার দূত হয় তাহলে তার নীরবতা সম্মতি রূপে গণ্য হবে। আর অন্য কেউ হলে নীরবতা সম্মতির পরিচায়ক হবেনা।

কেননা নীরবতার মধ্যে বোধগম্যতার দিকটি পরিবর্তিত হয় না। খবরদানকারী ব্যক্তি যদি (ওয়ালী বা তার প্রেরিত দূতের পরিবর্তে) ফালতু কোন ব্যক্তি হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে সাক্ষীর সংখ্যা বা সত্যবাদিতার শর্ত আরোপ করা হবে। সাহেবায়ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে সংবাদাতা ওয়ালীর দূত হলে সকলের মতেই উক্ত শর্ত আরোপ করা হবে না। এর আরো কতিপয় নযীর[১] রয়েছে।

যদি পূর্ব বিবাহিতা নারীর নিকট সম্মতি চাওয়া হয় তাহলে তার মুখের কথা দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করা জরুরী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الثيب تشاور। পূর্ব বিবাহিতা নারীর সংগে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া তার পক্ষে কথা বলাকে দূষণীয় মনে করা হয় না। আর যেহেতু এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে লজ্জা হ্রাস পেয়েছে সেহেতু তার জন্য কথা বলায় কোন বাধা নেই।

যদি লম্ফ-ঝম্ফ, জখম কিংবা বিবাহের বয়স পার হয়ে যাওয়ার কারণে কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে, সে কুমারীই গণ্য হবে।

কেননা প্রকৃতপক্ষে সে কুমারী রয়ে গেছে। কারণ তাকে স্পর্শকারী পুরুষ প্রথম স্পর্শকারী ব্যক্তি। এ থেকেই প্রথম ফলকে باكورة এবং দিবসের প্রথম অংশকে بكرة বলা হয়। তাছাড়া অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে স্বভাবতঃই সে লজ্জা বোধ করবে।

যদি যিনার কারণে তার কুমারিত্ব নষ্ট হয় তাহলেও তার হুকুম অনুরূপ,

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী। আর সাহেবায়ন ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার নীরবতা যথেষ্ট নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে ثيب কেননা তাকে স্পর্শকারী পুরুষ মূলতঃ তার প্রতি পুনরাগত। পুনঃপুনঃ অর্থ থেকেই مثابة -مثوبة (প্রত্যাবর্তন-স্থল) ও تثويب (ঘোষণার পর ঘোষণা) শব্দের উৎপত্তি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, মানুষ তো তাকে কুমারী বলেই জানে। সুতরাং মুখে বলার কারণে তারা তাকে লজ্জা দিবে। তাই স্বভাবতঃই সে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। তাই তার নীরবতাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হবে, যাতে তার (বিবাহ সম্পর্কিত) কল্যাণ ও স্বার্থসমূহ নষ্ট না হয়ে যায়।

আর সন্দেহ গ্রস্ততার কারণে কিংবা 'নষ্ট বিবাহের' ভিত্তিতে তার সংগে সহবাস করা হলে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা এর সংগে বিভিন্ন আহকাম যুক্ত করার মাধ্যমে শরীয়ত এটাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যিনার বিষয়টিকে গোপন করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এমনকি যদি তার বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তার নীরবতাকে যথেষ্ট মনে করা হবে না।

স্বামী যদি বলে যে, তোমার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর তুমি নীরব ছিলে; কিন্তু স্ত্রী বললো যে, আমি তো প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

---

১. যেমন উকীলকে অব্যাহতি প্রদান বা বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া।

ইমাম যুফার (র) বলেন, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা নীরবতা হলো মূল অবস্থা এবং প্রত্যাখ্যান হলো আরোপিত অবস্থা।[১] সুতরাং এ ব্যাপার ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেলো (বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে) যার অনুকূলে তিন দিনের ইচ্ছার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর যখন সে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর (বিক্রয় চুক্তি) প্রত্যাখ্যানের দাবী করে।[২]

আমাদের দলীল এই যে, স্বামী বিবাহচুক্তি কার্যকর হওয়ার এবং স্ত্রীর সম্ভোগ-অংগের মালিক হওয়ার দাবী করছে। পক্ষান্তরে স্ত্রী তা রোধ করছে। সুতরাং সে অস্বীকারকারী হলো।[৩] যেমন যার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয় আর সে আমানত ফেরত দেয়ার দাবী করে (তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়)। বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছার শর্ত আরোপের মাসা'আলা এর বিপরীত। কেননা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারাই বিক্রয় চুক্তি অনিবার্য হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

আর যদি স্ত্রীর নীরব থাকার অনুকূলে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তাহলে বিবাহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা সে তার দাবীকে প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টতর করেছে। আর যদি স্বামীর পক্ষে কোন প্রমাণ (সাক্ষী) না থাকে তাহলে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে কসম করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে না। এটা হলো ঐ দু'টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কসম গ্রহণের হুকুম আরোপিত হয় না।

দাওয়া পর্বে ইনশাআল্লাহ্ তা আলোচিত হবে।

ওয়ালী যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাকে বিবাহ দেয় তাহলে সে বিবাহ জায়েয হবে, বালিকা কুমারী হোক কিংবা পূর্ব বিবাহিতা। ওয়ালী হলো আছাবাগণ (মীরাছের ক্ষেত্রে বর্ণিত ক্রম অনুযায়ী পুরুষ আত্মীয়)। পিতা ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের বিষয়ে ইমাম মালিক (র) আমাদের বিরোধিতা করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) পিতা ও দাদা ব্যতীত এবং নাবালিকা পূর্ব বিবাহিতার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।

ইমাম মালিক (র) এর দলীল এই যে, স্বাধীনা নারীর উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করা হয় প্রয়োজনের কারণে। এখানে (অর্থাৎ নাবালেগের ক্ষেত্রে) প্রয়োজন নেই, কাম বৃত্তি না থাকার কারণে। তবে পিতার অভিভাবকত্ব 'নাছ' (বা শরীয়তের বাণী) দ্বারা কিয়াসের বিপরীতে

---

১. সুতরাং স্ত্রী হলো নাবীকারিণী বা বাদিনী। আর স্বামী হলো বিবাদী। কেননা যে মূল অবস্থার উপর অবিচল থাকে সেই হলো বিবাদী। আর যে মূল অবস্থার বিপরীত কোন আরোপিত অবস্থা দাবী করে সে হলো বাদী। আর দলীল প্রমাণ উপস্থিত না হলে বিবাদীর কথাই গ্রহণযোগ্য।

২. অর্থাৎ তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং অপর পক্ষ যে দাবী করছে যে এ লোক ইচ্ছা প্রয়োগ-না করে নীরব ছিলো; সুতরাং এ বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকা অপরিহার্য, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কেননা নীরবতাই হলো মূল অবস্থা আর প্রত্যাখ্যান হলো আরোপিত অবস্থা। সুতরাং যে নীরবতার দাবী করবে (দলীল প্রমাণের অনুপস্থিতিতে) তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. খোলাসা কথা এই যে, বাহ্যতঃ যদিও মনে হয় যে, স্ত্রী বাদিনী হবে এবং স্বামী-বিবাদী হবে। কিন্তু মূল ভাব ও অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বিপরীত হবে। কেননা, প্রকৃত অর্থে স্বামী বিবাহের এবং সম্ভোগ অংগের মালিকানার দাবী করছে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করছে। আর মূল অবস্থা হলো বিবাহ না হওয়া এবং সম্ভোগ অংগের মালিকানা না থাকা। আর মুকদ্দমার ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্যের বাহ্যার্থ বিবেচ্য নয় বরং অন্তর্গত অর্থই বিবেচ্য। একারণেই যার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছে সে যদি তা ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করে তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে প্রকৃত অর্থে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করছে আর আমানতের মালিক ক্ষতিপূরণ দাবী করছে।

সাব্যস্ত হয়েছে। আর দাদা পিতার সম গুণসম্পন্ন নয়। সুতরাং তাকে পিতার সংগে যুক্ত করা যাবে না।

এর জবাবে আমরা বলি (অভিভাকত্ব সাব্যস্ত করা কিয়াস বিরোধী নয়) বরং তা কিয়াসের অনুকূল। কেননা বিবাহের মধ্যে বিভিন্ন কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সাধারণতঃ উভয়ের মধ্যে 'কুফু' ছাড়া অর্জিত হয় না। আর 'কুফু' সব সময় পাওয়া যায় না, তাই 'কুফু'র সুযোগ অর্জনের উদ্দেশ্যে নাবালেগ অবস্থায়ও আমরা অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছি।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যদের হাতে অভিভাবকত্ব অর্পণ দ্বারা কল্যাণ সংরক্ষণ পূর্ণ হয় না। কেননা অন্যদের মাঝে স্নেহের স্বল্পতা ও আত্মীয়তার দূরত্ব রয়েছে। এ কারণেই অন্যরা আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং দেহ সত্ত্বার উপর ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকা আরো স্বাভাবিক। কেননা তা মর্যাদায় অধিকতর উচ্চ ও উত্তম।

আমাদের দলীল এই যে, আত্মীয়তা সম্পর্ক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি প্রেরণাদায়ক; যেমন পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে। আর তাদের মাঝে যে ত্রুটি রয়েছে, তা আমরা প্রকাশ করেছি, বাধ্যতামূলক অভিভাকত্ব রহিত করার মাধ্যমে।[১] আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা পরম্পরায় সংঘটিত হতে পারে। ফলে পরবর্তীতে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবেনা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অভিভাকত্বই প্রতিফলিত হবে। আর ত্রুটি সহকারে বাধ্যতামূলক অভিভাকত্ব সাব্যস্ত হবে না।

দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, পূর্ব বিবাহে যেহেতু অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তাই তা বিচক্ষণতা সৃষ্টির কারণ হিসেবে গণ্য। কাজেই সহজতার জন্য হুকুম ও সিদ্ধান্তকে আমরা 'পূর্ব বিবাহ' এর উপর আবর্তিত করেছি।

আমাদের দলীল আমরা এই মাত্র উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ (নাবালেগের ক্ষেত্রে) প্রয়োজন বিদ্যমান থাকা এবং (পিতা ও দাদার মধ্যে) স্নেহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা। আর কামবৃত্তি ছাড়া বিবাহের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে বিচক্ষণতা সৃষ্টি করে না। সুতরাং হুকুমটি (নাবালেগত্বের) উপর আবর্তিত হবে।

আমাদের পূর্ববর্ণিত বক্তব্যকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী সমর্থন করছে, النكاح الى العصبات

বিবাহ দানের অধিকার আছাবাগণের হাতে অর্পিত।

এখানে অভিভাকবৃন্দের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে আছাবাগণের ধারাবাহিকতা মীরাছের ক্ষেত্রের ধারাবাহিকতার অনুরূপ এবং দূরবর্তী আছাবা (যেমন চাচা) নিকটতর আছাবা (যেমন ভাই)-এর কারণে অভিভাকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

১। অর্থাৎ বাবা ও দাদা ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের মাঝে যেহেতু স্নেহ স্বল্পতা রয়েছে, সেহেতু তাদের অভিভাবকত্ব বাধ্যতামূলক নয়; বরং নাবালক ও নাবালিকা উভয়ে خيار البلوغ বা প্রাপ্ত বয়স্কত্বকালীন ইখতিয়ার লাভ করবে, তখন যদি তারা বিবাহটিকে নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে করে তাহলে তা বহাল রাখবে অন্যথায় তা বাতিল করবে।

পিতা কিংবা দাদা যদি তাদের (অর্থাৎ নাবালেগ বালক বা বালিকার) বিবাহ দেয় তাহলে বালেগ হওয়ার পর তাদের কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

কেননা তারা পূর্ণ বিচক্ষণ এবং পূর্ণ স্নেহশীল। সুতরাং তাদের দ্বারা সংঘটিত হওয়ার কারণে বিবাহ চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, যেমন বালেগ হওয়ার পর তাদের সম্মতিক্রমে সম্পাদন করলে বাধ্যতামূলক হতো।

পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ যদি বিবাহ দেয় তাহলে যখন তারা বালেগ হবে তখন তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখবে আর ইচ্ছা করলে তা রহিত করবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) পিতা ও দাদার উপর কিয়াস করে বলেন, তাদের কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

উপরোক্ত ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, ভাইয়ের আত্মীয়তা ত্রুটিযুক্ত। আর এই ত্রুটি স্নেহ স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং তাতে (বিবাহের) উদ্দেশ্যাবলী বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রাপ্ত বয়স্কতার ইচ্ছাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ সম্ভব।

পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের ক্ষেত্রে (প্রাপ্ত বয়স্কতার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে ইমাম কুদূরীর) নিঃশর্ত বক্তব্য মা ও কাযীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এই হল (ইমাম আবূ হানিফা থেকে বর্ণিত) বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত। কেননা একজনের মাঝে (অর্থাৎ মায়ের মাঝে) বিচক্ষণতার ত্রুটি রয়েছে। আর অপর জনের (কাযী সাহেবের) মাঝে স্নেহের ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং ইচ্ছাধিকার থাকবে।

তবে বিবাহ রহিত করার জন্য আদালতের রায় গ্রহণ শর্ত। স্বাধীনতা লাভকালীন ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন।[১]

কেননা প্রাপ্ত বয়স্কতার ক্ষেত্রে বিবাহ রহিত করা হয় একটি সূক্ষ্ম ক্ষতি রোধ করার জন্য।[২] আর তা হলো (বিবাহের উদ্দেশ্য লাভে) বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এ কারণেই প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার বালক-বালিকা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।[৩]

তাই এটা অন্যের উপর অভিযোগ আনয়নকারী হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং আদালতের ফায়সালার প্রয়োজন হবে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতাকালীন ইচ্ছাধিকার হলো একটি সুস্পষ্ট ক্ষতিরোধ করার জন্য। আর তা হলো স্ত্রীর উপর স্বামীর অতিরিক্ত মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, এ কারণেই উক্ত ইচ্ছাধিকার স্ত্রীর সংগে সম্পৃক্ত। সুতরাং এটাকে রোধ করা (আত্মরক্ষা করা) বলে বিবেচনা করা হবে। আর রোধ করার ব্যাপারে আদালতের ফায়সালার মুখাপেক্ষী নয়।

---

১ অর্থাৎ শুধু একথা বলা যথেষ্ট নয় যে, আমি বিবাহ রহিত করলাম। বরং কাযীর আদালতে আর্জি পেশ করতে হবে। তিনি ফায়সালা জারী করবেন, তখন বিবাহ রহিত হবে।

কিন্তু দাসী স্বাধীনতা লাভ করার পর কাযীর ফায়সালা ছাড়া সে নিজেই বিবাহ রহিত করতে পারে। স্বামী স্বাধীন হলেও তিনি নয়।

২. অর্থাৎ এখানে বিবাহ রহিত করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে বিবাহের উদ্দিষ্ট কল্যাণ ও উপকারিতা অর্জিত না হওয়ার ক্ষতি রোধ করার জন্য। আর এটা অস্পষ্ট বিষয় ফলে বিবাদ সৃষ্টির একটা যৌক্তিক অবকাশ রয়েছে। তাই আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে তা হতে হবে।

৩. বিবাহ রহিত করার ইচ্ছাধিকার দু'টি কারণে সাব্যস্ত হয়। একটি প্রচ্ছন্ন ক্ষতি রোধ করা (আর তা হলো বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া) দ্বিতীয়টি হলো স্পষ্ট ক্ষতি রোধ করা আর তা হলো স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর অধিক সংখ্যক তালাকের মালিক হওয়া। কেননা দাসী স্ত্রীর স্বামী দুই তালাকের মালিক, কিন্তু সে স্বাধীন হওয়া মাত্র স্বামী তিন তালাকের মালিক হয়। যেহেতু প্রথম কারণটি স্বামী স্ত্রী উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু উভয়ে ইচ্ছাধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কারণটি শুধু স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু শুধু স্ত্রী ইচ্ছাধিকার লাভ করে।

অতঃপর ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে নাবালিকা যদি সাবালিকা হয়, এবং বিবাহের কথা জানার পর নীরব থাকে, তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে। আর সে যদি বিবাহের ব্যাপারে অবগত না হয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে যতক্ষণ না অবগত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) মূল বিবাহের বিষয়ে অবগত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা এ বিষয়ে অবগতি ছাড়া বা (বিবাহ বহাল রাখা কিংবা রহিত করার) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না, আর অভিভাবক তার আগোচরেই বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং অজ্ঞতার কারণে তাকে মা'যূর ধরা হবে।

কিন্তু ইচ্ছাধিকারের বিষয়ে অবগত হওয়ার শর্ত নেই। কেননা শরীয়তের আহকাম জানার জন্য তার অবকাশ রয়েছে, আর দারুল ইসলাম হলো ইলমে দীন শিক্ষার স্থান। সুতরাং (শরীয়তের বিধানের বিষয়ে) অজ্ঞতার কারণে তাকে মাযূর ধরা হবে না।

স্বাধীনতা প্রাপ্ত দাসী-স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দাসী ইলম হাসিলের জন্য অবকাশ পায় না। সুতরাং ইচ্ছাধিকার লাভ হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে তাকে মা'যূর ধরা হবে।

কুমারীর ইচ্ছাধিকার নীরবতা দ্বারাই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু বালকের ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। যতক্ষণ না সে বলে যে, "আমি রাজী আছি।" কিংবা এমন কোন কাজ করে, যা দ্বারা সম্মতি বোঝায়। আর এ হুকুম ঐ তরুণীর বেলায় যখন বালেগ হওয়ার পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে। এ হুকুম বিবাহ শুরুর অবস্থার উপর কিয়াস করে দেওয়া হয়েছে।[১]

কুমারীর ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার মজলিসের শেষ পর্যন্ত[২] প্রলম্বিত হবে না। এবং পূর্ব বিবাহিতা নারী ও বালকের ক্ষেত্রে শুধু দাঁড়িয়ে পড়ার কারণে অধিকার বাতিল হবে না।

কেননা এটা স্বামীর সাব্যস্ত করার কারণে সাব্যস্ত হয়নি। বরং (স্নেহ স্বল্পতাজনিত ভিত্তিতে) বিঘ্ন সৃষ্টির ধারণার কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা সম্মতি প্রকাশ দ্বারা বাতিল হতে পারে। তবে কুমারীর ক্ষেত্রে নীরবতা সম্মতির পরিচায়ক।[৩]

পক্ষান্তরে স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার এর বিপরীত। কেননা তা মনিবের সাব্যস্ত করার মাধ্যমে অর্থাৎ আযাদ করার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তাতে মজলিস (সমাপ্ত হওয়া) বিবেচ্য হবে। স্বামী যাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে তার ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে যেমন।[৪]

বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, তা তালাক নয়।

কেননা এ বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, অথচ স্ত্রীর হাতে তালাকের অধিকার নেই। স্বাধীনতার কারণে লব্ধ ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে বিচ্ছেদ হয়, তারও এ হুকুম।

১। অর্থাৎ বিবাহের সূচনা অবস্থায় যেমন কুমারীর ক্ষেত্রে নিরবতা এবং ছাইয়েবার ক্ষেত্রে ও বালকের ক্ষেত্রে মৌখিক উচ্চারণ বিবেচ্য ছিলো; বর্তমান অবস্থায়ও সেটাই বিবেচ্য হবে।

২। অর্থাৎ যে মজলিসে হায়যের রক্ত দেখার মাধ্যমে বালেগা হয়েছে এবং বিবাহের খবর পেয়েছে। কিংবা বালিগ হওয়ার পর যে মজলিসে বিবাহের খবর শুনেছে।

৩। সুতরাং মজলিসে বিষয়টি শোনা মাত্র প্রত্যাখ্যান করতে হবে; কেননা নিরবতা পালন করলে সম্মতি বোঝা যাবে। এজন্য এই ইচ্ছাধিকার মজলিসের শেষ পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে না।

৪। অর্থাৎ স্বামী যে স্ত্রীকে বলেছে, তোমার ইচ্ছা বিবাহ বহাল রাখতে পারো কিংবা রহিতও করতে পারো।

এর কারণ তাই (এমাত্র) আমরা বলেছি । তবে স্বামী যে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা তালাকের অধিকারী স্বামীই তাকে মালিক বানিয়েছে।

বালিগ হওয়ার পূর্বে দু'জনের একজন যদি মারা যায় তাহলে অপরজন তার ওয়ারিশ হবে। তদ্রূপ যদি বালিগ হওয়ার পর বিচ্ছেদের পূর্বে মারা যায়।

কেননা মূল আক্দ তো বিশুদ্ধ আছে। আর সেই বিশুদ্ধ আক্দ দ্বারা (সম্ভোগ অংগের) যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে, তা মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। 'ফুজুল' (ওয়ালী বা ওকীল নয় এমন তৃতীয় ব্যক্তি) কর্তৃক বিবাহ প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন বিবাহ অনুমোদন করার পূর্বে মারা গেলে একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে বিবাহ স্থগিত থাকে। সুতরাং মৃত্যুর মাধ্যমে তা বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেখানে (অর্থাৎ অভিভাবকের বিবাহ প্রদানের ক্ষেত্রে) বিবাহ কার্যকর হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর মাধ্যমে তা স্থিতি লাভ করে।

ইমাম কুদূরী বলেন, দাস কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি অভিভাবক হতে পারে না।

কেননা তাদের নিজেদের উপরই নিজেদের কোন অভিভাকত্ব নেই। সুতরাং অন্যের উপর অভিভাবকত্ব না থাকা আরো স্বাভাবিক। তাছাড়া এ অভিভাবকত্ব হলো কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য। আর অভিভাকত্বের পর এদের হাতে অর্পণ করায় কল্যাণ সংরক্ষিত হয় না।

কোন মুসলমানের উপর কোন কাফেরের অভিভাবকত্ব নেই।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন প্রাধান্যের পথ রাখেন নি। একারণেই মুসলমানের বিপক্ষে কাফিরের সাক্ষী গ্রহণ করা হয় না। এবং একে অপরের ওয়ারিশ হয় না। তবে কাফির পিতার জন্য কাফির সন্তানকে বিবাহ দানের অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

যারা কুফুরি করেছে, তারা একে অপরের অভিভাবক। এ কারণেই কাফিরের বিপক্ষে কাফিরের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়। এবং উভয়ের মাঝে মীরাছও কার্যকর হয়।

আছাবা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরও বিবাহ দানের অভিভাবকত্ব রয়েছে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। অর্থাৎ আছাবা না থাকা অবস্থায় এ হুকুম হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তাদের জন্য অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না। আর এ হলো কিয়াসের দাবী। ইমাম আবূ হানিফা (র) থেকে অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মত দ্বিধান্বিত। তবে প্রসিদ্ধতর বর্ণনা মতে তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র) এর সংগে রয়েছেন।

সাহেবায়নের দলীল হলো ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এ কারণে যে, অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো আত্মীয়তাকে অসম পাত্র বা পাত্রীর সম্পৃক্ততা থেকে রক্ষা করা। আর এই সংরক্ষণ দায়িত্ব আছাবাদের উপর অর্পিত।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এই অভিভাবকত্ব হলো কল্যাণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আর এ লক্ষ্য ঐ ব্যক্তির উপর অর্পণের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে, যে এমন আত্মীয়তা সম্পর্কে সম্পৃক্ত, যা স্নেহ মমতা উদ্রেককারী।

যে নারীর অভিভাবক নেই,

অর্থাৎ আত্মীয়তার দিক থেকে কোন আছাবা নেই, তাকে যদি তার আযাদকারী মনিব **বিবাহ দান করে তাহলে তা জায়েয হবে**। কেননা আযাদকারী মনিবই হচ্ছে শেষ আছাবা।

যদি কোন অভিভাবকই না থাকে তাহলে তার অভিভাবকত্ব অর্পিত হবে ইমাম ও প্রশাসকের উপর।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার কোন অভিভাবক নেই তার অভিভাবক হলেন শাসক।

নিকটতর অভিভাবক যদি যোগাযোগহীন অবস্থায় গায়েব থাকে তাহলে তার চেয়ে দূরবর্তী অভিভাবক তাকে বিবাহ দান করতে পারে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, তা জায়েয হবে না। কেননা নিকটতর অভিভাবকের অভিভাবকত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কারণ আত্মীয়তাকে (অসম পাত্র বা পাত্রীর সম্পৃক্ততা থেকে) রক্ষার উদ্দেশ্যে তার অনুকূলে অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তার অনুপস্থিতির কারণে তা বাতিল হতে পারে না। এ কারণেই নিকটতর অভিভাবক যেখানে রয়েছে, সেখানে যদি সে তাকে বিবাহ দেয় তাহলে তা জায়েয, আর তার অভিভাকত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তো দূরতর ব্যক্তির অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, এই অভিভাবকত্বের উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ সংরক্ষণ। আর যার সুচিন্তিত মতামত থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়, তার উপর অভিভাবকত্ব অর্পণের দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। তাই আমরা দূরতর অভিভাবকের উপর তা অর্পণ করেছি।

আর দূরতর অভিভাবক শাসকের চেয়ে অগ্রগণ্য; যেমন নিকটতর অভিভাবকের মৃত্যুর বেলায় হয়ে থাকে।

যদি নিকটতর অভিভাবক তার অবস্থান ক্ষেত্রে থেকে তাকে বিবাহ দেয় তাহলে (তা কায়েম হওয়ার) বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। আর তা মেনে নিলেও আমরা বলবো দূরতর অভিভাবকের ব্যাপারে আত্মীয়তাগত দূরত্ব থাকলেও ব্যবস্থা গ্রহণের নৈকট্য রয়েছে। আর নিকটতর অভিভাবকের অবস্থা এর বিপরীত। এ কারণে উভয় সমপর্যায়ের ওয়ালীর স্তরে উপনীত হয়। সুতরাং উভয়ের যে কেউ আক্দ সম্পন্ন করলে তা কার্যকর হবে। রদ করা হবে না।

যোগাযোগহীন অবস্থায় গায়েব থাকার অর্থ এমন কোন শহরে থাকা, যেখানে (বাণিজ্য ইত্যাদির) কাফেলা বছরে একবারের বেশী যায় না।

এ মত ইমাম কুদূরী (র) গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে সফরের নিম্ন সময়ের দূরত্ব হলো মাপকাঠি। কেননা সফরের সর্বোচ্চ সময়ের কোন সীমা নেই। পরবর্তীকালের কোন কোন মাশায়েখ এ মত গ্রহণ করেছেন।

কোন কোন মতে মাপকাঠি হলো এমন দূরত্বে থাকা, যে তার মতামত জানার অপেক্ষায় (বিলম্বের কারণে) সম-পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। এটা হলো (চিন্তা ধারার) অধিকতর নিকটবর্তী। কেননা এমতাবস্থায় তার অভিভাবকত্ব অব্যাহত রাখার দ্বারা তার কল্যাণ সংরক্ষিত হয় না।

বিকৃত মস্তিষ্ক নারীর পিতা ও পুত্র উভয়ে যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে বিবাহ দানের ক্ষেত্রে তার পুত্র হলো তার অভিভাবক।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র) এর অভিমত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার পিতাই হলো অভিভাবক। কেননা পুত্রের চেয়ে পিতার স্নেহ অধিকতর। ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, 'আছাবা' হিসাবে পুত্র পিতার চেয়ে অগ্রগণ্য। আর এই অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো 'আছাবা' হওয়ার উপর। স্নেহের আধিক্যের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। যেমন কোন কোন আছাবার তুলনায় নানা (এর স্নেহ অধিক থাকা সত্ত্বেও)। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ পাত্র-পাত্রীর কুফূ

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর কুফূ বিবেচ্য।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولايزوجن الا من الاكفاء

সাবধান, ওয়ালী ছাড়া কেউ যেন নারীদের বিবাহ না দেয় এবং কুফূ ছাড়া যেন তাদেরকে বিবাহ দেওয়া না হয়।

আর এ জন্য যে, সাধারণতঃ দুই সমকক্ষ পাত্র-পাত্রীর মাঝেই (বিবাহের উদ্দিষ্ট) সুষ্ঠুরূপে কল্যাণ সম্পন্ন হয়। কেননা ভদ্র মহিলা নিম্ন শ্রেণীর লোকের 'শয্যা সংগিনী' হওয়া পছন্দ করে না। সুতরাং (স্বামীর দিক থেকে) বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী। স্ত্রীর দিক থেকে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বামী হলো শয্যা ব্যবহারকারী। ফলে শয্যার নিকৃষ্টতা তাকে বিরক্ত করে না।

নারী যদি নিজেই অসম পাত্রের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অধিকার ওয়ালীদের রয়েছে[১]; যেন তারা নিজেদের থেকে অপমানের ক্ষতি রোধ করতে পারে।

কুফূ বিবেচনা করা হবে বংশের মধ্যে।

কেননা বংশ দ্বারা পরস্পর গর্ব করা হয়ে থাকে।

সুতরাং কোরায়শ গোত্র পরস্পর কুফূ এবং আরবরা পরস্পর কুফূ।

এ বিষয়ে মূল সূত্র হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

قريش بعضهم اكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء
لبعض قبيلة بقبيلة والموالى بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل

১। অর্থাৎ আদালতের মাধ্যমে

যে কোরায়শ গোত্র পরস্পর কুফূ। যে কোন শাখা অপর শাখার কুফূ। আর আরবরা পরস্পর কুফূ, যে কোন গোত্র অপর গোত্রের কুফূ। আর অনারব পরস্পর কুফূ। যে কোন লোক অপর লোকের কুফূ।

কোরায়শের মাঝে বংশের দিক থেকে পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য নয়। দলীল হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি বিখ্যাত কোন বংশ হয় তাহলে তা বিবেচ্য হবে, যেমন খলীফা পরিবার। সম্ভবতঃ এটা তিনি বলেছেন খেলাফতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য এবং ফেতনা নিরসনের জন্য। বাহেলীরা সাধারণ আরবের সমকক্ষ নয়, কেননা হীনতার দিক দিয়ে তারা কুখ্যাত।

অনারবদের ক্ষেত্রে যারা দুই বা এর অধিক পুরুষ ধরে মুসলমান তারা পরস্পর কুফূ। অর্থাৎ যারা কয়েক পুরুষ ধরে মুসলমান তাদের।

যে ব্যক্তি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা তার এক পুরুষ (অর্থাৎ শুধু পিতা) মুসলমান, সে ঐ ব্যক্তির কুফূ নয়, যার দুই পুরুষ মুসলমান।

কেননা বংশ পরিচয়ের পূর্ণতা লাভ হয় বাবা ও দাদা দ্বারা।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এক পুরুষকে দুই পুরুষের সংগে যুক্ত করেছেন। যেমন (সাক্ষ্য) পরিচিতির ক্ষেত্রে এই তার মাযহাব।

যে ব্যক্তি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে ঐ ব্যক্তির কুফূ হবে না, যার এক পুরুষ ধরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

কেননা অনারবদের মাঝে ইসলামই হলো গর্বের বিষয়।

স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে কুফূর বিবেচনা ইসলামের ক্ষেত্রে কুফূর সাথে তুলনীয়, ঐ সকল প্রকারে যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

কেননা দাসত্ব হলো কুফ্‌রির ফল। আর তাতে যিল্লতির মর্ম বিদ্যমান। সুতরাং কুফূ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, ধার্মিকতায় অর্থাৎ দীনদারীর ব্যাপারেও কুফূ বিবেচনা করা হবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র) এর মত। এ-ই বিশুদ্ধ।

কেননা দীনদারী হল সর্বোত্তম গর্বের বিষয়। আর স্ত্রীকে স্বামীর বংশ-নীচতার চেয়ে বেশী-লজ্জা দেয়া হয় স্বামীর ফাসেকীর কারণে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দীনদারী কুফূ হিসেবে বিবেচ্য নয়। কেননা তা হল আ-খেরাতের বিষয়। সুতরাং এর উপর দুনিয়ার হুকুমের ভিত্তি হতে পারে না। তবে যদি বিষয়টি এত দূর গড়ায় যে, মানুষ তাকে চড় থাপ্পড় লাগায়, উপহাস করে কিংবা সে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় বের হয়, আর ছেলে পিলেরা তাকে নিয়ে কৌতুক করে, তা'হলে তা বিবেচ্য হবে। কেননা এর ফলে তাকে একেবারে হীন গণ্য করা হয়।

আরো বলেন, আর্থিক ব্যাপারেও কুফূ বিবেচনা করা হবে।

অর্থাৎ স্বামীকে মোহর আদায় ও ভরণ পোষণের পরিমাণ অর্থের মালিক হতে হবে। যাহিরে রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাই বিবেচ্য। সুতরাং যে এ দু'টি কিংবা কোন একটি পরিশোধের ক্ষমতা রাখে না, তাকে কুফূ গণ্য করা হবে না।

কেননা মোহর হলো সম্ভোগ-অংগের বিনিময়। সুতরাং তা পরিশোধ করা জরুরী। আর ভরণ-পোষণ দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের স্থিতি ও স্থায়িত্ব অর্পিত হয়।

আর মোহর দ্বারা ঐ পরিমাণ উদ্দেশ্য, যা নগদ আদায় করার রেওয়াজ রয়েছে। কেননা প্রচলিত রীতিতে বাকী অংশ দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শুধু ভরণ-পোষণের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। মোহরের বিষয়টি বিবেচনা করেননি। কেননা মোহরের বিষয়ে শিথিলতা প্রচলিত রয়েছে। আর পিতার সচ্ছলতার কারণে পুত্রকে মোহর আদায়ে সক্ষম গণ্য করা হয়।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে মালদারীতেও কুফূ বিবেচ্য। সুতরাং শুধু মোহর আদায়ে ও ভরণ-পোষণে সক্ষম ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর সম্পদশালী নারীর কুফূ হতে পারে না। কেননা মানুষ মালদারী নিয়ে গর্ব করে এবং দারিদ্র্যের কারণে লজ্জাবোধ করে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, মালদারী বিবেচ্য নয়। কেননা এর কোন স্থিতি নেই। কারণ সম্পদ এমন বস্তু, যা সকালে আসে বিকেলে যায়।

পেশাসমূহেও কুফূ বিবেচনা করা হবে। এ হলো সাহেবায়নের মত। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দু'টি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে আর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তা বিবেচ্য হবে না, যদি না বড় ধরনের পার্থক্য হয়। যেমন, নাপিত, তাঁতী, চামড়া পাকাকারী, এ জাতীয় (নিম্ন শ্রেণীর পেশাসমূহ)।

এক্ষেত্রে কুফূ বিবেচনা করার কারণ এই যে, মানুষ পেশার আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করে এবং পেশার নিকৃষ্টতার কারণে লজ্জাবোধ করে।

আর অন্যমতের কারণ এই যে, পেশা অবধারিত কোন বিষয় নয়। বরং (যে কোন সময়) নিকৃষ্ট পেশা থেকে উৎকৃষ্ট পেশায় পরিবর্তিত হওয়া সম্ভবপর।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন স্ত্রী লোক যদি নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর তার মাহরে মিছল থেকেও কম মাহর ধার্য করে তাহলে ওয়ালীদের তাতে আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। এ হল ইমাম আবূ হানিফার মত। সুতরাং হয় তার মাহরে মিছল পূর্ণ আদায় করবে কিংবা তাকে পরিত্যাগ করবে।

আর সাহেবায়ন বলেন, তাদের সে অধিকার নেই।

এ মাসা'আলাটি ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে তখনই শুদ্ধ হবে, যখন ওয়ালী ছাড়া বিবাহ হবে বলে মেনে নেওয়া হয়। 'জায়েয আছে' মতের প্রতি তিনি রুজু করেছেন বলে মেনে নেওয়া হয়।

আর তা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত।

আর তাঁর মত পরিবর্তনের ব্যাপারে এ মাসা'আলাটি অভ্রান্ত প্রমাণ।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, দশ দিরহামের উপরে যা হয়, তা তার নিজের হক। আর যে নিজের হক ছেড়ে দেয় তার উপর কোন আপত্তি করা যায় না, যেমন মোহর নির্ধারণের পরে।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, ওয়ালীগণ উচ্চ মোহর নিয়ে গর্ব করে থাকে এবং মোহর স্বল্পতার কারণে লজ্জাবোধ করে থাকে। সুতরাং তা কুফুর সদৃশ হলো।[২] মোহর নির্ধারণের পর তা মাফ করে দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ কারণে কেউ লজ্জাবোধ করেনা।

পিতা যদি তার নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয় এবং তার মোহরে মিছল থেকে পরিমাণ কম করে, কিংবা নাবালেগ পুত্রকে বিবাহ করায় আর তার স্ত্রীর মোহরের মান বাড়িয়ে দেয় তাহলে উভয়ের উপর তা বৈধরূপে কার্যকর হবে। বাবা ও দাদা ছাড়া অন্য কারো জন্য তা বৈধ হবে না।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন বলেন, সাধারণতঃ যে পরিমাণ কম-বেশি লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য, তার চেয়ে বেশী পরিমাণে কম-বেশি করা জায়েয হবে না।

এর অর্থ এই যে, তাদের মতে বিবাহ-আকদ বৈধ হবে না। কেননা, অভিভাবকত্বের উপকারিতা কল্যাণ সংরক্ষণের শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ শর্ত অনুপস্থিত হলে আক্দ বাতিল হয়ে যাবে।

এখানে কল্যাণ সংরক্ষণ অনুপস্থিত হওয়ার কারণ এই যে, (কন্যার ক্ষেত্রে) মোহরে মিছল হতে কম করা এবং (পুত্রের ক্ষেত্রে) বেশী করা কোনক্রমেই তার কল্যাণ সংরক্ষণের অনুকূল নয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। এ কারণেই তো বাবা ও দাদা ছাড়া অন্যেরা তা করতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর দলীল এই যে, (শরীয়তের) হুকুম (বিবাহের বৈধতা) কল্যাণ সংরক্ষণের দলীলের উপর আবর্তিত হবে, এবং তা নিকটাত্মীয়তা আর বিবাহের এমন কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, যা মোহরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে (ক্রয়-বিক্রয় তথা) আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে অর্থই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। আর (কল্যাণ সংরক্ষণের) প্রমাণ নিকটাত্মীয়তা) বাবা ও দাদা ছাড়া অন্যদের মাঝে আমরা পাইনি।

যে ব্যক্তি তার নাবালিগ কন্যাকে কোন দাসের সংগে বিবাহ দিল, কিংবা আপন না বালিগ পুত্রকে কোন দাসী বিবাহ করালো, তার এ বিবাহ দেওয়া ও করানো জায়েয হবে।

গ্রন্থকার বলেন, এগুলো ইমাম আবূ হানীফা (র) এর অভিমত। কেননা এমন কোন কল্যাণের জন্যই কুফুর বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা তার চেয়ে বড়।

১। মোহর নির্ধারণ করার পর তা থেকে কমালে বা মাফ করে দিলে অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার থাকে না।

২। অর্থাৎ সমকক্ষতার বিষয়টি ক্ষুণ্ন হলে যেমন অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে, তেমনি এখানেও অধিকার থাকবে।

সাহেবায়নের মতে এটি প্রকাশ্য ক্ষতি, যেহেতু কুফু নেই। সুতরাং তা জায়েয হবে না। আল্লাহই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ ওকীলের মাধ্যমে বা অন্য কারো মাধ্যমে বিবাহ

চাচাত ভাই তার (নাবালিগ) চাচাত বোনকে নিজের কাছে বিবাহ দিতে (অর্থাৎ নিজে বিবাহ করতে) পারে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, তা জায়েয হবে না।

কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে নিজের সংগে তার বিবাহ করে নেওয়ার অনুমতি দেয় আর সে-দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজের সংগে তার বিবাহ সম্পন্ন করে, তাহলে তা জায়েয হবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা জায়েয হবে না।

উভয়ের দলীল হলো, এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, একই ব্যক্তি মালিক বানাবে এবং নিজেই মালিকনা অর্জন করবে, যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সে ছাড়া কেউ তার ওয়ালী হতে পারে না; আর ওকীলের মধ্যে এ প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল এই যে, বিবাহের ক্ষেত্রে ওকীল নিছক বার্তাবাহক ও বক্তব্য উচ্চারক। আর পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয় হুকুকের ক্ষেত্রে, বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে নয়। আর (স্ত্রী পক্ষের) হকসমূহ তো তার উপর অর্পিত হচ্ছে না। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে ওকীল সরাসরি চুক্তি সম্পন্নকারী। তাই (উভয় পক্ষের) হকসমূহ তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। যখন বিবাহের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দায়িত্ব সে পালন করলো তখন তার 'বিবাহ দিলাম' কথাই (ইজাব ও কবূল) উভয় অংশকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। ফলে (আলাদা শব্দ দ্বারা) গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস ও দাসীর সম্পাদিত বিবাহ স্থগিত থাকবে। মনিব যদি অনুমোদন করে তাহলে জায়েয হবে আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বাতিল হয়ে যাবে। আর অদ্রূপ হুকুম কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দান করে কিংবা কোন পুরুষকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ করায়।

এ হলো আমাদের মাযহাব। কেননা যে কোন চুক্তি কোন 'ফালতু' লোকের পক্ষ হতে সম্পন্ন হয় আর তা অনুমোদন করার মত কোন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে তা অনুমোদন সাপেক্ষে স্থগিতরূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, 'ফালতু' ব্যক্তির যাবতীয় কর্মপদক্ষেপ (চুক্তি সম্পাদন) বাতিল। কেননা আকদ (চুক্তি) প্রবর্তিতই হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফলাফলের জন্য। আর ফালতু ব্যক্তি ফলাফল সাব্যস্ত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তা অর্থহীন। আর আমাদের দলীল এই যে,

আক্‌দে নিকাহের ভিত্তি (ইজাব ও কবুল) যোগ্য ব্যক্তির [১] পক্ষ হতে ব্যবহৃত ও উপযুক্ত স্থানের প্রতি সম্পৃক্ত। আর তা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং তা স্থগিত অবস্থায় সংঘটিত হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এতে কল্যাণ মনে করলে তা কার্যকর করবে। আর কখনো কখনো কার্যকারিতা বিলম্বিত হয়ে থাকে।

কেউ যদি বলে যে, তোমরা সাক্ষী থেকো আমি অমুককে বিবাহ করলাম; অতঃপর তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছালো আর সে তা অনুমোদন করলো তবে তা বাতিল। আর যদি (লোকটির উক্ত কথার পর) অন্য একজন বলে উঠে যে, তোমরা সাক্ষী থেকো আমি তাকে তার কাছে বিয়ে দিলাম। অতঃপর সে মহিলার নিকটে এ খবর পৌঁছলো এবং সে তা অনুমোদন করলো, তাহলে তা জায়েয হবে। অদ্রূপই (হুকুম) যদি স্ত্রী লোকটি উপরোক্ত কথাসমূহ বলে।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কোন নারী যদি কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট নিজেকে বিবাহ দেয় আর তার নিকট এ খবর পৌঁছার পর সে তা অনুমোদন করে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে।

এ মাসা'আলার খোলাসা কথা এই যে, ইমাম আবূ হানিফা ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ হতে ফালতু রূপে কিংবা এক পক্ষে আসল এবং অন্য পক্ষে ফালতু রূপে কার্য সম্পাদন করতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে তা করতে পারে।

যদি দুই ফালতু লোকের মধ্যে কিংবা একজন আসল ও একজন ফালতু লোকের মধ্যে আক্‌দ পরিচালিত হয় তাহলে সকলের মতেই তা জায়েয হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে আদিষ্ট (ওকীল) হতো তা হলে আক্‌দ কার্যকর হতো। সুতরাং ফালতু হয় তবে আক্‌দ স্থগিত থাকবে। আর বিষয়টি খোলা, কিংবা অর্থের বিনিময়ে থেকে প্রদান বা আযাদ করার ন্যায় হলো।[২]

ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, আক্‌দের একটি অংশ মাত্র বিদ্যমান হয়েছে, অপর পক্ষের উপস্থিতির সময়ও এটা আকদের একাংশ বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং তার অনুপস্থিতিতেও এটা আক্‌দের একাংশ বলে বিবেচিত হবে। আর আক্‌দের একাংশ মজলিশ পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত থাকে না। যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।[৩]

আর উভয় পক্ষ হতে আদিষ্ট হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তখন তার কথা আক্‌দকারী উভয় পক্ষের দিকে স্থানান্তরিত হবে। আর দুই ফালতু লোকের মাঝে অনুষ্ঠিত বিষয়টি (ইজাব ও কবুল বিদ্যমান থাকার কারণে) পূর্ণ চুক্তিরূপে গণ্য হবে। অদ্রূপ খোলা ও তার সমগোত্রীয়

১। যোগ্য ব্যক্তি বলতে স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্দেশ্য, আর যথা স্থান দ্বারা ঐ নারী উদ্দেশ্য যে বিবাহকারীর মাহরাম নয় এবং অন্য কোন কারণে তার জন্য হারাম নয়।

২। অর্থাৎ স্বামী যদি বলে যে আমি এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে খোলা করলাম কিংবা তালাক দিলাম কিংবা আযাদ করলাম তাহলে সকলের মতেই এটা এক সঙ্গে দুটি হয়ে যাবে যদিও উভয় তরফ বিদ্যমান নেই, সুতরাং আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হবে।

৩। অর্থাৎ কেউ যদি বলে আমি আমার গোলামকে অমুকের কাছে বিক্রি করলাম। কিন্তু ক্রেতার পক্ষ হতে কেউ কবুল করলনা তাহলেতো বাতিল হবে।

বিষয় দু'টিও (মালের বিনিময়ে তালাক ও আযাদী) পূর্ণ চুক্তি রূপে গণ্য হবে। কেননা তারপক্ষ থেকে এটা শপথ স্বরূপ; এজন্যই তা বাধ্যতামূলক। সুতরাং তা তার একার পক্ষ থেকেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কেউ যদি কোন লোককে আদেশ করে যে, তার সংগে যেন একজন মহিলাকে বিবাহ দেয়। আর সে একই আকদে দু'জন স্ত্রী লোককে তার সংগে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে একজনেরও বিবাহ তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। "কেননা, উভয়ের বিবাহ কার্যকর করার কোন যুক্তি নেই, তার আদেশের বিরোধিতার কারণে। আর অজ্ঞতার কারণে অ-নির্ধারিতভাবে একজনের বিবাহ কার্যকর করার যুক্তি নেই, অজ্ঞতার কারণে। এবং নির্ধারণ করারও কোন যুক্তি নেই, অগ্রাধিকারের কারণ না থাকার কারণে।" সুতরাং বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে গেলো।

কোন অভিজাত ব্যক্তি যদি একজন স্ত্রী লোককে তার সংগে বিবাহদানের জন্য কাউকে আদেশ করল আর সে অন্য একজনের একটি দাসীকে তার সংগে বিবাহ দিয়ে দিল তাহলে জায়েয হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। (এটা বলা হলো) 'স্ত্রী লোক' শব্দটি নিঃশর্ত ও সাধারণ হওয়ার এবং অপবাদের অবকাশ না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) বলেন, কুফূতে বিবাহ না দিলে তা জায়েয হবে না। কেননা নিঃশর্ত শব্দ প্রচলিত অর্থেই প্রয়োগ হয়। আর তাহল কুফূর সহিত বিবাহ দান।

এর জবাবে আমরা বলি, এ ব্যাপারের প্রচলনে (স্বাধীনা নারী ও দাসী) উভয়ে অন্তর্ভুক্ত। কিংবা এটা হলো 'কার্য-সংশ্লিষ্ট' রেওয়াজ, সুতরাং এটা শব্দের অর্থের শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত না।

(মুহাম্মদ (র) মবসূত কিতাবের) ওকালত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাহেবায়নের মতে, এক্ষেত্রে কুফূর বিষয়টি বিবেচনা করা সূক্ষ্ম দলীল ভিত্তিক।

কেননা যে কেউ সাধারণ স্ত্রী বিবাহ করতে অক্ষম হয়ে থাকেনা। সুতরাং সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সমপাত্রী বিবাহ করার জন্যই বলে বোঝা যাবে।

باب المهر

অধ্যায় ঃ মাহর

অধ্যায় ঃ মাহ্‌র

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মাহর নির্ধারণ করা না হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

কেননা আভিধানিক অর্থে নিকাহ্ বা বিবাহ হলো মিলন ও দাম্পত্য বন্ধন। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর বিদ্যমানেই তা সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর মাহর শরীয়তের বিধানে ওয়াজিব সম্পর্কিত স্থানের মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সুতরাং নিকাহ্ শুদ্ধ করার জন্য তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

তদ্রূপ স্ত্রী 'মাহর পাবে না' -এ শর্তে বিবাহ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

এ কারণেই আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি।[১]

এ সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) এর ভিন্ন মত রয়েছে।

মাহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিক্রয় ক্ষেত্রে যা কিছু মূল্য রূপে সাব্যস্ত হতে পারে তা স্ত্রীর মাহর রূপে সাব্যস্ত হতে পারবে। কেননা মাহর হলো স্ত্রীর হক। সুতরাং তার পরিমাণ নির্ধারণের অধিকারও তার হাতেই থাকবে।

আমাদের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

لا مهر اقل من عشرة

দশ (দিরহাম)-এর কমে কোন মাহর নেই। তাছাড়া সম্পর্কিত স্থানের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে এটা শরীয়তের হক। সুতরাং তা সম্মানজনক পরিমাণে নির্ধারিত হতে হবে। আর তা হলো দশ (দিরহাম) চুরির নেছাবের উপর কিয়াস করে।

যদি মাহর দশ দিরহামের কম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে সে দশ দিরহামই পাবে।

এটি আমাদের মাযহাব। ইমাম যুফার (র) বলেন, সে মাহরে মিছল পাবে।

কেননা যা মাহর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় তার নাম লওয়া নাম না লওয়ার মতই।

আমাদের দলীল এই যে, উক্ত পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'ফাসাদ' এসেছে শরীয়তের দাবীতে আর মাহর দশ দিরহামে উন্নীত করার মাধ্যমে শরীয়তের হক রক্ষিত হয়ে গেছে। আর স্ত্রীর হক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দশ দিরহামের কমেও তার সম্মতি প্রমাণ করে যে, দশ দিরহামে সে রাজী আছে।

মাহর নির্ধারণ না করার বিষয়টির উপর কিয়াস করার অবকাশ নেই। কেননা- বদান্যতা হিসাবে বিনিময় ছাড়া মালিকানা প্রদানে সে সম্মত হতে পারে, কিন্তু সামান্য পরিমাণ বিনিময় গ্রহণে সম্মত না-ও হতে পারে।

১। অর্থাৎ বিবাহের হাকীকত ও মূল অর্থে মাহরের বিষয়টি নেই। মাহর শর্ত করা হয়েছে শুধু সম্মান অংশের মর্যাদা প্রকাশের জন্য।

(দশ বা তার কম নির্ধারণের ক্ষেত্রে) **যদি সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে।**

এ হল আমাদের ইমাম ত্রয়ের অভিমত। ইমাম যুফার (র)-এর মতে 'মুত'আ' ওয়াজিব হবে। যেমন কোন মাহর নির্ধারণ ছাড়া (সহবাস-এর পূর্বে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে) হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি দশ দিরহাম বা ততোধিক পরিমাণ মাহর নির্ধারণ করেছে, তার উপর নির্ধারিত মাহর ওয়াজিব হবে যদি সে স্ত্রীর সংগে সহবাস করে থাকে কিংবা সে তাকে রেখে মারা যায়।

কেননা সহবাসের মাধ্যমে বিনিময়কৃত বস্তু সমর্পণ সাব্যস্ত হয়। আর এর দ্বারা বিনিময় লাযেম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মৃত্যুর মাধ্যমে বিবাহ তার শেষ সীমায় উপনীত হয়। আর কোন বিষয় তার শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার দ্বারা স্থিতি ও দৃঢ়তা লাভ করে। সুতরাং তা তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সহই স্থিত হবে।

আর যদি সহবাস ও একান্ত সাক্ষাতের পূর্বে তালাক প্রদান করে তাহলে সে নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক পাবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ

(যদি তাদের 'স্পর্শ' করার পূর্বে তোমরা তাদের তালাক প্রদান করো এবং তাদের জন্য কোন মাহর নির্ধারণ করে থাকো তাহলে যা নির্ধারণ করেছো তার অর্ধেক।)

আর এ বিষয়ে কিয়াসসমূহ বিপরীতমুখী। কেননা একদিকে এখানে স্বামী স্বেচ্ছায় সম্ভোগ অধিকার হাত ছাড়া করেছে অন্যদিকে 'চুক্তিকৃত বস্তুটি' স্ত্রী লোকটির নিকট অক্ষত অবস্থায় ফেরত এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে 'নাছ' হলো নির্ভরযোগ্য।

ইমাম কুদূরী (র) একান্ত সাক্ষাতের পূর্বে তালাক হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা আমাদের মতে, তা সহবাসের সমতুল্য, যেমন আমরা পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ্ বয়ান করব।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি কেউ কোন মাহর নির্ধারণ না করে কিংবা মাহর না দেওয়ার শর্ত নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করে তাহলে সে মাহরে মিছেল পাবে, যদি স্ত্রীর সংগে 'মিলন' হয়ে থাকে কিংবা স্ত্রী রেখে মারা যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, (সহবাসের পূর্বে) মৃত্যুর বেলায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর মিলনের বেলায় শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ মাশায়েখের মতে মাহর ওয়াজিব হবে।

তাঁর দলীল এই যে, মাহর হলো সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর নিজস্ব হক। সুতরাং সুচনাতেই সে না নেওয়ার মত ব্যক্ত করতে পারে, যেমন পরবর্তীতে রহিত করার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের দলীল এই যে, (সূচনাতে) মাহর ওয়াজিব হওয়া শরীয়তের হক, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর পরবর্তীতে অব্যাহত থাকা অবস্থায় তা স্ত্রীর 'হক'-এ পরিণত হয়। তাই সে অব্যাহতি দেওয়ার অধিকার রাখে, সূচনাতে অগ্রাহ্যের অধিকার থাকবে না।

যদি মিলনের পূর্বেই তাকে তালাক দেয় তাহলে সে মুত'আ পাবে।

কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন,

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ

আর তোমরা তাদেরকে মুত'আ দান কর সচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সচ্ছলতার পরিমাণে।

আর (আয়াতে বর্ণিত) আদেশবাচক শব্দের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত মুত'আ ওয়াজিব। আর এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র) এর ভিন্নমত রয়েছে।

আর মুত'আ হলো তার পোশাকের সমপর্যায়ের তিনটি বস্ত্র—কামীছ, ওড়না ও চাদর।

এই নির্ধারণ আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) এর বক্তব্য 'তার পোশাকের সমপর্যায়ের' দ্বারা এদিকে ইংগিত হয় যে, স্ত্রীর অবস্থা বিবেচ্য। ওয়াজিব মুত'আর ক্ষেত্রে এ-ই ইমাম কারখী (র) এর মত। কেননা তা মোহরে মেছেলের স্থলবর্তী। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ... এর উপর আমল হিসাবে স্বামীর অবস্থাই বিবেচ্য হবে। তবে তা মাহরে মেছেলের অর্ধেকের বেশী হতে পারবে না, আবার পাঁচ দিরহামের কমও হবে না। এই বিস্তারিত বিবরণ মবছুত কিতাব থেকে জানা যেতে পারে।

যদি মাহর নির্ধারিত না করেই কোন মহিলাকে বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে কোন মাহর নির্ধারণে সম্মত হয় তাহলে স্ত্রী উক্ত নির্ধারিত মাহরই পাবে, যদি স্বামী তার সাথে মিলিত হয়ে থাকে কিংবা তাকে রেখে মারা যায়। আর যদি মিলিত হওয়ার পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দেয় তবে সে মুত'আ পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর প্রথম অভিমত অনুযায়ী উক্ত নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই মত। কেননা এটা নির্ধারিত মাহর হয়ে গেছে। কুরআনের ভাষ্য (نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) অনুযায়ী তার অর্ধেক হবে।

আমাদের দলীল এই যে, এই নির্ধারণের অর্থ হলো আকদের মাধ্যমে যা ওয়াজিব হয়েছে তা নির্ধারণ করা। আর তা হল মাহরে মেছেল। আর মাহরে মেছেল কখনো অর্ধেক হয় না। সুতরং যা মাহরে মেছেলের স্থলবর্তী করা হয়েছে, তাও অর্ধেক হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী (র) যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, সেখানে আকদের মধ্যে 'নির্ধারণ' উদ্দেশ্য। কেননা নির্ধারণের এ অর্থই প্রচলিত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আকদের পরে যদি স্বামী তার স্ত্রীর মাহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয় তাহলে ঐ বর্ধিত পরিমাণ স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনশাআল্লাহ্‌ এ বিষয়টি আমরা বিক্রিত দ্রব্য এবং তার মূল্য বর্ধিত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

আর এ বর্ধিতকরণ যখন গ্রহণযোগ্য হলো তখন মিলনের আগে তালাক দিলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী মূল মাহরের সংগে বর্ধিত পরিমাণও অর্ধেক হবে। ইমাম আবূ হানিফা ও মহাম্মদ (র) এর দলীল হল, তাদের

মতে অর্ধেক হওয়ায় বিষয়টি আক্‌দের সময় নির্ধারিত মাহরের সংগে বিশিষ্ট; পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে আক্‌দের পরে নির্ধারণ আক্‌দের সময় নির্ধারণের অনুরূপ। যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

যদি স্ত্রী তার নির্ধারিত মাহরের পরিমাণ হ্রাস করে তাহলে এ হ্রাস শুদ্ধ হবে।

কেননা মাহর হলো তার হক। আর (সূচনাতে মাহর নাকচ করার অধিকার না থাকলেও) পরবর্তী অবস্থায় হ্রাসকরণের বিষয়টি মাহরের সংগে যুক্ত হতে পারে।

স্বামী যদি তার স্ত্রীর সংগে একান্তে মিলিত হয় আর সেখানে যৌন সম্ভোগে কোন বাধা না থাকে অতঃপর সে তাকে তালাক দেয় তাহলে সে পূর্ণ মাহর পাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সে অর্ধেক মাহর পাবে। কেননা যে বিষয়ে আক্‌দ হয়েছে অর্থাৎ সম্ভোগ- অংগের মালিকানা, তার পূর্ণভাবে প্রাপ্তি ঘটে সম্ভোগের মাধ্যমে। সুতরাং তা ছাড়া মাহর পাকা হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, স্ত্রী যাবতীয় বাধা দূর করার মাধ্যমে বিনিময়কৃত' সম্ভোগ অংগ' অর্পণ করে দিয়েছে আর এতটুকুই তার সাধ্য ছিলো। সুতরাং বিক্রয় এর উপর কিয়াস হিসাবে 'বিনিময়' এর ক্ষেত্রে তার হক পাকা হয়ে যাবে।

যদি দু'জনের কোন একজন অসুস্থ থাকে কিংবা রমযানের সিয়াম পালন অবস্থায় থাকে, কিংবা ফরয বা নফল হজ্জের ইহরাম অবস্থায় থাকে, কিংবা ওমরার ইহরাম অবস্থায় থাকে, কিংবা স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় 'একান্ত মিলন' শুদ্ধ গণ্য হবে না।

এমন কি সে যদি তালাক দেয় তবে স্ত্রী অর্ধেক মাহর পাবে। কেননা এ বিষয়গুলো সহবাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য। অসুস্থতা অর্থ ঐ অসুস্থতা, যা সহবাসের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। কিংবা সহবাসের দরুন (কোন একজন) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কোন কোন মতে স্বামীর যে কোন অসুস্থতাই যৌন নিস্তেজতা থেকে মুক্ত নয়, (সুতরাং তা প্রতিবন্ধক রূপে গণ্য হবে) উক্ত ব্যাখ্যা শুধু স্ত্রীর অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রমযানের সিয়াম প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ এই যে, সহবাসের কারণে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়।

ইহরামের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সহবাসের কারণে দম ওয়াজিব হয় ইবাদত নষ্ট হয় এবং কাযা ওয়াজিব হয়। আর হায়য তো রুচিবোধ ও শরীয়ত উভয় দিক থেকেই প্রতিবন্ধক।

যদি উভয়ের কোন একজন নফল সিয়াম পালনকারী হয় তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মাহর পাবে।

কেননা 'মুনতাকা' কিতাবের বর্ণনা মতে বিনা ওযরে তার জন্য রোযা ভংগ করা মুবাহ। আর মাহরের ক্ষেত্রে এ অভিমতই বিশুদ্ধ।

এক বর্ণনা মতে কাযা ও নযরের সওম নফল সিয়ামের অনুরূপ। কেননা এতে কাফফারা নেই।

আর (এ ক্ষেত্রে) সালাত সিয়ামের সমতুল্য অর্থাৎ ফরয সালাত ফরয সওমের এবং নফল সালাত নফল সওমের সমতুল্য।

'কর্তিত-পুরুষাঙ্গ' ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সংগে একান্তে মিলিত হয় অতঃপর তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মাহ্র পাবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, তার উপর অর্ধেক মাহর ওয়াজিব হবে। কেননা সে তো অসুস্থ ব্যক্তির চেয়েও অক্ষম। নপুংসক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মাহরের হুকুমটি পুরুষাংগ অক্ষত থাকার উপর আবর্তিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, ('কর্তিত পুরুষাংগ' স্বামীর) স্ত্রীর কর্তব্য হলো দলন ও সোহাগের জন্য নিজেকে সমর্পণ করা, আর সে তা করেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, এই সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে।

সূক্ষ্ম দলীলের ভিত্তিতে সতর্কতার খাতিরে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, কেননা গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে। আর ইদ্দত হলো শরীয়তের এবং (গর্ভস্থ) সন্তানের হক। সুতরাং অন্যের হক বাতিলের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। মাহরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মাহর হল মাল, যা ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরী নয়।

ইমাম কুদূরী (র) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রতিবন্ধকতা যদি শরীয়ত বিষয়ক হয় তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সহবাসের সক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি বাস্তব প্রতিবন্ধকতা থাকে, যেমন অসুস্থতা কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কতা, তাহলে ইদ্দত ওয়াজবি হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষেই সক্ষমতা অনুপস্থিত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে কোন তালাক প্রাপ্তাকে মুত'আ প্রদান করা মুস্তাহাব। শুধু একজন তালাক প্রাপ্তা ব্যতীত । আর সে হল স্বামী মিলনের পূর্বে থাকে তাকাল দিয়েছে। আর (আকদের পরে) তার জন্য মাহর নির্ধারণ করেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এই তালাক প্রাপ্তা ছাড়া আর সকল তালাক প্রাপ্তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব হবে। কেননা তা স্বামীর পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলক দান রূপে ওয়াজিব হয়েছে। কারণ সে তাকে বিচ্ছেদের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্ত করেছে। তবে এই ছূরতে অর্ধেক মাহর মুত'আ রূপেই সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা এ অবস্থায় তালাক অর্থ বিবাহ রহিত করা আর মুতআ একাধিকবার ওয়াজিব হয় না। আর বিনা মাহরে বিবাহে সম্মত নারীর ক্ষেত্রে মুত'আ হলো মাহরে মেছেলের স্থলবর্তী। কেননা তার জন্য মাহরে মেছেল বাদ পড়েছে। এবং মুত'আ ওয়াজিব হয়েছে। আর আক্দ কোন একটি বিনিময় দাবী করে। সুতরাং মুত'আ মাহরের স্থলবর্তী সাব্যস্ত হবে। আর স্থলবর্তী কখনো আসলের সংগে কিংবা তার অংশ বিশেষের সংগে একত্রিত হয় না। সুতরাং কোন পর্যায়ের মাহর ওয়াজিব হওয়ার অবস্থায় মুত'আ ওয়াজিব হতে পারে না।

আর স্ত্রীকে হতাশা গ্রস্ত করার ক্ষেত্রে সে অপরাধী নয়। (কেননা শরীয়তের অনুমোদিত কাজ সে করেছে।) সুতরাং তার উপর দন্ড আরোপিত হতে পারে না। তাই এটা সৌজন্য মূলক দানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেউ যদি আপন কন্যাকে এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহকারী আপন কন্যা কিংবা ভগ্নিকে তার কাছে বিবাহ দিবে, যাতে উভয় আকদের মধ্যে একটি অপরটির বিনিময় হবে; তাহলে উভয় আক্‌দ বৈধ হবে এবং এদের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী মাহরে মেছেল পাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় আক্‌দ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে সম্ভোগ-অংগের অর্ধেককে মাহর এবং বাকি অর্ধেককে বিবাহের আওতাভুক্ত করেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে অংশীদারীত্বের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ইজাব বাতিল হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল এই যে, সে এমন জিনিসের উল্লেখ করেছে, যা মাহর হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং আক্‌দ সহীহ হয়ে যাবে এবং মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে। যেমন কেউ যদি শূকরকে (মাহর রূপে) উল্লেখ করে।

আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া শরীকানা সাব্যস্ত হয় না।[১]

যদি কোন লোক স্বাধীন কোন মহিলাকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, সে তার এক বছর খেদমত করবে কিংবা তাকে কোরআন শিক্ষা দিবে, তবে সে স্ত্রী মাহরে মেছেলের অধিকারী হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, সে স্বামীর (এক বছরের) খিদমতের বিনিময় মূল্য পাবে।

আর কোন দাস যদি মনিবের সম্মতিক্রমে এক বছর খিদমত করার শর্তে কোন মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তা জায়েয হবে। এবং স্ত্রী তার এক বছরের সেবা লাভ করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রে কোরআন শিক্ষা ও খিদমত তার প্রাপ্য হবে। কেননা শর্ত করে যে জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করা যায় তা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মাহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা এভাবেই বিনিময় আদান-প্রদান হতে পারে। বিষয়টি এরূপ হলো যেন সে অন্য একজন স্বাধীন ব্যক্তির সম্মতিক্রমে তার খিদমতের বিনিময়ে বিবাহ করল। কিংবা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর মেষপাল চরানোর শর্তে বিবাহ করল।

আমাদের দলীল এই যে, শরীয়ত যা অনুমোদন করেছে তাহলো মালের বিনিময়ে (সম্ভোগ অধিকার) লাভ করা। আর শিক্ষাদান কোন মাল নয়। তদ্রূপ আমাদের নীতি অনুযায়ী (কোন সত্তার) উপাকরিতা মাল নয়। পক্ষান্তরে দাসের খেদমত মালের বিনিময় লাভ হিসেবে গণ্য। কেননা এখানে গোলামের আপন সত্তা সমর্পণ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি (এর ক্ষেত্রে এরূপ) নয়।

তাছাড়া বিবাহের আকদের মাধ্যমে স্বাধীন স্বামীর খেদমতের হকদার স্ত্রী হতে পারে না। কেননা এতে (বিবাহের) প্রকৃত অবস্থা পাল্টে যায়। অন্য স্বাধীন ব্যক্তির সম্মতিতে তার খেদমতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে কোন বিরোধ নেই। পক্ষান্তরে গোলামের খেদমতের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা মর্মগতভাবে সে তো তার মনিবের খেদমত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে

১. অর্থাৎ সম্ভোগ অংগ যখন মাহর হতে পারলনা তখন তাতে অর্ধ বছর শরিকানা সাব্যস্ত হতে পারল। সুতরাং এটি শর্তে ফাসেদ হবে আর শর্ত ফাসেদ দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না।

স্ত্রীর খিদমত করবে আপন মনিবের সম্মতি ও আদেশক্রমে। স্ত্রীর মেষপাল চরানোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো দাম্পত্য বিষয়াবলী আঞ্জাম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এতে কোন বিরোধ নেই। তাছাড়া এক বর্ণনা মতে এটাও নিষিদ্ধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্বামীর খেদমতের বিনিময় মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা (মোহর রূপে) নির্ধারিত বিষয়টি মূলত: মাল। কিন্তু বিরোধের কারণে স্বামী তা সমর্পণ করতে অক্ষম। সুতরাং বিষয়টি অন্যের গোলামকে মাহর নির্ধারণ করে বিবাহ করার মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে। কেননা খেদমত মাল নয়। কারণ বিবাহের আক্‌দের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামীর সেবা লাভের হকদার হয় না। সুতরাং এটি মদ বা শূকর উল্লেখ করার মতই হলো।

মাহরে মেছেল ওয়াজিব করার কারণ এই যে, চুক্তির মাধ্যমে সেবাকে মাল রূপে সাব্যস্ত করা হয় মানুষের প্রয়োজনের কারণে। সুতরাং যখন বিবাহ চুক্তিতে তা সমর্পণ করা ওয়াজিব হলো না তখন তার বিনিময় মূল্য প্রকাশ পাবে না। ফলে হুকুম তার মূলনীতির উপর রয়ে যাবে। আর তা হলো মাহরে মেছেল।

যদি স্ত্রীকে এক হাযার দিরহামের মাহরে বিবাহ করে আর স্ত্রী তা কবযা করে নেয় এবং স্বামীকে তা হেবা করে দেয় অতঃপর স্বামী মিলনের পূর্বেই তাকে তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে পঁচিশ দিরহাম ফেরত নিবে।

কারণ হেবা বা দানের মাধ্যমে স্বামীর নিকট হুবহু প্রাপ্য জিনিস পৌঁছেনি। কেননা চুক্তি সমূহ ও তা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দিরহাম ও দীনার (নির্ধারিত করলেও) নির্ধারিত হয় না।[১] তদ্রূপ হুকুম হবে যদি মাহর দিরহাম-দীনার ছাড়া পাত্র দ্বারা কিংবা দাড়িপাল্লা দ্বারা পরিমাপকৃত জিনিস যিম্মায় ওয়াজিব হয়। কেননা এক্ষেত্রেও প্রাপ্য বস্তুটি নির্ধাতি নয়।

পক্ষান্তরে যদি হাযার দিরহাম কবযা না করে তা স্বামীকে হেবা করে দেয়; এরপর স্বামী তাকে মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে উভয়ের কেউ অপর জনের নিকট থেকে কিছুই ফিরিয়ে পাবে না।

কিয়াসের দাবী মতে স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামী মাহর ফেরত পাবে। তাই ইমাম যোফার (র)-এর মত। কেননা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণে মাহর তার অনুকূলে অক্ষুণ্ন রয়েছে। সুতরাং মিলন পূর্ব তালাকের মাধ্যমে স্বামী যে অর্ধেক মাহরের অধিকারী হয়েছে, তা থেকে স্ত্রী অব্যহতি পেতে পারে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী এই যে, মিলনের পূর্বে তালাকের মাধ্য যে জিনিস পাওয়ার অধিকারী সে হয়েছে, হুবহু তা তার নিকটে পৌঁছেছে। আর তাহলো অর্ধেক মাহর থেকে তার অব্যাহতি লাভ। আর উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যাওয়ার পর 'কারণের' ভিন্নতা গ্রাহ্য হবে না।

যদি (এক হাযার থেকে) পাঁচশ দিরহাম কবযা করে থাকে অতঃপর উশুলকৃত এবং অ-উশুলকৃত সমগ্র এক হাযার দিরহাম হেবা করে কিংবা (অ-অশুলকৃত) অবশিষ্ট হেবা করে থাকে অতঃপর স্বামী তাকে মিলনের পূর্বে তালাক দেয় তাহলে উভয়ের কেউ অপরজনের নিকট থেকে কোন কিছু ফেরত পাবে না।

১। যেমন নির্দিষ্ট একটি দিরহাম দেখিয়ে কোন জিনিস খরিদ করল তখন খরিদকারী অন্য দিরহামও দিতে পারে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। সাহেবায়ন বলেন, স্ত্রী যা কবযা করেছে তার অর্ধেক স্বামী তার নিকট থেকে ফেরত নিবে। অংশকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে।১

তাছাড়া আংশিক হেবা করার অর্থ হলো পরিমাণ হ্রাস করা। সুতরাং এই হ্রাসকরণ আক্‌দের সংগে যুক্ত হবে। ফলে উশুলকৃত অংশটুকুই হবে কার্যত সমগ্র মাহর। সুতরাং তারই অর্ধেক করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, স্বামীর উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। আর তা হলো কোন বিনিময় ছাড়া অর্ধেক মাহর পুরোপুরি পাওয়া। সুতরাং তালাকের সময় স্ত্রীর নিকট ফেরত দাবী করতে পারবে না।

আর বিবাহের ব্যাপারে হ্রাসকৃত অংশকে আক্‌দের সময় ধার্যকৃত মূল মাহরের সংগে যুক্ত করা হয় না। তুমি কি জান না যে, পরিবর্ধিত অংশকে মূল মাহরের সংগে যুক্ত করা হয় না। এমনকি তা অর্ধেক করা হয় না।

আর যদি অর্ধেকের কম হেবা করে থাকে আর অবশিষ্টটুকু করা কবযা করে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে পূর্ণ অর্ধেক পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট থেকে পাবে।

পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে উশুলকৃত অংশের অর্ধেক ফেরত নেবে।

আর যদি কোন সামান এর বিনিময়ে বিবাহ করে আর স্ত্রী তা কবযা করে কিংবা কবযা না করে স্বামীকে তা হেবা করে দেয়, অতঃপর মিলনের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রী তার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারে না।

কিয়াসের দাবী মতে উক্ত সামানের অর্ধেক মূল্য স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নিবে। আর তা হল ইমাম যোফার (র) এর অভিমত।

কেননা পিছনের আলোচনা অনুযায়ী২ এক্ষেত্রে তো ওয়াজিব স্বয়ং মাহরের অর্ধেক ফেরত দেওয়া।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, তালাকের প্রেক্ষিতে স্বামীর প্রাপ্য হক হলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফরযকৃত জিনিসের অর্ধেক পুরোপুরি পেয়ে যাওয়া। আর তা তার কাছে পৌছে গেছে। এ কারণেই তো সকলের মতেই উক্ত দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য কিছু প্রদান করা। স্ত্রীর জন্য জায়েয না। পক্ষান্তরে মাহর স্বর্ণ রোপ্য হলে বিষয়টি বিপরীত৩। অদ্রূপ স্বামীর নিকট উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সেটাতো বিনিময়ের মাধ্যমে তার কাছে পৌছেছে।

---

১. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সমগ্র মাহর উশুল করতো এবং স্বামীকে তা হেবা করতো অতঃপর স্বামী তাকে মিলনের পূর্বে তালাক প্রদান করতো তাহলে স্বামী উশুলকৃত সমগ্রের অর্ধেক ফেরত নিতো। সুতরাং আংশিক মাহর উশুল করার ছূরতেও উক্ত আংশিকের অর্ধেক ফেরত নিবে। কেননা মূল বিষয় হলো উশুল করা না করা। আংশিকতা বা সামগ্রিকতা মূল বিষয় নয়।

২. আলোচ্য এই-স্ত্রী তাকে অব্যাহতি প্রদানের কারণে পূর্ণ তালাকের মাধ্যমে যে অর্ধ-মাহরের অধিকারী হয়েছে তা থেকে স্ত্রী অব্যাহতি পেতে পারেনা।

৩. অর্থাৎ এ অবস্থায় স্ত্রীর নিকট হতে অর্ধেক মাহর ফেরত নেবে। কেননা–স্বর্ণ (রোপ্য) নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না। সুতরাং স্বামীর প্রাপ্য ফরযকৃত দিরহাম দীনারের অর্ধেকের মাঝে নিহিত নয়। এ কারণেই উক্ত কবযাকৃত দিরহাম দীনারের পরিবর্তে অন্য দিরহাম দীনার প্রদান করা স্ত্রীর জন্য জায়েয রয়েছে।

যদি অনির্ধারিত কোন প্রাণী কিংবা দ্রব্যের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করে তাহলে একই হুকুম।

কেননা ফরযকৃত জিনিসটি ফেরতদানের সময় নির্ধারিত হয়ে যাবে।

এটা এজন্য যে, বিবাহের মাহরের ক্ষেত্রে 'অজ্ঞতাও' গ্রহণযোগ্য। সুতরাং পরে যখন নির্ধারণ করা হয় তখন ধরে নেয় হয় যে, আকদের সময় এ-ই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

যদি এই শর্তে এক হাযার দিরহামের মাহরে তাকে বিবাহ করে যে, তাকে এই শহর থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবে না। কিংবা তার বর্তমানে অন্য কাউকে বিবাহ করবে না। এখন যদি সে শর্ত পুরা করে তাহলে তো স্ত্রী নির্ধারিত মাহ্‌র পাবে।

কেননা এটা মাহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে আর এই পরিমাণের প্রতি তার পূর্ণ সম্মতিও পাওয়া গেছে।

পক্ষান্তরে যদি সে তার বর্তমানে অন্য কাউকে [১] বিবাহ করে কিংবা তাকে এই শহর হতে অন্যত্র নিয়ে যায় তাহলে সে মাহরে মেছ্‌ল পাবে।

কেননা সে এমন একটি বিষয় উল্লেখ করেছে, যাতে স্ত্রীর উপকরা রয়েছে। সুতরাং তার বিপরীত হলে এক হাযার দিরহামের মাহরের প্রতি তার সম্মতিও বিদ্যমান থাকবে না। সুতরাং তার জন্য পূর্ণ মাহরে মেছ্‌ল প্রাপ্য হবে। যেমন এক হাযার দিরহামের সংগে তাকে বখশিশ এবং উপহার দানের কথা উল্লেখ করলে (মাহরে মিছিল ওয়াজিব হয়)।

যদি এই শর্তে বিবাহ করে থাকে যে, স্বামী এ নগরে তার সংগে বাস করলে মাহ্‌র হবে এক হাযার আর এখান থেকে তাকে বাইরে নিয়ে গেলে দু'হাযার। এখন যদি স্বামী তার সংগে এ নগরীতে বাস করে তাহলে স্ত্রী এক হাযার দিরহামই পাবে। আর যদি বের করে নিয়ে যায় তাহলে সে মাহরে মেছ্‌ল পাবে, তবে তা দু'হাযারের বেশী হবে না এবং এক হাযারের কম হবে না।

এ **হল** ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, উভয় শর্তই বৈধ। সুতরাং স্বামী তার সংগে নগরে বাস করলে সে এক হাযার পাবে। আর সেখান থেকে তাকে অন্যত্র নিয়ে গেলে সে দু'হাযার দিরহাম পাবে।

ইমাম যোফার (র) বলেন, উভয় শর্তই ফাসেদ এবং সে মাহরে মেছ্‌ল পাবে, যা এক হাযারের কম হবে না আবার দু'হাযারের বেশী হবে না।

মাস'আলার মূল দলীল 'ইজারা' অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রসংগে বর্ণিত হয়েছেঃ যদি কেউ বলে যে, এটা আজ সেলাই করে দিলে তুমি এক দিরহাম পাবে আর আগামী কাল সেলাই করে দিলে অর্ধ দিরহাম পাবে। এ বিষয়টি ইনশা আল্লাহ আমরা সেখানে আলোচনা করবো।

যদি কোন মহিলাকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, এই গোলামটি কিংবা ঐ গোলামটি হবে মাহ্‌র। পরে দেখা গেল যে, একটি গোলাম কম দামী আর অন্যটি বেশী দামী। এখন যদি তার মাহরে মেছ্‌ল কম দামী গোলামটির চেয়েও পরিমাণে কম হয় তাহলে কম দামী গোলামটিই পাবে। আর যদি তার মাহরে মেছ্‌ল উৎকৃষ্টতর গোলামটির

১। এটা বলে দুটি বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রাণী বা দ্রব্য নির্ধারিত না করেও বিবাহ বৈধ হওয়া। দ্বিতীয়তঃ ফেরত দানের ক্ষেত্রে ফরযকৃত জিনিস নির্ধারিত হয়ে যায়।

চেয়েও অধিক হয় তাহলে সে উৎকৃষ্টতর গোলামটি পাবে। আর যদি মাহরে মেছেল উভয়ের মধ্যবর্তী হয় তাহলে সে মাহরে মেছেল পাবে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। আর সাহেবায়ন বলেন, সর্বাবস্থায় সে কম দামী গোলামটি পাবে।

যদি মিলনের পূর্বে তাকে তালাক দেয় তাহলে সর্বাবস্থায় সে নিম্নতর গোলামটির অর্ধেক পাবে। এ হল সর্বসম্মত মত। সাহেবায়নের দলীল এই যে, নির্ধারিত মাহর সাব্যস্ত করা অসম্ভব হলে তখনই মাহরে মেছেলের দিকে যেতে হয়। অথচ এখানে নিম্নতর গোলামটি ওয়াজিব করা সম্ভব। কেননা নিম্ন মানেরটি তো সুনিশ্চিত। এবং তা মালের বিনিময়ে 'খোলা' করা কিংবা 'আযাদ' করার অনুরূপ হলো।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিবাহের মূল ওয়াজিব হলো মাহরে মেছেল। কেননা তাই হলো অধিকতর ন্যায়সংগত, মাহর নির্ধারণ সঠিক হলেই শুধু তা থেকে সরে আসা যায়। আর এখানে অজ্ঞতার কারণে মাহর নির্ধারণ ফাসেদ হয়ে গেছে। খোলা ও আযাদ করার বিষয়টি এর বিপরীত।[২]

কেননা তার বদলে বিনিময় রূপে কোন কিছু ওয়াজিব নেই। তবে মাহরে মেছেল যদি উৎকৃষ্টতর গোলামের চেয়ে অধিক হয় তাহলে (বলা হবে যে,) স্ত্রী তো (মাহরে মেছেল থেকে) হ্রাস করতে রাজী হয়েছে। আর যদি মাহরে মেছেল নিম্নতর গোলামটির চেয়ে কম হয় তাহলে (বলা হবে যে,) স্বামী তো মাহরে মেছেলের উপর বর্ধিত করতে রাজী হয়েছে। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে মিলন পূর্ব তালাক হলে মুত'আ সাব্যস্ত হয়। আর নিম্নতর গোলামটির অর্ধেক মূল্য সাধারণতঃ মুত'আর চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। সুতরাং তা-ই ওয়াজিব হবে। কেননা স্বামী বর্ধিত পরিমাণে প্রদানে স্বীকৃত হয়েছে।

গুণ বর্ণনা ছাড়া কোন প্রাণীকে মাহর সাব্যস্ত করে যদি বিবাহ করে তাহলে এই মাহর নির্ধারণ শুদ্ধ হবে। আর স্ত্রী ঐ প্রাণীর মধ্যম স্তরের একটি প্রাণী পাবে। আর স্বামীর এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে ঐ প্রাণীটি দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তার মূল্য প্রদান করতে পারে।

গ্রন্থকার বলেন, এই মাসা'আলার অর্থ এই যে, প্রাণীর প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কোন গুণ বর্ণনা করা হয়নি। যেমন ঘোড়া কিংবা গাধা উল্লেখ করে বিবাহ করল। পক্ষান্তরে যদি প্রাণীর প্রকার উল্লেখ না করে, যেমন একটি চতুষ্পদ জন্তুর বিনিময়ে বিবাহ করলো, তাহলে মাহর নির্ধারণ বৈধ হবে না এবং মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ছূরতেই মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁর মতে যা বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য হওয়ার যোগ্য নয়, তা (বিবাহের মাহর রূপে) নির্ধারিত হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ (বিক্রয় ও বিবাহ) উভয়টি (মূলতঃ) বিনিময়ের আদান প্রদান।

---

১. অর্থাৎ যদি বলে যে, এই গোলাম কিংবা ঐ গোলামের বিনিময়ে তোমার বিষয়ে খোলা করলাম কিংবা তোমাকে আযাদ করলাম, তখন নিম্নতর গোলামটি নির্ধারিত হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ শরীয়ত খোলা ও আযাদ করার বদলে কোন কিছু ওয়াজিব করেনি। সুতরাং কেউ যদি বিনিময় উল্লেখ না করে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে থেকে খোলা করলাম বা তোমাকে আযাদ করলাম, তাহলে বিনিময় ছাড়াই তা কার্যকর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে বিনিময় উল্লেখ না করলে, এমনকি বিনিময়ে না থাকার শর্ত আরোপ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হয়।

আমাদের দলীল এই যে, নিকাহের মধ্যে মালের বিনিময় হল এমন জিনিস, যা মাল নয়। সুতরাং বিবাহকে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থ দায় গ্রহণ বলে ধরে নিলাম। তাই মূলতঃ (মালের ধরন সম্পর্কে) অজ্ঞতার কারণে বিবাহ ফাসিদ হবে না। 'দিয়ত' ও দায় স্বীকারের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে[১]।

আর আমরা শর্ত আরোপ করেছি যে, নির্ধারিত মাহরটি এমন মাল হতে হবে যার মধ্যস্তর জানা আছে, যাতে উভয় পক্ষের রেয়ায়েত করা সম্ভব হয়। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন প্রাণীটির প্রকার জানা থাকবে। কেননা একটি প্রকারের ভিতরে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনটি স্তর অন্তর্ভুক্ত। আর মধ্যমটি উত্তম ও অধম উভয়টির অংশ প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে প্রকার অজ্ঞাত থাকলে মধ্যম স্তর নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা প্রাণীর প্রকারের মাঝে জাতিগত ভিন্নতা বিদ্যমান। বিক্রয়ের বিষয়টির ভিন্ন। কেননা বিক্রয়ের ভিত্তি হলো সংকোচন ও দরকষাকষির উপর। পক্ষান্তরে বিবাহের ভিত্তি হলো উদারতার উপর।

আর এখতিয়ার প্রদানের কারণ এই যে, মূল্য ধার্য ছাড়া মধ্যম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আদায় করার ক্ষেত্রে মূল্যই হল আসল। আর গোলাম হলো মাহর রূপে উল্লেখের দিক থেকে আসল। সুতরাং উভয়ের মাঝে এখতিয়ার থাকবে।

যদি গুণ বর্ণনা না করে কোন কাপড় মাহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে তবে স্ত্রী মাহরে মেছেল পাবে।

অর্থাৎ শুধু কাপড় কথাটা উল্লেখ করেছে, এর অতিরিক্ত কোন কিছু বলেনি। এর কারণ এই যে, এখানে প্রকারের বিষয়ে অজ্ঞতা রয়েছে। কেননা কাপড় তো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

যদি প্রকার উল্লেখ করে থাকে, যেমন বললো 'হারাবী' কাপড়, তাহলে এই নির্ধারণ শুদ্ধ হবে এবং (স্বামী মাঝারী ধরনের হারাবী কাপড় কিংবা তার মূল্য প্রদানের) এখতিয়ার প্রাপ্ত হবে।

এর কারণ আমরা (ইতিপূর্বে) বর্ণনা করেছি।

অদ্রূপ (এখতিয়ার প্রাপ্ত হবে) যদি কাপড়ের আরো অতিরিক্ত গুণ বর্ণনা করে থাকে।

এ হুকুম যাহেরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী। কেননা এটা সদৃশ শ্রেণীভুক্ত নয়।

অদ্রূপ হুকুম যদি পাত্র পরিমাপিত কিংবা পাল্লা পরিমাপিত কোন জিনিস উল্লেখ করে এবং তার প্রকার উল্লেখ করে; কিন্তু কোন গুণ উল্লেখ না করে[২]। পক্ষান্তরে যদি প্রকার ও গুণ উল্লেখ করে তাহলে স্বামীকে এখতিয়ার দেওয়া হবে না। কেননা এ জাতীয় গুণ বর্ণিত জিনিস বিশুদ্ধ রূপেই জিম্মায় সাব্যস্ত হয়।

১। অর্থাৎ শরীয়ত দিয়তের ক্ষেত্রে একশ উট ওয়াজিব করেছে, কিন্তু তার গুণ বর্ণনা করেনি; অদ্রূপ কেউ যদি কারো অনুকূলে কোন ঋণ স্বীকার করে বলে যে, অমুক আমার কাছে কোন জিনিস পাবে, তাহলে এই স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

২। যেমন কেউ বললো, এত পরিমাণ গমের বিনিময়ে কিংবা জাফরানের বিনিময়ে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। গমের বা জাফরানের গুণাগুণ বর্ণনা করলো না. এ ক্ষেত্রে স্বামীকে মধ্যম স্তরের গম ও জাফরান কিংবা তার মূল্য প্রদানের এখতিয়ার দেওয়া হবে।

কোন মুসলমান যদি মদ বা শূওরের বিনিময়ে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে। আর স্ত্রী মাহরে মেছেল পাবে। কেননা মাহর রূপে মদ গ্রহণের শর্ত হলো শর্তে ফাসেদ। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে আর শর্ত নাকচ হয়ে যাবে।

বিক্রয় এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতেল হয়ে যায়। তবে মাহর রূপে এর উল্লেখ বৈধ হয়নি। কেননা মুসলমানের জন্য এটা মাল নয়। সুতরাং মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

যদি কোন স্ত্রী লোককে 'এই মটকা ভর্তি সিরকার' বিনিময়ে বিবাহ করে, কিন্তু দেখা গেল যে, তা মদ; তাহলে সে মাহরে মেছেল পাবে।

এই হল আবূ হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, সে এ মটকার সম-পরিমাপের সিরকা পাবে।

আর যদি এই গোলাম এর বিনিময়ে বিবাহ করে, কিন্তু দেখা গেলো যে, সে স্বাধীন মানুষ; তাহলে মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

এহল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন, মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, সে তাকে একটি মালের আশা দিয়েছে, কিন্তু তা অর্পণ করতে অপারগ হচ্ছে। সুতরাং তার মূল্য ওয়াজিব হবে। কিংবা সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে, যদি পরিমাপ জাতীয় দ্রব্য হয়। মাসআলাটি এমন হল, যেমন মাহর রূপে নির্ধারিত গোলাম স্ত্রীর হাতে অর্পণ করার পূর্বে মারা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এখানে (এই শব্দ দ্বারা) ইংগিত এবং (গোলাম শব্দের) উল্লেখ একত্র হয়েছে। সুতরাং ইংগিতটিই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তথা পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে ইংগিতই অধিক কার্যকর[১]। সুতরাং যেন সে মদ কিংবা স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে বিবাহ করেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মূলনীতি এই যে, উল্লেখকৃত জিনিসটি যদি ইংগিতকৃত জিনিসের স্বগোত্রীয় হয় (যেমন গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি) তাহলে আক্‌দ বা চুক্তির সম্পর্ক হবে ইংগিতকৃত জিনিসটির সাথে। কেননা উল্লেখকৃত জিনিসটি সত্তাগতভাবে ইংগিতকৃত জিনিসটির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, আর গুণ তো সত্তার অনুবর্তী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উল্লেখকৃত জিনিসটি ইংগিতকৃত জিনিসের জিন্‌স (বা গোত্র) বহির্ভূত হলে আক্‌দের সম্পর্ক হবে উল্লেখকৃত জিনিসটির সংগে। কেননা (উদ্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে) উল্লেখকৃত জিনিসটি ইংগিতকৃত জিনিসটির সমকক্ষ; তার অনুবর্তী নয়। আর (জিনস বা গোত্র ভিন্ন হওয়ার অবস্থায়) পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে নামোল্লেখ অধিক কার্যকর। কেননা নামোল্লেখ বস্তুর হাকীকতের পরিচয় দেয়। তার ইংগিত বস্তুর সত্তার পরিচয় তুলে ধরে।

দেখুননা, কেউ যদি আংটি খরিদ করে এই শর্তে যে, তা ইয়াকুত পাথরের; কিন্তু পরে দেখা গেলো যে, তা কাঁচ, তাহলে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না। কেননা জিন্‌স ভিন্ন। আর যদি এই শর্তে খরিদ করে থাকে যে, তা লাল ইয়াকুত হবে, কিন্তু দেখা হেল যে, তা সবুজ ইয়াকুত, তাহলে চুক্তি সম্পন্ন হবে। কেননা জিন্‌স এক। এখন আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে দাস

১ কেননা ইংগিত করার অর্থ বস্তুটি নির্দিষ্ট করা। তখন ভিন্ন সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়।

ও স্বাধীন ব্যক্তি হলো এক জিন্‌স। কেননা উপকার লাভের ক্ষেত্রে পার্থক্য কম। আর সিরকার মুকাবেলায় মদ ভিন্ন জিন্‌স। কারণ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

যদি এই দুই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, একজন হলো স্বাধীন লোক, তাহলে সে অপর গোলামটিই শুধু পাবে, যদি তা দশ দিরহামের সম পরিমাণ হয়।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। কেননা এ হলো নির্ধারতি মাহর। আর নির্ধারিত মাহর সাব্যস্ত হওয়ার পর পরিমাণে তা যত কমই হোক, মাহরে মেছেল সাব্যস্ত করতে বাধা দেয়। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন, স্ত্রী গোলামটি পাবে এবং স্বাধীন লোকটি গোলাম গণ্য হলে যে মূল্য হতো সেই মূল্য পাবে। কেননা সে তার স্ত্রীকে উভয় গোলাম পুরোপুরি অর্পণের আশা দিয়েছে। অথচ এখন দু'টির একটিকে অর্পণ করতে অপারগ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, আর যা হল ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত একটি মত তার মাহরে মেছেল যদি গোলামের থেকে বেশী হয় তাহলে সে মাহরে মেছেল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপর গোলামটির মূল্য পাবে। কেননা লোক দুটি উভয়ে যদি স্বাধীন হতো তাহলে তার মতে পূর্ণ মাহরে মেছেল ওয়াজিব হতো। সুতরাং একজন যদি গোলাম হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মাহরে মেছেল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত গোলামটির মূল্য ওয়াজিব হবে।

নিকাহে ফাসিদ এর ক্ষেত্রে মিলনের পূর্বে যদি কাযী উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন তাহলে সে কোন মাহর পাবেনা।

কেননা নিকাহ ফাসিদ হওয়ার কারণে শুধু আকদের কারণে মাহর ওয়াজিব হয় না। বরং সম্ভোগ অংগের ফায়দা অর্জন করার কারণে মাহর ওয়াজিব হয়।

তদ্রূপ নির্জনে সাক্ষাতের পরও (সে মাহর পাবে না।)

কেননা নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে নির্জন সাক্ষাৎ দ্বারা (সহবাসের উপর) সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং নির্জন সাক্ষাৎ মিলনের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হবে না।

আর যদি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকে তাহলে মাহরে মেছেল পাবে। কিন্তু তা নির্ধারণকৃত মাহরের অধিক হতে পারবে না।

এ হল আমাদের মত। ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একে 'ফাসিদ বিক্রয়ের' উপর কিয়াস করেন[১]।

আমাদের দলীল এই যে, (সম্ভোগ অংগের লাভ) অর্জিত বিষয় কোন মাল নয়। মাহর উল্লেখের মাধ্যমেই তা মূল্যদার হয়। সুতরাং যখন নির্ধারিত মাহর মাহরে মেছেলের চেয়ে বেশী হয় তখন মাহর উল্লেখ করণ অশুদ্ধ হওয়ার কারণে অতিরিক্ত পরিমাণটুকু ওয়াজিব হবে না। আর তা মাহরে মেছেলের চাইতে কম হলে নির্ধারিত মাহরের অতিরিক্তটুকু ওয়াজিব হবে না। কেননা অতিরিক্ত পরিমাণটুকু উল্লেখ করা হয়নি। বিক্রয় এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিক্রিত বস্তু তো নিজস্ব সত্তা হিসাবে মূল্যদার মাল। সুতরাং তার (বাজার) মূল্য দ্বারাই তার স্থলবর্তী নির্ধারিত হবে।

১। তিনি বলেন, সে মাহরে মেছেল পাবে, যদিও তা নির্ধারিত মাহর হতে অধিক হয়। অশুদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন একটি গোলাম একশ দিরহামে খরিদ করলো এবং ক্রেতা তা কব্‌যা করলো অতঃপর গোলাম মারা গেলো; তখন ক্রেতাকে গোলামের (বিক্রয় মূল্য নয়, বরং) বাজার মূল্য প্রদান করতে হবে, তার পরিমাণ যতই হোক।

আর ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। যেহেতু সর্তকতার ক্ষেত্রে এবং নসবকে সন্দেহমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সন্দেহযুক্ত বিবাহকে প্রকৃত বিবাহের সংগে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আর ইদ্দতের প্রারম্ভ বিচ্ছেদের সময় থেকে গণ্য করা হবে। শেষ মিলন থেকে নয়।

এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা এ ইদ্দত বিবাহের সন্দেহের কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার নিরসন হচ্ছে বিচ্ছেদ ঘটানোর মাধ্যমে।

আর তার সন্তানের নসব স্বীকৃত হবে।

কেননা সন্তানের জীবন ধারণ নিশ্চিত করার জন্য নসব সাব্যস্ত করার অনুকূলে সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং যে বিবাহ কোন অবস্থায় সাব্যস্ত হয়, সে বিবাহের উপরই নসব সাব্যস্ত হবে।

আর নসবের মিয়াদ গণ্য করা হবে মিলনের সময় থেকে।

এ হল মুহম্মদ (র) এর অভিমত। এবং এর উপরই ফতোয়া। কেননা ফাসিদ নিকাহ্ মিলনের প্রতি প্রেরণা দায়ক নয়। আর এ হিসাবেই বিবাহকে মিলনের স্থলবর্তী গণ্য করা হয়ে থাকে। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্ত্রীর মাহরে মেছেল সাব্যস্ত হবে তার বোন, ফুফু, ও চাচাত বোনদের মাহরের সংগে তুলনা করে।** কেননা ইবনে মাসউদ (র) বলেছেন, সে তার সমগোত্রীয় নারীদের অনুরূপ মাহর পাবে—কমও নয়, বেশীও নয়। আর তারা হলো পিতৃকুলের আত্মীয়া। তাছাড়া মানুষ তার পিতার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রূপে গণ্য হয়। আর কোন জিনিষের মূল্য তার সমগোত্রীয়ের মূল্যের দিকে লক্ষ্য করলেই জানা যায়।

মা ও খালা যদি তার স্বগোত্রীয় না হয়, তাহলে তাদের মাহরের সাথে তুলনা করা যাবে না। এর কারণ উপরে বর্ণনা করেছি। **মা যদি তার পিতার গোত্রীয় হয়, যেমন পিতার চাচাতো বোন, তখন তার মায়ের মাহরের সাথে তুলনা করা যাবে।** কেননা মা তো তার পিতার গোত্রীয়া।

মাহরে মেছেলের ক্ষেত্রে উভয় নারীর বয়সে, সৌন্দর্যে, অর্থ-সম্পদে, জ্ঞানে, ধর্মিকাতায় এবং দেশ-কালের ব্যাপারে সমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

কেননা এ সকল গুণের বিভিন্নতার কারণে মাহরে মেছেল বিভিন্ন হয়ে থাকে। তদ্রূপ দেশ ও কালের ব্যবধানের কারণেও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ফকীহগণ বলেছেন, কুমারিত্বের ক্ষেত্রে মিল হতে হবে। কেননা কুমারিত্ব ও অকুমারিত্বের কারণে মাহরে পার্থক্য হয়ে থাকে। **ওয়ালী যদি মাহরের যামিন হয় তাহলে তার যামানত ছহী হবে।**

কেননা সে দায়দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য এবং দায়িত্ব এমন একটি বিষয়ের সংগে সম্পৃক্ত করেছে যা দায়িত্বভুক্ত হতে পারে। কাজেই যামানত ছহী হবে। **অতঃপর স্ত্রীর মাহর দাবী করার এখতিয়ার থাকবে স্বামীর কাছে কিংবা ওয়ালীর কাছে।** এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে অন্যান্য যামিনদারির উপর কিয়াস করে। তবে ওয়ালী নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে থাকলে স্বামীর নিকট হতে ফেরত নিবে, যদি স্বামীর আদেশে যামিন হয়ে থাকে। যামিনদারির ক্ষেত্রে এ হলো নিয়ম।

স্ত্রী না-বালেগ হলেও এ যামিনদারি ছহী হবে। তবে যদি পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মাল বিক্রি করে এবং মূল্যের যামিন হয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন। কেননা বিবাহের ক্ষেত্রে ওয়ালী নিছক বার্তাবাহক ও বক্তব্য আদায়কারী। পক্ষান্তরে বিক্রির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী। তাই দায়দায়িত্ব তার উপর আরোপিত হয় এবং হকসমূহ তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র) এর মতে তাকে দায়মুক্ত করা ছহী হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে মূল্য ফরয করারও অধিকারী হবে। সুতরাং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওয়ালীকে যদি মূল্যের বৈধ যামিন গণ্য করা হয় তাহলে সে নিজে নিজের জন্য যামিন সাব্যস্ত হবে। আর পিতার জন্য মাহর কব্‌যা করার অধিকার হাসিল হয় পিতৃত্বের দাবীতে, আক্দ সম্পাদনকারী হিসাবে নয়। এ জন্যই না-বালেগা-বালেগ হওয়ার পর মাহর কব্‌যা করার অধিকার পিতার থাকে না। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের জন্য নিজে যামিন হচ্ছে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মাহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী নিজেকে বিরত রাখতে পারে এবং তাকে বাইরে অর্থাৎ সফরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও বাধা প্রদান করতে পারে।

যাতে বদলের ক্ষেত্রে তার হক নির্ধারিত হয়ে যায়, যেমন বদলকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর হক নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর ব্যাপারটি 'বিক্রয়'- এর মত হলো।[১]

স্বামীর এ অধিকার নেই যে, স্ত্রীকে সফর থেকে বাধা দিবে, ঘর থেকে বের হতে বাধা দিবে এবং তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বাধা দিবে, যতক্ষণ না সে পূর্ণ মাহর আদায় করবে।

অর্থাৎ মু'আজ্জাল মাহর (চাহিদা মাত্র দেয় মাহর)।

কেননা আবদ্ধ রাখার হক (স্বামীর জন্য) হাসিল হয় নিজ প্রাপ্য উশুল করার জন্য। অথচ (মাহর) আদায় করার পূর্বে উশুল করার অধিকার স্বামীর নেই।

যদি সবটুকু মাহরই বিলম্বে দেয়া হয় তাহলে স্ত্রীর নিজকে বিরত রাখার অধিকার নেই।

কেননা বিলম্বে আদায়ের অবকাশের মাধ্যমে নিজের হক সে নিজেই রহিত করেছে, যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। তবে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর ভিন্ন মত রয়েছে।[২]

যদি স্বামী তার সংগে মিলিত হয়ে থাকে তাহলেও অনুরূপ হুকুম।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, নিজেকে বিরত রাখার অধিকার স্ত্রীর নেই।

তবে এই মতপার্থক্য হলো ঐ ছুরতে, যখন মিলন তার সম্মতিক্রমে হবে। পক্ষান্তরে বল প্রয়োগের মাধ্যমে হলে কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বিকৃত মস্তিক হলে সকলের মতেই তার নিজেকে বিরত রাখার হক রহিত হবেনা। আর সর্বসম্মতিক্রমে অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে তার সংগে নির্জনে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে। খোরপোষের হকদার হওয়ার বিষয়টিও এর উপর নির্ভর করে। সাহেবায়নের দলীল এই যে, একটি সহবাস কিংবা একবারে নির্জনে সাক্ষাতের মাধ্যমে

১। অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্য বুঝে পাওয়ার পর্যন্ত বিক্রিত দ্রব্য আটক রাখবে।

২। বিলম্বে দেয় মূল্য আদায় না করা পর্যন্ত বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্য আটকে রাখতে পারে না।

চুক্তিকৃত সম্ভোগ অংগ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হয়ে গেছে। এতদ্বারাই পূর্ণ মাহ্‌রের অধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং পরবর্তীতে তার নিজেকে বাধা প্রদানের অধিকার থাকবে না। যেমন- বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করে দেয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিনিময়ের বিপরীতে যা রয়েছে, সে স্বামীর নিকট অর্পণে বিরত রাখছে। কেননা প্রতিটি সহবাসের অর্থ হলো সম্মানযোগ্য সম্ভোগ অংগে ব্যবহার। সুতরাং ঐ সম্ভোগ অংগের মর্যাদা প্রকাশের জন্য কোন মিলনই বিনিময়মুক্ত হবে না।

তবে একটি মিলন দ্বারাই সমগ্র মাহর নিশ্চিত হওয়ার কারণ এই যে, পরবর্তী মিলনগুলো অজ্ঞাত। সুতরাং সেগুলো জ্ঞাত মিলনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। অতঃপর যখন দ্বিতীয় মিলন অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তা জ্ঞাত হয়ে যাবে তখন তার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে এবং মাহর সমগ্র মিলনের মোকাবেলায় গণ্য হবে। যেমন কোন দাস একটি অপরাধ করলে সম্পূর্ণ গোলামটিকে তার বিনিময়ে অর্পণ করতে হয়। অতঃপর আরেকটি এবং আরেকটি অপরাধ করলেও মাহরগুলির বিনিময়েই তাকে অর্পণ করতে হয়।

যখন সে তার প্রাপ্য মাহর পূর্ণ আদায় করে দেবে তখন তাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ তোমরা যেখানে বসবাস করো সেখানেই তাদেরকে বসবাস করাও।

তবে কেউ কেউ বলেছেন, তার নিজের শহর থেকে তাকে অন্য শহরে বের করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা প্রবাস জীবন তার জন্য কষ্টদায়ক হবে। তবে শহরের কাছাকাছি বস্তিগুলোতে প্রবাস সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী লোককে বিবাহ করলো, অতঃপর মাহরের পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখাদিলো, তখন মাহরে মেছেল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য। আর মাহরে মেছেলের অতিরিক্তের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য। আর যদি তার সাথে মিলনের পূর্বে তাকে তালাক দেয় তাহলে অর্ধেক মাহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তালাকের পূর্বে এবং পরে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি সে অল্প পরিমাণের কথা বলে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অল্প পরিমাণের অর্থ হল এমন পরিমাণ, যা মাহর রূপে সমাজে প্রচলিত নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, স্ত্রী লোকটি অতিরিক্তের দাবী করছে। আর স্বামী তা অস্বীকার করছে। আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি সে এমন অল্প পরিমাণের কথা বলে, যাকে বাহ্যিক অবস্থা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, (তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না)। এর কারণ এই যে, সম্ভোগ অংগের উপকার লাভের মূল্য নির্ধারণ অনিবার্য কারণবশতঃ। সুতরাং যখন নির্ধারিত কোন জিনিসকে মাহর সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে তখন মাহরে মেছেলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবেনা।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহম্মদের দলীল এই যে, দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা যার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। আর বাহ্যিক অবস্থা তারই অনুকূলে প্রমাণিত, যার অনুকূলে মাহরে মেছেল সাক্ষ্য দেয়। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতের বিবাহের ক্ষেত্রে এটাই মূলত: যা ওয়াজিব তা হল মাহরে মেছেল। এটা কাপড়ের মালিকের সংগে রঞ্জকের অবস্থার মতো হলো; যখন উভয়ে মজুরির পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ করে। তখন রংয়ের মূল্যকেই মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়।[১]

আর গ্রন্থকার কুদূরী (র) এখানে উল্লেখ করেছেন যে, মিলনের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মাহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা জামেউস ছাগীর ও মাবছূতের বর্ণনা। জামেউল-কবীরে বর্ণিত আছে যে, তার সমস্তরের মুত'আকে এক্ষেত্রে মানদন্ড সাব্যস্ত করা হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহমদ (র) এর মতের কিয়াসের দাবী। কেননা তালাকের পূর্বে মাহরে মেছেলের মত তালাকের পরে মুত'আ ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং মাহরে মেছেলের ন্যায় এ ক্ষেত্রে মুত'আকে মানদন্ড ধরা হবে। তবে এ (মতান্তরের মাঝে) সমন্বয় এরূপ হতে পারে যে, মাবছূত কিতাবে ইমাম মোহম্মদ (র) মাসাআলাটি উপস্থাপন করেছেন এক হাযার এবং দুই হাযার ছূরতের উপর। আর মুত'আ সাধারণত: এই পরিমাণে পৌছে না। সুতরাং মুত'আকে মানদন্ড ধরলে কোন ফলাফল হবে না। পক্ষান্তরে জামেউল কবীরে মাস'আলা উপস্থাপন করেছেন একশ ও দশ দিরহামের ছূরতের উপর আর তার সমান্তরের মুত'আ বিশ দিরহাম হয়ে থাকে। সুতরাং মুত'আকে মানদন্ড ধরার ফলাফল পাওয়া যাবে। আর জামেউস-ছাগীরে পরিমাণ উল্লেখ করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং সেটাকে মাবছূতে উল্লেখিত পরিমাণের উপর প্রযুক্ত ধরা হবে।

বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় উভয়ের মতপার্থক সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর অভিমতের ব্যাখ্যা এই যে, স্বামী যদি এক হাযার দিরহামের দাবী করে আর স্ত্রী দুই হাযার দিরহামের দাবী করে তবে তার মাহরে মেছেল এক হাযার বা তার কম হলে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। আর দুই হাযার কিংবা তার বেশী হলে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে।

উভয় ছূরতে দু'জনের যে কেউ সাক্ষী পেশ করবে তার কথাই গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষী পেশ করে তাহলে প্রথম ছূরতে স্ত্রীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার সাক্ষী অধিক পরিমাণ সাব্যস্ত করছে। আর দ্বিতীয় ছূরতে স্বামীর স্বাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তা (মাহরে মেছেল থেকে) হ্রাসকৃত পরিমাণ সাব্যস্ত করছে।

যদি তার মাহরে মেছেল পনের শ দিরহাম হয় তাহলে উভয়কে কসম করতে হবে। যদি উভয়ে কসম করে নেয় তাহলে পনের শ দিরহাম ওয়াজিব হবে।

১। প্রথমে রং ছাড়া কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। তারপর রংসহ তার মূল্য নিরূপণ করা হবে। অতঃপর লক্ষ করা হবে, যদি তা রঞ্জক দাবীর সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কাপড়ওয়ালার দাবীর সংগে সংগতিপূর্ণ হয় তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এটা হলো ইমাম রাযী (র) এর বের করা মাসআলা। আর ইমাম কারখী (র) বলেন তিনো অবস্থায় উভয়ে কসম করবে। অতঃপর মাহরে মেছেলকে মানদন্ড সাব্যস্ত করা হবে।

আর যদি মূলতঃ মাহর নির্ধারণ সম্পর্কেই মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সকলের মতেই মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

কেননা ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে মাহরে মেছেলই হলো আসল। আর আবু ইউসুফ (র) এর মতে নির্ধারিত মাহর সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং মাহরে মেছেলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

যদি দু'জনের কোন এক জনের মৃত্যুর পর মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে এর হুকুম তাদের জীবদ্দশার মতই হবে।

কেননা দু'জনের কোন এক জনের মৃত্যুর কারণে মাহরে মেছেলের গ্রাহ্যতা রহিত হয় না।

আর যদি উভয়ের মৃত্যুর পর মাহরের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে স্বামীর ওয়ারিশদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। এমন কি পরিমাণ স্বল্পতার বিষয়টিকেও তিনি ব্যতিক্রম ধরেননি। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে স্বামীর ওয়ারিছদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি না তারা খুব অল্প পরিমাণ বলে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে জীবদ্দশায় যে হুকুম ছিলো, এ অবস্থায়ও সেই হুকুমই হবে।

আর যদি মূলতঃ মাহর নির্ধারণ সম্পর্কেই মতবিরোধ হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে যে মাহর অস্বীকার করবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। মোট কথা ইমাম সাহেবের মতে উভয়ের মৃত্যুর পর মাহরে মেছেলকে মানদন্ড ধরা হবে না। ইনশা আল্লাহ্ পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা আলোচনা করবো।

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মারা যায় এমন অবস্থায় যে, স্বামী স্ত্রীর জন্য মাহর নির্ধারণ করেছিলো, তাহলে স্ত্রীর ওয়ারিছদের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঐ নির্ধারিত মাহর উশুল করবে। আর যদি মাহর নির্ধারত না করে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওয়ারিশরা কিছুই পাবে না।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর ওয়ারিছগণ মাহর পাবে। অর্থাৎ প্রথম ছুরতে নির্ধারিত মাহরে আর দ্বিতীয় ছুরতে মাহরে মেছেল পাবে।

প্রথমোক্ত ছুরতের কারণ এই যে, নির্ধারিত মাহরটি স্বামীর যিম্মায় ঋণ রূপে বিদ্যমান রয়েছে, যা মৃত্যুর মাধ্যমে পাকাপোখ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং উক্ত ঋণ তার সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে। তবে যদি জানা যায় যে, স্ত্রী আগে মারা গিয়েছে, তখন উক্ত মাহর থেকে স্বামীর হিসাব বাদ যাবে।

দ্বিতীয় ছুরতে সাহেবায়নের মতামতের কারণ এই যে, নির্ধারিত মাহরের মত মাহরে মেছেলও স্বামীর জিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে। সুতরাং মৃত্যুর দ্বারা এ ঋণ রহিত হবে না। যেমন কোন একজনের মৃত্যুতে মাহরে মেছেল রহিত হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, উভয়ের মৃত্যু প্রমাণ করে যে, তাদের সমসাময়িক লোকেরা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। সুতরাং তাদের মাহরের সাথে তুলনা করে কাযী মাহরে মেছেল নির্ধারণ করবেন?

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট কিছু পাঠালো আর স্ত্রী বললো যে, এটা হাদিয়া বা উপহার ছিলো। পক্ষান্তরে স্বামী বললো যে, এটা মাহরের অংশ বিশেষ ছিলো-তখন স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে,

কেননা সেই হচ্ছে মালিকানা দানকারী। সুতরাং মালিকানার দিক সম্পর্কে সেই অধিক অবগত রয়েছে। কেন তা হবে না? দৃশ্যতঃ এইতো স্বাভাবিক যে, সে তার ওয়াজিব পরিশোধে সচেষ্ট হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তবে আহারযোগ্য খাদ্যদ্রব্যের হলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ঐ সকল উদ্দেশ্য, যা আহারের জন্য প্রস্তুতকৃত। কেননা তা হাদিয়া রূপেই প্রচলিত। পক্ষান্তরে গম ও যবের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওড়না ও কামীজ জাতীয় যেসকল পোষাক দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব, সেগুলোকে সে মোহর হিসাবে গণ্য করতে পারবে না। কেননা বাহ্যিক অবস্থা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ

কোন খৃষ্টান পুরুষ যদি কোন খৃষ্টান নারীকে মৃত জন্তুর বিনিময়ে কিংবা মাহর না দেয়ার শর্তে বিবাহ করে, আর তাদের ধর্মে তা জায়েয থাকে এবং সে ঐ স্ত্রীর সংগে সহবাস করে কিংবা সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেয় কিংবা তাকে রেখে মারা যায় তাহলে স্ত্রী মাহর পাবে না। এরূপই হুকুম যদি দুই হারবী দারুল হরবে এই ভাবে বিবাহ করে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। উভয়েই হারবী হলে তাদের সম্পর্কে সাহাবায়নেরও একই মত। আর যদি যিম্মী হয় সে মাহরে মেছেল পাবে, যদি তাকে রেখে স্বামী মারা গিয়ে থাকে কিংবা তার সাথে সহবাস করে থাকে। আর যদি সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে মুত'আ পাবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয় হারবী হলেও স্ত্রী মাহরে মেছেল পাবে। তাঁর দলীল এই যে, শরীয়ত মাল ছাড়া বিবাহ সংঘটন বৈধ করেনি। আর এই শরীয়ত সার্বজনীন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ব্যাপক ভাবেই বিধান সাব্যস্ত হবে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, হারবীগণ তো ইসলামের বিধানসমূহ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। আর দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে বিধান প্রয়োগ করার ক্ষমতাও অনুপস্থিত।

যিম্মী নারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সুদ, যিনা ইত্যাদি মু'আমালা জাতীয় ক্ষেত্রে তারা আমাদের বিধান পালনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং দেশ এক হওয়ার কারণে বিধান প্রয়োগের কর্তৃত্বও বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, যিম্মীগণ ধর্মীয় বিষয়ে এবং যে সকল মু'আমালায় তারা ভিন্ন আকীদা পোষণ করে, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের বিধান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। আর বিধান প্রয়োগের কর্তৃত্ব অর্জিত হয় তলোয়ারের শক্তি কিংবা যুক্তি প্রমাণে বাধ্য করার মাধ্যমে। অথচ এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণই তাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত যিম্মী চুক্তি বহাল থাকার কারণে। কেননা আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে তাদের ধর্মমতের উপর ছেড়ে দিতে। সুতরাং তারা হারবীদের মতই হয়ে গেলো।

যিনার বিষয়টিই ভিন্ন। কেননা, এটা সকল ধর্মেই হারাম আর সুদের বিষয়টি তাদের সংগে কৃত চুক্তি থেকে বহির্ভূতনবী ছাল্লাল্লাহু আলাহাই ওয়াসাল্লামের এ বাণীর কারণে ঃ

الا من اربى فليس بيننا وبينه عهد -কিন্তু যে সুদ গ্রহণ করবে তার ও আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই।

জামেউস-ছগীর কিতাবে ইমাম মোহম্মদ (র) এর উক্তি أو على غير مهر (কিংবা মাহর ছাড়া) অর্থ মাহর না দেয়ার শর্তও হতে পারে। কিবা মাহর প্রসংগে নীরবতা অবলম্বন করাও হতে পারে।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, মুরদার ও নীরবতা অবলম্বন সম্পর্কে (ইমাম আবূ হানিফা র থেকে) দু'টি বর্ণনা রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, প্রত্যেকটি ছূরতেই মতবিরোধ রয়েছে।

কোন যিম্মী যদি কোন যিম্মী মহিলাকে মদ বা শূওরের বিনিময়ে বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে কিংবা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে স্ত্রী মদ ও শূওর পাবে।

অর্থাৎ যদি উভয়টি নির্দিষ্ট রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং ফরয করার আগেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আর যদি নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে মদের ক্ষেত্রে তার মূল্য এবং শূকরের ক্ষেত্রে মাহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই সে মাহরে মেছেল পাবে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই সে মূল্য পাবে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, ফরযকৃত বস্তুটির মাঝে মালিকানা সংহত করে। সুতরাং তা মূল আকদ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো। কাজেই ইসলামের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, যেমন আকদ করা। তাই (মদ ও শূকর) উভয়টি অনির্ধারিত হলে যে হুকুম হয় তেমনি হবে।

মোট কথা, কবযার অবস্থা যখন আকদের অবস্থার সংগে যুক্ত হলো তখন ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন, আকদের সময় উভয়ে মুসলমান হলে মাহরে মেছেল ওয়াজিব হয়। সুতরাং এখানেও তাই হবে। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, নাম উল্লেখ শুদ্ধ হয়েছে। কেননা তাদের আকীদা মতে উল্লেখিত বস্তু মাল। কিন্তু ইসলামের কারণে এগুলোর অর্পণ করা নিষিদ্ধ হয়েছে, সুতরাং মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন, কবযার পূর্বে নির্ধারিত গোলাম মারা গেলে হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, নির্ধারিত মাহরের ক্ষেত্রে শুধু আকদের দ্বারাই মালিকানা হয়ে যায়। এ জন্যই স্ত্রী কবযা করার পূর্বে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। কবযা দ্বারা স্বামীর যিম্মা থেকে স্ত্রীর যিম্মায় স্থানান্তরিত হয় মাত্র। আর এই স্থানান্তর ইসলাম গ্রহণের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। যেমন ছিনিয়ে নেওয়া মদ ফেরত আনা। পক্ষান্তরে অনির্ধারিত ক্ষেত্রে কবযা নির্দিষ্ট বস্তুর উপর মালিকানা সাব্যস্ত করে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ দ্বারা তা বাধাপ্রাপ্ত হবে। ক্রেতার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্রয়কৃত দ্রব্যে ইচ্ছামত ব্যবহারের মালিকানা কবযার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তো অনির্ধারিতের ক্ষেত্রে যখন ফরয করা অসম্ভব তখন শূওরের মূল্য ওয়াজিব হবে না। কেননা তা 'মূল্যমান' বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার মূল্য গ্রহণ করা শূওর গ্রহণ করারই সমতুল্য। তাদের বিষয়টি অনুরূপ নয়। কেননা এটা সদৃশ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। দেখুন না, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে স্বামী যদি মূল্য প্রদান করতো তাহলে তা গ্রহণে স্ত্রীকে বাধ্য করা হতো শূওরের ক্ষেত্রে। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে নয়। সহবাসের পূর্বে যদি তালাক দেয় তাহলে যারা মাহরে মেছেল ওয়াজিব করেছেন তাঁরা মুত'আ ওয়াজিব বলেন। আর যারা মূল্য ওয়াজিব করেছেন তারা অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব বলেন।

باب نكاح الرقيق

অধ্যায় ঃ দাসের বিবাহ

অধ্যায় ঃ দাসের বিবাহ

মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস ও দাসীর বিবাহ জায়েয নয়।

ইমাম মালিক (র) বলেন, দাসের জন্য বিবাহ করা জায়েয হবে। কেননা সে তালাকের অধিকারী, সুতরাং বিবাহেরও অধিকারী হবে।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ايما عبد تزوج بغير أذن مولاه فهو عاهر

কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী।

তাছাড়া তাদের বিবাহ কার্যকর করলে তাদের খুঁত যুক্ত করা হয়। কেননা দাস ও দাসীর ক্ষেত্রে বিবাহ হলো খুঁত। সুতরাং দাস ও দাসী তাদের মনিবের অনুমতি ছাড়া তা করার অধিকারী হবে না।

মুকাতাব (আযাদীর জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম) সম্পর্কেও তেমনই হুকুম।

কেননা মুকাতাবের সাথে কৃত চুক্তি উপার্জনের ক্ষেত্রে তার বন্ধন মুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং সে বিবাহের ক্ষেত্রে দাসত্বের হুকুমের উপর বহাল থাকবে। এ জন্যই তো মুকাতাব তার গোলামকে বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু তার দাসীকে বিবাহ দিতে পারে। কেননা (দাসীকে বিবাহ দান মাহর ও সন্তান লাভের কারণে) উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ মুকাতাবা দাসী মাওলার অনুমতি ছাড়া নিজেকে বিবাহ দিতে পারে না। কিন্তু নিজের দাসীকে বিবাহ দিতে পারে। তার কারণ এই মাত্র আমরা বর্ণনা করেছি।

মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ সম্পর্কেও একই হুকুম।

কেননা তাদের মাঝে মনিবের মালিকানা বহাল রয়েছে।

দাস যখন তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করবে তখন মাহর তার ঘাড়ে ঋণ রূপে থাকবে এবং তা আদায় করার জন্য তাকে বিক্রয় করা যাবে।

কেননা এটা এমন ঋণ, যা গোলামের গর্দানে ওয়াজিব হয়েছে, এ জন্য যে, যোগ্য পাত্রের পক্ষ থেকে ঋণের কারণ অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর তা মনিবের উপর কার্যকরী হবে। এই কারণে যে, মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতি জারি হয়েছে।

সুতরাং ঋণ পাওনাদারদের ক্ষতিগ্রস্ততা দূর করার জন্য তার ঘাড়ের সাথে ঋণ যুক্ত করে দেয়া হবে। যেমন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ঋণের বেলায়।[১]

মুদাব্বার ও মুকাতাব মাহর পরিশোধ করার জন্য মজুরি করবে। কিন্তু এ কারণে তাদের বিক্রি করা যাবে না।

কেননা মুকাতাব ও মুদাব্বার থাকা অবস্থায় তাদের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সুতরাং তাদের উপার্জন দ্বারা মাহর পরিশোধ করা হবে, তাদের নিজের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা নয়।

১। ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ঋণগ্রস্ত হলে তাকে বিক্রী করে ঋণ শোধ করা হবে।

দাস যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে আর মনিব তাকে বলে যে, তাকে তালাক দাও কিংবা তাকে পরিত্যাগ কর, তবে এটা বিবাহের অনুমতি রূপে বিবেচ্য হবে না। কেননা তা প্রত্যাখ্যান অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কারণ এই আকদ রদ ও বর্জন করাকে তালাক ও পরিত্যাগ বলা হয়ে থাকে। আর অবাধ্য গোলামের ক্ষেত্রে এ-ই অধিক উপযুক্ত কিংবা এ জন্য যে, এ অর্থ নিকটবর্তী। সুতরাং এ অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।

আর যদি তাকে বলে যে, তাকে তুমি এক তালাক দাও, যাতে তোমার রুজু করার অধিকার থাকে, তাহলে এটাকে বিবাহের অনুমতি ধরা হবে।

কেননা তালাকে রিজয়ী বিশুদ্ধ বিবাহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে হয় না। সুতরাং অনুমতি দানের দিকটি নির্ধারিত হয়ে যাবে।

কেউ যদি তার দাসকে বলে যে, এই দাসীকে বিবাহ কর আর সে তাকে অশুদ্ধরূপে বিবাহ করল এবং তার সাথে সহবাস করলো তাহলে তাকে মাহর পরিশোধের জন্য বিক্রি করা যাবে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, সে যখন আযাদ হবে তখন তার নিকট থেকে মাহর আদায় করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর নীতি এই যে, তাঁর মতে বিবাহের অনুমতি শুদ্ধ -অশুদ্ধ উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এ মাহর মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পাবে।

সাহেবায়নের মতে এ অনুমতি বৈধ বিবাহের জন্য কার্যকরী হবে, অবৈধ বিবাহের জন্য নয়। সুতরাং এই মাহর মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পাবে না। অতএব আযাদী লাভের পর তার নিকট থেকে মাহর উসুল করা হবে।

সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, বিবাহের ভবিষ্যত উদ্দেশ্য হলো সতীত্ব ও সুচিতা রক্ষা করা। আর তা বৈধ বিবাহ দ্বারাই অর্জিত হয়। এ কারণেই কেউ যদি কসম করে যে, সে বিবাহ করবে না, তাহলে তা বৈধ বিবাহের ওপরই কার্যকর হবে। বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ফাসেদ বিক্রয় দ্বারাও কোন কোন উদ্দেশ্য হাছিল হয়। আর তাহলো ব্যবহারের মালিকানা।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, 'বিবাহ কর' শব্দটি নিঃশর্ত। সুতরাং তা নিঃশর্ততার উপরই প্রযোজ্য হবে; বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন। আর ফাসিদ বিবাহ দ্বারাও কিছু কিছু উদ্দেশ্য হাছিল হয়, যেমন নসব সাব্যস্ত হওয়া; মাহর ওয়াজিব হওয়া এবং ইদ্দত পালন সহবাসের অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে।

আর আলোচ্য নীতি অনুযায়ী কসমের মাস'আলাটি (ইমাম আবু হানিফার মতে) গ্রহণযোগ্য নয়।

যে ব্যক্তি আপন এমন গোলামকে কোন মহিলার সাথে বিবাহ দিল, যে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত, ঋণগ্রস্ত, তার বিবাহ দান ফাসিদ হবে, আর স্ত্রী মাহর আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের সম অধিকারী হবে।

অর্থাৎ যদি মাহরে মেছেলের উপর বিবাহ হয়ে থাকে। আর ইহা এ জন্য যে, মনিবের অভিভাবকত্বের কারণ হলো তার সত্তার মালিকানার অধিকারী হওয়া। বিষয়টি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

আর বিবাহ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে পাওনদারদের হক নষ্ট করার সাথে যুক্ত নয়। বিবাহ যখন শুদ্ধ হলো তখন এমন একটি কারণে ঋণ সাব্যস্ত হলো, যা 'রদ' করার উপায় নেই। সুতরাং নষ্ট করার কারণে যে ঋণ সাব্যস্ত হয়, আলোচ্য মাহর তার সমতুল্য হল এবং ঋণগ্রস্ত অসুস্থ ব্যক্তির কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার মতো হলো। সুতরাং সে তার মাহরে মেছেলের ক্ষেত্রে পাওনাদারদের সমান অংশীদার হবে।

যে ব্যক্তি তার দাসীকে বিবাহ দিল, তার জন্য তাকে স্বামীর ঘরে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া জরুরী নয়। বরং সে মনিবেরই খেদমত করবে। আর স্বামীকে বলা হবে যে, যখন তুমি সুযোগ পাবে তখন তার সাথে মিলিত হবে।

কেননা, খেদমত গ্রহণের ব্যাপারে মনিবের হক বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বামীর ঘরে অবস্থানে সে হক নষ্ট করা হয়।

যদি মনিব তাকে স্বামীর ঘরে তার সঙ্গে অবস্থান করতে দেয় তাহলে সে খোরপাষ অবস্থান পাওয়ার অধিকারী হবে, অন্যথায় নয়।

কেননা খোরপোষ তো হলো (স্বামীর ঘরে) আবদ্ধ থাকার বিনিময়ে।

আর যদি মনিব বাঁদীকে (স্বামীর সঙ্গে) কোন গৃহে থাকতে দেয়, এবং তাকে পুনরায় নিজে খেদমতে ফিরিয়ে আনা সমীচীন মনে করে তাহলে সে তা করতে পারে।

কেননা মালিকানা বিদ্যমান থাকার কারণে তার খেদমত গ্রহণের হক বহাল রয়েছে। সুতরাং স্বামীর ঘরে পাঠানোর কারণে তা রহিত হবে না। যেমন বিবাহের কারণে রহিত হয় না।

গ্রন্থকার বলেন, (জামেউস-ছাগীর কিতাবে) দাস ও দাসীকে মনিবের বিবাহ দানের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের সম্মতির কথা বলেননি। ইহা আমাদের মাযহাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, মনিব দাস ও দাসীকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে দাসকে বাধ্য করার অধিকার নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও এই মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে। কেননা বিবাহ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর গোলাম মনিবের মালিকানার অধীন হয়েছেন মাল হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়। সুতরাং সে তাকে নিজের ইচ্ছায় বিবাহ দানের অধিকারী হবে না। দাসীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে দাসীর সম্ভোগ অংগের অধিকারী। সুতরাং সে অন্যকে ঐটির মালিক বানাতে পারবে।

আমাদের দলীল এই যে, বিবাহ দানের উদ্দেশ্য হলো তার মালিকানাধীন জিনিসের হেফাযত ও সংশোধন। কেননা এতে দাসকে যিনা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হয় আর যিনা হল হালাক ও ক্ষতি হওয়ার কারণ। সুতরাং দাসীর উপর কিয়াস করে বলা যায় যে, মনিব তাকে বিবাহ দানের অধিকারী হবে।

মুকাতাব দাস ও দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ব্যবহারের অধিকারের দিক থেকে তারা স্বাধীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের সম্মতির শর্ত থাকবে। **মূল গ্রন্থকার বলেন, মনিব তার দাসীকে বিবাহ দেওয়ার পর স্বামীর সহবাসের পূর্বেই তাকে হত্যা করে, তাহলে এ দাসীর জন্য কোন মাহর নেই।**

এ হল ইমাম আবু হানীফা। (র) এর মত। আর সাহেবায়ন দাসীর স্বাভাবিক মৃত্যুর উপর কিয়াস করে বলেন, মনিবের অনুকূলে স্বামীর উপর মাহর সাব্যস্ত হবে। আর তা এই জন্য যে, নিহত ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময়ই মারা গিয়েছে। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তি তাকে হত্যা করার মতই হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, অর্পণ করার পূর্বে বিনিময়কৃত জিনিসটিকে (তথা সম্ভোগ অংগকে) মনিব আটকে দিয়েছে। সুতরাং বিনিময় (তথা মাহর)-কে আটকে দেয়ার মাধ্যমে তার শোধ গ্রহণ করা হবে। যেমন হুকুম স্বাধীন নারী যখন মুরতাদ হয়ে যায়। আর দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে হত্যাকে বিনষ্ট করা ধরা হয়েছে। এ জন্যই তো কিছাছ এবং দিয়াত ওয়াজিব হয়। সুতরাং মাহরের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে।

স্বাধীন স্ত্রীলোক যদি স্বামীর সহবাসের পূর্বে আত্মহত্যা করে তবে তার মাহর আদায় করতে হবে। ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মুরতাদ হওয়ার উপর এবং মনিব তার দাসীকে হত্যা করার উপর একে কিয়াস করেন। আর (উভয়ের মাঝে) সে ব্যপারে মিল রয়েছে, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

আমাদের দলীল এই যে, দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে আত্ম-অপরাধ ধর্তব্য নয়। সুতরাং এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর সমপর্যায়ের হবে। আর মনিব তার দাসীকে হত্যা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দুনিয়ার বিধানে তা ধর্তব্য। এ কারণেই মনিবের উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়।

কেউ যদি দাসীকে বিবাহ করে তাহলে 'আয্ল' করার ক্ষেত্রে অনুমতির বিষয়টি মনিবের সাথে সম্পৃক্ত।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) এর মতে অনুমতির বিষয়টি দাসীর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা সহবাস হলো দাসীর হক, তাইতো সহবাস দাবী করার অধিকার তার জন্য সাব্যস্ত। আর 'আয্লে'র মাধ্যমে তার হক নষ্ট করা হয়। সুতরাং তার সম্মতির শর্ত আরোপিত হবে-স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেমন। তবে নিজের মালিকানাধীন দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (মনিবের নিকট) সহবাস দাবী করার অধিকার দাসীর নেই। সুতরাং তার সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না।

জাহেরী রেওয়ায়াতের দলীল এই যে, 'আয্ল' সন্তান লাভের উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করে। আর তা হলো মনিবের হক। সুতরাং তার সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। আর এর দ্বারাই দাসীর বিষয়টি স্বাধীন স্ত্রীলোক থেকে ভিন্ন হয়ে গেলো।

যদি দাসী তার মনিবের অনুমতি ক্রমে বিবাহ করে অতঃপর সে স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে তার জন্য ইখতিয়ার হাসিল হবে। তার স্বামী স্বাধীন হোক কিংবা দাস হোক

কেননা স্বাধীনতা লাভ করার পর হযরত বারীরা (রা) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ملكت بضعك فاختاري (তুমি তোমার সম্ভোগ অংগের অধিকারিণী হয়েছো, সুতরাং তুমি ইখতিয়ার প্রয়াগ করতে পারো)

এখানে সম্ভোগ অংগের মালিকানাকে নিঃশর্ত রূপে কারণ বলা হয়েছে। সুতরাং (স্বামী-স্বাধীন বা দাস হওয়া) উভয় অবস্থাকেই অন্তর্ভূক্ত করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) আমাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। সেক্ষেত্রে প্রথম স্বামী স্বাধীন। উক্ত হাদীস তাঁর বিপক্ষে দলীল।

তাছাড়া এ কারণে যে, স্বাধীনতা লাভের সময় তার উপর স্বামীর মালিকানা বৃদ্ধি পায়। কেননা স্বাধীনতার পর স্বামী তিন তালাকের অধিকারী হয়। সুতরাং অতিরিক্ত মালিকানা রোধ করার জন্য মূল আকদকে রহিত করার অধিকার সে লাভ করবে।

মুকাতাব নারীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

অর্থাৎ যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে অতঃপর স্বাধীনতা লাভ করে। আর ইমাম যুফার (র) বলেন, তার কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা বিবাহের আক্দ তার সম্মতি ক্রমেই তার উপর কার্যকরী হয়েছে, এবং সেই মাহর পাবে। সুতরাং তার জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত করার কোন মানে নেই। দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (বিবাহের ক্ষেত্রে) তার সম্মতি ধর্তব্য নয়।

আমাদের দলীল এই যে, স্বাধীনতার পর মালিকানা বৃদ্ধিই হলো ইখতিয়ারের কারণ, আর তা মুকাতাবা নারীর ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি। কেননা মুকাতাবা নারীর ইদ্দত ছিলো দুটি হায়য এবং তার তালাকের সংখ্যা ছিলো দুটি।

দাসী যদি তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে অতঃপর স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

কেননা দাসী বক্তব্য প্রদানের অধিকারিণী। তবে তার বক্তব্যের কার্যকারিতা রহিত ছিলো মনিবের হকের কারণে, আর তা এখন দূর হয়ে গেছে।

তবে তার কোন এখতিয়ার থাকবেনা।

কেননা বিবাহ কার্যকর হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের পর। সুতরাং (স্বামীর) মালিকানা বৃদ্ধি সাব্যস্ত হচ্ছে না। স্বাধীনতা লাভের পর নিজেকে বিবাহ দিলে যেমন হতো।

যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া এক হাযার দিরহামের উপর বিবাহ বসে অথচ তার মাহরে মেছেল হলো একশ দিরহাম। অতঃপর স্বামী তার সাথে সবাস করলো এবং মনিব তাকে আযাদ করে দিল। তাহলে পূর্ণ মাহর মনিবের জন্য হবে।

কেননা, স্বামী যে ফায়দা হাছিল করেছে তা মনিবের মালিকানাধীন ছিল।

আর যদি সহবাসের পূর্বে মনিব তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে মাহর স্ত্রীর জন্যই সাব্যস্ত হবে।

কেননা স্বামী স্ত্রীর মালিকানাধীন ফায়দা হাছিল করেছে।

এখানে মাহর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত এক হাযার দিরহাম। কেননা, স্বাধীনতা লাভের মাধ্যম যে বিবাহ কার্যকর হচ্ছে, তা আক্দের অস্তিত্বের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং মাহরের নির্ধারণ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত মাহর সাব্যস্ত হবে। এ জন্যই তো স্থগিত বিবাহের ক্ষেত্রে (যেমন কোন ফজুল ব্যক্তি বিবাহ দান করল) সহবাস দ্বারা মাহর সাব্যস্ত হয় না। কেননা বিবাহের কার্যকারিতাকে পূর্ববর্তী আক্দের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে আক্দ অভিন্ন রয়ে গেছে। সুতরাং সে আকদ একটি মাহরই ওয়াজিব করবে।

কেউ যদি আপন পুত্রের দাসীর সংগে সহবাস করে, আর দাসী তার দ্বারা সন্তান জন্ম দেয় তাহলে দাসীটি তারই 'উম্মে ওয়ালাদ' হয়ে যাবে। আর পুত্রের অনুকূলে পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে তার উপর কোন মাহর ওয়াজিব হবে না।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, যদি পিতা উক্ত সন্তানের দাবী করে।

এর কারণ এই যে, জীবন ধারণের প্রয়োজনে পুত্রের মালের মালিকানা ব্যবহারের অধিকার পিতার রয়েছে। সুতরাং বীর্যের হিফাজতের প্রয়োজনে পুত্রের দাসীর মালিকানা হাসিলের অধিকারও তার থাকবে। তবে বংশ রক্ষার প্রয়োজন জীবন রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে নিম্ন স্তরের। এ কারণেই দাসীর মালিকানা লাভ করবে মূল্য দ্বারা। আর খাদ্যের মলিকানা সাব্যস্ত হবে মূল্য ছাড়া। অবশ্য এ মালিকানা সাব্যস্ত হবে সন্তান উৎপাদনের পূর্ব মুহূর্তে। কেননা সন্তান লাভ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি শর্ত। কেননা প্রকৃত মালিকানা কিংবা মালিকানার হক হলো সন্তান লাভকে বিশুদ্ধতা দানকারী। অথচ এর কোনটাই পিতার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত নয়। এ জন্যই তো উক্ত দাসীকে পিতা বিবাহ করতে পারে। সুতরাং মালিকানা অগ্রবর্তী হওয়া জরুরী। এতে প্রকাশিত হবে হয়ে, সহবাস তার মালিকানাতে সংঘটিত হচ্ছে, সুতরাং তার উপর ওয়াজিব হবে না।[১]

ইমাম যুফার ও শাফেয়ী (র) বলেন, ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁরা সন্তান লাভের (শর্ত রূপে নয়, বরং) হুকুম (বা ফল) রূপে মালিকানা সাব্যস্ত করেন, যৌথ মালিকানার দাসীর ক্ষেত্রে যেমন যে থাকে।[২] আর কোন কিছুর হুকুম বা ফল তার পশ্চাদ্বর্তী হয়ে থাকে। মাস'আলাটি সুপরিচিত।[৩]

গ্রন্থকার বলেন, পুত্র যদি তার দাসীকে পিতার নিকট বিবাহ দান করে আর সে সন্তান প্রসব করে তাহলে দাসীটি পিতার 'উম্মে ওয়ালাদ' হবেনা। এবং পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে না, বরং তার উপর মাহর ওয়াজিব হবে। আর দাসীর পুত্রটি স্বাধীন হবে।

১। স্বাধীনা স্ত্রীর মাহরে মেছেল আর দাসীর ক্ষেত্রে (বাকেরা) কুমারী হলে মূল্যের এক দশমাংশ এবং সায়্যেবা (কুমারী) হলে তার অর্ধেক عقر বলা হয়।

২। অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের যৌথ মালিকানায় যদি দাসী থাকে এবং সন্তান প্রসবের পর পিতা যদি উক্ত সন্তানের নসব দাবী করে, তাহলে নসব সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং 'উকর' (عقر) সাব্যস্ত হয়। অথচ এক ধরনের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এতে প্রমাণ করে যে, সহবাসের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা মালিকানাকে অগ্রবর্তী করি যাতে সন্তান উৎপাদনের বিষয়ই মালিকানার বাইরে না হয়। আর এখানে যেহেতু এক ধরণের মালিকানা পূর্ব হতেই বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু মালিকানাকে অগ্রবর্তী করার প্রয়োজন নেই।

৩। অর্থাৎ আমাদের মতে সন্তান উৎপাদনের পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হতে হয়। কেননা এটা সন্তান উৎপাদন শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে সন্তান উৎপাদিত হওয়ার পর তার অনিবার্য পরিণতি রূপে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক এ কারণে যে, আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি যে, পুত্রের দাসীর মাধ্যমে পিতার সন্তান উৎপাদন বৈধ আর বৈধতার পূর্বশর্ত হলো মালিকানার মধ্যে সংঘটিত হওয়া। এ কারণেই তো অন্যের দাসীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন বৈধ নয়। সুতরাং তার এ পদক্ষেপকে হারাম হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য মালিকানাকে অগ্রবর্তী করা অপরিহার্য।

কেননা আমাদের মতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেছে। ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের যুক্তি এই যে,) এই দাসী পিতার মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। লক্ষ্য করছেন না কি যে, সকল দিক থেকে পুত্র এই দাসীর মালিক। সুতরাং কোন দিক থেকেই পিতার পক্ষে দাসীর মালিক হওয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ পুত্র ঐ সকল ব্যবহারের অধিকারী যার পর আর পিতার মালিকানা থেকে থাকলেও তা বিদ্যমান থাকতে পারে না। সুতরাং এটা পিতার মালিকানা না থাকা প্রমাণ করে। তবে মালিকানায় সন্দেহ্ থাকার কারণে যিনার হদ রহিত হয়।

মোট কথা, বিবাহ যখন শুদ্ধ হয়ে গেল তখন বিবাহের কারণে তার বীর্য সংরক্ষিত হয়ে গেলো। ফলে দাসত্ব সূত্রে আর মালিকানা সাব্যস্ত হলো না। সুতরাং দাসীটি আর পিতার উম্মে ওয়ালাদও হলোনা। আর পিতার উপর ঐ দাসীটির মূল্য এবং সন্তানটির মূল্য ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো তাদের মালিক হয়নি, তবে বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে পিতার উপর মাহর লাযিম হবে। আর দাসীর পুত্র স্বাধীন হবে। কেননা তার ভাই তার মালিকানা লাভ করেছে। ফলে আত্মীয়তার কারণে সে তার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার বলেন, কোন স্বাধীন স্ত্রীর স্বামী যদি দাস থাকে এবং সে স্ত্রী স্বামীর মনিবকে বলে যে, তাকে আমার পক্ষ হতে এক হাযারের বিনিময়ে আযাদ করে দিন। মনিব তাই করলো, তখন বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, ফাসিদ হবে না।

আসল বিষয় এই যে, আমাদের মতে আদেশদাতার পক্ষ থেকে আযাদী সংঘটিত হয়। এ কারণেই দাসের উত্তরাধিকার আদেশদাতার হক। আর এই আদেশদাতা যদি এই আযাদকরণ দ্বারা কাফফারার নিয়ত করে তাহলে কাফফারার দায় থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র) এর মতে (যাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে) তার পক্ষ হতেই আযাদ সংঘটিত হবে।

কেননা আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করেছে যেন সে নিজের গোলামকে আদেশদাতার পক্ষ থেকে আযাদ করে, আর তাতো অসম্ভব। কেননা মানুষ যে গোলামের মালিক নয়, তাকে সে আযাদ করতে পারে না, তাই তার আদেশ প্রদান শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আদিষ্টের পক্ষ থেকেই আযাদ করণ সাব্যস্ত হবে। আমাদের দলীল এই যে, এটি শুদ্ধ করা সম্ভব অবস্থার কাহিদার মালিকানা অগ্রবর্তী করার মাধ্যমে। কেননা তার পক্ষ থেকে আযাদকরণ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিকানা হলো পূর্বশর্ত। সুতরাং আদেশদাতার 'আযাদ কর' কথাটির অর্থ হবে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তার পক্ষ থেকে তাকে মালিক বানানোর দাবী। অতঃপর আদেশদাতার পক্ষ হতে আদেশ দাতার গোলামকে আযাদ করার আদেশ প্রদান। আর আদেশকৃত ব্যক্তির 'আযাদ করলাম' কথাটার অর্থ হবে, প্রথমে তার পক্ষ হতে আদেশদাতাকে মালিক বানানো অতঃপর তার পক্ষ হতে তাকে আযাদ করা। যখন আদেশদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হলো তখন বিবাহ ফাসিদ হয়ে গেলো। এই দুই মালিকানার মাঝে বৈপরীত্ব থাকার কারণে।

যদি স্ত্রী বলে যে, আমার পক্ষ হতে আযাদ করুন, আর কোন মালের কথা উল্লেখ না করে, তাহলে বিবাহ ফাসিদ হবে না। আর আযাদকারীর জন্য ولاء সাব্যস্ত হবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এই ছূরত এবং প্রথমটি অভিন্ন। কেননা, তিনি 'আদেশদাতার 'কার্য'-কে শুদ্ধ করার জন্য বিনিময় ব্যতীত মালিকানাকে অগ্রবর্তী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। কবযার বিষয়টি এখানে রহিত হয়ে যাবে। যেমন কারো উপর যিহারের কাফ্ফারা ওয়াজিব হলো আর সে অন্যকে তার পক্ষ থেকে (ফকিরকে) খাওয়ানোর আদেশ দিল।

আর আবূ হানিফা ও মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, শরীয়তের 'নাস্স' দ্বারা হেবার ক্ষেত্রে কব্যা শর্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এটাকে রহিত করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি চাহিদার প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়। কেননা এ হল প্রত্যক্ষ গোচর কাজ। বিক্রয়-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ হল শরীয়ত সম্মত কাজ। আর যিহারের কাফফার ক্ষেত্রে (আহার গ্রহণকারী) ফকীর, কব্যা করার ক্ষেত্রে আদেশদাতার স্থলবর্তী হচ্ছে। অথচ গোলামের হাতে কিছু আসছেনা, যাতে (তা গ্রহণের ক্ষেত্রে) সে আদেশদাতার স্থলবর্তী হতে পারে।

باب نكاح اهل الشرك

অধ্যায় ঃ মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ

অধ্যায় ঃ মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ

কাফির যদি সাক্ষী ছাড়া কিংবা অন্য কাফিরের ইদ্দতের মাঝে বিবাহ করে আর তা তাদের ধর্মে বৈধ হয়ে থাকে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ বহাল রাখা হবে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয় ছুরতেই বিবাহ ফাসিদ। তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কিংবা সিদ্ধান্ত চেয়ে আদালতে মামলা উত্থাপনের পূর্বে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

প্রথম ছুরতে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। আর দ্বিতীয় ছুরতে ইমাম যুফার (রহ.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন।

ইমাম যুফার (র) এর দলীল এই যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শরীয়তের সম্বোধন সার্বজনীন। সুতরাং এ সম্বোধন তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। তবে তাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা হবে না তাদের সাথে যিম্মী চুক্তির কারণে। আর উপেক্ষা করার ভিত্তিতে, স্বীকৃতি প্রদানের ভিত্তিতে নয়।

তবে যদি শাসকবর্গের নিকট তারা বিচার দায়ের করে কিংবা ইসলাম গ্রহণ করে; অথচ নিষিদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে, তখন বিচ্ছেদ ঘটানো ওয়াজিব হবে। সাহেবায়নের দলীল এই যে, ইদ্দত পালনকারী নারীর বিবাহের নিষিদ্ধতা সর্বসম্মত বিষয়, সুতরাং তারাও তা পালনের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ। পক্ষান্তরে সাক্ষী ছাড়া বিবাহের নিষিদ্ধতার বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। আর তারা আমাদের শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধান মতপার্থক্যসহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেনি।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, হুরমত ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের হক রূপে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা শরীয়তের হক সমূহ আদায় করার ব্যাপারে সম্বোধিত নয়। তদ্রূপ স্বামীর হক হিসাবে ইদ্দত সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা স্বামী এটি তার হক বলে আকিদা রাখে না। পক্ষান্তরে সে কোন মুসলমানের বিবাহাধীন থাকলে ভিন্ন কথা, কেননা স্বামী এটাকে নিজের হক বলে বিশ্বাস করে।

যাই হোক, যখন বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেলো তখন আদালতে বিচার দায়ের এবং ইসলাম গ্রহণ হলো বিবাহের পরবর্তী অবস্থা আর বিবাহের পরবর্তী অবস্থায় সাক্ষ্য শর্ত নয়। তদ্রূপ ইদ্দতও বিবাহের পরবর্তী অবস্থার পরিপন্থী নয়। যেমন কোন বিবাহিতার সংগে সন্দেহ বশতঃ সহবাস হয়ে গেলো।[১]

১। তখন পূর্ব বিবাহ বাকি থাকা সত্ত্বেও এই সহবাসের কারণে ইদ্দত পালন করতে হয়।

কোন মজূসী যদি তার মা কিংবা কন্যাকে বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তখন উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

কেননা সাহেবায়নের মতে মাহরাম বিবাহের বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রেও বাতিল বলে গণ্য, যেমন ইদ্দত পালন করা (কাফির নারীকে বিবাহ করার) প্রসংগে আলোচনা করে এসেছি। আর এখন ইসলাম গ্রহণের কারণে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয় পড়েছে। সুতরাং বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এ বিবাহের বৈধতা রয়েছে। তবে মাহরাম হওয়া বিবাহের স্থায়িত্বের অবস্থার পরিপন্থী, সুতরাং ইসলামের কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ইদ্দতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বিবাহ স্থায়িত্বের পরিপন্থী নয়।

আর দু'জনের এক জনের ইসলাম গ্রহণর কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কিন্তু (ইসলামের বিধান জানতে চেয়ে) আদালতে এক জনের মামলা দায়েরের কারণে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না। এ হল আবু হানীফা (র) এর মত।

সাহেবায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন।

এই পার্থক্যের কারণ এই যে, বিবাহের স্থায়িত্বের ব্যাপারে এক জনের অধিকার অন্য জনের মামলা দায়েরের কারণে বাতিল হয় না। কেননা এতে তো তার আকীদা ও বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় না। পক্ষান্তরে কুফুরির ব্যাপারে অনড় ব্যক্তির বিশ্বাস মুসলিমের ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কারণ ইসলামের স্থান সর্বোচ্চে, নিম্নস্তরে নয়।

যদি উভয়ে মামলা-দায়ের করে তাহলে সকলের মতেই বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

কেননা উভয়ের মামলা দায়েরের অর্থ হলা উভয়র পক্ষ থেকে (কাযীকে) বিচারক হিসেবে মেনে নেয়া।

মোরতাদের জন্য কোন মুসলিম নারী, কিংবা কাফির নারী কিংবা মোরতাদ নারীকে বিবাহ করা জায়েয নয়।

কেননা সে তো হত্যাযোগ্য। তাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, শুধু চিন্তা করার প্রয়োজনে। আর বিবাহ তাকে চিন্তা থেকে অন্যমনস্ক করবে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে বিবাহ শরীয়ত অনুমোদিত হবে না।

তদ্রূপ মোরতাদ নারীকেও কোন মুসলিম কিংবা কোন কাফির বিবাহ করতে পারে না।

কেননা সে চিন্তাভাবনার জন্য আবদ্ধ থাকবে। অথচ স্বামীর সেবা তাকে চিন্তাভাবনা থেকে অন্যমনস্ক করে দিবে। তাছাড়া উভয়ের মাঝে বিবাহ সম্পর্কিত কল্যাণসমূহ সুষ্ঠুভাবে সাঙ্গাম পাবে না। অথচ বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজস্ব সত্তাগত কারণে বৈধতা লাভ করেনি, বরং সংশ্লিষ্ট কল্যাণ সমূহের কারণে।

স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি মুসলমান হয় তাহলে সন্তান তারই ধর্মের উপর গণ্য হবে তদ্রূপ যদি উভয়ের কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ছোট সন্তান থাকে, তাহলে তার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার এ সন্তান মুসলমান গণ্য হবে।

কেননা তাকে মুসলিমের অনুগামী করার মধ্যেই তার প্রতি কল্যাণ রয়েছে।

যদি উভয়ের একজন কিতাবী হয় আর অপর জন মাজুসী হয় তাহলে সন্তানকে কিতাবী গণ্য করা হবে।

কেননা এতে তার প্রতি একপ্রকার কল্যাণ রয়েছে। কারণ মাজূসী ধর্ম কিতাবী ধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট। যেহেতু উভয়ের মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে, তাই ইমাম শাফেয়ী (র) এ বিষয়ে আমাদের মতের বিরোধিতা করেন। কিন্তু আমরা অগ্রাধিকার প্রমাণ করেছি।

স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তার স্বামী কাফির থাকে তাহলে কাযী তার নিকট ইসলাম পেশ করবেন। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে তার স্ত্রী রূপে বহাল থাকবে। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। আর এটি তালাক বিবচিত হবে, ইমাম আবূ হানীফা (র)ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে। আর যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার অধীনে অগ্নি উপাসক স্ত্রী থাকে তাহলে তার নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে তার স্ত্রী থাকবে। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে কাযী উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। কিন্তু উভয়ের মাঝের এ বিচ্ছেদ তালাক বলে বিবেচিত হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উভয় অবস্থার কোনটিতেই বিচ্ছেদ তালাক হবে না।

ইসলাম পেশ করার বিষয়টি আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ইসলাম পেশ করা হবে না। কেননা এতে কাফিরদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়। অথচ যিম্মি চুক্তির মাধ্যমে আমরা তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা দিয়েছি। তবে যেহেতু সহবাসের পূর্বে বিবাহের মালিকানা দৃঢ় নয়, তাই শুধু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তা ভংগ হয়ে যাবে। আর সবাসের পরে তা দৃঢ় হয়। তাই বিচ্ছেদের বিষয়টি তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। যেমন-তালাকের ক্ষেত্রে স্থগিত থাকে।

আমাদের দলীল এই যে, (একজনের ইসলাম গ্রহণের কারণে) বিবাহের উদ্দেশ্য সমূহ ব্যাহত হয়ে গেছে। সুতরাং এমন একটি কারণ থাকতে হবে, যার উপর বিচ্ছেদের ভিত্তি রাখা যায়। ইসলাম হলো আল্লাহর আনুত্য, সুতরাং তা বিচ্ছেদের কারণ হতে পারেনা। সুতরাং ইসলাম পেশ করা হবে, যাতে ইসলাম গ্রণের কারণে বিবাহের মকছুদ হাছিল হতে পারে কিংবা অস্বীকার করার কারণে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এর দলীল এই যে, বিচ্ছেদ এমন কারণে হয়েছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরীক, সুতরাং এটা তালাক হতে পারে না। যেমন মালিকানা লাভের কারণে সাব্যস্ত বিচ্ছেদ তালাক নয়।

ইমাম আবূ হানিফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতির মাধ্যমে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে স্ত্রীকে রাখা থেকে বিরত রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীকে মুক্ত করার ব্যাপারে কাযী তার স্থলবর্তী হবে। যেমন-কর্তিত পুরুষাংগ বা পুরুষত্ব রহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যেহেতু স্ত্রী তালাকের অধিকারী নয়, তাই সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হলে কাযী উভয় পক্ষ থেকে তালাকের স্থলবর্তী হতে পারে না।

কাযী যখন স্ত্রীর অস্বীকারের কারণে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবেন, তখন স্বামী তার সংগে সহবাস করে থাকলে সে পূর্ণ মাহর পাবে।

কেননা সহবাসের কারণে মাহর অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। **আর যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলে সে মাহর পাবে না।** কেননা বিচ্ছেদ তার পক্ষ হতে ঘটেছে আর মাহর অবশ্যম্ভাবী হয়নি। সুতরাং বিষয়টি মুরতাদ হওয়ার কিংবা স্বামী-পুত্রকে সুযোগ প্রদানের অনুরূপ হলো।

স্ত্রী যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে আর তার স্বামী কাফির থেকে যায়, কিংবা হারবী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তার স্ত্রী কোন মাজূসী নারী থাকে তাহলে তিন হায়িয অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর উপর বিচ্ছেদ পতিত হবে না। এরপর সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

এর কারণ এই যে, ইসলাম বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। আর (ইসলামী শাসকের) কর্তৃত্ব না থাকার কারণে ইসলাম পেশ করা সম্ভবপর নয়, অথচ ফাসাদ নিরসনের জন্য বিচ্ছেদ অপরিহার্য। তাই বিচ্ছেদের শর্ত তথা তিন হায়য অতিক্রান্ত হওয়াকে আমরা সবরের স্থলবর্তী করেছি। যেমন কূপ খননের ক্ষেত্রে।[১] সহবাসকৃতা হওয়া না হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দারুল ইসলামের একই ধরনের ঘটনায় তিনি পার্থক্য করেছেন।

যদি বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় আর স্ত্রী হারবিয়া হয় তাহলে (সকলের মতেই) তার উপর ইদ্দত আবশ্যক নয়। আর যদি স্ত্রী মুসলমান হয় তাহলেও একই হুকুম। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইনশা আল্লাহ এ আলোচনা সামনে আসবে।

কিতাবী নারীর স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে।

কেননা উভয়ের মাঝে বিবাহের সূচনা বৈধ। সুতরাং বিবাহ বহাল থাকাটা আরো স্বাভাবিক। ইমাম কুদূরী বলেন, **স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন যদি মুসলমান হয়ে দারুল হরব থেকে আমাদের কাছে চলে আসে তাহলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।**

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিচ্ছেদ ঘটবেনা।

স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন যদি বন্দী হয়ে যায় তাহলে তালাক ছাড়াই উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এক সংগে বন্দী হলে বিচ্ছেদ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। মোট কথা, আমাদের মতে (বিচ্ছেদের) কারণ হলো দুই দেশের ভিন্নতা, বন্দিত্ব নয়। কিন্তু তিনি এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

তার যুক্তি এই যে, দুই দেশের ভিন্নতার প্রভাব হলো (উভয়ের মাঝে) কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে, আর বিচ্ছেদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা নেই। যেমন নিরাপত্তা গ্রহণ করে আগমনকারী হরবী এবং নিরাপত্তা গ্রহণ করে গমনকারী মুসলমান (নিজ নিজ বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব কর্তিত হয়ে যায়, অথচ বিচ্ছেদ হয় না)।

---

১. কূপের পতনের মূল কারণ হলো ওজন; আর খনন হলো পতনের শর্ত। শরীয়ত খননকেই কার্যকারণের স্থলবর্তী করেছে এবং খননকারীর উপর পতনের দায় দায়িত্ব আরোপ করেছে।

পক্ষান্তরে বন্দিত্বের দাবী হলো বন্দীকারীর জন্য বন্দী পূর্ণরূপে অধিকারে এসে যাওয়া। আর তা বিবাহ বন্ধন কর্তিত হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই বন্দীর যিম্মার যাবতীয় ঋণ রহিত হয়ে যায়।

আমাদের দলীল এই যে, প্রকৃত এবং দৃশ্যত: দেশ-ভিন্নতা অবস্থায় বিবাহের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকতে পারে না।[১] সুতরাং মাহরাম হওয়ার মতো হয়ে গেলো। আর বন্দিত্ব দেহ সত্তার উপর মালিকানা সাব্যস্ত করে আর তা বিবাহের সূচনার পরিপন্থী নয়। সুতরাং বিবাহের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও তা প্রতিবন্ধক হবে না। সুতরাং তা ক্রয়ের ন্যায় হলো।

তাছাড়া বন্দিত্ব তার কর্মক্ষেত্রে বন্ধনহীনতা দাবী করে আর তা হলো তার দেহ-সত্তার অর্থগত দিক। কিন্তু বিবাহের স্থলের মধ্যে বন্ধনহীনতা দাবী করে না।

আর নিরাপত্তা নিয়ে আমনকারীর ক্ষত্রে আইনত: দেশ-ভিন্নতা হয়নি। কেননা তার প্রত্যাবর্তনের নিয়ত রয়েছে।

স্ত্রী যদি হিজরত করে আমাদের নিকট দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে সে বিবাহ করতে পারে। তার উপর ইদ্দত আবশ্যক নয়।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। সাহেবায়নের মতে তার উপর ইদ্দত আবশ্যক। কেননা দারুল ইসলামে প্রবেশের পর বিচ্ছেদ ঘটেছে। সুতরাং তার উপর ইসলামের বিধান কার্যকর হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, ইদ্দত হলো পূর্ববর্তী বিবাহের ফল, যা বিবাহের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ওয়াজিব হয়েছে। আর হারবীর মালিকানার কোন মর্যদা নেই। এ কারণেই বন্দী মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব নয়।

যদি স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয় তাহলে প্রসবের পূর্বে বিবাহ করতে পারবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এক বর্ণনায় আছে যে, বিবাহ বৈধ হয়ে যাবে। তবে স্বামী প্রসব পর্যন্ত তার নিকটবর্তী হতে পারবে না। যেমন যিনার কারণে গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে।

প্রথমোক্ত মতের কারণ এই যে, (অন্যের পক্ষ থেকে) এ গর্ভের নসব প্রমাণিত। সুতরাং নসবের ক্ষেত্রে যখন শয্যাধিকার প্রকাশ পেল তখন সতর্কতার খাতিরে বিবাহ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও তা প্রকাশ পাবে।

গ্রন্থকার বলেন, স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন যদি ইসলাম থেকে মোরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ধর্মত্যাগ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। তিনি (স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর) স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অস্বীকৃতির উপর এটিকে কিয়াস করেন। উভয় ছুরতের মাঝে সমন্বয় আমরা এটিকে পূর্বে বর্ণনা করেছি।

১। প্রকৃত দেশ ভিন্নতা হলো স্থূলভাবে দেশের ভিন্নতা, আর দৃশ্যত: ভিন্নতার অর্থ হলো যে দেশে আছে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত নেই। বরং ফিরে যাওয়ার নিয়ত রয়েছে। যেমন নিরাপত্তা নিয়ে আগমনকারী হারবী কিংবা গমনকারী মুসলমান। যেহেতু তাদের প্রত্যাবর্তনের নিয়ত রয়েছে। সেজন্য তাদের উপর দেশ ভিন্নতার হুকুম আরোপিত হতে পারে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে বর্ণিত তার নীতিই এ বিষয়ে অনুসরণ করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তাঁর দলীল এই যে, ধর্মত্যাগ বিবাহের পরিপন্থী। কেননা তা নিরাপত্তা রহিতকারী। পক্ষান্তরে তালাক বিবাহ স্থগিতকারী। সুতরাং উক্ত বিচ্ছেদকে তালাক গণ্য করা সম্ভব নয়। ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা সদাচারের সাথে স্ত্রীকে রাখার সুযোগকে নষ্ট করে। সুতরাং উত্তম ভাবে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই অস্বীকৃতিজনিত বিচ্ছেদ আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল। অথচ ধর্মত্যাগ জনিত বিচ্ছেদ তার উপর নির্ভরশীল নয়।

ধর্মত্যাগ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে সহবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী পূর্ণ মাহর পাবে আর সহবাসের পূর্বে হয়ে থাকলে সে অর্ধেক মাহর পাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে সহবাস হয়ে থাকলে সে পূর্ণ মাহর পাবে। আর সহবাস না হয়ে থাকলে সে কোন মাহর পাবে না এবং খোরপোষও পাবে না।

কেননা বিচ্ছেদ তার দিক থেকে এসেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি উভয়ে একত্রে ধর্মত্যাগ করে আবার একত্রে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা উভয়ে নিকাহের উপর বহাল থাকবে।

এ হুকুম হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। আর ইমাম যুফার (র) বলেন, বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা দু'জনের একজনের ধর্মত্যাগ বিবাহের পরিপন্থী আর উভয়ের ধর্মত্যাগের মাঝে একজনের ধর্মত্যাগ বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, বর্ণিত আছে যে, বনু হানীফা গোত্রের লোক একসাথে ধর্মত্যাগ করেছিলো অতঃপর একসাথে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু ছাহাবা কেরাম তাদের বিবাহ নবায়নের আদেশ প্রদান করেননি। তাদের ধর্মত্যাগ একসংগে হয়েছিলো বলেই ধরা হবে তারীখ না জানার কারণে।

(উভয়ের এক যোগে) ধর্মত্যাগের পর যদি একজন পুনঃইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উভয়ের মাঝে বিবাহ ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা অন্য জন ধর্মত্যাগের উপর অনড় রয়েছে। আর ধর্মত্যাগের সুচনা যেমন বিবাহের পরিপন্থী; তদ্রূপ ধর্মত্যাগের উপর অনড় থাকাও বিবাহের পরিপন্থী।

অধ্যায় ঃ পালা বন্টন

কোন লোকের যদি দু'জন স্বাধীন স্ত্রী থাকে তাহলে উভয়ের মাঝে পালা বন্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা ওয়াজিব। তারা উভয়ে কুমারী হোক কিংবা অকুমারী, কিংবা একজন কুমারী এবং অন্য জন অকুমারী।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كانت له امرأتان ومال الى احدهما فى القسم جاء يوم القيمة وشقه مائل!

যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, আর সে তাদের হক বন্টনের ক্ষেত্রে কোন এক জনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার এক পার্শ্ব ঝুঁকে থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে পালা বন্টনের সমতা বিধান করতেন এবং বলতেন,

اللهم هذا قسمى فيما املك فلاتواخذنى فيما لااملك!

হে আল্লাহ! এটা আমার বন্টন, যে ক্ষেত্রে আমার সাধ্য রয়েছে; সুতরাং যে ক্ষেত্রে আমার সাধ্য নেই, অর্থাৎ মুহব্বতের আধিক্যের ক্ষেত্রে, সে ক্ষেত্রে আমাকে পাকড়াও করবেন না।

আর আমাদের বর্ণিত হাদীসে (কুমারী অকুমারীর মাঝে) কোন পার্থক্য করা হয়নি।

পুরাতন ও নতুন স্ত্রী এ ক্ষেত্রে সমান।

কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীস শর্তহীন। তাছাড়া পালাবন্টন হলো বিবাহের অন্যতম হক। আর এ ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

তবে পালার পরিমাণ নির্ধারণের এখতিয়ার ন্যস্ত হলো স্বামীর প্রতি। কেননা স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো দক্ষতা, সমতার পন্থা নয়। অদ্রূপ সমতা হবে একত্রে রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে, সহবাসের ক্ষেত্রে নয়। কেননা তা নির্ভর করে শারীরিক প্রফুল্লতার উপর।

যদি একজন স্বাধীন আর অপর জন দাসী হয় তাহলে বন্টনের ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রী দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং দাসী স্ত্রী পাবে এক তৃতীয়াংশ।

হাদীসে এ রূপই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এই কারণে যে, দাসী স্ত্রীর নিকাহ্ হালাল হওয়ার ক্ষেত্র স্বাধীন স্ত্রীর হালাল হওয়ার ক্ষেত্র থেকে নিম্নস্তরের। সুতরাং হকসমূহের ক্ষেত্রে এ নিম্নতা প্রকাশ করা জরুরী। মুকাতাবা, মুদাব্বারা ও উম্মে ওয়ালাদ দাসীগণও সাধারণ দাসীর সমতুল্য। কেননা পার্থক্য তাদের ব্যাপারেই বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সফরের অবস্থায় পালা বন্টনের কোন হক তাদের নেই। বরং স্বামী তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সংগে নিয়ে সফর করতে পারে। তবে উত্তম হলো তাদের মাঝে লটারী করা এবং লটারীতে যার নাম আসে তাকে নিয়ে সফর করা।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, লটারী করা ওয়াজিব। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। তবে আমরা বলি যে, এই লটারী ছিলো তাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের হবে।

এর কারণ এই যে, স্বামীর সফরের সময় তার উপর স্ত্রীর কোন হক নাই। দেখছেন না যে, তাদের কোন এক জনকেও সংগে না নিয়ে সে সফর করতে পারে। সুতরাং তাদের কোন এক জনকে সংগে নিয়েও সফর করার অধিকার তার রয়েছে। এ সময়টুকু তার হিসাব করা হবে না।

কোন স্ত্রী যদি তার পালা তার অন্য সঙ্গিনীকে দিয়ে দিতে সম্মত হয় তাহলে তা জায়েয। কেননা সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করেছিলেন যেন তিনি তাকে রুজু করে নেন এবং তিনি নিজের পালা আয়েশা (রা) কে দিচ্ছেন।

অবশ্য স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এ দান ফিরিয়ে নেয়ার। কেননা সে এমন হক রহিত করেছে যা এখনও ওয়াজিব হয়নি। সুতরাং তা রহিত হবেনা।

অধ্যায় ঃ স্তন্য পান

ইমাম কুদূরী (র) বলেন , অল্প এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পানের হুকুম সমান। যদি তা স্তন্যপানের মেয়াদ কালে হয়ে থাকে তার সাথে হুরমতের হুকুম সম্পৃক্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পাঁচ ঢোকের কমে হুরমত সাব্যস্ত হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان

এক বা দুই বার চোসা দ্বারা এবং এক বা দুই বার স্তন মুখে দেয়া দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়না।

আমাদের প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ (الاية)

আর তোমাদের ঐ মাতাগণ, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

দুগ্ধ পানের কারণে সে সকলই হারাম হবে, নসবের কারণে যা কিছু হারাম।

(এ আয়াতে ও হাদীসে) অল্প ও বেশীর মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া এই জন্য যে, যদিও বিবাহের হুরমতের কারণ হলো উভয়ের মাঝে শারীরিক আংশিকতা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ যা দুধের দ্বারা হাড়মাংস তৈরী ওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু এটা দৃষ্টির অগোচর বিষয়। সতরাং দুগ্ধ পানের উপরই হুকুম সম্পৃক্ত হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত অথবা উহা দ্বারা রহিত।

তবে তা দুগ্ধ পানের মেয়াদ কালে হতে হবে। যার দলীল আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করব।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে দুগ্ধ পানের মেয়াদকাল ত্রিশ মাস।

সাহেবায়ন বলেন, মেয়াদ দুই বছর। ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও এমত। ইমাম যুফার (র) বলেন, তিন বছর। কেননা এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে পরিবর্তনের জন্য এক বছরই হলো যথাযোগ্য। আর দুই বছরের উপর কিছু অতিরিক্ত সময় জরুরী। এর কারণ পরবর্তীতে আমরা বর্ণনা করব। সুতরাং এই অতিরিক্ত সময়কে এক বছর নির্ধারণ করা হবে।

সাহেবায়নের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا (তাকে গর্ভ ধারণের এবং দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হলো ত্রিশ মাস)।

আর গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হলো ছয় মাস। সুতরাং দুধ ছাড়ানোর জন্য দুই বছর অবশিষ্ট রইল।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا رضاع بعد الحولين (দু' বছরের পর দুগ্ধ পানের কোন অবকাশ নেই)।

উপরোক্ত আয়তই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল। এর ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা দু'টি বিষয় উল্লেখ করে উভয়টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং মেয়াদ পূর্ণ ভাবে উভয়টির জন্য স্থিরকৃত হবে। যেমন দুটি ঋণের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধরণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

তবে একটির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ গর্ভ ধারণের ক্ষেত্রে) উক্ত মেয়াদ হ্রাসকারী দলীল রয়েছে।[১] সুতরাং দ্বিতীয়টি তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

তাছাড়া এ কারণে যে (স্তন্য ত্যাগের সময়) খাদ্য পরিবর্তনের অবকাশ প্রদান জরুরী। যাতে দুগ্ধ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হতে পারে। আর সেটা সম্ভব এমন অতিরিক্ত মেয়াদ নির্ধারণের মাধ্যমে, যে মেয়াদে শিশু অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সর্ব নিম্ন গর্ভকাল দ্বারা উক্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। কেননা এ সময়কাল খাদ্য-প্রকার পরিবর্তনকারী। কারণ গর্ভস্থ সন্তানের খাদ্য দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাদ্য থেকে ভিন্ন, যেমন দুগ্ধ পোষ্য শিশুর খাদ্য স্তন্য পরিত্যাগকারী শিশুর খাদ্য থেকে ভিন্ন।

আর (সাহেবায়ন বর্ণিত) হাদীসটি প্রযোজ্য হবে দুগ্ধপানের অধিকারের মেয়াদকালের উপর। আর এ অর্থেই প্রয়োগ করা হবে কিতাবুল্লাহর যে আয়াতটিতে দু'বছরের কথা উল্লেখিত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্তন্য পানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুগ্ধ পানের সাথে হুরমতের সম্পর্ক হবেনা।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا رضاع بعد الفصال (স্তন্য ছাড়ানোর পর স্তন্যপান ধর্তব্য নয়।)

তাছাড়া এই কারণে যে, হুরমত সাব্যস্ত হয় (দুধ দ্বারা শরীরের) বৃদ্ধি লাভ হওয়ার কারণে। আর সেটা হয়ে থাকে স্তন্য পানের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে। কেননা বড় বাচ্চা উক্ত দুধ দ্বারা পুষ্টি লাভ করে না। তদ্রূপ সময়ের পূর্বে দুধ ছাড়িয়ে দোয়াও ধর্তব্য নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত একটি মতে তা ধর্তব্য হবে, যদি শিশু উক্ত দুগ্ধের মুখাপেক্ষী না থাকে। এর কারণ এই যে, খাদ্য পরিবর্তিত হওয়ার কারণে দুগ্ধ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো মেয়াদের পরে কি স্তন্যদান জায়েয হবে। কোন কোন মতে জায়েয হবে না। এ বৈধতা ছিল জরুরী ভিত্তিক শরীরের অংশ বিশেষ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নসবের কারণে যাঁরা হারাম হন, স্তন্য পানের কারণেও তাঁরা হারাম হবেন।

এর দলীল ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তবে দুধ-বোনের মাকে[২] বিবাহ করা জায়েয আছে। কিন্তু নসবী বোনের মাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা হয় সে তার আপন মা হবে কিংবা পিতার সহধর্মিনী (সৎমা) হবে। দুধ বোনের বেলায়-তা নয়।

দুধ-পুত্রের বোনকে বিবাহ করা জায়েয রয়েছে। কিন্তু নসবের ক্ষেত্রে তা জায়েয নয়।

১। আয়েশা (রা) বলেছেন, মাতৃ গর্ভে সন্তান দু'বছরের বেশী মুহূর্ত কালও থাকতে পারেনা।

২। এর কয়েকটি সুরত হতে পারে। কারো দুধ বোন রয়েছে, আর সেই বোনের নসবী (গর্ভধারিণী) মা রয়েছে; কিংবা নসবী বোনের দুধ মা রয়েছে; কিংবা অপরিচিত বাচ্চা-বাচ্চি অপরিচিত নারীর দুধ পান করেছে, আর বাচ্চির অন্য দুধমা রয়েছে, এদের সকলকে সে বিবাহ করতে পারবে।

কেননা (নসবী পুত্রের সৎ) বোনের মায়ের সংগে সাহবাসের কারণে সে তার জন্য হারাম হয়ে যায়।

দুধ-পুত্রের বোনের ক্ষেত্রে এ অবস্থা পাওয়া যায়নি।

দুধ-পিতার স্ত্রীকে কিংবা দুধ-পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয নেই, যেমন নসবের ক্ষেত্রে তা জায়েয নয়।

এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস। আর আয়াতে পুত্র সম্পর্কে যে ঔরসজাত বলা হয়েছে, তার উদ্দশ্য হলো পালক পুত্রকে বাদ দেওয়া। বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

যে স্বামীর কারণে স্ত্রীর স্তনে দুধ এসেছে, তার সংগেও হুরমতের সম্পর্ক হবে। অর্থাৎ স্ত্রী যদি কোন শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে এই মেয়ে উক্ত স্ত্রীর স্বামী এবং স্বামীর পিতা এবং উর্ধ্বতন সকল পুরুষ এবং স্বামীর সন্তান ও অধঃস্তন সকল পুরুষ সকলের জন্য হারাম হবে। আর যে স্বামীর কারণে তার স্তনে দুধ এসেছে সে ঐ মেয়ের দুধ-পিতা হবে।

শাফেয়ী (র) থেকে একটি বর্ণিত মতে উক্ত স্ত্রীর স্বামীর সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। কেননা হুরমতের সম্পর্ক হয় (দুধের মাধ্যমে শারীরিক) আংশিকতার সন্দেহের কারণে, আর দুধ তো স্ত্রীর অংশ, স্বামীর অংশ নয়।

আমাদের দলীল হলো পূর্বে যে হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি। আর নসবের ক্ষেত্রে হুরমত (মা বাবা) উভয় দিক থেকে হয়। সুতরাং স্তন্য পানের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

ليلج عليك افلح فانه عمك من الرضاعة

আফলা তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে। কেননা সে তোমার দুধ চাচা।

তাছাড়া এ কারণে যে, স্বামী হলো স্ত্রীর স্তনে দুধ প্রবাহিত হওয়ার কারণ। সুতরাং সতর্কতা হিসাবে হুরমতের ক্ষেত্রে তার সংগেও দুধ সম্পৃক্ত হবে।

দুধ ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা নসবী ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েয আছে। যেমন বাপ শরীক ভাইয়ের যদি তার মায়ের পক্ষের কোন বোন থাকে তাহলে বাপ শরীক ভাই সেই বোনকে সে বিবাহ করতে পারে।

দুই ছেলে মেয়ে যদি কোন স্ত্রী লোকের স্তন্যপান করে থাকে তাহলে তারা একে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

এ-ই হলো নীতিগত হুকুম। কেননা উভয়ের দুধমা এক হওয়ার কারণে তারা একে অন্যের ভাইবোন হয়ে গেছে। **স্তন্য পান কারিণী তার দুধ মাতার কোন পুত্রকে বিবাহ করতে পারে না।** কেননা সে তার দুধ ভাই হবে।

তদ্রূপ দুধমাতার পুত্রের সন্তানকে বিবাহ করতে পারেনা। কেননা, সে তার ভাইয়ের সন্তান হবে। তদ্রূপ দুধ পানকারী বাচ্চা স্তন্যদানকারিণীর স্বামীর বোনকে বিবাহ করতে পারবেনা। কেননা সে তার দুধ ফুফু হলো।

যদি স্তনের দুধ পানির সংগে মিশ্রিত হয় আর দুধের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে উক্ত দুধের সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে। পক্ষান্তরে পানির অংশ অধিক হলে তার সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, উক্ত পানিতে প্রকৃত পক্ষে তো দুধ বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, বিধান অনুযায়ী অধিক পরিমাণ অংশ অস্তিত্বহীন গণ্য হয়। তাই অধিক পরিমাণের মুকাবেলায় তা প্রকাশ পাবে না। যেমন কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[১]

যদি খাদ্য দ্রব্যের সংগে স্তনের দুধ মিশ্রিত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দুধের অংশ বেশী হলেও তার সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। তবে সাহেবায়নের মতে দুধের অংশ বেশী হলে তার সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাহেবায়নের বক্তব্য হলো ঐ দুধ সম্পর্কে, যা আগুনে জ্বাল দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে যদি আগুনে জ্বাল দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সকলের মতেই তার সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, আধিক্যই বিবেচ্য। যেমন পানির সংগে মিশ্রণের ক্ষেত্রে । যদি অন্য কিছু তার অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, খাদ্য দ্রব্যই হলো মূল আর দুধ হলো তার অনুবর্তী উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে। সুতরাং সেটা স্বল্পতার পর্যায় হয়ে গেলো।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে খাবার থেকে দুধ ফোঁটা ফোঁটায় পড়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা খাদ্যের মধ্যেই রয়েছে শরীরের পুষ্টিগত গুণ।

কেননা এ পুষ্টিই হলো মূল লক্ষ্য ।

দুধ যদি ঔষধের সংগে মিশ্রিত হয় আর দুধের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে তার সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে।

কেননা এ ক্ষেত্রে দুধও উদ্দেশ্য মূলক থাকে। কারণ ঔষধ প্রয়োগ করা হয় দুধ যথা স্থানে পৌছার শক্তিবৃদ্ধির জন্য। **দুধ যদি বকরীর দুধের সংগে মিশ্রিত হয় আর তা বকরীর দুধের চেয়ে অধিক হয় তাহলে তার সংগে হুরমত সম্পর্কিত হবে। পক্ষান্তরে বকরীর দুধ অধিক হলে তার সংগে হুরমত সম্পর্কিত হবে না।**

এ সিদ্ধান্ত দেয়া হলো অধিক্যের দিক বিবেচনা করে। যেমন পানির ক্ষেত্রে ।

যদি দু'জন স্ত্রী লোকের দুধ মিশ্রিত হয় তাহলে যার দুধ পরিমাণে অধিক তার সাথে হুরমতের সম্পর্ক হবে।

এ হলো ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত। কেননা সাকুল্য দুধ একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং স্বল্পতরকে অধিকতরের অনুবর্তী ধরে তার উপর হুকুমের ভিত্তি হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র) বলেন, হুরমতের সম্পর্ক হবে উভয় দুধের সাথে। কেননা কোন জিনিস সমজাতীয় জিনিসের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ কোন জিনিস সমজাতীয় জিনিসের সাথে মিশ্রিত হলে তা বিলীন হয়না। কেননা উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ) হতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। আর মূল মাসআলাটি কসম সম্পর্কিত[২] (বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট-)।

কুমারী নারীর যদি দুধ নেমে আসে আর তা কোন বাচ্চাকে পান করায় তাহলে উক্ত দুধের কারণে হুরমতের সম্পর্ক হবে।

কেননা এই সম্পর্কীয় আয়াত নিঃশর্ত। তাছাড়া দুধ হলো শরীরের বৃদ্ধির কারণ। সুতরাং এর দ্বারা শারীরিক আংশিকতার সন্দেহ সাব্যস্ত হয়।

১। অর্থাৎ কসম করল যে, দুধ খাবেনা- অতঃপর পানি মিশ্রিত দুধ পান করল আর পানি দুধের চেয়ে বেশী, তবে তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

২। অর্থাৎ যদি কসম করে যে, এই বকরীর দুধ খাবে না; অতঃপর অন্য বকরীর দুধের সংগে মিশ্রিত করে পান করল, আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর প্রবল ছিলো তখন তাতে একই যুক্তিতে একই মতপার্থক্য সাব্যস্ত হবে।

কোন নারী মৃত্যুর পর যদি তার দুধ দোহন করা হয় এবং তা কোন শিশুর মুখে প্রবেশ করানো হয় তাহলে তার সংগে হুরমতের সম্পর্ক হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো স্তন্যদানকারিণী নারী। অতঃপর তার মাধ্যমে অন্যদের দিকে হুরমতের বিস্তার ঘটে কিন্তু মৃত্যুর কারণে সে তো হুমতের ক্ষেত্র থাকেনি। এ কারণেই তার সংগে যৌন সম্ভোগ দ্বারা বৈবাহিক হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, শারীরিক আংশিকতার সন্দেহই হুরমতের কারণ আর তা হলো দুধের মধ্যে। যেহেতু তাতে শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির গুণ রয়েছে আর তা দুধের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। আর এই (দুধের সাথে সম্পৃক্ত) হুরমত মৃতার বেলায় প্রকাশ পাবে, দাফন ও তৈয়াম্মুম করনের ক্ষেত্রে। আর সহবাসের বেলায় আংশিকতা ধর্তব্য হয় উৎপাদন ক্ষেত্রের সংগে বীর্যের সংযোগের কারণে। আর মৃত্যুর কারণে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং উভয় ছূরতে পার্থক্য রয়েছে।

আর যদি শিশুকে দুধ ডুশ দ্বারা দেয়া হয় তাহলে এ দুধের কারণে হুরমতের সম্পর্ক হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তা হুরমত সাব্যস্ত করবে, যেমন তা দ্বারা সিয়াম ফাসিদ হয়ে যায়।

যাহেরী বর্ণনা মতে উভয় ছূরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, সিয়ামের ক্ষেত্রে ভংগকারী বিষয় হলো শরীরের সংশোধন (বা উপকার সাধন।) আর অষুধ প্রয়োগের মধ্যে এ বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে দুগ্ধ পানের ক্ষেত্রে হারামকারী বিষয় হলো পুষ্টি অর্জনের গুণ। আর তা ডুশ ব্যবহারের মাঝে পাওয়া যায়না। কেননা পুষ্টি লাভ হয় উপরের দিক থেকে (নাক-মুখ) থেকে গ্রহণের মাধ্যমে।

পুরুষের যদি দুধ নামে আর সে তা কোন শিশুকে পান করায় তাহলে তাতে হুরমতের সম্পর্ক হবেনা।

কেননা গবেষণার সিদ্ধান্ত মতে তা দুধ নয়। সুতরাং এর সংগে শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সংগে সম্পর্তিত হবেনা। কারণ স্তন্য দুগ্ধ ঐ সত্তার ক্ষেত্রেই শুধু কল্পনা করা যায়, যে ক্ষেত্রে সন্তান প্রসব সম্ভব।

কতিপয় শিশু যদি একটি বকরীর দুধ পান করে তাহলে উক্ত দুধের কারণে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। কেননা মানুষ ও পশুর মাঝে শারীরিক আংশিকতার সম্পর্ক নেই। আর এর কারণেই হুরমতের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়।

কোন লোক যদি বড় ও ছোট-কে বিবাহ করে আর বড় ছোটটিকে স্তন্য দান করে বসে- তাহলে উভয়ে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

কেননা লোকটি তখন দুধ-মা ও দুধ-কন্যাকে একত্রকারী হয়ে যাবে; আর তা হারাম যেমন নসবী মা ও মেয়েকে একত্র করা।

বড়টির সংগে যদি সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে সে কোন মাহর পাবেনা।

কেননা সহবাসের পূর্বেই তার দিক থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে। **তবে ছোটটি অর্ধেক মাহর পাবে।** কেননা বিচ্ছেদ তার দিক থেকে ঘটেনি। দুগ্ধ পান যদিও তারই কর্ম, কিন্তু তার হক রহিত করার ক্ষেত্রে তার কর্ম ধর্তব্য নয়। যেমন ছোট শিশু যদি এমন কাউকে হত্যা করে, যার কাছ থেকে তার মিরাছ পাওয়ার কথা (তাহলে সে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হয়না।)

তবে স্বামী বড়টির কাছ থেকে মাহর বাবদ প্রদত্ত অর্থ উসুল করবে। যদি সে দুধ পান করিয়ে বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করে থাকে। আর যদি সে এ ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে তার উপর কোন অর্থ দন্ড আসবে না, যদিও তার তা জানা থাকে যে, ছোট মেয়েটি তার স্বামীর স্ত্রী।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে. উভয় ছুরতেই তার নিকট থেকে স্বামী মাহরের অর্থ ফেরত পাবে।

তবে যাহিরে রেওয়াতের বর্ণনাই সহীহ। কেননা এটা ঠিক যে, যে অর্ধ মোহর রহিত হওয়ার সম্ভবনাপূর্ণ ছিলো. সেটাকে রহিত করে দিয়েছে। আর তা নষ্ট করার সমতুল্য। কিন্তু এ বিষয়ে সে অনুঘটক মাত্র। ইহা এ জন্য যে, স্তন্যদান প্রকৃতিগত ভাবে বিবাহ নষ্টকারী নয়, আর এখানে তা ঘটনাচক্রে সাব্যস্ত হচ্ছে। অথবা বিবাহ নষ্ট হওয়া মাহর সাব্যস্ত করার কারণ নয় বরং মাহর রহিত হওয়ার কারণ। তবে অর্ধ মাহর ওয়াজিব হচ্ছে মুত'আ হিসাবে, যেমন ইতিপূর্বে পরিজ্ঞাত হয়েছে। কিন্তু এই ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিবাহ বাতিল হওয়া।

যখন সে অনুঘটক বলে সাব্যস্ত হলো তখন দন্ড সাব্যস্ত করার জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালংঘন পাওয়ার শর্ত হবে, যেমন কূপ খননের বিষয়টি[১]।

তবে বড় স্ত্রী সীমালংঘনকারী তখনই হবে. যখন সে বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে আর স্তন্যদানের মাধ্যমে বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা থাকে। আর যদি বিবাহ সম্পর্কে জানা না থাকে কিংবা জানা তো ছিলো, কিন্তু সে ছোট মেয়েটির ক্ষুধা নিবারণ করার এবং জীবন রক্ষা করার ইচ্ছা করেছিলো. বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করেনি, তাহলে সে সীমালংঘন কারিণী হবে না। কেননা (এরূপ ক্ষেত্রে) এটা করার জন্য সে (শরীয়তের পক্ষ থেকে) আদিষ্ট।

যদি বিবাহের বিষয়টি জানা থেকে থাকে কিন্তু বিবাহ নষ্ট হওয়ার হুকুম না জানা থাকে তাহলে সে সীমালংঘনকারিণী হবে না।

আমাদের পক্ষ থেকে একক অজ্ঞতা বিবেচনা করার কারণ 'নষ্ট করণের ইচ্ছা' না থাকার ক্ষেত্রে, শরীয়তের হুকুম রোধ করার ক্ষেত্রে নয়।[২]

স্তন্যপানের ক্ষেত্রে নারীদের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য-তা সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মালিক (র) বলেন, যদি সে সৎ প্রকৃতির হয় তাহলে সেরূপ এক স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যেও তা সাব্যস্ত হবে। কেননা এই হুরমত হলো শরীয়তের হক। সুতরাং এক ব্যক্তির খবরে তা সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ গোশত খরিদ করলো আর এক ব্যক্তি তাকে খবর দিলো যে, এটা অগ্নি পূজকের জবাইকৃত।

আমাদের দলীল এই যে, বিবাহের ক্ষেত্রে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া মালিকানা রহিত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; আর মালিকানা বাতিল করা দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া সাব্যস্ত হতে পারে না। গোশততের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা খাবারের হুরমত মালিকানা রহিত হওয়া থেকে পৃথক হতে পারে। সুতরাং তা একটি দ্বীনী বিষয় রূপে গণ্য হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

---

১. খননকৃত কূপে যদি কেউ পড়ে মারা যায় সেক্ষেত্রে খননকারী হলো তার পতনের অনুঘটক, সুতরাং যদি চলাচলের স্থানে খনন করে থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে সীমালংঘন সাব্যস্ত হবে এবং এই 'অনুঘটন'টি ধর্তব্যে আসবে এবং ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে. পক্ষান্তরে যদি নিজের জমিতে খনন করে থাকে তাহলে তারপক্ষ থেকে কোন সীমালংঘন হয়নি, সুতরাং এই অনুঘটন ধর্তব্য নয়।

২. অর্থাৎ প্রশ্ন হতে পারে যে, দারুল ইসলামে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতা তো গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে এখানে স্ত্রী লোকটির ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতাকে কিভাবে বিবেচনায় আনা হল? উত্তর এই যে, এখানে শরীয়তের হুকুম তথা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা সীমা লংঘনের উপর নির্ভর করে। আর সীমালংঘন সাব্যস্ত হবে বিবাহ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তার জানা থাকলে. যখন নষ্ট করার ইচ্ছা অবিদ্যমান হলো তখন বোঝা গেলো যে, অজ্ঞতার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা নেই, এ বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য শরীয়তের হুকুম রোধ করার জন্য নয়, সেটা রোধ হয়েছে পরোক্ষভাবে।

كتاب الطلاق

তালাক পর্ব

অধ্যায় ঃ সুন্নত পদ্ধতির তালাক

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তালাক তিন প্রকার ঃ حسن—উত্তম احسن।—অতি উত্তম এবং بدعة, বিদ'আত। সর্বোত্তম পদ্ধতি এই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাস বিহীন একটি তুহ্‌র-এ এক তালাক প্রদান করবে। অতঃপর তার সাথে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে।

কেননা সাহাবা কেরাম (র) এই পসন্দ করতেন যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন এক তালাকের অধিক না দেয়া হয়। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির প্রত্যেক তুহ্‌রে এক তালাক করে তিন তালাক প্রদানের চেয়ে এটা উত্তম।

তাছাড়া এ কারণে যে, এটা পরে অনুশোচনার চেয়ে অধিকতর নিরাপদ। (কেননা ইদ্দতের ভিতরে রুজু করার অবকাশ থাকে)। এবং স্ত্রীর জন্যও কম ক্ষতিকর। আর এটা মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

আর حسن অর্থাৎ উত্তম তালাক হল সুন্নত সম্মত তালাক। আর তা এই যে, সহবাসকৃত স্ত্রীকে তিন তুহ্‌র-এ তিন তালাক দেওয়া।

ইমাম মালিক (র) বলেন, এটি বিদ'আত। কেননা তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই হলো মূল বিধান। বৈধতা এসেছে বন্ধন মুক্তির প্রয়োজনে। আর সে প্রয়োজন এক তালাকের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়।

আমাদের দলীল এই যে, হযরত ইবনে ওমর (র) এর ঘটনা প্রসংগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুন্নত এই যে, 'তুহ্‌র' এর অপেক্ষা করবে। অতঃপর প্রত্যেক 'তুহ্‌র'-এ একটি তালাক দিবে।

তাছাড়া এ কারণে যে, তালাক মুবাহ হওয়ার হুকুমটি প্রয়োজনের প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। আর তা হলো নতুন আগ্রহ হওয়ার সময় তথা তুহ্‌র এর সময় তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া।[১] সুতরাং প্রয়োজনের প্রমাণের প্রেক্ষিতে ধরা হবে যেন প্রয়োজনটি বারংবার হয়েছে।

১। অর্থাৎ তালাক প্রদানের প্রয়োজন একটি অপ্রকাশিত বিষয়। সেটা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণকেই প্রয়োজনের স্থলবর্তী গণ্য করা হয়। আর এখানে প্রয়োজনের প্রমাণ এই যে, স্ত্রী হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার কারণে সহবাসের প্রতি আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া প্রমাণ করে যে, অনিবার্য কোন কারণ দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে হায়যের সময় তালাক দিলে বলা যেতে পারে যে, অনাগ্রহের কারণে তালাক দিয়েছে।

অবশ্য কোন কোন মতে উত্তম হলো তুহরের শেষ সময় পর্যন্ত তালাক প্রদান বিলম্বিত করা, ইদ্দতের দীর্ঘায়ন পরিহার করার জন্য। তবে জাহের রেওয়ায়াত অনুসারে পবিত্র হওয়া মাত্র তালাক দিবে। কেননা বিলম্বিত করলে হতে পারে যে, সে স্ত্রী সহবাস করে ফেলবে। অথচ তার নিয়ত হলো তালাক দেওয়া। ফলে সে সহবাসের পর তালাক প্রদানে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বিদ'আত তালাক হলো স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া অথবা একই তোহ্‌রে তিন তালাক দেওয়া। এরূপ যদি করে তাহলে তালাক পতিত হবে তবে সে গোনাহাগার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সকল প্রকার তালাকই মুবাহ। কেননা এটা শরীয়ত সম্মত কার্য, যার কারণে তা থেকে হুকুম প্রবর্তিত হয়। আর শরীয়ত স্বীকৃত হওয়া নিষিদ্ধতার সাথে একত্র হতে পারে না। পক্ষান্তরে হায়যের অবস্থায় তালাক দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ ক্ষেত্রে তালাক দেওয়া হারামের কারণ নয়। হারামের কারণ হল স্ত্রীর ইদ্দতকে দীর্ঘ করা।[১]

আমাদের দলীল এই যে, তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই হলো মূল। কেননা এতে সে নিকাহ্‌কে যার সংগে বিভিন্ন দ্বিনী ও দুনিয়ারী কল্যাণ সম্পৃক্ত, তাকে কর্তন করা হয়। তালাকের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে শুধু সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কারণে। আর তিন তালাককে একত্র করার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে তিন তোহ্‌রে পৃথক পৃথক তিন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের বিদ্যামনতা সম্ভব। সুতরাং এ ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার দলীলকে স্থলবর্তী কল্পনা করা যেতে পারে।[২]

আর বন্ধন মোচন হিসাবে নিজস্ব সত্তাগতভাবে তালাকের শরয়ী কার্যকারিতা ভিন্ন কারণে নিষিদ্ধতার বিপরীত নয়।[৩] আর ভিন্ন কারণ তা-ই, আমরা উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ দ্বিনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ বর্জিত হওয়া)

তদ্রূপ এক তোহরে দুই তালাক প্রদান করা বিদ'আত। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ একাধিক তালাক একত্র করার প্রয়োজন নেই)।

আর এক তালাক বায়ন দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে। মাবসূত কিতাবে ইমাম মোহাম্মদ (র) লিখেছেন যে, সে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কেননা বন্ধন মুক্তির জন্য অতিরিক্ত বিশেষণ তথা তাৎক্ষণিত বায়ন যোগ করার প্রয়োজন ছিলো না। তবে الزيادات এর বর্ণনা মতে তা মাকরূহ নয়। কেননা তাৎক্ষণিক ভাবে বন্ধন মুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে।

---

১ কেননা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ইদ্দত গণনা করা হয় তোহর দ্বারা। আর আমাদের মতে হায়য দ্বারা গণনা করা হলেও যে হায়যে তালাক প্রদান করা হবে, তা গণ্য হবে না।

২। একথা বলার প্রয়োজন হয়েছে এ জন্য যে, নিছক দলীল বা প্রমাণ মাদলূল বা প্রমাণিত বিষয়ের বিদ্যমানতাকে অনিবার্য করে না। যতক্ষণ না মাদলূলের বিদ্যমানতা সম্ভাবনাপূর্ণ হয়।

৩। এটি ইমাম শাফেয়ী (র) এর বক্তব্য-'নিষিদ্ধতা ও শরয়ী কার্যকারিতা একত্র হতে পারে না' —এর জবাব। তদ্রূপ এক তোহরে দুই তালাক প্রদান করা বিদ'আত। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ একাধিক তালাক একত্র করার প্রয়োজন নেই)।

তালাকের ক্ষেত্রে সুন্নত দু'দিক থেকে রয়েছে। প্রথমত: সময়ের দিক থেকে সুন্নত। দ্বিতীয়ত: সংখ্যার দিক থেকে সুন্নত। সংখ্যাগত সুন্নতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়া না হওয়া দু'টোই সমান।

আর তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর সময়ের দিক থেকে সুন্নত শুধু সহবাসকৃত স্ত্রীর সংগেই বিশিষ্ট। অর্থাৎ যে তোহরে সহবাস হয়নি, সে তোহরে তাকে তালাক দেওয়া।

কেননা প্রয়োজনের দলীল বিদ্যমান থাকার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর প্রয়োজনের প্রমাণ হলো সহবাসের প্রতি নতুনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সময় তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া। আর সে সময়টা হলো সহবাসমুক্ত তোহ্র। কেননা হায়যের সময়টুকু হচ্ছে (রুচিগত ভাবে) অনাগ্রহের সময়। তদ্রূপ তোহ্রের সময় একবার সহবাস করার দ্বারা আগ্রহ শিথিল হয়।

যে স্ত্রীর সংগে সহবাস হয়নি, তাকে তোহর এবং হায়য উভয় অবস্থায় তালাক প্রদান করা যেতে পারে। ইমাম যোফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি তাকে সহবাসকৃতা স্ত্রীর উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, অসহবাসকৃত স্ত্রীর ক্ষেত্রে আগ্রহ বহাল থাকে। যতক্ষণ তার থেকে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য বর্জিত না হয়, ততক্ষণ হায়যের কারণেও আগ্রহ কমে না। পক্ষান্তরে সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তোহ্রের দ্বারা আগ্রহ নবায়িত হয়।

বয়স স্বল্পতার কারণে কিংবা বার্ধক্যের কারণে যদি স্ত্রীর হায়য না আসে আর স্বামী তাকে সুন্নত মুতাবিক তিন তালাক দিতে চায় তাহলে প্রথমে এক তালাক দিবে। আর এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরেক তালাক দিবে। (এভাবে আর এক মাস পর আরেক তালাক দিবে)।

কেননা তাদের ক্ষেত্রে মাস হায়যের স্থলবর্তী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَالّٰئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِى لَمْ يَحِضْنَ

অর্থাৎ তোমাদের যে সকল স্ত্রীর হায়য রহিত হয়ে গেছে আর যাদের হায়য শুরু হয়নি, যদি তোমরা তাদের ইদ্দতের বিষয়ে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড় তাহলে (হুকুম এই যে,) তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।

আর মাস-কে হায়যের স্থলবর্তী করাটাই প্রমাণিত। এজন্যই তো তাদের ক্ষেত্রে 'গর্ভিব মুক্তির' বিষয়টি মাস দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। আর গর্ভমুক্তির বিষয়টি হায়য দ্বারাই সাব্যস্ত হয়, তোহর দ্বারা নয়। (সুতরাং বোঝা গেলো যে, মাস হায়যেরই স্থলবর্তী, তোহ্র এর নয়)।

অতএব তালাক যদি মাসের প্রারম্ভে দেওয়া হয় তাহলে তিন মাস চাঁদের হিসাবে বিবেচনা হবে। আর যদি মাসের মাঝে হয় তাহলে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে (ত্রিশ) দিনের দ্বারা মাস হিসাব করা হবে। আর ইদ্দতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) এর

মত তাই। পক্ষান্তর সাহেবায়নের মতে প্রথম মাসের ভগ্নাংশকে শেষ মাসের ভগ্নাংশ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। আর মধ্যবর্তী দুই মাসকে চাঁদের হিসাবে গণ্য করা হবে। এটা মূলতঃ ইজারা (ভাড়া) সংক্রান্ত মাসআলা (এর অনুরূপ)।

ইমাম কুদূরী বলেন, তালাক এবং সহবাসের মাঝে সময়ের ব্যবধান না করেও (হায়যহীনা স্ত্রীকে) তালাক দেওয়া জায়েয আছে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয়ের মাঝে এক মাসের ব্যবধান করবে। কেননা, এক মাসকে হায়যের স্থলবর্তী করা হয়েছে। তাছাড়া সহবাসের মাধ্যমে আগ্রহ কমে যায়। আর তা সময়ের ব্যবধানে নতুন ভাবে ফিরে আসে। আর সে সময়কালটা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) হলো একমাস।

আমাদের দলীল এই যে, (অল্পবয়স্কা ও হায়যরহিতা) এই দু'জনের ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের কথা কল্পনা করা যায় না। আর ঋতুবতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতেই মাকরূহ হওয়া গণ্য হয়েছে। কেননা তখন ইদ্দতের দিকটি অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আর ইমাম যুফার (র) যে দিক উল্লেখ করেছেন, সে দিক থেকে যদিও আগ্রহ কমে যায় কিন্তু অন্যদিক থেকে তা বৃদ্ধি পায়। কেননা সন্তানের দায়দায়িত্ব এড়ানোর জন্য গর্ভসঞ্চারহীন সহবাসের প্রতি সে আগ্রহী হবে। সুতরাং এ সময়টি আগ্রহের সময়ই হলো। ফলে তা গর্ভকালীন সময়ের ন্যায় হয়ে গেলো।

গর্ভবতী স্ত্রীকে সহবাসের পর তালাক প্রদান করা জায়েয।

কেননা তা ইদ্দতের দিককে অস্পষ্ট করে না। আর গর্ভকাল হলো সহবাসের প্রতি অনাগ্রহের কাল। কারণ তা গর্ভসঞ্চারী নয়। কিংবা গর্ভকাল হলো স্ত্রীর প্রতি আগ্রহের কাল। কারণ তার সন্তান তার গর্ভে রয়েছে। সুতরাং সহবাসের কারণে আগ্রহ হ্রাস পাবে না।

গর্ভবতী স্ত্রীকে সুন্নত মুতাবিক তিন তালাক দিতে হলে প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে এক মাসের ব্যবধান করবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র) এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, সুন্নত মুতাবেক তাকে এক তালাকের বেশী দিতে পারবে না। কেননা তালাকের ক্ষেত্রে মূল হল নিষিদ্ধতা। আর শরীয়তে ইদ্দতের বিভিন্ন অংশে পৃথক করে তালাক প্রদানের আদেশ এসেছে।[১] আর গর্ভবতীর ক্ষেত্রে মাস ইদ্দতের বিভিন্ন অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং সে ঐ স্ত্রীলোকের মতো হয়ে গেলো, যার তোহর দীর্ঘায়িত হয়েছে।

১. কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فطلقوهن لعدتهن তাদেরকে তাদের ইদ্দতে তালাক প্রদান কর। ইবনে আব্বাস (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইদ্দতের তোহরগুলোতে তালাক প্রদান কর। তাই ঋতুবতীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তোহরে পৃথকভাবে তালাক প্রদানের বিধান দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ঋতু রহিতা বৃদ্ধা এবং অল্পবয়স্কা বালিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাসে পৃথকভাবে তালাক প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। কেননা তাদের ক্ষেত্রে মাস হলো তোহরের স্থলবর্তী। পক্ষান্তরে গর্ভবতীর ক্ষেত্রে মাস ইদ্দতের বিভিন্ন অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা গর্ভকাল দীর্ঘ হলেও প্রকৃতপক্ষে এবং কার্যত: একটি তোহর রূপেই গণ্য। আর তোহর যত দীর্ঘ হোক, তা ইদ্দতের একটি অংশ রূপে গণ্য। তাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে তালাক প্রদান সম্ভব নয়।

ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র) এর দলীল এই যে, তালাকের বৈধতা প্রয়োজনের কারণে। আর মাস হলো প্রয়োজনের প্রমাণ স্বরূপ। যেমন রয়েছে ঋতু নিরাশ মহিলার ও অল্প বয়স্কার ক্ষেত্রে। মাসকে প্রয়োজনের প্রমাণ ধর্তব্যের কারণ এই যে, সৃষ্টিগত সুস্থ স্বভাবের চাহিদা হিসাবে এক মাসের ব্যবধান সহবাসের আগ্রহ নতুন ভাবে জাগ্রত হওয়ার সময়। সুতরাং তা প্রয়োজনের আলামত ও দলীল হওয়ার যোগ্য। আর যে স্ত্রীলোকের তোহর দীর্ঘায়িত হয়েছে তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের আলামত হলো তোহ্র। আর তা যে কোন সময় (ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার মাধ্যমে) আশা করা যায়। অথচ গর্ভাবস্থায় তা আশা করা যায় না।

কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে হায়যের অবস্থায় তালাক দিলে তালাক সাব্যস্ত হবে।

কেননা (হায়যের সময়) তালাক প্রদানের নিষিদ্ধতা তালাকের বহির্ভূত কারণে হয়েছে। আর বহির্ভূত কারণ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ ইদ্দত দীর্ঘায়িত করা) সুতরাং উক্ত তালাকের শরয়ী কার্যকারিতা বিলুপ্ত হবে না।

তবে তার জন্য মুস্তাহাব স্ত্রীর সাথে রাজ'আত করবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (র) কে বলেছেন, তোমার ছেলেকে আদেশ করো যেন সে তার স্ত্রীকে রাজা'আত করে। আর তিনি তার স্ত্রীকে হায়যের অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। আর এই হাদীস দ্বারা (হায়যের সময়) তালাক ওয়াকে' হওয়া প্রমাণিত হয় এবং তার উৎসাহ প্রদান প্রমাণিত হয়।

মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিই কোন কোন মাশায়েখের মত। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ মত হল তা ওয়াজিব। কেননা এতে আমর এর প্রকৃত অর্থের উপর আমল এবং যথাসম্ভব গুনাহ্ দূরীভূত করার প্রেক্ষিতে তালাকের ফল তথা ইদ্দত গণনা প্রতিহত করার মাধ্যমে। আর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হওয়ার ক্ষতিকে নিবারণের জন্য।

ইমাম কুদূরী বলেন, তারপর সে মহিলা যখন তোহর লাভ করার পর হায়যগ্রস্থা হয় এর পরে তোহর লাভ করে তখন স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিবে আর ইচ্ছা করলে স্ত্রী রূপে রেখে দেবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহম্মদ (র) মাবসূত কিতাবে এরূপই বলেছেন। আর ইমাম তাহাবী (র) বলেন, প্রথম হায়যের পরবর্তী তোহর এর সময়ই তালাক দিতে পারবে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র) বলেন, ইমাম তাহাবী (র) যা বলেছেন, তা ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। আর মাবসূতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল সাহেবায়নের মত।

মাবসূতে উল্লেখিত মতের কারণ এই যে, সুন্নত হলো প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে একটি (পূর্ণ) হায়যের ব্যবধান থাকা। অথচ এখানে ব্যবধান হচ্ছে আংশিক হায়য: সুতরাং দ্বিতীয় হায়য দ্বারা তা পূর্ণ করান হবে। আর যেহেতু হায়যকে খণ্ডিত করা সম্ভব নয়, সেহেতু দ্বিতীয়টি পূর্ণরূপে অতিবাহিত হতে হবে। আর যখন দ্বিতীয় হায়যটি পূর্ণ হয়ে গেল তখন পরবর্তী তোহরই হবে সুন্নত তালাকের সময়। সুতরাং ঐ সময় তাকে সুন্নত অনুযায়ী তালাক

দেওয়া সম্ভব। (ইমাম তাহাবী (র) বর্ণিত) অপর মতের দলীল এই যে, তালাকের প্রতিক্রিয়া তো প্রত্যাহারের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যেন হায়যের মাঝে তাকে তালাক দেয়ইনি। অতএব তাকে নিকটবর্তী তোহরের সময় তালাক দেওয়া সুন্নতের মুতাবিক হবে। **যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী ও সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে যে, তোমার প্রতি সুন্নাত মুতাবেক তিন তালাক, অথচ সে বিশেষ কোন নিয়ত করেনি। এমতাবস্থায় প্রত্যেক তোহ্‌রে তার উপর একটি তালাক পড়বে।**

কেননা এখানে লিস্ সুন্নতে শব্দের লাম হল সময়ের জন্য। আর সুন্নতে সমর্থিত সময় হলো এমন তোহর, যাতে সহবাস করা হয়নি।

আর যদি এমন নিয়ত করে থাকে যে, একই সময়ে তিন তালাক পতিত হবে কিংবা প্রত্যেক মাসের প্রারম্ভে এক তালাক পতিত হবে তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ীই তালাক সাব্যস্ত হবে।

প্রত্যেক মাসের প্রারম্ভে সে হায়য অবস্থায় থাকুক কিংবা তোহর অবস্থায়।

ইমাম যুফার (র) বলেন, একত্র তালাকের নিয়ত করা ছহী হবে না। কেননা এটা বেদ'আত আর বিদ'আত হলো সুন্নাতের বিপরীত। (সুতরাং সুন্নাত শব্দ দ্বারা তা উদ্দেশ্য হতে পারে না।)

আমাদের দলীল এই যে, তার শব্দের মধ্যে এ সম্ভাবনা রযেছে। কেননা, একত্রে তিন তালাক প্রতিত হওয়া সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত, এ প্রেক্ষিতে যে, তা পতিত হওয়া সুন্নত দ্বারা সাধিত অথচ এরূপ তালাক দেওয়া সুন্নত মুতাবিক নয়। সুতরাং তার নিঃশর্ত কথা তা অন্তর্ভুক্ত করবে না। নিয়ত দ্বারা তা অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর যদি স্ত্রী নিরাশ বয়সের কিংবা মাস গণনাকারিণী অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই এক তালাক পতিত হবে। আর এক মাস পর এক তালাক এবং আরেক মাস পরে আরেক তালাক পতিত হবে।

কেননা তার ক্ষেত্রে মাসই (তালাকের) প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ, যেমন ঋতুবতীদের ক্ষেত্রে তোহর। বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। **আর যদি তৎক্ষণাৎ তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে থাকে তাহলে তা পতিত হয়ে যাবে।**

এ হল আমাদের মত। আর এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। **আর যদি বলে যে, তোমাকে সুন্নাত মুতাবেক তালাক, কিন্তু তিন শব্দটি উচ্চারণ করেনি, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ এখানে তিন তালাক একত্র করার নিয়ত শুদ্ধ হবে না।** কেননা তিন তালাকের নিয়ত এতে বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, সুন্নত মুতাবেক কথা-টা সুন্নত সমর্থিত সময় নির্দেশ-করে। সুতরাং তাতে (সুন্নাত সমর্থিত) সময়ের ব্যাপকতা প্রতীয়মান হবে। আর এর অনিবার্য ফল হলো ঐ সময়ে পতিত তালাকের ব্যাপকতা। অথচ তিন তালাক একত্র করার নিয়ত করলে সময়ের ব্যাপকতা বাতিল হয়ে যাবে। তাই তিন তালাকের নিয়ত করা দুরস্ত হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮৭.

প্রত্যেক স্বামীরই তালাক পতিত হবে যখন সে সুস্থ মস্তিষ্ক ও বালেগ থাকে। আর নাবালিগ, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না।

কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كل طلاق جائز الا طلاق الصبى والمجنون। সকল তালাকই বৈধ। কিন্তু নাবালিকা ও পাগলের তালাক বৈধ নয়।

তাছাড়া এই জন্য যে, যোগ্যতা সাব্যস্ত হয় পার্থক্য বোধক বিবেকের মাধ্যমে। আর এ দু'জন হল বিবেকহীন। আর ঘুমন্ত ব্যক্তির তো কোন ইচ্ছাই নেই।

বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বল প্রয়োগ ইচ্ছার সাথে একত্র হতে পারে না। আর ইচ্ছার দ্বারাই শরীয়ত তিত্তিক কর্মসমূহ ধর্তব্য হয়। ঠাট্টাকারীর তালাকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তালাক শব্দ উচ্চারণে সে ইচ্ছাধীন।

আমাদের দলীল এই যে, (তালাক প্রদানের) যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং তা তালাকের ফলাফল থেকে মুক্ত হবে না তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এটা কিয়াস করা হয়েছে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদানকারীর উপর।

এর কারণ এই যে, সে দু'টি মন্দের সম্মুখীন হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে লঘুতরটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। আর এটা ইচ্ছা ও গ্রহণের প্রমাণ। অবশ্য তালাকের ফলাফলের প্রতি সে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু তা তালাক সাব্যস্ত হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক নয়। যেমন পরিহাসচ্ছলে তালাক প্রদানকারীর ক্ষেত্রে।

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে।

ইমাম কারখী ও ইমাম তাহাবী (র) এর কাছে গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী তার তালাক পতিত হবে না। আর এ হল ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি। কেননা আকল দ্বারা ইচ্ছা বিশুদ্ধ হয়। অথচ নেশাগ্রস্তের আকল বিলুপ্ত। সুতরাং ভাঙ কিংবা ঔষুধের কারণে আকল বিলুপ্ত হওয়ার মতই হবে।

আমাদের দলীল এই যে, তার আকল এমন এক কারণ দ্বারা বিলুপ্ত হয়েছে, যা গোনাহর কাজ। সুতরাং তার সতর্কতার জন্য হুকুমের দিক থেকে আকলকে বিদ্যমান বলে গণ্য করা হবে। অতএব যদি মদ্যপানের পর মাথা ধরে আর তীব্র মাথা ধরার কারণে আকল বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে আমরাও তার তালাক পতিত হবে না বলে মত পোষণ করি।

আর বোবা ব্যক্তির তালাক ইশারার মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে। কেননা তার ইশারা পরিজ্ঞাত। সুতরাং তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ইশারাকে বচনের স্থলবর্তী করা হয়েছে। এ বিষয়টির বিভিন্ন দিক কিতাবের শেষ দিকে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

দাসীর তালাক দু'টি, তার স্বামী স্বাধীন হোক কিংবা দাসী হোক। আর স্বাধীন নারীর তালাক তিনটি, তার স্বামী স্বাধীন হোক কিংবা দাস হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তালাকের সংখ্যা পুরুষদের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

তালাক পুরুষের সংগে সংশ্লিষ্ট। আর ইদ্দত নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাছাড়া মালিকানার গুণটি মর্যাদার বিষয়। আর 'মানবতা' হলো মর্যাদার হকদার। আর মানবতার গুণ স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সুতরাং তার মালিকানা হবে অধিক ও বেশী।

আর আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان

দাসীর তালাক দু'টি আর তার ইদ্দত হলো দুই হায়েয।

তাছাড়া এ কারণে যে, 'সম্ভোগ স্থান' হালাল হওয়া স্ত্রীর জন্য একটি নেয়ামত। আর নেয়ামতের পরিমাণকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব রয়েছে। তবে যেহেতু এক তালাক খণ্ডিত করা যায় না, সেহেতু দুই তালাক পূর্ণ হবে। ইমাম শাফেয়ী যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, তালাক প্রদান পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত।

দাস যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে থাকে অতঃপর তালাক প্রদান করে তাহলে তার তালাক পতিত হবে। কিন্তু দাস-পত্নীর উপর মনিবের তালাক পতিত হবে না।

কেননা বিবাহের মালিকানা হলো দাসের নিজস্ব হক। সুতরাং তা রহিত করার ক্ষমতা তার হাতেই থাকবে; মনিবের হাতে না।

ايقاع الطلاق
অধ্যায় ঃ তালাক প্রদান

অধ্যায় ঃ তালাক প্রদান

তালাক দুই প্রকার ঃ সুস্পষ্ট তলাক ও ইংগিত সূচক তালাক। সুস্পষ্ট তালাক অর্থ (তালাক শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে) এভাবে বলা 'তুমি তালাক' কিংবা 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' এসকল শব্দ দ্বারা তালাকে রাজঈ পতিত হবে।

কেননা (লোক প্রচলনে) এ সকল শব্দ তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এগুলি হল সুস্পষ্ট তালাকের শব্দ। আর সুস্পষ্ট তালাকের পর কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী রিজ'আতের অধিকার থাকে।

আর এ তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই।

কেননা এক্ষেত্রে অধিক ব্যবহারের কারণে শব্দটি তালাকের অর্থে সুস্পষ্ট।

আর অদ্রূপই হুকুম, যদি (এ শব্দের দ্বারা) বায়ন তালাকের নিয়ত করে।

কেননা শরীয়ত যে তালাকের কার্যকারিতাকে ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে, সেটাকে সে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং তার ইচ্ছা প্রত্যাখাত হবে।

আর যদি তালাক শব্দটি দ্বারা সে (আভিধানিক অর্থ তথা) শৃংখল বন্ধন থেকে মুক্তির নিয়ত করে থাকে তাহলে আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে না।

কেননা এ হল বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

তবে এ নিয়ত আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা (আভিধানিক দিক থেকে) শব্দটি উপরোক্ত অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

আর যদি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির নিয়ত করে থাকে তাহলে আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আল্লাহ ও বান্দার মাঝেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা তালাক সাব্যস্ত হয় (বিবাহ) বন্ধন বিলুপ্ত করার জন্য আর বিবাহ বন্ধন কর্ম বন্ধন নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা শব্দটি রেহাই দানের অর্থে ব্যবহার করা হয়। **যদি বলে তুমি مطلقة (হরফটি সাকিন ط উচ্চারণ করে) তাহলে নিয়ত ছাড়া তালাক হবে না।**

কেননা সাধারণ প্রচলনে শব্দটি তালাকের অর্থে ব্যবহৃত নয়। সুতরাং তা সুস্পষ্ট তালাক নয়।

ইমাম কদূরী বলেন, উক্ত শব্দগুলি দ্বারা শুধু এক তালাক পতিত হবে। যদিও সে একাধিক তালাকের নিয়ত করে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যা নিয়ত করবে তাই পতিত হবে। কেননা তা উক্ত শব্দের সম্ভাবনাভুক্ত।

কারণ তালাক শব্দের উচ্চারণে আভিধানিক অর্থে তালাকের উচ্চারণ হয়, যেমন 'আলিম শব্দের উচ্চারণে 'ইলম' এর উচ্চারণ হয়। আর এ জন্যই এর সাথে সংখ্যা ثلاثا যুক্ত করা শুদ্ধ রয়েছে। সুতরাং এ সংখ্যার উল্লেখ ব্যাখ্যা স্বরূপ গণ্য হবে।

আমাদের দলীল এই যে, তালাক শব্দটি একজনের অবস্থা বুঝায়। এ কারণে দু'স্ত্রীর জন্য বলা হয় طالقان আর তিন জনের জন্য বলা হয় طوالق-সুতরাং এতে সংখ্যার সম্ভাবনা নেই। কেননা সংখ্যা হল মূল শব্দের অর্থের বিপরীত।*

যদি তালাক শব্দটিকে স্ত্রীর সমগ্র সত্তার সংগে যুক্ত করে কিংবা এমন অংগের সংগে যুক্ত করে, যা দ্বারা সমগ্র সত্তা বোঝানো হয়ে থাকে, তবে তালাক পতিত হবে। কেননা, তালাকের সম্পর্ক করা হয়েছে তার যথাস্থানের সাথে।

যেমন সে বলে, তুমি তালেক। কারণ 'তুমি' সর্বনাম দ্বারা স্ত্রী বোঝায়। তোমার গর্দান তালাক কিংবা তোমার গলা তালাক কিংবা তোমার মাথা তালাক কিংবা তোমার আত্মা তালাক কিংবা তোমার শরীর বা দেহ তালাক কিংবা তোমার গুপ্তাংগ তালাক কিংবা তোমার মুখ তালাক।

কেননা এ সকল শব্দ দ্বারা সমগ্র দেহ বোঝানো হয়। শরীর বা দেহ শব্দটিতো স্পষ্ট। অন্যান্য শব্দগুলোও অদ্রূপ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ একটি গর্দান (একটি গোলাম) আযাদ করা।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, فظلت اعناقهم তাদের গলা সমূহ অর্থাৎ তাদের সত্তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لعن الله الفروج على السروج

যে লজ্জা স্থান অর্থাৎ নারীরা অশ্বে আরোহণ করে, আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করুন।

তাছাড়া বাগধারায় বলা হয় فلان رأس القوم- অমুক হলো গোষ্ঠীর মাথা। (অর্থাৎ প্রধান) আরো বলা হয় وجه العرب- অমুক আরবের মুখ মন্ডল (অর্থাৎ আরবের গণ্যমান ব্যক্তি) আরো বলা হয় هلك روحه -তার প্রাণ শেষ হলো (অর্থাৎ সে শেষ হলো)

এক বর্ণনামতে রক্ত শব্দটি এই শ্রেণীভুক্ত। কেননা বলা হয় دمه هدر তার রক্ত পণ মুক্ত। তদ্রূপ নফস শব্দটি দ্বারা পূর্ণ সত্তা উদ্দেশ্য হওয়া স্পষ্ট।

একই হুকুম হবে যদি বিস্তীর্ণ অংশকে তালাক দেয়। যেমন বললো তোমার অর্ধেক তালাক কিংবা তোমার এক তৃতীয়াংশ তালাক।

কেননা বিস্তীর্ণ অংশ বেচাকেনা ও অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্র রূপে গণ্য হয়। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্র রূপেও গণ্য হবে। তবে তালাকের ক্ষেত্রে যেহেতু খন্ডিত হওয়া সম্ভব নয় সেহেতু অনিবার্যভাবে সর্বাংশে তালাক সাব্যস্ত হবে।

---

* এখানে কিছু বিবরণ আরবী ভাষার বিশেষ ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কারণে এ অংশের অনুবাদ বোধগম্য হবে না বলে বাদ দেওয়া হল

যদি বলে তোমার হাত তালাক কিংবা তোমার পা তালাক, তাহলে তালাক পতিত হবে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তালাক পতিত হবে। একই মতপার্থক্য রয়েছে এমন সকল নির্ধারিত অংগের ক্ষেত্রে, যা দ্বারা সমগ্র দেহ অভিব্যক্ত হয় না। উভয়ের দলীল এই যে, এগুলো এমন অংগ, যা বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে ভোগ করা হয়। আর যে সকল অংগের এই অবস্থা, সেগুলো বিবাহ বিধানের ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাই তালাকেরও ক্ষেত্র হবে। সুতরাং সম্বন্ধ সূত্রের চাহিদায় ঐ অংগটিতে তালাকের হুকুম সাব্যস্ত হবে। অতঃপর সমগ্র দেহ সত্তায় তালাকের হুকুম বিস্তার লাভ করবে। যেমন বিস্তীর্ণ অংশের ক্ষেত্রে।

আর নির্ধারিত অংগের দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিস্তার লাভ করা অগ্রহণযোগ্য ও নিষিদ্ধ। কারণ অন্য সকল অংগের হারাম হওয়া এই অংগের হালাল হওয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করবে। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে বিষয়টি এর বিপরীত।

আমাদের দলীল এই যে, যা তালাকের ক্ষেত্র নয়, তার দিকে সে তালাককে সম্পর্কিত করেছে। সুতরাং তা বাতিল। যেমন, স্ত্রীর থুথুর দিকে কিংবা নখের দিকে সম্পর্কিত করে। এর কারণ এই যে, যেখানে বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে তাই হবে তালাকের ক্ষেত্র। কেননা তালাক বন্ধন মুক্তির অর্থ প্রকাশ করে। আর হাতের মধ্যে কোন বন্ধন নেই। এই কারণেই হাতের দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে বিস্তীর্ণ অংশের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আমাদের মতে তা বিবাহের ক্ষেত্র। এ কারণে বিস্তীর্ণ অংশের দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ। তাই তা তালাকের ক্ষেত্র হবে।

পেট ও পিঠকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। আর প্রবল মত এই যে, তা শুদ্ধ হবে না। কেননা এ দু'টি শব্দ দ্বারা সমগ্র শরীর বোঝানো হয় না।

যদি স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক বা তৃতীয়াংশ তালাক দেয় তাহলে সে এক তালাক প্রাপ্ত হবে। কেননা তালাক খণ্ডিত হয় না, আর যা খণ্ডিত হয় না তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা পূর্ণটির উল্লেখ করার ন্যায়। একই হুকুম হবে তালাকের যে কোন খণ্ডিত অংশ উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও। এর কারণ যা আমরা বর্ণনা করেছি।

যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি দুই তালাকের তিন অর্ধেক তালাক তাহলে সে তিন তালাক প্রাপ্তা হবে।

কেননা দুই তালাকের অর্ধেক হলো এক তালাক। সুতরাং যখন সে তিনটি অর্ধেককে একত্র করেছে তখন অনিবার্যভাবেই তিনটি তালাক হবে।

যদি স্ত্রীকে বলে তোমার প্রতি এক তালাকের তিন অর্ধেক তালাক, তাহলে তার উপর কোন কোন মতে দুই তালাক পতিত হবে।

কেননা এর অর্থ হলো এক তালাক ও অর্ধ তালাক। সুতরাং অর্ধ তালাক দ্বারা পূর্ণ তালাক সাব্যস্ত হবে। আর কেউ কেউ বলেন, এতে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে।

কেননা প্রতিটি অর্ধ তালাক নিজস্বভাবে পূর্ণ তালাক হবে। সুতরাং তিন তালাক হয়ে যাবে।

যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি এক থেকে দুই পর্যন্ত তালাক কিংবা এক থেকে দুই পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী তালাক, তাহলে এক তালাক হবে। আর যদি বলে, এক থেকে তিন

পর্যন্ত কিংবা এক থেকে তিন পর্যন্ত-এর মধ্যবর্তী তালাক তাহলে দুই তালাক হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, প্রথম ছূরতে দুই তালাক এবং দ্বিতীয় ছূরতে তিন তালাক হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, প্রথম ছূরতে কোন তালাকই পতিত হবে না। আর দ্বিতীয় ছূরতে এক তালাক হবে। এটাই কিয়াসের দাবী। কেননা শেষ সীমা সে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়। যেমন যদি কেউ বলে, আমি তোমার নিকট এই দেয়াল থেকে এই দেয়াল পর্যন্ত বিক্রি করলাম (তখন উভয় দেয়াল অন্তর্ভুক্ত থাকে না।)

সাহেবায়নের দলীল এই যে, আর এটাই হলো সূক্ষ্ম কেয়াস-যখন এ ধরনের কথা বলা হয়, তখন সাধারণ প্রচলনে সমগ্রটুকু উদ্দেশ্য হয়। যেমন, তুমি কাউকে বললে, তুমি আমার মালের এক দিরহাম থেকে একশ পর্যন্ত নিয়ে নাও। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এই ধরনের কথার উদ্দেশ্য হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ থেকে অধিক এবং সর্বাধিক পরিমাণ থেকে কম। যেমন লোকে বলে, আমার বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত কিংবা ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত এর মধ্যে। আর একথা দ্বারা আমাদের উল্লেখিত অর্থই উদ্দেশ্য হয়।

আর সমগ্রটি উদ্দেশ্য ঐ ক্ষেত্রে হয়, যেখানে মোবাহ্ বিষয়ের পথ অনুসরণ করা হয়। যেমন সাহেবায়নের উল্লেখিত ছূরতে হয়েছে। আর তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই মূল বিষয়।

আর (ইমাম যুফার (র) এর দলীলের জবাব এই যে,) প্রথম সীমাটি বিদ্যমান থাকা অনিবার্য, যাতে তার উপর দ্বিতীয় সীমাটি কার্যকর হতে পারে। আর তা অস্তিত্ব লাভ করবে সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে তো উল্লেখিত সীমাটি বিক্রয়ের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি এক তালাকের নিয়ত করে তাহলে ديانة বা দীনী বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু قضاء বা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা সেটা তার উচ্চারিত কথার সম্ভাবনাভুক্ত রয়েছে। তবে তা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

যদি বলে যে, তুমি দুইয়ের মধ্যে এক তালাক আর একথা দ্বারা সে অংকের 'গুণ' উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা তার কোন নিয়ত না থাকে তাহলে এক তালাক হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, দুই তালাক হবে। কেননা অংশের ক্ষেত্রে এটাই প্রচলিত অর্থ। হাসান বিন যিয়াদেরও এ মত।

আমাদের দলীল এই যে, গুণের ভূমিকা হলো বস্তুর অংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, গুণকৃত বস্তুকে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়। আর একটি তালাকের অংশবৃদ্ধি তালাকে সংখ্যা বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে না।

আর যদি নিয়ত করে থাকে এক তালাক এবং দুই তালাক, তাহলে তিন তালাকই সাব্যস্ত হবে।

কেননা উচ্চারিত শব্দ এ অর্থের সম্ভাবনা না রাখে। কারণ এবং শব্দটি একত্রীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ظرف বা পাত্রকে مظروف বা পাত্রস্থ বস্তুর সংগে যুক্ত করা হয়ে থাকে। আর দুই যদি সহবাসকৃতা হয় তাহলে একটি তালাক সাব্যস্ত হবে। যেমন সে বলল এক তালাক ও দুই তালাক। আর যদি নিয়ত করে থাকে এক তালাক তাহলে দুই সংযুক্ত তিন

তালাক পতিত হবে। কেননা 'মাঝে' শব্দটি সংযুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ (আমার বান্দাদের মাঝে দাখেল হও)। অর্থাৎ আমার বান্দাদের সাথে দাখেল হও।

আর যদি ('দুইয়ের মাঝে' দ্বারা এক তালাকের) পাত্র উদ্দেশ্য করে থাকে তাহলে এক তালাক পতিত হবে।

কেননা তালাক তো পাত্র হতে পারে না, সুতরাং (দুইয়ের মাঝে) কথাটার উল্লেখ বাতিল বলে গণ্য হবে। **আর যদি বলে, দুইয়ের মাঝে দুই তালাক এবং অংকের গুণ নিয়ত করে তাহলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে।** ইমাম যুফার (র) এর মতে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা (গুণ হিসাবে) এ বক্তব্যের দাবী হলো চার তালাক হওয়া। কিন্তু তিনের অধিক তালাকের সংখ্যা নেই।

আমাদের মতে প্রথম অংশটুকু শুধু বিবেচ্য হবে। যেমন (এইমাত্র) আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি বলে, তুমি এখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তালাক, তাহলে এক তালাক হবে, আর তার 'রুজু করার' অধিকার থাকবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, এটা বায়ন তালাক হবে। কেননা তালাককে সে দৈর্ঘ্য গুণে গুণান্বিত করেছে।

আমরা বলি যে, না, সে বরং এটাকে সীমাবদ্ধতা গুণে গুণান্বিত করেছে। কেননা তালাক যখন সাব্যস্ত হয় তখন তা সর্বত্রই সাব্যস্ত হয়।

যদি বলে যে, তুমি মক্কায় বা মক্কার মধ্যে তালাক, তাহলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তালাকপ্রাপ্তা হবে এবং সকল দেশের জন্যই কার্যকর হবে। তদ্রূপ (একই হুকুম হবে) যদি বলে তুমি ঘরের মধ্যে তালাক।

কেননা তালাক কোন স্থান বাদ দিয়ে কোন স্থানের সাথে বিশিষ্ট হয় না। যদি সে উদ্দেশ্য করে থাকে যে, যখন তুমি মক্কায় উপনীত হবে তখন তালাক হবে, তাহলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এ নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার অন্তর্নিহিত নিয়ত বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

আর যদি বলে, যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তুমি তালাক, তাহলে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা তালাককে সে প্রবেশের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। আর যদি বলে, তুমি তোমার ঘরে দাখেল হওয়ার মাঝে তালাক, তাহলে তালাক ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। কেননা শর্ত ও ظـرف (বা পাত্র) এর মধ্যে মিল রয়েছে। সুতরাং পাত্রের অর্থ অসম্ভব হওয়ার বেলায় শর্তের অর্থে প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ তালাককে সময়ের সাথে সম্বন্ধকরণ প্রসঙ্গে

যদি স্বামী বলে, তুমি আগামীকাল তালাক, তাহলে ফজর উদিত হওয়ার সংগে সংগে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে।

কেননা তালাককে সে সমগ্র আগামীকাল এর সাথে সম্বন্ধ করেছে, আর তা বাস্তবায়িত হবে আগামীকালের প্রথম অংশে, তালাক পতিত হওয়ার মাধ্যমে।

আর যদি আগামীকাল দ্বারা দিনের শেষাংশ নিয়ত করে থাকে তাহলে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে গ্রহণীয় হবে। কিন্তু আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে ব্যাপকতার মাঝে বিশিষ্টতা নিয়ত করেছে আর শব্দটি এর সম্ভাবনা রাখে আর তা বাহ্যিক ব্যবহারের বিপরীত :

আর যদি বলে, তুমি আজ-আগামীকাল তালাক কিংবা আগামীকাল-আজ তালাক, তাহলে প্রথম উচ্চারিত শব্দটিই বিবেচ্য হবে। সুতরাং প্রথম বাক্যের ক্ষেত্রে 'আজই' তালাক সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে আগামীকাল সাব্যস্ত হবে।

কেননা 'আজ' বলার অর্থ তাৎক্ষণিক তালাক প্রদান, আর তাৎক্ষণিক প্রদত্ত তালাককে 'আগামীকালের' সংগে সম্বন্ধ করায় অবকাশ রাখে না। পক্ষান্তরে যদি আগামীকাল বলে তাহলে তা সম্বন্ধিত হবে। আর সম্বন্ধিত বিষয় তাৎক্ষণিক হতে পারে না। কেননা তাতেও সম্বন্ধকে বাতিল করা হয়। সুতরাং উভয় অবস্থায় দ্বিতীয় শব্দটি বাতিল হবে।

যদি বলে, তুমি আগামীকালের মধ্যে তালাক, অতঃপর সে বলে যে, আমি দিবসের শেষাংশ উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, বিশেষভাবে আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (ديانة হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে)।

কেননা সে সমগ্র আগামীকালে স্ত্রীকে তালাক এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তার এ কথাটি আগামীকাল বলার অনুরূপ হলো। যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। এ কারণেই যে তা নিয়ত না থাকা অবস্থায়ও আগামীকালের প্রথম অংশে তালাক পতিত হয়। এর কারণ এই যে, 'মধ্যে' কথাটি উক্ত থাকা না থাকা দু-ই সমান। কেননা উভয় অবস্থাতেই আগামীকাল শব্দটি ظرف রূপে বিবেচিত।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, সে তার উচ্চারিত কথার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য করেছে। কেননা মধ্যে শব্দটি ظرف (বা পাত্র) নির্দেশক। আর পাত্র হওয়ার বিষয়টি সর্বব্যাপকতা দাবী করে না। আর প্রথম অংশটি নির্ধারিত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী সময় বিদ্যমান না থাকায় অনিবার্য কারণে। কিন্তু দিবসের শেষাংশকে যখন সে নির্ধারণ করলো তখন ইচ্ছাকৃত ভাবে নির্ধারিত সময় অনিবার্যরূপে নির্ধারিত সময়ের মোকাবেলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে শুধু আগামীকাল কথাটি ভিন্ন। কেননা তা সামগ্রিকতা দাবী করে। কারণ স্ত্রীকে সে তালাক গুণে সম্পর্কিত করেছে এমন অবস্থায় যে, তা সমগ্র আগামীকালের সংগে সম্বন্ধযুক্ত। এর উদাহরণ এই যে, কেউ বললো, আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন রোযা রাখবো। আর প্রথমটির উদাহরণ হলো আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবনের মধ্যে রোযা রাখবো। এক যুগ এবং এক যুগের মধ্যে এক্ষেত্রেও একই মত পার্থক্য রয়েছে।

যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি গতকাল তালাক, অথচ তাকে বিবাহ করেছে আজ, তাহলে কোন তালাক পতিত হবে না।

কেননা তালাককে সে এমন একটি নির্ধারিত অবস্থার সংগে যুক্ত করেছে, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থি। সুতরাং তা অনর্থক হবে। যেমন, যদি বলে যে, আমার সৃষ্টির পূর্বেই তুমি তালাক।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, বাক্যটির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করা সম্ভব। এই অর্থে যেন সে এ খবর দিচ্ছে যে, (গতকাল তুমি) আমার বিবাহাধীনে ছিলে না। কিংবা অন্য স্বামীর পক্ষ হতে তালাক প্রাপ্ত ছিলে।[১]

আর যদি গতকালের পূর্বে তাকে বিবাহ করে থাকে তাহলে তাৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে।

কেননা তালাককে সে এমন অবস্থার সংগে যুক্ত করেনি, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থি। আর এটাকে সংবাদ রূপে বিশুদ্ধ প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা সৃজন অর্থে হবে। আর অতীতকালের সৃজন বর্তমান কালের সৃজন হিসেবে ধর্তব্য। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে।

যদি বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তোমার প্রতি তালাক তাহলে কোন তালাক পতিত হবে না।

কেননা তালাককে সে তালাকের মালিকানার পরিপন্থী অবস্থার সংগে সম্পর্কিত করেছে। সুতরাং এটা তার এই বক্তব্যের মতো হবে: আমি শৈশব অবস্থায় কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে তালাক দিলাম।

কিংবা এই কারণে যে, এ বাক্যটিকে (তার বিবাহাধীনে না থাকার কিংবা অন্য স্বামীর পক্ষ হতে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার) সংবাদ রূপে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা সম্ভব। যেমন (এই মাত্র) আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি বলে যে, তোমার প্রতি তালাক যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দিই, অথবা বলে, যে পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দিই, অথবা বলে, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে তালাক না দিই—এ বলে সে নীরব হয়ে যায়। তাহলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে।

১। অর্থাৎ এ বাক্যটি কাঠামোগত দিক থেকে সংবাদবাচক কিন্তু সংবাদ অর্থে গ্রহণ অসম্ভব হওয়ার কারণে সেটাকে 'সৃজন' অর্থে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সংবাদ অর্থে গ্রহণ সম্ভব হওয়ার কারণে সৃজন অর্থে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা তালাককে সে এমন একটি সময়ের সংগে যুক্ত করেছে, যা তালাক থেকে মুক্ত। আর নীরবতা অবলম্বন করা মাত্র সে সময়টি বিদ্যমান হয়েছে। আর তা এই জন্য যে, আরবী শব্দে متى ما - متى (যে পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না) স্পষ্ট সময় নির্দেশক। কেননা উভয়টি সময়ের পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত। তদ্রূপ ما (যতক্ষণ) শব্দটি সময়ের জন্য ব্যবহৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন مَادُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ জীবিত কালে।

আর যদি বলে যে, আমি যদি তোমাকে তালাক না দেই তবে তুমি তালাক, তাহলে স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তালাক হবে না।

কেননা জীবনের সম্ভাবনা থেকে নিরাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক না দেওয়া সাব্যস্ত হবে না; আর তাই ছিল শর্ত। যেমন যদি সে বলে, আমি যদি বসরায় গমন না করি (তাহলে তুমি তালাক) স্ত্রীর মৃত্যু স্বামীর মৃত্যুর অনুরূপ।* এটাই বিশুদ্ধমত। **যদি এরকম বলে যে, তোমার পতি তালাক যখন তোমাকে তালাক না দেই তোমার প্রতি তালাক। তাহলে এই দ্বিতীয় তালাক দ্বারা সে তালাকপ্রাপ্তা হবে।**

অর্থাৎ যদি তা পূর্ববর্তী কথার সাথে সংযুক্ত ভাবে বলে। কিয়াসের দাবী হলো সময়ের সাথে সম্বন্ধিত তালাক পতিত হওয়া। সুতরাং স্ত্রী সহবাসকৃত হলে দুই তালাক পতিত হবে। এ হল ইমাম যুফার (র) এর মত। কেননা (স্বামীর উপরোক্ত কথা বলার সংলগ্ন পরেই) এমন একটি সময় পাওয়া গেছে, যে সময়টুকুতে স্ত্রীকে সে তালাক দেয়নি; যদিও তা অল্পই হোক আর তা হলো (দ্বিতীয় বার) 'তোমার প্রতি তালাক' বলা থেকে অবসর হওয়ার পূর্ববর্তী সময়টুকু।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য প্রদত্ত বক্তব্যের সময়টুকু অবস্থার চাহিদায় শর্তের বহির্ভূত ধরা হবে। কেননা শর্তের উদ্দেশ্যই হলো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। আর এই পরিমাণ সময়কে শর্তের বহির্ভূত না ধরলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আলোচ্য মাসআলার মূল এই যে, কোন ব্যক্তি কসম করে বললো যে, এই ঘরে বাস করবেনা এবং সেই মুহূর্তে সে আসবাবপত্র সরানোর কাজে লেগে গেলো। এ ধরনের অন্যান্য মাসায়েল যা ইনশাআল্লাহ কসম অধ্যায়ে আসবে।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে যেদিন তোমাকে বিবাহ করবো সেদিনই তোমাকে তালাক; অতঃপর সে তাকে রাত্রিকালে বিবাহ করলো, তাহলে সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে।

কেননা দিন বলে কখনো দিবসের আলোকিত অংশটুকু বোঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং তার সংগে প্রলম্বিত কোন কাজ যুক্ত হলে দিন দ্বারা দিবসের আলোকিত অংশটুকুই উদ্দেশ্য হবে যেমন রোযার ক্ষেত্রে। (যেমন বললো, যেদিন অমুক আগমন করবে সেদিন রোযা রাখার মান্নত করলাম।) তদ্রূপ স্ত্রীকে ইচ্ছা দানের ক্ষেত্রে (যেমন বলা হয় যেদিন অমুক আগমন করবে, সেদিন তোমার বিষয় তোমার হাতে অর্পণ করা হলো।)

---

* মূল কিতাবের পরবর্তী অংশটুকু আরবী ব্যাকরণ সংক্রান্ত হওয়ায় বাংলা ভাষা ভাষীদের জন্য বোধগম্য হবে না বলে বাদ দেয়া হলো

কেননা এ ক্ষেত্রে সময় দ্বারা সময়ের পরিমাপ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় দিবসের অংশটুকু উদ্দেশ্য করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর কখনো দিন উল্লেখ করে সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ (যেদিন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে) এখানে দিন দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং যখন তার সংগে অপ্রলম্বিত কাজ যুক্ত করা হবে তখন দিন শব্দটি সাধারণ সময় অর্থে প্রযোজ্য হবে। আর তালাক এই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং রাত্র ও দিবস উভয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

যদি সে বলে যে, দিন দ্বারা আমি বিশেষভাবে দিবসের আলোকিত অংশ বুঝিয়েছি, তাহলে আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে শব্দটির প্রকৃতি অর্থ নিয়ত করেছে। পক্ষান্তরে যদি 'রাত্র' শব্দটি ব্যবহার করে তাহলে সময়ের অন্ধকার অংশটুকুই শুধু উদ্দেশ্য হবে। আর যদি দিবস শব্দটি উল্লেখ করে তাহলে শুধু সময়ের আলোকিত অংশটুকু উদ্দেশ্য হবে। এটাই আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ।

অনুচ্ছেদ ঃ

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমার থেকে তালাকপ্রাপ্ত, তাহলে কিছুই হবে না; যদিও তালাকের নিয়ত করে। আর যদি বলে, আমি তোমার থেকে বিছিন্ন কিংবা আমি তোমার জন্য হারাম আর এ কথা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তাহলে স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, প্রথম ছূরতেও তালাক হয়ে যাবে, যদি নিয়ত করে থাকে। কেননা বিবাহের মালিকানায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরীক। স্ত্রী এ কারণেই সহবাস দাবী করতে পারে, স্বামী যেমন সহবাসের সুযোগদানের দাবী করতে পারে। তদ্রূপ হালাল হওয়ার বিষয়েও উভয়েই শরীক। আর তালাক এ দুটিকে বিলুপ্ত করার জন্য নির্ধারিত। সুতরাং তালাক স্বামীর দিকেও সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ। যেমন 'বিচ্ছিন্ন' এবং 'হারাম' শব্দ দুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আমাদের দলীল এই যে, তালাক বন্ধন মুক্তির জন্য, আর বন্ধন রয়েছে স্ত্রীর ক্ষেত্রে; স্বামীর ক্ষেত্রে নয়। তুমি কি জাননা যে, স্ত্রীর প্রতিই তো বিধি নিষেধ আরোপিত অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে এবং স্বামীগৃহ ছেড়ে বের হওয়া থেকে।

আর যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, তালাক হলো মালিকানা বিলুপ্ত করার জন্য তাহলে মালিকানা স্ত্রীর উপর রয়েছে। কেননা স্ত্রী স্বামীর মালিকানাধীন এবং স্বামীই মালিক। এ জন্যই স্ত্রীকে منكوحة (বিবাহকৃতা) বলা হয়।

পক্ষান্তরে 'বিচ্ছিন্ন' হওয়া শব্দটি ভিন্ন। কেননা তা সম্পর্ক বিলুপ্তির অর্থ বোঝায়। আর সম্পর্কের মধ্যে উভয়ের শরীকানা রয়েছে। তদ্রূপ 'হারাম' শব্দটিও ভিন্ন। কেননা তা 'হালালত্ব' বিলুপ্ত করার জন্য। আর হালাল হওয়ার মধ্যে উভয়ের শরীকানা রয়েছে। সুতরাং এ শব্দ দু'টিকে উভয়ের দিকে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হবে। কিন্তু তালাকের সম্বন্ধ শুধু স্ত্রীর দিকেই করা যাবে।

যদি বলে তোমার প্রতি এক তালাক কিংবা নয়, তাহলে কিছুই হবে না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, জামেউস ছাগীর কিতাবে বিষয়টাকে বিনা মতপার্থক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর শেষ মত। ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে—আর এটি ছিল ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর প্রথম মত— যে, তার উপর এক তালাকে রজিঈ পতিত হবে।

কিতাবুত্তালাক-এ ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এক তালাক কিংবা কিছুই না। আর উভয় মাসআলায় কোন পার্থক্য নেই।

আর যদি জামেউস ছাগীরে বর্ণিত মত সর্বসম্মত হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে যে,) ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে দুটি মত বর্ণিত রয়েছে।

তার দলীল এই যে, এক তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ কিংবা কে এক তালাকও না বাচক শব্দের মাঝে প্রয়োগ করার কারণে। সুতরাং এক তালাকের

গ্রহণযোগ্যতা রহিত হয়ে যাবে এবং 'তোমার প্রতি তালাক' কথাটাই শুধু বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে তোমার প্রতি তালাক কিংবা 'নয়' এ কথাটি ভিন্ন। কেননা সে মূল তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তালাক পতিত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের দলীল এই যে, তালাক গুণটিকে যখন সংখ্যার সাথে যুক্ত করা হয় তখন সংখ্যার উল্লেখের দ্বারা তালাক পতিত হয়। দেখুন না যদি অসহবাসকৃতা স্ত্রীকে 'তুমি তিন তালাক' বলে তাহলে তিন তালাকই সাব্যস্ত হয়। যদি গুণবাচক শব্দটি দ্বারা পতিত হতো তাহলে (অসহবাসকৃতার ক্ষেত্রে) তিন শব্দটি অর্থহীন হতো। এর কারণ এই যে, মূলতঃ যা পতিত হয় তা হল উহ্য ধাতুটি অর্থাৎ তুমি তালাকপ্রাপ্ত, এক তালাক যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যখন যার সঙ্গে সংখ্যা সংশ্লিষ্ট তা-ই পতিত হয় তখন মূল-তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সন্দেহ সৃষ্টি হলো। সুতরাং সন্দেহের কারণে কোন কিছুই পতিত হবে না। **যদি বলে, তুমি আমার মৃত্যুর সংগে সংগে তালাক কিংবা বলে তুমি তোমার মৃত্যুর সংগে সংগে তালাক, তাহলে কিছুই হবে না।** কেননা সে তালাককে এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করেছে, যা তালাকের পরিপন্থী। কারণ স্বামীর মৃত্যু তালাক প্রদানের যোগ্যতার পরিপন্থী। আর স্ত্রীর মৃত্যু তালাকের ক্ষেত্র থাকার পরিপন্থী। অথচ (তালাক পতিত হওয়ার জন্য) উভয়ের বিদ্যমানতা জরুরী।

স্বামী যদি তার স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীর কোন অংশের মালিক হয়ে যায় কিংবা স্ত্রী যদি স্বামীর কিংবা স্বামীর কোন অংশের মালিক হয়ে যায় তাহলে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

কেননা দু'ধরনের মালিকানার মাঝে বৈপরীত্ব রয়েছে। স্ত্রী যদি স্বামীর মালিক হয় তাহলে বৈপরীত্বের কারণ এই যে, মালিক হওয়া এবং মালিকানাধীন হওয়া একই ক্ষেত্রে একত্র হচ্ছে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর মালিক হয় তাহলে কারণ এই যে, বিবাহসূত্রের মালিকানা তো জরুরী প্রয়োজন ভিত্তিক। আর দেহসত্তার মালিকানা থাকা অবস্থায় প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। সুতরাং বিবাহ সূত্রের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যদি তার স্ত্রীকে খরিদ করার পর তালাক দেয় তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে না।

কেননা তালাক বিবাহের বিদ্যমানতা দাবী করে। আর বিপরীত বিষয়ের সাথে বিবাহের অস্তিত থাকতে পারে না। আংশিকভাবে না এবং সামগ্রিকভাবেও না।

তদ্রূপ স্ত্রী যদি স্বামীর মালিকানা লাভ করে কিংবা তার অংশ বিশেষের মালিক হয় তাহলে তালাক পতিত হবে না। কারণ ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, উভয় মালিকানার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তালাক পতিত হবে। কেননা এই মহিলার জন্য ইদ্দত ওয়াজিব। প্রথম ছূরত এর বিপরীত। কারণ সেখানে কোন ইদ্দত নেই। তাই স্ত্রীর সংগে সহবাস করা স্বামীর জন্য জায়েয রয়েছে।

অন্যের দাসী থাকা অবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার মনিব তোমাকে আযাদ করার সংগে সংগে তুমি দুই তালাক। অতঃপর মনিব তাকে আযাদ করলো তাহলে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে।

কেননা স্বামী তালাক প্রদানকে আযাদ করা বা আযাদ হওয়ার সাথে যুক্ত করেছে। কারণ عتق শব্দটি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। আর শর্ত বলে ঐ বিষয়কে। যা বর্তমানেও অবিদ্যমান কিন্তু বিদ্যমানতার সম্ভাবনা থাকে, আর তার সংগে হুকুমের সম্পর্ক থাকে। আমাদের উল্লেখিত আযাদ করার বিষয়টি এই গুণ সম্পন্ন। আর আযাদ করার সংগে তালাক প্রদানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা সম্পৃক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মতে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময় তালাক প্রদান বলে সাব্যস্ত হবে। যখন তালাক প্রদান কর্মটি আযাদ করা বা আযাদ হওয়ার সংগে সম্পৃক্ত হলো তখন তালাক প্রদান তার পরেই সাব্যস্ত হবে। আর তালাকের অস্তিত্ব লাভ হবে তালাক প্রদানের পরে। সুতরাং অনিবার্যভাবেই তালাক আযাদ হওয়া থেকে বিলম্বিত হবে। সুতরাং প্রদত্ত তালাক স্ত্রীলোকটির সংগে তার আযাদ হওয়া অবস্থায় যুক্ত হবে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে দুই তালাক দ্বারা হুরমতে মুগাল্লাযা (চূড়ান্ত হুরমত) সাব্যস্ত হবে না।

একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়, আর তা এই যে, সংগে শব্দটি যুক্ততা বোঝায়। (সুতরাং আযাদীর পরে নয় বরং তার সংগে যুক্ত হয়ে তালাক সাব্যস্ত হওয়ার কথা।) আমাদের দলীল এই যে, বিলম্ব অর্থেও তা উল্লেখ করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেই রয়েছে সহজতা, কষ্টের সাথেই রয়েছে সহজ। এখানে 'সাথে' দ্বারা পরে বুঝান হয়েছে। সুতরাং শর্তের যে অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি তার আলোকে সংগে শব্দটিকে 'পরে' অর্থে গ্রহণ করা হবে।

যদি বলে যে, যখন আগামীকাল হবে তখন তুমি দুই তালাক, আর তার মনিবও বললো যে, যখন আগামীকাল হবে তখন তুমি আযাদ। তাহলে আগামীকাল হওয়ার পর সে স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে। আর তার ইদ্দত হবে তিন হায়য।

এটা হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর মত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। কেননা স্বামী তালাক প্রদানকে মনিবের আযাদ করার সংগে যুক্ত করেছে। কারণ মনিব যে শর্তের সংগে আযাদ করণকে সম্পৃক্ত করেছে, তার সংগেই স্বামী তালাক প্রদানকে সম্পৃক্ত করেছে। আর সম্পৃক্ত বিষয়টি শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময়ই কারণ রূপে সাব্যস্ত হয়। আর আযাদ হওয়া আযাদ করার সংগে সংযুক্ত। কেননা আযাদ করা আযাদ হওয়ার মূল। এটি এ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে যে, সক্ষমতা কর্মের সংগে সংযুক্ত হয়। তাই অনিবার্য ভাবেই তালাক প্রদান আযাদ হওয়ার সংগে সংযুক্ত হবে। সুতরাং আযাদ হওয়ার পরেই তালাক সাব্যস্ত হবে। কাজেই এটা প্রথমোক্ত মাসআলার অনুরূপ হলো। আর এ কারণেই সর্বসম্মিতক্রমে তার ইদ্দত তিন হায়য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, স্বামী তালককে এমন বিষয়ের সংগে সম্পৃক্ত করেছে, যার সংগে মনিব আযাদ করার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছে। আর যেহেতু আযাদকরণ তার সংগে দাসী অবস্থায় যুক্ত হচ্ছে, সেহেতু তালাকও দাসী অবস্থায় যুক্ত হবে। আর দুই তালাক দাসীর

ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হুরমত সাব্যস্ত করে। প্রথম মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সেখানে স্বামী তালাক প্রদানকে মনিবের আযাদ করার সংগে যুক্ত করেছে। সুতরাং আযাদ হওয়ার পর তালাক সাব্যস্ত হবে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা সবিস্তার করে এসেছি।

ইদ্দতের মাসা'আলাটিও ভিন্ন। কেননা ইদ্দতের ক্ষেত্রে সতর্কতার দিকটি গ্রহণ করা হয়। অদ্রূপ হুরমতে মুগাল্লা যার (চূড়ান্ত হুরমতের) ক্ষেত্রেও সতর্কতার দিকটি গ্রহণ করা হয়। আর ইমাম মুহম্মদ (র) যা বলেছেন, তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা হেতু বা কার্যকারণ হওয়ার কারণে আযাদ হওয়া যদি আযাদ করার সংগে সংযুক্ত হয় এবং দাতার মূল হওয়ার কারণ তাহলে তালাকও তালাক প্রদানের সংগে সংযুক্ত হবে। কারণ তালাক প্রদান তালাক সাব্যস্ত হওয়ার মূল। সুতরাং উভয়টি এক সংগে কার্যকর হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ তুলনা দিয়ে তালাক দেওয়া এবং তালাকের সাথে যুক্ত করা।

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এই রূপ তালাক আর সে বৃদ্ধাঙ্গুলি শাহদাত ও মধ্যমা দ্বারা ইশারা করে তাহলে তা তিন তালাক হবে।

কেননা আঙ্গুলের ইশারা যদি অস্পষ্ট সংখ্যার সংগে যুক্ত হয় তাহলে প্রচলিত নিয়মে তা সংখ্যা বুঝায়। রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, الشهر هكذا وهكذا وهكذا

মাস হলো এই রূপ, এবং এই রূপ এবং এইরূপ শেষ পর্যন্ত (এভাবে উনত্রিশ সংখ্যার দিকে ইশারা করেছেন।)

আর যদি এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে তাহলে এক তালাক হবে। এবং যদি দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে তাহলে দুই তালাক হবে। এর কারণ ইতিপূর্বে আমরা বলেছি।

আর ছড়ানো আঙ্গুল দ্বারা ইশারা বিবেচ্য হবে। কারো কারো মতে যদি আঙ্গুলের পৃষ্ঠ দ্বারা ইশারা করে তাহলে গুটানো আঙ্গুলগুলো উদ্দেশ্য হবে।

ছড়ানো আঙ্গুল গুলো দ্বারা যেখানে ইশারা হওয়ার কথা সেখানে সে যদি দুটি বদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা ইশারার নিয়ত করে থাকে তাহলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অদ্রূপ যদি আঙ্গুলের পরিবর্তে হাতের তালুর ইশারার নিয়ত করে থাকে, তাহলে প্রথম ছুরতে ديانة হিসাবে দুই তালাক এবং দ্বিতীয় ছুরতে এক তালাক হবে। কেননা এটার সম্ভাবনা রয়েছে তবে তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। এ জন্যই আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সে هكذا (এই রূপ) না বলে তাহলে এক তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা আঙ্গুলের ইশারা কোন অস্পষ্ট সংখ্যার সংগে যুক্ত হয়নি। সুতরাং তোমার প্রতি তালাক কথাটাই শুধু বিবেচ্য হবে।

তালাকের সাথে যদি কোন প্রকার অতিরিক্ততা বা কঠোরতার গুণ যুক্ত করা হয় তাহলে তালাকে বায়েন হবে। যেমন, বলল তোমার প্রতি তালাকে বায়েন কিংবা অকাট্য তালাক।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সহবাসের পরে হলে এক তালাকে রাজয়ী হবে। কেনন স্পষ্ট তালাক শব্দকে শরীয়ত রাজা'আতযোগ্য করে অনুমোদন করেছে। সুতরাং তাতে বায়ন হওয়ার গুণ আরোপ করা শরীয়তের অনুমোদিত দানের বিপরীত হবে। ফলে তা বাতিল হবে। যেমন যদি কেউ বলে, তোমার প্রতি এমন তালাক যে, তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোন অধিকার আমার নাই।

আমাদের দলীল এই যে, সে তালাকের উপর এমন একটি গুণ আরোপ করেছে, তালাক শব্দটি যে গুণের সম্ভাবনা রাখে। দেখুন না, সহবাসের পূর্বে এবং ইদ্দতের পরে এ শব্দ দ্বারা বায়ন হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উক্ত গুণটি (বায়ন ও রিজয়ী) এই দুই সম্ভাবনার একটি নির্ধারণের জন্য গণ্য হবে।

ফিরিয়ে আনার অধিকার নেই-সংক্রান্ত মাসআলা আমাদের মায্হাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে একটি বায়ন তালাক হবে, যদি তার কোন নিয়ত না থাকে কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করে থাকে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে তিন তালাক হবে।

যদি তালাক দ্বারা একটি এবং আরোপিত গুণ (বায়ন বা অকাট্য) দ্বারা আরেকটি তালাক উদ্দেশ্য হয় তাহলে দু'টি বায়ন তালাক হবে। কেননা আলোচ্য গুণ প্রাথমিক ভাবে তালাক প্রদানের যোগ্যতা রাখে।

তদ্রূপ বায়ন হবে যদি বলে, তোমার প্রতি নিকৃষ্টতম তালাক।

কেননা তালাকের ফলাফলের লক্ষ্যে এই জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। আর এ ফলাফল হলো তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। সুতরাং এটি 'বায়ন' শব্দটি উচ্চারণ করার মতোই হলো।

তদ্রূপ যদি বলে, অতিশয় ঘৃণিত তালাক কিংবা অতি মন্দ তালাক পূর্বে এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। **তদ্রূপ যদি বলে, তোমাকে শয়তানের তালাক দিলাম কিংবা বিদ'আতী তালাক দিলাম।**

কেননা তালাকে রিজয়ী হলো সুন্নাত মুতাবেক তালাক। সুতরাং বিদআতী বা শয়তানী তালাক অবশ্যই বায়ন তালাক হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'তোমার প্রতি বিদ'আতী তালাক' এ কথাতে নিয়ত ছাড়া বায়ন তালাক হবে না। কেননা বিদ'আত তালাক কখনো কখনো হায়যের অবস্থায় প্রদানের মাধ্যমেও হয়। সুতরাং নিয়ত জরুরী। আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, স্বামী যদি বলে, তোমার প্রতি বিদআতী তালাক কিংবা শয়তানী তালাক তাহলে তা তালাকে রিজয়ী। কেননা তালাকের এই গুণ হায়যের অবস্থায় তালাক প্রদানের মাধ্যমেও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সন্দেহের কারণে বায়ন তালাক সাব্যস্ত হবে না। **তদ্রূপ যদি বলে, পাহাড়ের মত** (তালাক দিলাম)। কেননা পাহাড়ের সংগে তুলনা অনিবার্যভাবেই অতিরিক্ত প্রমাণ করে। আর তা অতিরিক্ততা গুণ সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই হতে পারে।

তদ্রূপ যদি বলে, পাহাড়ের সদৃশ তালাক। এর কারণ আমরা আগেই বলেছি। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তালাকে রিজয়ী হবে। কেননা পাহাড়গুলো এক বস্তু। সুতরাং পাহাড়ের সাথে তালাকের এই উপমা এককত্বের ক্ষেত্রে গণ্য হবে।

যদি বলে যে, তোমার প্রতি কঠিনতম তালাক, কিংবা হাযারের মত তালাক, কিংবা ঘর ভর্তি তালাক, তাহলে এক তালাকে বায়ন সাব্যস্ত হবে। তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তাই সাব্যস্ত হবে।

প্রথমটির কারণ এই যে, তালাককে সে কঠোরতার গুণযুক্ত করেছে আর সেটা বায়ন তালাকের মাঝে বিদ্যমান। কেননা তা ভেঙ্গে ফেলা বা উপেক্ষা করার অবকাশ রাখে না। পক্ষান্তরে তালাকে রিজয়ীতে সে অবকাশ রয়েছে। তিন তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এখানে তালাক ধাতুর উল্লেখ রয়েছে, (যা এক তালাক সাব্যস্ত করে আর তিন সমষ্টিগতভাবে একের হুকুম রাখে)।

দ্বিতীয়টির কারণ এই যে, এ দ্বারা কখনো শক্তিশালী হওয়ার আবার কখনো সংখ্যার তুলনা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, সে (একাই) এক হাযার। আর এ কথা দ্বারা শক্তিমত্তা বোঝানো উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং শক্তিমত্তা ও সংখ্যা উভয়ের নিয়তই শুদ্ধ হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় উভয়ের মধ্যে অল্পতরটি সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, নিয়ত না থাকা অবস্থায় তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা এটা সংখ্যাবাচক শব্দ। সুতরাং ব্যহত: সংখ্যার তুলনাই উদ্দেশ্য হবে। তাই যেন সে বললো, তোমার প্রতি এক হাযার সংখ্যার মত তালাক।

তৃতীয়টির কারণ এই যে, কোন জিনিস ঘর পূর্ণ করে তার মর্যাদাগত বড়ত্ব দ্বারা, আবার কখনো পূর্ণ করে তার অধিক সংখ্যা দ্বারা। সুতরাং (গুরুতরতা কিংবা সংখ্যাধিক্য) যে নিয়তই করবে, সে নিয়ত দুরস্ত হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় অল্পতরটি সাব্যস্ত হবে।

(এ সম্পর্কে) ইমাম আবু হানীফা (র) এর মূলনীতি এই যে, তালাককে যখন কোন কিছুর সংগে উপমা দেয় তখন বায়ন তালাক হবে, উপমার বস্তু যে কোন জিনিসই হোক; গুরুতরতার কথা উল্লেখ করুক বা উল্লেখ না করুক। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, উপমা গুণের অতিরিক্ততা প্রমাণ করে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে যদি গুরুতরতা প্রকাশক শব্দ উল্লেখ করে তাহলে বায়ন তালাক হবে; অন্যথায় হবে না। উপমার বস্তুটি যাই হোক। কেননা গুরুতরতা থেকে মুক্ত অবস্থায় উপমাটি এককত্বের উদ্দেশ্যেও হতে পারে। কিন্তু গুরুত্ব বিষয়ের উল্লেখ অবধারিতভাবেই অতিরিক্ত গুণ প্রকাশের জন্য হবে।

ইমাম যুফার (র) এর মতে উপমার বাছাই যদি এমন হয়, যা মানুষের নিকট গুরুতর বিশেষণে বিশেষিত হয়ে থাকে তাহলে বায়ন তালাক হবে। অন্যথায় তালাক রিজয়ী হবে।

কোন কোন মতে ইমাম মুহম্মদ (র) ইমাম আবু হানীফা (র) এর সংগে রয়েছেন। আর কোন কোন মতে আবু ইউসূফ (র) এর সংগে রয়েছেন।

উপরোক্ত মতামত অভিব্যক্ত হয় স্বামীর এ উক্তিতে যে, সুঁইয়ের মাথায় মতো বা সুঁইয়ের মাথার মত বড় কিংবা পাহাড়ের মতো বা পাহাড়ের মতো বড়।

আর যদি বলে, তোমার প্রতি একটি প্রচন্ড তালাক, কিংবা বিস্তৃত তালাক কিংবা লম্বা তালাক তাহলে এক বায়ন তালাক হবে।

কেননা, যে তালাকের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়, সেটা স্বামীর জন্য পচণ্ড হবে। আর সে ধরনের তালাক হলো বায়ন তালাক। আর যে জিনিসের ক্ষতিপূরণ কঠিন হয়ে থাকে, সেটিকে বিস্তৃত ও দীর্ঘ বলা হয়ে থাকে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত যে, এ ধরনের কথা দ্বারা তালাকে রিজয়ী হবে। কেননা এ ধরনের বিশেষণ তালাকের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। সুতরাং বিশেষণটি বাতিল গণ্য হবে। আর যদি এই ক্ষেত্রগুলোতে তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে। কেননা বায়ন তালাক একাধিক প্রকার (লঘু ও গুরুতর) হয়ে থাকে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সকল শব্দ দ্বারা যে তালাক হয়ে থাকে, তা বায়ন তালাক।

অনুচ্ছেদ ঃ সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে

সহবাসের পূর্বে কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর উপর তা পতিত হবে। কেননা তালাক প্রকৃতপক্ষে পতিত হচ্ছে উহ্য শব্দমূলের দ্বারা। কারণ, তার অর্থ দাঁড়ায় (انت طالق) طلاقا ثلاثا (তুমি তিন তালাক দ্বারা তালাক প্রাপ্তা) যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং 'তুমি তালাক' এ কথাটা আলাদাভাবে সাব্যস্ত হবে না, বরং একত্রে সবগুলো (তিন তালাক) পতিত হবে।

আর যদি অসহবাসকৃতা স্ত্রীকে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেয় তাহলে প্রথমটি দ্বারাই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক আর পতিত হবে না।

যেমন বললো, তুমি তালাক, তালাক, তালাক। কারণ, প্রতিটি শব্দ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা সে তার বক্তব্যের শেষাংশে এমন কথা উল্লেখ করল যদ্বারা প্রথম অংশের মধ্যে পরিবর্তন আসে, যাতে প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর নির্ভরশীল হয়।

সুতরাং প্রথমটি তাৎক্ষণিক পতিত হবে আর দ্বিতীয় তার সংগে এমন অবস্থায় গিয়ে যুক্ত হবে যে, সে বায়েন হয়ে গেছে।

তদ্রূপ যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি এক তালাক, আরো এক তালাক, তবে একই তালাক পতিত হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সে তো প্রথম তালাকেই বায়েন হয়ে গেল। **আর যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি তালাক 'এক' আর 'এক' বলার পূর্বেই স্ত্রী মারা যায়, তবে এ তালাক বাতিল হয়ে যাবে।** কেননা সে তালাকের গুণটি সংখ্যার সাথে মিলিত করেছে। সুতরাং সংখ্যাটি পতিত হবে এবং সে যখন সংখ্যা উচ্চারণের আগে মারা গেলে তখন তালাক পতিত হওয়ার আগেই ক্ষেত্র রহিত হয়ে গেল। কাজেই সেই তালাক বাতিল গণ্য হবে।

তদ্রূপ যদি বলে, তোমার প্রতি তালাক 'দুই' অথবা 'তিন' (এ তালাকও বাতিল গণ্য হবে) এর কারণ আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। এ মাসআলাটিও মর্মের দিক দিয়ে পূর্বোক্ত মাস'আলার অনুরূপ।

তদ্রূপ যদি সহবাসকৃতাকে বলে, তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক। কিংবা তুমি এমন এক তালাক, যার পরে এক তালাক রয়েছে; তাহলে এক তালাক পতিত হবে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, যদি দুটি জিনিস উল্লেখ করা হয় আর উভয়ের সাথে **কালবাচক শব্দ** (যেমন আগে বা পরে) থাকে এবং কালবাচক শব্দের সংগে সর্বনাম যুক্ত করা হয় তাহলে এ কালবাচক শব্দ পরবর্তী শব্দের বিশেষণ হবে। যেমন কেহ বলল, আমার নিকট যায়দ এসেছে, তার পূর্বে আমর।

আর যদি কালবাচক শব্দের সংগে সর্বনাম যুক্ত না হয় তাহলে কালবাচক শব্দ পূর্বোল্লেখিত শব্দের বিশেষণ হবে। যেমন কেহ বলল, যায়দ এসেছে আমরের পূর্বে।

আর বিগত সময়ে তালাক প্রদানের অর্থ হলো বর্তমান সময়ে তালাক দেওয়া। কেননা বিগত সময়ের সংগে তালাক যুক্ত করার সাধ্য তার নেই।

সুতরাং তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক। এ বক্তব্যে পূর্ববর্তীতার বিষয়টি প্রথমোক্ত তালাকের বিশেষণ। সুতরাং প্রথম তালাক দ্বারাই স্ত্রী বায়েন হয়ে যাবে। ফলে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না।

পক্ষান্তরে তুমি এক তালাক যার পরেও এক তালাক এখানে পরবর্তিতার বিষয়টি শেষোক্ত শব্দে বিশেষণ। সুতরাং প্রথম তালাক দ্বারাই বায়েন হয়ে যাবে।

যদি বলে তুমি এমন এক তালাক, যার এক তালাক রয়েছে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে।

কেননা সর্বনাম যুক্ত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তিতার বিষয়টি এখানে দ্বিতীয় শব্দের বিশেষণ। তাই দ্বিতীয় তালাকটি বিগত সময়ে এবং প্রথম তালাকটি বর্তমান সময়ে পতিত হওয়ার দাবী করে; কিন্তু বিগত সময়ে তালাক প্রদানও বর্তমান সময়ে তালাক প্রদানেই গণ্য। সুতরাং একত্র হবে এবং এক সংগে হবে।

তদ্রূপ যদি বলে তুমি এক তালাকের পর এক তালাক, তাহলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে।

কেননা পরবর্তিতা এখানে প্রথম শব্দের বিশেষণ। সুতরাং প্রথম তালাকটি তৎক্ষণাৎ এবং অপর এক তালাকটি এর পূর্বে হওয়া দাবী করে। তাই উভয়টি একত্রেই প্রযোজ্য হবে।

আর যদি কেউ বলে, তুমি এক তালাকের সংগে এক তালাক, কিংবা এমন এক তালাক যার সংগে আরেকটি তালাক রয়েছে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে।

কেননা সংগে শব্দটি সংযুক্ততা বাচক। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত "স্বামীর উক্তি 'যার সংগে আরেকটি তালাক রয়েছে' এতে একই তালাক হবে।" কেননা উহার সাথে দ্বারা যে তালাকটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তার অগ্রবর্তিতা অপরিহার্য (তখন পরবর্তী তালাকটি এমন অবস্থায় স্ত্রীর সংগে যুক্ত হবে যে, প্রথম তালাক দ্বারাই সে বায়েন হয়ে গেছে)।

সহাবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল ছুরতে দুটি তালাক পতিত হবে।

কেননা প্রথম তালাকটি পতিত হওয়ার পরও তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে।

যদি (অসহবাস কৃতা) স্ত্রীকে বলে যে, তুমি যদি গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তুমি এক তালাক, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, দুই তালাক পতিত হবে।

পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি এক তালাক আরো এক তালাক যদি তুমি গৃহে প্রবেশ করো। অতঃপর সে গৃহে প্রবেশ করলো, তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে দুই তালাক পতিত হবে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, 'আর' অব্যয়টি সাধারণভাবে একত্র করার জন্য ব্যবহৃত। সুতরাং উভয় তালাক একত্রভাবে শর্তের সংগে যুক্ত হবে। যেমন স্পষ্টভাবে দুই তালাক বলার ক্ষেত্রে কিংবা শর্তকে বক্তব্যের শেষে যোগ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, দুটি জিনিসকে (এবং অব্যয় যোগে) সাধারণভাবে একত্রীকরণ যেমন সংযুক্ততার সম্ভাবনা রাখে তেমনি ধারাবাহিকতার সম্ভাবনাও রাখে। সুতরাং প্রথম সম্ভাবনার ভিত্তিতে দুই তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনার ভিত্তিতে এক তালাকই পতিত হবে। যেমন- উক্ত শব্দ দ্বারা শর্তহীন তালাক প্রদান করলে হতো। সুতরাং সন্দোহাবস্থায় একের অধিক তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে বাক্যের শেষে শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শর্ত বাক্যের প্রথমাংশকে পরিবর্তন করে দেয়। সুতরাং বাক্যের প্রথমাংশও শর্তের উপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং (শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার পর) তালাকও একত্রে পতিত হবে। আর শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করা হলে বাক্যের শেষে কোন পরিবর্তনকারী নেই সুতরাং তা নির্ভরশীল থাকবেনা। আর যদি ক্রমবাক্য (অতঃপর, অনন্তর ইত্যাদি) অব্যয় যোগে বলা হয় তাহলে ইমাম কারখী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর ফকীহ আবুল্লায়ছ (র) বলেন, সর্বসম্মতিক্রমে এক তালাক পতিত হবে। কেননা ক্রমবাচক অব্যয়টি পরবর্তীতার জন্য ব্যবহৃত। এটিই বিশুদ্ধতম মত।

তালাকের দ্বিতীয় প্রকার হলো ইংগিত সূচক শব্দযোগে তালাক। সেক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়া কিংবা অবস্থাগত ইংগিত ছাড়া তালাক পতিত হবে না।

কেননা ইংগিত সূচক শব্দ মূলত: তালাকের জন্য গঠিত নয়। বরং তা তালাক ও অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নিয়ত দ্বারা কিংবা অবস্থাগত ইংগিত দ্বারা তালাকের অর্থটি নির্ধারিত হওয়া জরুরী।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, ইংগিত সূচক তালাক দুই প্রকার। প্রথমত: তিনটি শব্দ এমন রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তালাকে রিজয়ী হয় এবং শুধু মাত্র একটি তালাক পতিত হয়। শব্দ তিনটি হলো তুমি গণনা করো, তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত করে 'তুমি এক'।

প্রথম শব্দটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত ইদ্দতের দিন গণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার আল্লাহর নেয়ামত গণনা করা হতে পারে। তার নিয়তের কারণে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর তা তালাকের পূর্ববর্তিতা দাবী করে। আর তালাক পরবর্তীতে স্ত্রীকে রাজআতের অবকাশ থাকে।

দ্বিতীয় শব্দটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তা ইদ্দতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা ইদ্দতের যা উদ্দেশ্য, সেটাই এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইদ্দতের কথা বলার মতই হলো। আবার তালাক প্রদানের পদ্ধতি হিসাবে গর্ভাশয় খালি করার আদেশও হতে পারে।

তৃতীয় শব্দটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সংখ্যাটি উহ্য তালাক শব্দটির বিশেষণ হতে পারে। সুতরাং যখন সে এই নিয়ত করবে তখন ধরা হবে যেন তালাক শব্দটিই উচ্চারণ করেছে। আর তালাক পরবর্তীতে রাজআত করার অধিকার থাকে। তদ্রূপ অন্য অর্থের সম্ভাবনা আছে। যেমন তুমি আমার একমাত্র স্ত্রী কিংবা তুমি তোমার বংশে অনন্যা।

মোট কথা, এ শব্দগুলো যেহেতু তালাক ও অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু নিয়তের প্রয়োজন হবে এবং একটি মাত্র তালাক পতিত হবে। কেননা (এ গুলোতে দাবী হিসেবে অথবা উহ্য হিসেবে) রয়েছে, তোমার প্রতি তালাক। আর এ শব্দটি স্পষ্ট হলে এক তালাকই পতিত হতো। সুতরাং উহ্য অবস্থায় তো একটি পতিত হওয়া আরো স্বাভাবিক।

'এক' এর ক্ষেত্রে যদিও তালাক শব্দ মূলটি বিদ্যমান রয়েছে (আর সে ক্ষেত্রে তালাকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয়) কিন্তু এক সংখ্যার স্পষ্ট উল্লেখ তিন তালাকের নিয়তকে প্রতিহত করে। আরবী শব্দে তালাকের সাথে واحدة (এক) উচ্চারণ করলে অধিকাংশ ফকীহদের মতে এর 'স্বরচিহ্ন' ধর্তব্য বিষয় নয়। এ-ই বিশুদ্ধ। কেননা সাধারণ লোক স্বরচিহ্নের কারসমূহে কোন পার্থক্য করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অন্যান্য ইংগিত সূচক শব্দদ্বারা যদি তালাকের নিয়ত করে তাহলে এক তালাকে বায়েন হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাক হবে। পক্ষান্তরে দুই তালাকের নিয়ত করলে এক তালাকে বায়েন হবে। যেমন বলা হলো, তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হলো, কর্তন করা হলো, তুমি হারাম, তোমার লাগাম তোমার কাঁধে, বাপের বাড়ী যাও, তুমি মুক্ত, তোমাকে মাফ করে দিলাম, তোমাকে ত্যাগ করলাম, তোমার বিষয় তোমার হাতে দিলাম, তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো, তুমি স্বাধীন, মুখে নেকাব পর, উড়না মাথায় দাও, পর্দা কর, দূর হও, বের হও, যাও (উঠ) স্বামী সন্ধ্যান করো ইত্যাদি।

কেননা এ সকল শব্দ তালাক ও অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নিয়ত জরুরী।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, তবে যদি তালাকের আলোচনা প্রসংগে হয় তখন (নিয়ত না থাকার দাবী করলেও) **আদালতের বিচারে এতে তালাক পতিত হবে। কিন্তু নিয়ত করা ব্যতীত আল্লাহ ও বন্দার মাঝে হবে না।**

গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম কুদুরী এ শব্দগুলোকে সমান সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এটা হলো ঐ সকল ক্ষেত্রে, যেগুলো (স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার) প্রত্যাখ্যান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না।

এ বিষয়ে মোট কথা এই যে, অবস্থা মোট তিন প্রকার হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে খুশি ও সন্তুষ্টির অবস্থা, তালাকের আলোচনার অবস্থা, ক্রোধ বা অসন্তুষ্টির অবস্থা। তদ্রূপ ইংগিতসূচক শব্দগুলোও তিন প্রকার। (প্রথমতঃ ঐ সকল শব্দ) যা স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার অনুকূল উত্তর আবার প্রত্যাখ্যানও হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ যেগুলো উত্তর হতে পারে, প্রত্যাখ্যান হতে পারে না। তৃতীয়তঃ ঐ সকল শব্দ, যা উত্তর হতে পারে আবার গালিগালাজ হতে পারে।

সন্তুষ্টির অবস্থায়তো উক্ত শব্দ দ্বারাই নিয়ত ছাড়া তালাক হবে না। আর নিয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

তালাকের আলোচনা চলা অবস্থায় যে সকল শব্দ উত্তর হতে পারে, প্রত্যাখ্যান হতে পারে না, সেগুলোর ক্ষেত্রে '(তালাকের) নিয়ত করিনি' বললে আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। যেমন বললো, তুমি মুক্ত, তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হলো, কিংবা কর্তন করা হলো, কিংবা তুমি হারাম, কিংবা গণনা কর, কিংবা তোমার বিষয় তোমার হাতে কিংবা ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো। কেননা তালাকের প্রার্থনা সময় ব্যহ্যতঃ তালাক প্রদানই তার উদ্দেশ্য হবে।

আর যে সকল শব্দ উত্তর হতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও হতে পারে, যেমন বলা হলো, চলে যাও, বের হও, উঠে যাও, নেকাব পর, উড়না মাথায় দাও, এই জাতীয় অন্যান্য শব্দ। কেননা এগুলো প্রত্যাখ্যান অর্থের সম্ভাবনা রাখে। আর তাই নিকটবর্তী। সুতরাং সে অর্থেই একে প্রয়োগ করা হবে।

আর ক্রোধের অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই তার (তালাকের নিয়ত না থাকার দাবী) গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এগুলো প্রত্যাখ্যান বা গালি দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে যে সকল শব্দ তালাকের সম্ভাবনা রাখে কিন্তু প্রত্যাখ্যান বা গালি হতে পারেনা, যেমন গণনা করো, নিজের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর, তোমার বিষয় তোমার হাতে, এসকল ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ক্রুদ্ধ অবস্থা তালাকের ইচ্ছা প্রমাণ করে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, স্বামীর উক্তি, তোমার উপর আমার কোন মালিকানা নেই, তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই, তোমার পথ খুলে দিয়েছি, তোমাকে পরিত্যাগ করা যাবে, এগুলোর ক্ষেত্রে ক্রোধের অবস্থায় তার (তালাকের নিয়ত না থাকায়) দাবী গ্রহণ করা হবে। কেননা এতে গালির অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

আর প্রথম তিনটি বাক্য ছাড়া অন্যগুলো দ্বারা বায়েন তালাক হওয়া আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এগুলো দ্বারা তালাকে রিজয়ী হবে। কেননা এগুলো তালাকের প্রতি ইংগিতকারী বিধায় এগুলো দ্বারা তালাক হয়ে যাবে। এ জন্যইতো এগুলোতে তালাকের নিয়ত করা শর্ত। এবং এগুলো প্রয়োগের কারণে তালাকের সংখ্যা হ্রাস পায়। আর তালাক পরবর্তীতে স্ত্রীকে ফেরত লওয়ার অধিকার সাব্যস্ত করে। স্পষ্ট তালাক শব্দটির ক্ষেত্রে যেমন।

আমাদের দলীল এই যে, শরীয়ত প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিচ্ছেদ করণ কর্ম উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রয়োগ হয়েছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রের সংগে সম্পর্কিত হয়েছে। স্বামীর যোগ্যতা এবং স্ত্রীর তালাকের যথার্থ ক্ষেত্র হওয়ার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই। আর শরীয়ত প্রদত্ত ক্ষমতার প্রমাণ এই যে, এ অধিকার সাব্যস্ত করার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে প্রতিকারের পথ তার জন্য বন্ধ না হয়ে যায়। আবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও রাজায়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর দায়ভার যেন তার উপর পড়ে না যায়।

আর প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলো তালাকের প্রতি كناية বা ইংগিতকারী নয়। কেননা এগুলো তাদের প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর নিয়তের শর্ত, বায়নের দুই প্রকারের একটিকে নির্ধরণ করার জন্য, তালাকের অর্থ নির্ধারণ করার জন্য নয়।[১] আর তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হলো যে, এ দ্বারাই সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়।[২] আর তিন তালাকের নিয়ত ছহী হওয়ার কারণ হলো বায়েনের প্রকারভেদ লঘু ও গুরু এ দুটি হওয়া।[৩] আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় বিচ্ছেদের লঘু প্রকারটি সাব্যস্ত হবে।

আমাদের মতে দুই তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না। ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা দুই হলো নিছক একটি সংখ্যা। পূর্বে আমরা এর কারণ বর্ণনা করেছি।

যদি সে তার স্ত্রীকে বলে গণনা কর, গণনা কর, গণনা কর, আর বলে যে, প্রথমটি দ্বারা তালাক বুঝিয়েছি আর অবশিষ্ট দু'টি দ্বারা (ইদ্দত হিসাবে) হায়েয গণনা করা বুঝিয়েছি, তাহলে আদালতের বিচারে তার কথা গ্রহণ করা হবে।

কেননা সে তার উচ্চারিত শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ত করেছে। তাছাড়া স্বামী সাধারণতঃ তালাকের পর তার স্ত্রীকে ইদ্দত গণনার আদেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থাও তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আর যদি সে বলে যে, অবশিষ্ট দু'টি কিছুরই নিয়ত করিনি তাহলে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা সে যখন প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করছে তখন বিদ্যমান অবস্থাটি তালাকের আলোচ্য অবস্থা হয়ে গেল। সুতরাং এই অবস্থাগত প্রমাণের মাধ্যমে অবশিষ্ট শব্দ দুটি তালাকের জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল। তাই নিয়ত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না।

পক্ষান্তরে যদি বলে যে, শব্দত্রয় দ্বারা কোন তালাকের নিয়ত করিনি, তাহলে কিছুই পতিত হবে না। কেননা এখানে কোন বাহ্যিক অবস্থা তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা।

তদ্রূপ যদি বলে যে, তৃতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছি, প্রথম দুটি দ্বারা নিয়ত করিনি। তাহলে শুধু একটি তালাকই সাব্যস্ত হবে। কেননা প্রথম দুটি শব্দ বলার সময় তালাকের আলোচনার অবস্থা ছিলনা।

আর যে সকল ক্ষেত্রে নিয়ত অস্বীকারের বিষয়ে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে বলা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে শপথসহ তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা তার মনের গুপ্ত কথা অবহিত করার ব্যাপারে সেই একমাত্র আমানতদার হিসেবে গণ্য। আর আমানতদারের কথা গ্রহণযোগ্য হয় শপথসহ।

---

১. অর্থাৎ নিয়তের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য যদি তালাকের অর্থ নির্ধারণ করা হতো তাহলে শাফেয়ী (র) এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতো, অথচ তা নয়। এ শব্দগুলো দ্বারা মূলত: বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হচ্ছে। আর বিচ্ছেদ হলো দু'প্রকার خفيفة বা লঘু এবং غليظة বা চূড়ান্ত। এখন নিয়তের উদ্দেশ্য হলো এই দুই প্রকারের একটি নির্ধরণ করা।

২. অর্থাৎ এ শব্দগুলো দ্বারা বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হচ্ছে। আর তার অনিবার্য ফল হিসাবে একটি তালাক সাব্যস্ত হচ্ছে। এ কারণে স্বামীর হাতে বিদ্যমান তালাকের সংখ্যা তিনটি থেকে একটি কমে যায়।

৩. অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, শব্দগুলো দ্বারা তালাক শব্দের প্রতি ইংগিত হচ্ছে। ফলে স্পষ্ট তালাক শব্দের ক্ষেত্রে যেমন তিন তালাকের নিয়ত করা যেতো, এখানেও সে কারণে তিন তালাকের নিয়ত করা যাচ্ছে। না, বরং এ শব্দগুলো দ্বারা বায়ন বা বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হচ্ছে, আর বায়ন দু' প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো غليظة যা তিন তালাক রূপে কার্যকর হয়। সুতরাং নিয়তের দ্বারা বায়ন-এর এক প্রকার নির্ধারিত হওয়ার সুবাদে তিন তালাক সাবস্যাত হচ্ছে। সেটি কথা শাফেয়ী (র) এর মতে এ শব্দগুলো তালাক শব্দের প্রতি ইংগিত করছে। সুতরাং স্পষ্ট তালাক শব্দ বললে যে হুকুম হতো, এখানেও সে হুকুম হবে। পক্ষান্তরে আমাদের শব্দগুলো দ্বারা بينونة বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হচ্ছে। আর বিচ্ছেদের প্রকার হলো দুটি লঘু ও চূড়ান্ত। এই বিচ্ছেদের ফল হিসাবে তালাক সাব্যস্ত হয়েছে।

باب تفويض الطلاق
অধ্যায় ঃ (স্ত্রীকে) তালাকের ক্ষমতা প্রদান

পরিচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ

কেউ যদি আপন স্ত্রীকে তালাকের (ক্ষমতা প্রদানের) নিয়ত করে বলে যে, তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ কর, কিংবা তাকে বলল, তুমি নিজেকে তালাক প্রদান কর, তাহলে সে ঐ মজলিসে থাকা পর্যন্ত নিজেকে তালাক প্রদান করতে পারে। কিন্তু যদি মজলিস থেকে উঠে যায় কিংবা অন্য কোন কাজ শুরু করে তাহলে (তালাক প্রদানের অধিকারের) বিষয়টি তার ক্ষমতা বহির্ভূত।

কেননা যাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয় তার জন্য মজলিসই হলো বিবেচ্য। এ বিষয়ে সকল সাহাবা কেরামের 'ইজমা' রয়েছে। তাছাড়া এ হল স্ত্রীকে একটি কাজের অধিকার প্রদান। আর অধিকার প্রদানমূলক কর্মকাণ্ড বিদ্যমান মজলিসেই জবাব দাবী করে, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। কেননা মজলিসের মুহূর্ত সমূহকে একই মুহূর্ত বিবেচনা করা হয়। তবে মজলিস পরিবর্তন হয় কখনো মজসিল থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে আবার কখনো পরিবর্তন হয় অন্য কাজে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে। কেননা খাওয়ার মজলিস তো বিতর্কের মজলিস থেকে ভিন্ন।

শুধু উঠে দাঁড়ানোর দ্বারাই তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা এটা (বিষয়টির প্রতি) উপেক্ষা করার প্রমাণ। বাইউছ্ ছারফ (স্বর্ণ বিনিময় ও রৌপ্য বিনিময়) ও বাইউস-সালাম (নগদের বিনিময়ে বাকি পণ্য বিক্রয়) এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হলো কব্জা না করে মজলিস থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। **তবে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে নিয়ত থাকা জরুরী।** কেননা এর অর্থ যেমন স্ত্রীকে তার নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রদান হতে পারে তেমনি অন্য কোন বিষয়ে ইচ্ছাধিকার প্রদানও হতে পারে।

"ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো" স্বামীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্ত্রী যদি তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে একটি বায়ন তালাক হবে।

কিয়াসের দাবী হলো কোন তালাক না হওয়া, যদিও স্বামী তালাকের নিয়ত করে। কেননা স্বামী এই ধরনের শব্দযোগে তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং (এ শব্দ দ্বারা) অন্যকেও তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে না।

তবে আমরা এটাকে সূক্ষ্ম কিয়াসের মাধ্যমে বৈধতা দান করেছি, ছাহাবায়ে কিরামের ইজমা এর কারণে।

তাছাড়া স্বামী তো বিবাহকে অব্যাহত রাখা কিংবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকারী। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সে তার স্থলবর্তী করতে পারে।

এ অধিকার বলে প্রদত্ত তালাক বায়েন হবে। কেননা তার নিজেকে গ্রহণ করা সাব্যস্ত হবে নিজের বিষয়ে নিজের একক মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে। আর তা বায়ন তালাকের মাধ্যমেই হতে পারে।

তবে তিন তালাক হবে না। যদিও স্বামী সে নিয়ত করে থাকে।

কেননা নিজের মালিকানা গ্রহণ একাধিক প্রকার হয় না। 'বায়ন' শব্দের ব্যবহার এর বিপরীত। কেননা বায়ন একাধিক প্রকার হয়ে থাকে। **আর ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বামীর বক্তব্যে কিংবা স্ত্রীর বক্তব্যে 'নিজেকে' কথাটা যুক্ত থাকা অপরিহার্য। তাই যদি স্বামী বলে গ্রহণ করো (ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো) আর স্ত্রী বলে, গ্রহণ করলাম (ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করলাম) তাহলে তা বাতিল গণ্য হবে।**

কেননা বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'জনের কোন একজনের পক্ষ হতে (নিজেকে শব্দটি দ্বারা) ব্যাখ্যাকৃত হওয়ার সাথে।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, অস্পষ্ট কথা অস্পষ্ট কথার ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আর অস্পষ্টতা অবস্থায় কোন দিক নির্ধারিত হতে পারে না।

স্বামী যদি বলে, তুমি নিজেকে গ্রহণ করো আর স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম, তাহলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে।

কেননা স্বামীর ব্যক্তব্যটি স্পষ্টতাসহ এসেছে আর স্ত্রীর বক্তব্য তার উত্তরে এসেছে। সুতরাং স্বামীর বক্তব্যের স্পষ্টতা তার কথায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তদ্রূপ (একটি বায়েন তালাক হবে) যদি স্বামী বলে, তুমি তোমার ইচ্ছাধিকার একবার গ্রহণ করো আর স্ত্রী বলে, আমি গ্রহণ করলাম।

কেননা ইচ্ছাধিকার শব্দের সাথে এমন কর্ম রয়েছে, যা একবার বুঝায়। আর নিজেকে গ্রহণ করাটাই কখনো একবার হয় আবার কখনো একাধিকবার হয়। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে কথাটা স্পষ্টতাসহ হয়েছে।

আর যদি স্বামী বলে, তুমি গ্রহণ করো আর স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম। তাহলে স্বামী তালাকের নিয়ত করলে তালাক হবে।

কেননা স্ত্রীর কথাটি স্পষ্টতাসহ হয়েছে। আর স্বামী যা নিয়ত করেছে, তা তার বক্তব্যের সম্ভাবনা ভুক্ত। **আর স্বামী যদি বলে, তুমি গ্রহণ করো, আর স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে গ্রহণ করছি, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে।**

কিয়াসের দাবী হলো তালাক না হওয়া। কেননা এটা নিছক প্রতিশ্রুতি কিংবা (ভবিষ্যতের নিয়ত না করে থাকলে) 'তালাক সৃজন' অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, স্বামী স্ত্রীকে বললো, তুমি নিজেকে তালাক প্রদান করো আর স্ত্রী বললো, আমি নিজেকে তালাক দিচ্ছি।

কিয়াসের বিপরীতে সূক্ষ্ম দলীল হলো হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস; কেননা তিনি বলেছিলেন, না, বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করছি। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তাঁর পক্ষ হতে জবাব রূপে বিবেচনা করেছেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, এই শব্দটি প্রকৃত পক্ষে বর্তমান কালের জন্য; আর রূপক অর্থে ভবিষ্যতের জন্য। যেমন কালেমা-ই শাহাদাত এবং সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে (বর্তমান অর্থে ব্যবহার হয়।)

পক্ষান্তরে নিজেকে তালাক দিচ্ছি কথাটা ভিন্ন। কেননা এটাকে বর্তমান অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ বিদ্যমান কোন অবস্থার বর্ণনা এটা নয়। আমি নিজেকে ইখতিয়ার করছি কথাটা সেরূপ নয়। কেননা এটা হলো বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ আর তা হলো নিজের সত্তাকে গ্রহণ করা।

যদি কেউ বলে, গ্রহণ করো, গ্রহণ করো, গ্রহণ করো, আর স্ত্রী বলে, প্রথমটি, মধ্যবর্তীটি ও শেষটি গ্রহণ করলাম, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তিন তালাক হয়ে যাবে। স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন হবে না। সাহেবায়ন বলেন, এক তালাক হবে।

স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন না থাকার কারণ এই যে, শব্দটি তিনবার উচ্চারণ তালাকের উদ্দেশ্য প্রমাণ করে। কেননা তালাকের ক্ষেত্রেই স্ত্রীর গ্রহণ বারংবার হতে পারে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, 'প্রথম' শব্দটি এবং অনুরূপ অন্য শব্দ দুটি তারতীবের অর্থে যদিও কার্যকর নয়, কিন্তু সংখ্যার অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর। সুতরাং যে বিষয়ে শব্দগুলো কার্যকর, সে বিষয়ে সেগুলো বিবেচ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এটি একটা অর্থহীন বিশেষণ। কেননা যে তিনটি তালাক (স্ত্রীর) মালিকানায় জমা হয়েছে, তাতে কোন তারতীব বা ক্রম নেই। যেমন একটি স্থানে একত্রিত লোকদের মাঝে কোন তারতীব নেই। আর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শব্দগুলো মূলত: তারতীব বা ক্রম প্রকাশক فرد বা সংখ্যা হলো তার অনিবার্য অর্থ। সুতরাং 'মূল'এর ক্ষেত্রে যখন শব্দগুলো অকার্যকর হয়ে গেল তখন তার উপর ভিত্তিকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও অকার্যকর গণ্য হবে।

(স্বামীর উপরোক্ত কথার উত্তরে) স্ত্রী যদি বলে, আমি একবার গ্রহণ করলাম, তাহলে সকলের মতে তিন তালাক হয়ে যাবে।

কেননা শুধু গ্রহণ করলাম বললেও তিন তালাক সাব্যস্ত হতো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আরো ভালোভাবেই তা হবে। কারণ 'একবার'শব্দটি তালাকের বিশেষণ নয় বরং তা জোর দেওয়ার জন্য ধর্তব্য।

আর যদি বলে, আমি নিজেকে তালাক দিলাম কিংবা একটি তালাকের মাধ্যমে আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম তাহলে একটি তালাক হবে। আর তার পরে স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে।

কেননা এই শব্দটি ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর বন্ধনমুক্তি সাব্যস্ত করে। সুতরাং যেন সে ইদ্দতের পর হতে নিজেকে গ্রহণ করলো।

যদি স্বামী বলে যে, এক তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয় তোমার হাতে, কিংবা একটি তালাকের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করতে পারো। আর স্ত্রী বললো, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম, তাহলে সে একটি তালাকপ্রাপ্তা হবে আর স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে।

কেননা স্বামী তাকে ইচ্ছাধিকার দান করেছে সত্য কিন্তু সেটা এক তালাকের দ্বারা আবদ্ধ। আর এটি এমন শব্দ, যার পিছনে রুজু রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ বিষয়টি হাতে অর্পণ সম্পর্কে

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, তোমার বিষয় তোমার হাতে এবং এতে তিন তালাকের নিয়ত করে বলে যে, আমি নিজেকে একবারে গ্রহণ করলাম, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে।

কেননা গ্রহণ করা শব্দটি "তোমার বিষয় তোমার হাতে" বক্তব্যের উত্তর হতে পারে। কারণ উক্ত বক্তব্যের অর্থ হলো (তালাকের) মালিক বানানো, এখতিয়ার প্রদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর (স্ত্রীর উচ্চারিত) 'একবারে' কথাটি 'গ্রহণ' এর বিশেষণ, (তালাকের সংখ্যাগত বিশেষণ নয়) সুতরাং যেন সে বললো, আমি নিজেকে একবারেই গ্রহণ করলাম, আর তা দ্বারা তিন তালাক পতিত হবে।

আর যদি স্ত্রী (উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে) বলে যে, আমি নিজেকে এক দ্বারা তালাক দিলাম, কিংবা আমি নিজেকে এক তালাক দ্বারা গ্রহণ করলাম, তাহলে একটি বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে।

কেননা 'এক' কথাটি উহ্য ধাতু মূলের বিশেষণ। আর প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ আমি নিজেকে একবারে গ্রহণ করলাম) ধাতুমূল হলো গ্রহণ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ একদ্বারা তালাক দিলাম) ধাতুমূল হলো– তালাক। তবে তা বায়েন তালাক হবে। কারণ, এ ক্ষমতা প্রদান তাকে বায়েন তালাকের ব্যাপারে হয়েছে। আর তাকে তার বিষয়ের অনিবার্য মালিকানা প্রদানের চাহিদা হিসেবে। আর স্ত্রীর বক্তব্যটি স্বামীর কথার জবাবে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা প্রদানের সময় তালাকের যে বিশেষণ বিবেচ্য ছিলো, স্ত্রীর তালাক প্রয়োগের সময়ও সে বিশেষণটি বিবেচ্য হবে।

তোমার বিষয় তোমার হাতে, এ বক্তব্যে তো তিন তালাকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ এই যে, এ বাক্যটির মধ্যে ব্যাপক তা ও বিশিষ্টতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তিন তালাকের নিয়ত করার অর্থ হলো ব্যাপকতার নিয়ত করা। পক্ষান্তরে গ্রহণ করো (বা ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো) বক্তব্যটি ভিন্ন। কেননা তা ব্যাপকতার অবকাশ রাখেনা। ইতিপূর্বে আমরা এর তাৎপর্য বর্ণনা করে এসেছি।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, আজ এবং আগামী পরশু 'তোমার বিষয় তোমার হাতে' তাহলে (মধ্যবর্তী) রাত্রটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি সে বর্তমান দিনটিতে তাকে পদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখান করে তাহলে বর্তমান দিনটির ক্ষমতা বাতিল হবে, কিন্তু আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে থেকে যাবে।

কেননা সে স্পষ্টভাবে দু'টি সময়ের কথা উল্লেখ করেছে, যাদের মাঝে একই প্রকারের আরেকটি সময় রয়েছে; কিন্তু প্রদত্ত ক্ষমতা ঐ মধ্যবর্তী সময়টি অন্তর্ভুক্ত করেনি। কারণ, একক শব্দের দ্বারা 'অজকের দিন' উল্লেখ করলে রাত্রটি তার অন্তর্ভুক্ত হয়না। সুতরাং দু'টো সময় আলাদা বিষয় হবে। তাই একদিনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলে অন্য দিনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান হবে না। ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয়টি অভিন্ন বিষয়। যেমন, যদি বলে, তুমি আজ এবং আগামী পরশু তালাক।

আমাদের বক্তব্য এই যে, তালাক তো নির্ধারিত সময় দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। পক্ষান্তরে নিজের সম্পর্কে ক্ষমতা ন্যাস্ত করার বিষয়টি সময়াবদ্ধতার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রথম দিনের বিষয় ঐ দিনের সাথে আবদ্ধ থাকবে। আর দ্বিতীয় দিনের বিষয়টিকে নতুন বিষয় রূপে গণ্য করা হবে।

স্বামী যদি বলে যে, আজ এবং আগামীকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে, তাহলে রাত্র তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর যদি বর্তমান দিনে বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আগামীকাল বিষয়টি তার হাতে থাকবেনা।

কেননা এটা এক ও অভিন্ন বিষয়। কারণ উল্লেখিত দুই সময়ের মাঝে ঐ সময়দ্বয়ের সমগোত্রীয় সময় মধ্যবর্তী হয়নি। যাকে উচ্চারিত বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেনি। আর কখনো এমনও হয় যে,আলোচনা ও পরামর্শের মজলিস রাত এসে যাওয়ার পর শেষ হয় না। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন সে বললো, দু'দিনের জন্য তোমার বিষয়টি তোমার হাতে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত যে, স্ত্রী যদি বিষয়টিকে বর্তমান দিনে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আগামী দিন সে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কেননা সে স্বামীর ক্ষমতা প্রদানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে বলে, যেমন তালাক প্রদানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

যাহেরী রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, সে যদি বর্তমান দিনে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে আর আগামী কালের জন্য তার ইচ্ছাধিকার বাকি থাকে না। তদ্রূপ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে যখন সে স্বামীকে গ্রহণ করবে, তখন পরবর্তী দিন তার এখতিয়ার বাকি থাকবেনা। কেননা দুটি জিনিসের মাঝে যখন কাউকে কোন এখতিয়ার প্রদান করা হয় তখন সে দুটির একটিকেই শুধু গ্রহণ করার অধিকার রাখে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, আজ তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং আগামী কাল তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তাহলে দুটি বিষয় রূপে গণ্য হবে। কেননা প্রতিটি সময়ের জন্য সে আদালা হুকুম উল্লেখ করেছে। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত ছূরতটি ভিন্ন।

স্বামী যদি বলে যে, অমুক যেদিন আসবে সেদিন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। পরে অমুক আগমন করলো কিন্তু স্ত্রী অমুকের আগমনের কথা জানতে পারেনি, এমনকি রাত হয়ে গেলো, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবেনা।

কেননা ইচ্ছাধিকার একটি প্রলম্বিত বিষয়। সুতরাং তার সংগে যুক্ত দিন শব্দটিকে দিবসের আলোকিত অংশের অর্থেই প্রযোজ্য হবে। ইতিপূর্বে আমরা বিষয়টির তাৎপর্য বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাহাদিগের সাথেই সিমাবদ্ধ থাকবে। এবং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

স্বামী যদি স্ত্রীর বিষয়টিকে স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে কিংবা তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে আর স্ত্রী সে স্থানে একদিন অবস্থান করে এবং সে উঠে না যায় তাহলে অন্য কাজ শুরু না করা পর্যন্ত তার ইচ্ছাধিকার অব্যাহত থাকবে।

কেননা, স্বামীর এ বক্তব্যের অর্থ হলো স্ত্রীকে তালাকের মালিকানা প্রদান করা। কারণ মালিক ঐ ব্যক্তিকেই বলে, যে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে)তার ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারে। আর আলোচ্য বিষয়ের স্ত্রীর অবস্থা অনুরূপ। আর মালিকানা প্রদান মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। ইতিপূর্বে আমরা তা বর্ণনা করে এসেছি।

সে যদি মজলিসের এমন অবস্থায় হয় যে,স্বামীর কথা মানতে যায় তাহলে তার সে মজলিসই বিবেচ্য হবে। আর যদি (অনুপস্থিতির কারণে কিংবা বধিরতার কারণে) স্ত্রী শুনতে না পায় তাহলে যে মজলিসে সে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে কিংবা সংবাদ তার কাছে এসে পৌঁছবে সেই মজলিস বিবেচ্য হবে। কেননা, এটা এমন মালিকানা প্রদান, যাতে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। সুতরাং মজলিস শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে। আর স্বামীর মজলিস বিবেচ্য হবে না। তার ক্ষেত্রে তো শর্তারোপ বাধ্যতামূলক।

বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নিছক মালিকানা প্রদান। এতে শর্তারোপের বিষয় মিশ্রিত নয়। যাই হোক যখন স্ত্রী লোকটির মজলিস বিবেচ্য হলো তখন (বক্তব্য এই যে,) মজলিস তো কখনো পরিবর্তিত হয় অন্যত্র প্রস্থানের মাধ্যমে। আবার কখনো হয় উক্ত মজলিসে থেকেই অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়ার দ্বারা। ইচ্ছাধিকার প্রদান প্রসংগে বিষয়টি আমরা বর্ণনা করেছি। আর ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি (মজলিস থেকে) দাঁড়ানো মাত্র তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। কেননা এটি উপেক্ষা করার প্রমাণ। কারণ উঠে দাঁড়ানো মতামতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

পক্ষান্তরে একদিন পর্যন্তও বসে থাকে এবং না দাঁড়ায় এবং অন্য কোন কাজ শুরু না করে তাহলে ইচ্ছাধিকার রহিত হবে না। কেননা মজলিস কখনো দীর্ঘ হয় আবার কখনো সংক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে যতক্ষণ কোন কর্তনকারী উপস্থিত না হয় কিংবা উপেক্ষার কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়।

একদিন অবস্থানের বিষয়টি (উদাহরণ রূপে বলা হয়েছে) সময়সীমা নির্ধারণ হিসেবে নয়।

আর (ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মন্তব্য 'যতক্ষণ না সে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়' দ্বারা এমন কাজ উদ্দেশ্য, যা ঐ কাজকে কর্তনকারী রূপে পরিচিত, যে কাজে স্ত্রীলোকটি বিদ্যমান রয়েছে। যে কোন কাজ উদ্দেশ্য নয়।

যদি (স্বামীর কথা শুনে) দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। কেননা এটা বিষয়টির প্রতি আগ্রহী হওয়ার প্রমাণ। কারণ রাত্রের অবস্থা চিন্তাকে অধিকতর সংহতকারী।

তদ্রূপ (ইচ্ছাধিকার থাকবে) যদি (বিষয়টি শোনার পর) বসা অবস্থা থেকে হেলান দেয় কিংবা হেলান অবস্থা থেকে উঠে বসে।

কেননা এটা হলো এক অবস্থার বসা থেকে অন্য অবস্থার বসায় যাওয়া। সুতরাং ইহা উপেক্ষার প্রমাণ হবে না। যেমন সে যদি হাঁটু তুলে বসা অবস্থায় ছিল, পরে আসন করে বসলো।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো জামেউছ-ছাগীর এর বর্ণনা। অনত্র ইমাম মুহম্মদ (র) লিখেছেন, যদি সে বসা অবস্থা থেকে হেলান দেয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। কেননা হেলান দেয়ার অর্থ বিষয়টির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। সুতরাং এটা উপেক্ষা বলে বিবেচিত হবে। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিকতর বিশুদ্ধ।

আর যদি বসা থেকে পার্শ্ব শয়ন করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমি পরামর্শের জন্য আমার আব্বাকে ডাকবো কিংবা স্বাক্ষী হওয়ার জন্য লোক ডাকবো, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে।

কেননা পরামর্শ হল সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার উদ্দেশ্যে আর সাক্ষী রাখার অনুসন্ধান হলো পরবর্তীতে স্বামীর অস্বীকার করা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এটা উপেক্ষার প্রমাণ হবে না।

যদি সওয়ারীতে বা হাওদায় আরোহণ অবস্থায় চলতে থাকে আর বিষয়টি শুনে থেমে যায় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চলা অব্যাহত রাখে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা সওয়ারীর চলা এবং থামা তার দিকেই সম্পর্কিত হবে।

আর নৌকা ও জাহাজ গৃহের স্থলবর্তী। কেননা জলযানের চলা তার যাত্রীর দিকে সম্পর্কিত নয়। কারণ সেতো তা থামাতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে সওয়ার তার সওয়ারীকে থামাতে সক্ষম।

পরিচ্ছেদ ঃ ইচ্ছা প্রসংগ

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি নিজেকে তালাক দাও, আর এ কথায় তার কোন নিয়ত না থাকে, কিংবা এক তালাকের নিয়ত থাকে, আর স্ত্রী বলে যে, আমি নিজেকে তালাক দিলাম, তাহলে তা একটি তালাকে 'রিজয়ী' হবে। আর যদি নিজেকে তিন তালাক দেয় এবং স্বামীও সে নিয়ত করে থাকে তাহলে তার উপর তিন তালাকই পতিত হবে।

কেননা 'তালাক দাও' কথাটির অর্থ হল "তুমি তালাকের কার্য সম্পাদন কর" আর উচ্চারিত তালাক কাজটি জিন্স বা জাতি বাচক শব্দ। সুতরাং যাবতীয় জাতিবাচক শব্দের মতো এখানেও সমগ্রের সম্ভাবনাসহ সর্বনিম্নটি সাব্যস্ত হবে। এ কারণেই আলোচ্য ক্ষেত্রে তিন তালাকের নিয়ত কার্যকর হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় এক তালাকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর সে এক তালাকটি 'রিজয়ী' হবে।

কেননা তার ক্ষমাতায় সরীহ (স্পষ্ট) তালাক ন্যস্ত করা হয়েছে। আর তাতে 'রিজয়ী' তালাক হয়।

যদি দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলে ছহীহ হবে না। কেননা এটা নিছক সংখ্যার নিয়ত। (তালাকের সর্ব নিম্নও নয় এবং সমগ্র ও নয়।) তবে স্ত্রীটি দাসী হলে ভিন্ন কথা কেননা, তার ক্ষেত্রে দুই হলো সমগ্র তালাক।

আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজেকে তালাক দাও, আর সে বললো, আমি নিজেকে 'বায়ন তালাক' দিলাম, তাহলে তালাক(রিজয়ী) সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে না।

কেননা 'বায়ন' শব্দটি তালাকের শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বামী যদি তালাকের নিয়তে বলে, 'আমি তোমাকে বায়ন তালাক দিলাম' কিংবা স্ত্রী যদি বলে, 'আমি নিজেকে 'বায়ন

তালাক' দিলাম, আর স্বামী তার উত্তরে বলে, আমি তা অনুমোদন করলাম, তাহলে বায়ন তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, মূল তালাকের ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারে স্ত্রী একমত হয়েছে। তবে তাতে সে একটি অতিরিক্ত বিশেষণ যুক্ত করেছে আর তা হলো বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করণ। সুতরাং অতিরিক্ত বিশেষণটি বাতিল হবে এবং মূল তালাক সাব্যস্ত হবে। যেমন যদি স্ত্রী বলে, 'আমি নিজেকে একটি বায়ন তালাক দিলাম', (তাহলে মূল তালাক সাব্যস্ত হবে)।

এক তালাকে রিজয়ী হওয়াই যুক্তিযুক্ত দাবী। ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তালাকের শব্দ নয়। এ জন্যই স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করলাম, কিংবা বলে, তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করো আর এ কথা দ্বারা তালাক প্রদানের নিয়ত করে তাহলে তালাক হবে না। তদ্রূপ স্ত্রী যদি কথার সূচনা করে বলে, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম, আর স্বামী তার উত্তরে বলে, আমি তা অনুমোদন করলাম, তাহলে কিছুই হবে না। তবে যদি স্ত্রীর এ কথাটি স্বামীর পক্ষ হতে ইচ্ছাধিকার প্রদানের জওয়াবে উচ্চারিত হয় তখন ইজমা এর মাধ্যমে সেটা তালাক রূপে সাব্যস্ত হবে। অথচ 'তুমি নিজেকে তালাক দাও' স্বামীর এ বক্তব্য ইচ্ছাধিকার প্রদান নয়। সুতরাং তা বাতিল হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীর 'আমি নিজেকে 'বায়ন' তালাক দিলাম' এই কথা দ্বারা কিছুই হবে না। কেননা সে এমন শব্দ প্রয়োগ করেছে, যা তার হাতে অর্পণ করা হয়নি। কারণ বায়ন প্রদান করা তালাক থেকে ভিন্ন।

স্বামী যদি বলে, তুমি নিজেকে তালাক দাও, তাহলে সে এ কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

কেননা এতে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। কেননা এখানে তালাককে স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর শর্তারোপিত বিষয় হলো বাধ্যতামূলক কর্ম। **যদি সে (একথা শোনার পর) মজলিস থেকে উঠে যায় তাহলে (তার তালাক প্রদানের ক্ষমতা) বাতিল হয়ে যাবে।** কেননা এখানে তাকে মালিকানা প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি বলে তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও, তবে সেটা ভিন্ন রকম। কেননা তাকে নায়েব বা ওকীল নিয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এটা মজলিসের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং তা প্রত্যাহার যোগ্য হবে।

আর যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দাও, তাহলে স্ত্রী মজলিসে এবং মজলিসের বাইরে তালাক প্রদান করতে পারে।

কেননা, 'যেমন ইচ্ছা' কথাটা সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। সুতরাং এ কথাটি এর অনুরূপ হয়ে যাবে, যখন সে বলল, সময়ই তোমার ইচ্ছা হয়।

যদি কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করো, তাহলে সে মজলিসে এবং মজলিসের পরে তালাক প্রদান করতে পারে। এবং স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারে।

কেননা এ কথার অর্থ হলো উকীল বানানো এবং সাহায্য গ্রহণ করা। সুতরাং বাধ্যতামূলক হবেনা, আবার মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধও থাকবে না।

পক্ষান্তরে নিজের স্ত্রীকে যদি বলা হয় যে, তুমি নিজেকে তালাক দাও, তাহলে সেটা ভিন্ন রকম হবে। কেননা সে তো নিজের জন্য কাজ করছে। সুতরাং স্বামীর এ বক্তব্যের অর্থ ওকীল বানানো নয়, মালিক বানানো।

যদি কেউ কোন লোককে বলে, তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তাহলে তার স্ত্রীকে শুধু মজলিসেই তালাক দিতে পারবে আর স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

যুফার (র) বলেন, এটা আর প্রথমটা (আমার স্ত্রীকে তালাক দাও) সমান।(অর্থাৎ মজলিস পর্যন্ত সীমাদ্ধ থাকবে না আর স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে।)

কেননা ইচ্ছার কথা স্পষ্টভাবে বলা না বলার মতই। কেননা সে তো তার ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ করবে। সুতরাং সে বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত ওকীলের মত হলো, যখন তাকে বলা হয় যে, তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহলে তা বিক্রি কর।

আমাদের দলীল এই যে,এ বাক্যটির অর্থ মালিক বানানো। কেননা সে মালিকানাকে তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর মালিক তাকেই বলে, যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করে।

আর তালাকে শর্তরোপের সুযোগ রয়েছে। বিক্রয় এর বিপরীত; এতে শর্ত আরোপের সুযোগ নেই।

যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজেকে তিন তালাক দাও আর সে এক তালাক দেয় তাহলে এক তালাকই সাব্যস্ত হবে।

কেননা সে তিন তালাক প্রয়োগের মালিকানা লাভ করেছে। সুতরাং অনিবার্যভাবেই তার এক তালাক প্রয়োগের মালিক নাও থাকবে।

যদি তাকে বলে যে, তুমি নিজেকে এক তালাক দাও, আর সে নিজেকে তিন তালাক দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কিছুই হবে না। আর সাহেবায়ন বলেন, এক তালাক পতিত হবে।

কেননা সে যে তালাকের অধিকারিণী হয়েছিল, তা অতিরিক্তসহ প্রয়োগ করেছে। সুতরাং তা এমন হয়ে গেল যে, কোন স্বামী তার স্ত্রীকে এক হাযার তালাক দেয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সে এমন তালাক প্রয়োগ করেছে, যা তার হাতে অর্পণ করা হয়নি। সুতরাং নিজের পক্ষ থেকে সূচনাকারী হলো। এর কারণ এই যে, স্বামী তো তাকে এক তালাকের অধিকারীণী করেছে। আর তিন একের বিপরীত। কারণ তিন হলো এমন সংখ্যার নাম, যা সম্মিলিত ও একত্রিত। আর এক হলো একক সংখ্যা, যাতে যৌগিকতা নেই। সুতরাং উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যের ভিত্তিতে ভিন্নতা রয়েছে। স্বামীর (হাযার তালাক প্রদানের) বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে মালিকানার সূত্রে বক্তব্য উচ্চারণ করছে। প্রথম মাসআলাটিতে স্ত্রী সম্পর্কেও একই কথা। কেননা সে তিন তালাকের মালিকানা লাভ করেছে। কিন্তু এখানে সে তিন তালাকের মালিকানা লাভ করেনি এবং তার হাতে যা অর্পণ করা হয়েছে, তা সে প্রয়োগ করেনি। সুতরাং তা বাতিল হবে।

স্বামী যদি স্ত্রীকে এমন তালাক দেওয়ার আদেশ করে, যারপর স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকে আর স্ত্রী বায়ন তালাক দিয়ে বসে। কিংবা যদি সে স্ত্রীকে বায়ন তালাক প্রদানের আদেশ করে আর সে রিজয়ী তালাক প্রদান করে, তাহলে স্বামী যে তালাক প্রদানের আদেশ করেছে, সে তালাকই পতিত হবে।

প্রথম মাসআলার ছূরত এই যে, স্বামী তাকে বললো, তুমি নিজেকে এমন একটি তালাক প্রদান করো, যাতে আমার রুজু করার অধিকার থাকে। আর স্ত্রী বললো, আমি নিজেকে একটি বায়ন তালাক প্রদান করলাম, তাহলে রিজয়ী তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা সে

অতিরিক্ত বিশেষণসহ মূল বিষয়টি প্রয়োগ করেছে, যেমন (এই মাত্র) আমরা আলোচনা করলাম। সুতরাং অতিরিক্ত বিশেষণটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মূলটি বহাল থাকবে।

আর দ্বিতীয় মাসআলার ছূরত এই যে, স্বামী তাকে বললো, তুমি নিজেকে একটি বায়ন তালাক প্রদান করো, আর সে বলে, আমি নিজেকে একটি রিজয়ী তালাক প্রদান করলাম। এ ক্ষেত্রে বায়ন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা স্ত্রীর পক্ষ থেকে রিজয়ী কথাটি বাতিল। কেননা স্বামী যখন অর্পিত তালাকের বিশেষণ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তখন স্ত্রীর প্রয়োজনীয় কাজ হলো মূল তালাকটি প্রয়োগ করা, বিশেষণ নির্ধারণ করা নয়। সুতরাং সে যেন মূল তালাকটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তাই স্বামীর নির্ধারণকৃত বিশেষণ সহই তা সাব্যস্ত হবে; বায়ন হোক কিংবা রিজয়ী হোক।

যদি স্বামী তাকে বলে, তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহলে নিজেকে তিন তালাক প্রদান করো কিন্তু সে নিজেকে এক তালাক প্রদান করলো; তাহলে কিছুই হবে না।

কেননা মূলত: বাক্যটির অর্থ হলো, যদি তুমি তিন তালাক প্রদানের ইচ্ছা করো তাহলে তিন তালাক প্রদান কর। আর এক তালাক প্রদানের মাধ্যমে (স্পষ্ট হল যে), সে তিন তালাকের ইচ্ছা করেনি। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি।

যদি স্বামী তাকে বলে, যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে নিজেকে এক তালাক প্রদান করো। আর সে নিজেকে তিন তালাক প্রদান করলো, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একই হুকুম সাব্যস্ত হবে।

কেননা এক তালাকের ইচ্ছা করা তিন তালাকের ইচ্ছা করা নয়। যেমন এক তালাক প্রয়োগ করা তিন তালাক প্রয়োগ করা নয়।

সাহেবায়ন বলেন, এক তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা তিন তালাকের ইচ্ছার মধ্যে এক তালাকের ইচ্ছাও অন্তর্ভুক্ত। যেমন- তিন তালাক প্রয়োগ এক তালাক প্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং শর্ত বিদ্যমান হয়েছে।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি চাও তাহলে তুমি তালাক। আর স্ত্রী বলে, যদি তুমি চাও তাহলে আমিও চাই আর স্বামী তালাকের নিয়তে বলে, আমি চাইলাম, তাহলে এখতিয়ার বাতিল হয়ে গেলো।

কেননা স্বামী স্ত্রীর তালাকটিকে শর্তহীন চাওয়ার সাথে যুক্ত করেছে আর স্ত্রী শর্তযুক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুতরাং স্বামীর (আরোপিত) শর্ত পাওয়া যায়নি। বরং স্ত্রীর উচ্চারিত কথার অর্থ হলো যা উদ্দেশ্য করা হয়নি, তার সাথে প্রবৃত্ত হওয়া। সুতরাং বিষয়টি তার ইখতিয়ার বহির্ভূত হয়ে যাবে। আর স্বামীর 'আমি চাইলাম' বলা দ্বারা তালাক পতিত হবে না; যদিও সে তালাকের নিয়ত করে থাকে। কেননা স্ত্রীর কথায় তালাকের কোন উল্লেখ নেই, যাতে স্বামীকে স্ত্রীর তালাক চেয়েছে বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

আর অনুচ্চারিত কোন বিষয়ে তো নিয়ত কার্যকর হয় না। তবে যদি স্বামী বলে যে, আমি তোমার তালাক চাইলাম এবং একথা দ্বারা যদি তালাকের নিয়ত করে তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা এটা নতুনভাবে তালাক প্রয়োগ করা হলো। কারণ 'চাইলাম' কথাটা অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। আর যদি বলে, আমি তোমার তালাকের ইচ্ছা করলাম, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে না। তাই 'ইচ্ছা করলাম' কথাটা অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে না।

তদ্রূপ যদি স্ত্রী বলে, যদি আমার আব্বা চান তাহলে আমি চাই। কিংবা এখনো ঘটেনি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বললো যে, যদি অমুক বিষয় হয়ে থাকে তাহলে আমি চাই।

কেননা আমরা আলোচনা করেছি যে, স্ত্রী শর্তযুক্ত ইচ্ছা পেশ করেছে। সুতরাং তালাক সাব্যস্ত হবে না এবং এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি 'ঘটে গেছে' এমন কোন বিষয় প্রসংগে বলে যে, যদি তা হয়ে থাকে তাহলে আমি চাইলাম, তাহলে সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে। কেননা কোন সংঘটিত শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ হলো তাৎক্ষণিক প্রয়োগ করা।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, যখন তুমি ইচ্ছা করবে তখন তুমি তালাক আর স্ত্রী যদি বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রত্যাখ্যান সাব্যস্ত হবে না। এবং তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধও থাকবে না।

কেননা 'যখন' শব্দটি সময়বাচক। আর তা সকল সময়ের মধ্যে ব্যাপক। যেন সে বললো, যে কোন সময় তুমি ইচ্ছা করবে। সুতরাং সকলের মতেই তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। এবং যদি সে বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে না। কেননা সে তাকে ঐ সময়ের জন্য তালাকের মালিক বানিয়েছে, যখন সে ইচ্ছা করবে। সুতরাং ইচ্ছা করার পূর্বে তো মালিক বানানো সাব্যস্ত হয়নি, যাতে তার প্রত্যাখ্যানে প্রত্যাখ্যাত হয়। আর সে নিজেকে এক তালাকের বেশি দিতে পারবে না। কেননা, 'যখন' শব্দটি সময়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা জ্ঞাপন হলেও 'কর্মের' ব্যাপারে নয়। সুতরাং সকল সময়ে তালাক প্রদানের মালিক হবে। কিন্তু এক তালাকের পর আরেক তালাকের মালিক হবে না।

আর اذا ও اذا ما (যখন) এবং متى (যে সময়) এ সকল শব্দ সাহেবায়নের নিকট সমান এবং ইমাম আবূ হানিফা (র) বলেন, যদিও এ শব্দগুলি শর্তের জন্য ব্যবহার হয়, যেমন সময়ের জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু বিষয়টি যখন স্ত্রীর অধিকারে ন্যস্ত হয়ে গেছে, তখন সন্দেহের কারণে অধিকার বহির্ভূত হবে না। পূর্বে এর বিশদ আলোচনা এসেছে।

আর যদি বলে 'যত বার' তুমি ইচ্ছা করবে (তত বার) তুমি তালাক, তাহলে স্ত্রী নিজেকে একের পর এক তিন তালাক প্রদান করতে পারবে।

কেননা 'যতবার' কথাটা কর্মের বারংবারতা সাব্যস্ত করে।

তবে এই শর্তযুক্ততা বর্তমান মালিকানার দিকেই শুধু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং যদি অন্য স্বামীর ঘর করার পর এ স্বামীর কাছে ফিরে আসে এবং নিজেকে তালাক প্রদান করে তাহলে কিছুই হবে না। কেননা এটা নতুন সৃষ্ট মালিকানা।

'যত বার চাও' এর সূত্রে স্ত্রী নিজেকে এক শব্দে তিন তালাক প্রদান করতে পারবে না। কেননা শব্দটি সংখ্যা ব্যাপকতা সাব্যস্ত করে; কিন্তু সংখ্যা সমবেত হওয়া সাব্যস্ত করে না। সুতরাং সে এক শব্দে এবং একত্রে তালাক প্রদানের অধিকারিণী হবে না।

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক, 'যেখানে' তুমি চাইবে বা যে স্থানে তুমি চাইবে, তাহলে সে চাওয়ার পূর্বে তালাক সাব্যস্ত হবে না। আর যদি সে মজলিস থেকে উঠে যায় তবে তার ইচ্ছাধিকার থাকবেনা।

কেননা 'যেখানে' ও 'যে স্থানে' শব্দটি স্থান বাচক। আর স্থানের সাথে তালাকের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। সুতরাং স্থানের উল্লেখ বাতিল আর শর্তহীন ইচ্ছার উল্লেখ বহাল থাকবে। ফলে তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। সময়বাচক শব্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সময়ের সাথে তালাকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাইতো এক সময় তালাক সাব্যস্ত হয় কিন্তু অন্যসময় হয় না। সুতরাং বিশিষ্টতা ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী।

যদি তাকে বলে যে, তুমি তালাক, 'যেভাবে' তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে এক তালাক সাব্যস্ত হবে, যার পরে স্বামী রুজু করার অধিকারী থাকবে। অর্থাৎ স্ত্রীর চাওয়ার পূর্বেই।

অতঃপর স্ত্রী যদি বলে যে, আমি একটি বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাক চাইলাম আর স্বামী বলে, সেটাই আমি নিয়ত করেছিলাম, তাহলে সে যেমন বলবে, তেমনই হবে। কেননা তখন স্ত্রীর চাওয়া এবং স্বামীর ইচ্ছার মাঝে ঐক্যমত সাব্যস্ত হবে।

আর যদি স্ত্রী তিন তালাক চায় আর স্বামী একটি বায়ন তালাক ইচ্ছা করে কিংবা বিষয়টি যদি উল্টো হয় তাহলে একটি রিজয়ী তালাক হবে।

কেননা স্বামীর সাথে কথার মিল না হওয়ার কারণে স্ত্রীর বক্তব্য বাতিল হবে। সুতরাং স্বামীর তালাক প্রয়োগ বহাল থাকবে। আর যদি স্বামীর কোন নিয়ত না থাকে তাহলে মাশায়েখগণ বলেছেন, স্ত্রীর চাওয়াই গ্রহণযোগ্য হবে। ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন হয় তার উপর কিয়াস করে তারা এটা বলেন।

হেদায়া গ্রন্থকার (র) বলেন, মাবসূত কিতাবে বলা হয়েছে, এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়নের মতে স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তালাক প্রয়োগ না করবে, তালাক হবে না, সে রিজয়ী বা বায়ন কিংবা তিন তালাক যা ইচ্ছা চাইতে পারে। গোলাম আযাদের ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, স্বামী স্ত্রীর হাতে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে; স্ত্রী তালাককে যে কোন বিশেষণে চায়। সতুরাং মূল তালাককে তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত রাখা অপরিহার্য, যাতে সর্বাবস্থায় তাঁর ইচ্ছা কার্যকরী হতে পারে, অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে হোক কিংবা পরে।

ইমাম আবূ হানীফার (র) দলীল এই যে,'কিভাবে' (এবং যেভাবে) কথাটা বিশেষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত। (মূল বিষয়টি জানতে চাওয়ার জন্য নয়।) বলা হয়, কিভাবে তোমার সকাল হয়েছে? আর বিশেষণ প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ মূল বিষয়ের অস্তিত্ব দাবী করে। আর তালাকের অস্তিত্ব হয় তা প্রযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে।

যদি তাকে বলে, তোমার উপর তালাক, তুমি যে পরিমাণ চাও অথবা যত চাও, তা হলে সে যত সংখ্যক ইচ্ছা নিজের উপর তালাক প্রদান করতে পারে।

কেননা শব্দদ্বয় সংখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, যে যত সংখ্যা তালাক ইচ্ছা করবে তত সংখ্যাই তার হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

যদি সে মজলিস থেকে উঠে যায় তাহলে ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা এটা অভিন্ন বিষয় আর তা বর্তমান সময়ের জন্য সম্বোধন। সুতরাং বর্তমান সময়েই জওয়াব আবশ্যক।

যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি নিজেকে তিন তালাক হতে যতটা ইচ্ছা তালাক দাও। তাহলে সে নিজেকে এক বা দুই তালাক দিতে পারবে। কিন্তু তিন তালাক দিতে পারে না।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়নের মতে স্ত্রী যদি চায় তাহলে নিজেকে তিন তালাক দিতে পারবে।

কেননা, যার যতটা (আরবীতে ما) শব্দটি ব্যাপকতার অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে থেকে বা হতে (আরবীতে من) অব্যয়টি কখনো কখনো ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অব্যয়টিকে এখানে তালাকের জিনস (বা সমগ্র পরিমাণ) ব্যাখ্যার অর্থে গ্রহণ করা হবে। যেমন বলা হয়, তুমি আমার খাবার হতে যা ইচ্ছা খাও। কিংবা আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যে চায়, তাকে তালাক প্রদান কর। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, হতে বা থেকে (আরবী من) অব্যয়টি প্রকৃত পক্ষে আংশিকতা জ্ঞাপক। এবং যা (ما) অব্যয়টি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সুতরাং উভয়টি কার্যকরী হবে।

সাহেবায়ন প্রমাণ হিসেবে যে দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন, তন্মধ্যে প্রথমটিতে আংশিকতার অর্থ বর্জন করা হয়েছে; তাতে প্রকাশের ইঙ্গিত থাকার কারণে এবং দ্বিতীয়টিতে বিশেষণের অর্থাৎ 'যে চায়' এ ব্যাপকতার কারণে। এ জন্যই যদি বলে, আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যাকে তুমি ইচ্ছা কর তাকে তালাক দাও তাহলে সেখানেও মতপার্থক্য হবে। (কেননা এখানে বিশেষণটি ব্যাপক নয়; বরং শুধু একজনের সংগে যুক্ত।)

باب الايـمان فى الـطلاق

অধ্যায় ঃ শর্তযুক্ত তালাক

অধ্যায় ঃ শর্তযুক্ত তালাক

তালাক প্রদানকে যদি বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া মাত্র তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে বললো, তোমাকে যদি বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক। কিংবা (বললো) যে কোন স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করবো সে তালাক।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন,এ ধরনের কথায় তালাক হবে না। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন (رواه ابن ماجة) لا طلاق قبل النكاح

বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।

আমাদের দলীল এই যে, এতে শর্ত ও পরিণতি বিদ্যমান হওয়া সাপেক্ষে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর তা সহীহ হওয়ার জন্য বর্তমানে বিবাহের মালিকানা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। কেননা তালাক তো পতিত হবে শর্ত পাওয়ার সময় আর তখন 'স্বামী সত্ত্ব' বিদ্যমান থাকা সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে শর্তের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে বক্তব্যটির ক্রিয়া হলো 'নিবারণ'। আর তা বক্তব্য উচ্চারণ কারীর সংগে সংশ্লিষ্ট।

আর আলোচ্য হাদীসটি তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকরী না হওয়ার উপর প্রযোজ্য। আর এর উপর প্রয়োগ ইমাম শা'বী, যুহরী ও অন্যান্য পূর্ববর্তীগণ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

যদি তালাককে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে উক্ত শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পরপরই তালাক সাব্যস্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ স্বামী তার স্ত্রীকে বললো, তুমি যদি এই গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক।

এ সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত। কেননা শর্ত আরোপের সময় 'স্বামী সত্ব' বিদ্যমান রয়েছে। আর বাহ্যতঃ শর্ত অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত স্বামী সত্ব বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং বক্তব্যটি সহীহ হবে শর্তসাপেক্ষরূপে কিংবা তালাক প্রদান হিসেবে। **তালাককে শর্তযুক্ত করা তখনই শুধু সহীহ হবে, যখন শর্তারোপকারী (তালাকের) অধিকারী হবে কিংবা যখন তালাককে অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত করবে।**

কেননা جزاء (বা শর্তের পরিণতি) এর অস্তিত্ব সম্ভাবনাপূর্ণ হতে হবে, যাতে তা সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য হুঁশিয়ারি ও শতর্ককারী বিবেচিত হয়। তখন يمين (শর্তারোপ) এর যথার্থ তথা 'নিবারণী শক্তি'এর প্রকাশ ঘটবে। আর পরিণতির সম্ভাব্যতা এই দুই অবস্থায় সাব্যস্ত হতে পারে। অধিকারের সূত্রের সংগে সম্পৃক্ত করা স্বয়ং অধিকারের সংগে সম্পৃক্ত করার সমার্থক। কেননা অধিকারের সূত্র সাব্যস্ত হওয়ার সময় অধিকার সাব্যস্ত হওয়া সুস্পষ্ট।[১]

১। যেমন মনিব যদি কোন দাসকে উদ্দেশ্য করে বলে, যদি তোমাকে খরিদ করি তাহলে তুমি আযাদ কিংবা যদি বলে, যদি আমি তোমার মালিক হই তাহলে তুমি আযাদ। এখানে ক্রয় হচ্ছে মালিকানার সূত্র। তবে উভয় বাক্যের ফলাফল অভিন্ন হবে।

সুতরাং পুরুষ যদি কোন ভিন্ন স্ত্রীলোককে বলে, যদি তুমি এই গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক; অত:পর সে তাকে বিবাহ করলো আর (স্ত্রী হওয়ার পর) সে গৃহে প্রবেশ করলো, তাহলে তালাক হবে না।

কেননা উপরোক্ত বক্তব্য উচ্চারণকারী তালাকের অধিকারী ছিল না। এবং তালাককে অধিকার বা অধিকারের সূত্র কোনটার সাথেই সম্পৃক্ত করেনি। অথচ দুটির কোন একটির সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক।

শর্ত বাচক শব্দগুলো (আরবীতে) নিম্নরূপ ان (যদি) اذا - اذاما (যখন) كل (যে কোন) كلما (যখনই) متى - متى ما (যখন)। কেননা, শর্ত আসলে আলামতের অর্থ থেকে নির্গত। আর উল্লেখিত শর্তবাচক শব্দগুলির পরে ক্রিয়া মিলিত রয়েছে। সুতরাং সেই ক্রিয়ার সংগঠন শর্ত ভঙ্গের আলামত হিসেবে গণ্য হবে।

ان অব্যয়টি নিছক শর্তবাচক অব্যয়। কেননা তাতে কালজনিত কোন অর্থ নেই। আর অন্য শব্দগুলি ان এর অনুগামী। আর كل শব্দটি প্রকৃতপক্ষে শর্তের জন্য নয়। কেননা এর সংলগ্ন শব্দটি اسم। অথচ শর্ত হবে এমন বিষয় যার সাথে কোন جزاء বা পরিণতি যুক্ত হতে পারে। আর পরিণতি যুক্ত হয় কোন فعل বা ক্রিয়ার সংগে। তবে كل কে এদিক থেকে শর্তবাচক অব্যয়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে যে, তার সংলগ্ন اسم টির সংলগ্ন একটি فعل বা ক্রিয়া থাকে। (সেটা হলো পরবর্তী جزاء -এর শর্ত) যেমন বলা হয়- كل عبد اشتريته فهو حر (যে কোন গোলাম আমি খরিদ করবো সে আযাদ হবে।)

ইমাম কুদুরী বলেন ঃ সুতরাং এ সকল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন তা পূর্ণরূপে শর্ত শেষ হয়ে যাবে। কেননা আভিধানিকভাবে এ শব্দগুলো ব্যাপকতা ও পুনঃপৌনিকতা দাবী করে না। সুতরাং ক্রিয়াটি একবার সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে শর্ত সমাপ্তি লাভ করবে। আর শর্ত ব্যতীত অঙ্গীকার অব্যাহত থাকে না।

তবে كلما (যখনই) শব্দটি ব্যতিক্রম। কেননা তা ক্রিয়ার ব্যাপকতা (ও পুনঃ পৌনিকতা) দাবী করে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন।

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ

(যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখনই আমি সে চামড়ার পরিবর্তে তাদেরকে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো যাতে তারা আযাব ভোগ করে।) আর ক্রিয়ার ব্যাপকতার অনিবার্য দাবী হলো পুনঃপৌনিকতা।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ অতঃপর অন্য স্বামীর বিবাহ ও তালাক হওয়ার পর যদি এ স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং শর্তটি পুনঃ সংঘটিত হয় তাহলে কোন তাকাল হবে না।

কেননা পূর্ববর্তী বিবাহের সূত্রে লব্ধ তিন তালাকের অধিকার পূর্ণ প্রয়োগ করার পর جزاء (বা পরিণতি) অব্যাহত নেই। অথচ শর্ত ও পরিণতি'র বিদ্যমানতা দ্বারাই ইয়ামীন বিদ্যমান থাকে। এ সম্পর্কে ইমাম যুফার (র)-এর ভিন্নমত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিষয়টি আলোচনা করবো।

كلما (যখন) শব্দটি যদি স্বয়ং বিবাহ শব্দের সাথে যুক্ত হয়, যেমন সে বললো, যখনই কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করবো তখনই সে তালাক হবে, তাহলে প্রতিবারই তালাক হবে। এমন কি অন্য স্বামীর স্ত্রীত্বে থেকে আসার পরও। কেননা এ ক্ষেত্রে শর্ত সংশ্লিষ্টিত হয়েছে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামী যে তালাকের অধিকারী হয় তার ভিত্তিতে; আর এখানে তা অসংখ্য হতে পারে। **ইমাম কুদূরী বলেন ঃ শর্ত উচ্চারণের পর স্বামী-স্বত্ব বিলুপ্তি শর্তকে বাতিল করে না।**[১]

কেননা শর্ত এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি। সুতরাং তা বহাল রয়েছে। অন্যদিকে جزاء (বা পরিণতি)-এর ক্ষেত্র (তথা স্ত্রী লোকটি) বিদ্যমান থাকার কারণে তার সম্ভাবনাও বহাল রয়েছে। সুতরাং শর্তও বহাল থাকবে।

অতঃপর যদি তালাকের অধিকার বিদ্যমান অবস্থায় শর্ত সম্পন্ন হয় তাহলে শর্ত পূর্ণ হয়ে গেল এবং তালাক হয়ে যাবে।

কেননা শর্ত বিদ্যমান হয়েছে আর ক্ষেত্রটি পরিণতি যোগ্য হয়েছে। সুতরাং পরিণতি কার্যকর হবে। তবে (সামনের জন্য) শর্ত বহাল থাকবে না। এর কারণ ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

পক্ষান্তরে শর্তটি যদি স্বামী-স্বত্বের অবর্তমানে ঘটে থাকে তাহলে শর্তের উপস্থিতির কারণে শর্ত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষেত্রটি না থাকার কারণে কোন তালাক হবে না।

আর যদি শর্ত সম্পন্ন হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য হয় তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু স্ত্রী সাক্ষী (তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে)।

কেননা স্বামী মূল অবস্থার দাবীদার। আর তা হলো শর্তের অনুপস্থিতি। তাছাড়া স্বামী তালাক পতিত হওয়া এবং অধিকার বিলুপ্ত হওয়া অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে স্ত্রী তা দাবী করছে।

আর যদি শর্তটি এমন হয় যা স্ত্রীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয় তাহলে তার নিজের ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ পুরুষ যদি বলে, তুমি যদি ঋতুগ্রস্তা হয়ে পড়ো তাহলে তুমি এবং (আমার) অমুক (স্ত্রী) তালাক, পরে স্ত্রী বললো আমি ঋতুগ্রস্ত হয়েছি তাহলে তার ক্ষেত্রে তো তালাক হবে কিন্তু অন্য স্ত্রীটির[২] ক্ষেত্রে তালাক হবে না।

তালাক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবী হচ্ছে তালাক সাব্যস্ত না হওয়া। কেননা ঋতুগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি হলো শর্ত। তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমন গৃহ প্রবেশের (শর্তটির) ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি নিজের ব্যাপারে (শরীয়তের পক্ষ হতে) আমানতদার। কেননা বিষয়টি তার দিক থেকেই শুধু জানা সম্ভব। সুতরাং তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে, ইদ্দত শেষ হওয়া না হওয়া এবং

১। অর্থাৎ তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর তাহলে তুমি তালাক, এ কথা বলার পর যদি তাকে বায়ন তালাক প্রদান করে তাহলে পূর্ববর্তী শর্ত বহাল থাকবে। সুতরাং পুনঃবিবাহের পর গৃহ প্রবেশ হলে শর্ত কার্যকর হবে এবং তালাক হবে।

২। এ সিদ্ধান্তটি অবশ্য স্বামীর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর কথা সত্য বলে স্বীকার করে নেয় তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রেই তালাক হবে।

সহবাসের বৈধতার ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে।[১] পক্ষান্তরে সতীনের ব্যাপারে তার ভূমিকা হলো সাক্ষ্য প্রদানকারীর। বরং তার বক্তব্য সন্দেহজনক। সুতরাং সতীনের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

তদ্রূপ পুরুষ যদি বলে, তুমি যদি এটা পছন্দ করো যে, আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামের আগুনে আযাব দিবেন তাহলে তুমি তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ। উত্তরে স্ত্রী বললো, আমি তা পছন্দ করি। কিংবা পুরুষ বললো, তুমি যদি আমাকে ভালবাসো তাহলে তুমি এবং তোমার সাথে এই স্ত্রীটি তালাক। উত্তরে স্ত্রী বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাহলে তার নিজের তালাক হয়ে যাবে, কিন্তু গোলাম আযাদ হবে না এবং সতীনেরও তালাক হবে না।

এর কারণ আমরা পূর্বেই বলে এসেছি।

স্ত্রী মিথ্যা বলেছে, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেননা স্বামীর প্রতি প্রচন্ড বিদ্বেষের কারণে (মূর্খতাবশত:) আযাবের বিনিময়ে হলেও তার বন্ধন হতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা সে প্রকাশ করতে পারে।

মোট কথা, তার নিজের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি (ভালোবাসা ও পছন্দ সম্পর্কে) তার বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যদিও সে মিথ্যাবাদী হয়; কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি মূল বিষয় অর্থাৎ ভালবাসা ও পছন্দ এর উপর বহাল থাকবে।[২]

আর যদি স্বামী তাকে বলে, যখন তুমি ঋতুগ্রস্তা হবে তখন তুমি তালাক। অতঃপর সে রক্তস্রাব দেখতে পেলো তাহলে তালাক হবে না। যতক্ষণ না রক্তস্রাব তিনদিন স্থায়ী হয়।

কেননা যে রক্তস্রাব এর চেয়ে কম সময়ে বন্ধ হবে, তা হায়য বলে গণ্য হবে না।

যখন তিনদিন পূর্ণ হবে তখন আমরা হায়যের সূচনাকাল থেকে তালাকের হুকুম আরোপ করবো। কেননা স্রাবকাল প্রলম্বিত হওয়া দ্বারা জানা গেল যে, এ রক্ত জরায়ু থেকে নির্গত হয়েছে। সুতরাং শুরু থেকেই তা হায়য গণ্য হবে।

আর যদি স্বামী তাকে বলে যে, যখন তোমার একটি হায়য হবে তখন তুমি তালাক, তাহলে হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে তালাক হবে না।

কেননা একটি হায়যের দ্বারা পূর্ণ একটি হায়য বোঝা যায়। এ কারণেই মুদ্দতহীন সহবাসের বৈধতার ব্যাপারে জরায়ু মুক্ত হওয়া সংক্রান্ত হাদীসে (যা حديث الاستبراء নামে পরিচিত) حيضة (একটি হায়য) শব্দটিকে পূর্ণ হায়য অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।[৩] আর হায়য শেষ হওয়া দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর তা হয় পবিত্রতা লাভের দ্বারা।

১। অর্থাৎ স্ত্রী যদি বলে যে, আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ যদি বলে, আমি এখন সহবাসের উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য।

২। তার বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। বরং যেহেতু জাহান্নাম পছন্দ না করা এবং এ ধরনের স্বামীর প্রতি ভালোবাসা না থাকাই হলো স্বাভাবিক অবস্থা; সেহেতু অন্যের ক্ষেত্রে আসল ও স্বাভাবিক অবস্থার উপরই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে।

৩। হাদীসের عبارت এই রূপ– হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস গোত্রের যুদ্ধ বন্দিনীদের সম্পর্কে বলেছেন, কোন গর্ভবতীর সংগে গর্ভ-প্রসবের পূর্বে ও অগর্ভবতীর সংগে এক হায়যের পূর্বে সহবাস করা যাবে না। (আবূ দাউদ)

আর যদি বলে, যখন তুমি একদিন রোযা রাখবে তখন তুমি তালাক, তাহলে রোযা রাখার দিন সূর্যাস্তের সময় থেকে তালাক হবে।

কেননা দিনকে যখন কোন প্রলম্বিত কাজের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন আলোকিত দিবসই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি বলে, 'যখন তুমি রোযা রাখবে' (তাহলে রোযা শুরু করা মাত্র তালাক হয়ে যাবে)। কেননা এখানে রোযাকে তার সময়কাল দ্বারা আবদ্ধ করা হয়নি, আর রোযা কর্মটি রোকন ও শর্তসহ অস্তিত্ব লাভ করে ফেলেছে।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি পুত্র সন্তান প্রবস করো তাহলে তোমার উপর এক তালাক আর যদি কন্যা প্রসব করো তাহলে তোমার উপর দুই তালাক। অতঃপর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলো, কিন্তু কোন্‌টি প্রথম তা জানা যায়নি, তাহলে আদালতের বিচারে তার উপর এক তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে সন্দেহ মুক্ততার দৃষ্টিতে দু'তালাক পতিত হবে। এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

কেননা যদি প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করে থাকে তাহলে এক তালাক হবে এবং কন্যা সন্তান প্রসব দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হবে। তবে দ্বিতীয় প্রসব দ্বারা আরেক তালাক পতিত হবে না। কারণ এ প্রসবটি তো হলো ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থা।

আর কন্যা সন্তানের প্রসব প্রথমে হলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে এবং পুত্র সন্তানের প্রসব দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হবে। অতঃপর এই প্রসব দ্বারা কোন তালাক হবে না। এর কারণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করেছি যে, এটা হলো ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এক অবস্থায় এক তালাক হচ্ছে, আরেক অবস্থায় দুই তালাক হচ্ছে। সুতরাং নিছক সন্দেহ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে দ্বিতীয় তালাকটি সাব্যস্ত হবে না। তবে সন্দেহ মুক্ততা ও সর্তকার দিক থেকে দুই তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়াই উত্তম। কিন্তু উপরে বর্ণিত কারণে ইদ্দত অবশ্য নিশ্চিতভাবেই পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর যদি স্বামী তাকে বলে, যদি তুমি আবূ আমর ও আবূ ইউসুফের সংগে কথা বলো তাহলে তোমার উপর তিন তালাক। অতঃপর স্বামী তাকে এক তালাক দিলো এবং বিচ্ছেদ হয়ে গেলো। আর ইদ্দত পূর্ণ হলে পরে (বিচ্ছেদ অবস্থায়) সে আবূ আমরের সংগে কথা বললো। এরপর স্বামী তাকে আবার বিবাহ করলো। অতঃপর (স্ত্রী অবস্থায়) সে আবূ ইউসুফের সংগে কথা বললো, তাহলে পূর্ববর্তী এক তালাকের সংগে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। ইমাম যুফার (র) বলেন, কোন তালাক হবে না।

আলোচ্য মাসআলার বিভিন্ন ছূরত রয়েছে: প্রথমতঃ উভয় শর্ত যদি স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তবে তালাক হয়ে যাবে। আর তা স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ যদি উভয় শর্ত স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তবে তালাক হবে না। তৃতীয়তঃ যদি প্রথম শর্তটি স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় এবং দ্বিতীয় শর্তটি স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয় তখনও তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, পরিণতি স্বামী-স্বত্ব না থাকা অবস্থায় পতিত হয় না। সুতরাং তালাক হবে না। চতুর্থতঃ প্রথম শর্তটি যদি অবিদ্যমান অবস্থায় এবং দ্বিতীয় শর্তটি বিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, এটাই হলো কিতাবের মতনে বর্ণিত বিরোধপূর্ণ মাস'আলা।

ইমাম যুফার (র) প্রথম শর্তটিকে দ্বিতীয় শর্তের নিরিখে বিচার করেন। কেননা তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে উভয় শর্ত মূলতঃ অভিন্ন শর্তের মত।

আমাদের দলীল এই যে, বক্তার বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতার উপর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল। তবে স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকা শর্ত, শর্ত আরোপের সময় যাতে চলমান অবস্থার[১] নিরীখে পরিণতির অস্তিত্ব সুসম্ভাব্য হয় এবং শর্ত শুদ্ধ হয় এবং শর্ত সম্পূর্ণ হওয়ার সময়ও (স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকা আবশ্যক) যাতে পরিণিতি সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা তা (তালাক) স্বামী স্বত্বের বিদ্যমানতা ছাড়া পতিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে (শর্তায়ণ ও শর্তের অস্তিত্ব লাভ) এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হলো শর্ত বাক্যের বিদ্যমান থাকার অবস্থা। সুতরাং তখন স্বামী স্বত্বের বিদ্যমান থাকার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় গণ্য হবে।

কেননা শর্ত বাক্যের বিদ্যমানতা ক্ষেত্রের বিদ্যমানতার সাথে সম্পৃক্ত। আর ক্ষেত্র হলো বক্তব্য উচ্চারণকারীর দায়িত্ব যোগ্যতার।

আর যদি স্বামী তাকে বলে, তুমি যদি এ গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তোমার উপর তিন তালাক। অতঃপর স্ত্রীকে সে আপনা থেকেই দুই তালাক দিলো আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করল এবং সে স্বামী তার সাথে বাসর যাপন করলো। এরপর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এলো এবং উক্ত গৃহে প্রবেশ করলো এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তিন তালাক হবে। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ তিন তালাকের অবশিষ্ট যে তালাকটি রয়েছে, তাই পতিত হবে।

ইমাম যুফার (র)-এরও এই মত। মতপার্থক্যের মূল ভিত্তি এই যে, শায়খায়নের মতে তিনের কম সংখ্যক তালাকগুলো দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর নিকট শর্ত সাপেক্ষ তিন তালাকসহ ফিরে আসবে।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহম্মদ ও যুফার (র)-এর মতে তিনের কম সংখ্যার সাব্যস্ত পূর্ববর্তী তালাকগুলো বিলুপ্ত হবে না। সুতরাং স্ত্রী লোকটি প্রথম স্বামীর নিকট শুধু অবশিষ্ট তালাকসহ ফিরে আসবে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আর যদি স্বামী তাকে বলে, যদি তুমি এই গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তিন তালাক। অতঃপর সে নিঃশর্তভাবে বললো, তোমাকে দিলাম তিন তালাক। তারপর স্ত্রীলোকটি অন্যকে বিবাহ করলো এবং স্বামীর সংগে তার একান্ত মিলন হলো। অতঃপর (নির্ধারিত প্রক্রিয়ায়) প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এলো আর উক্ত গৃহে প্রবেশ করল। তখন কোন তালাক হবে না।

ইমাম যুফার (র) বলেন, তিন তালাক হয়ে যাবে। তাঁর দলীল এই যে,পরিণতি হল, শর্তমুক্ত 'তিন' উচ্চারিত শব্দ শর্তমুক্ত থাকার কারণে। তিন শব্দটির আর (স্বতন্ত্রভাবে তালাক লাভের পরও পুনঃ বিবাহের সম্ভাবনার কারণে) উক্ত তিন তালাকের অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মূল শর্ত বহাল থাকবে।

১। استصحاب الحال। এর অনুবাদ অর্থাৎ যে অবস্থা বিদ্যমান ছিলো, তার না থাকার কোন প্রমাণ যেহেতু নেই, সেহেতু উক্ত অবস্থাই বহাল রয়েছে বলে ধরে নেওয়া।

আমাদের দলীল এই যে, আলোচ্য শর্ত বাক্যের পরিণতি হচ্ছে বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক। কারণ শর্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিণতির ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে নিবারণ আর বর্তমান অধিকার বলে লব্ধ তিন তালাকই হচ্ছে নিবারণকারী। কেননা ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে তার অনস্তিত্বই বর্তমানে দৃশ্যমান, (সুতরাং সেটা দ্বারা ভয় প্রদর্শন সম্ভব নয়।) অথচ শর্ত বাক্যের উচ্চারণই হয় পরিণতির ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে নিবারণ কিংবা উদ্বুদ্ধ করণের জন্য। যাই হোক (বর্তমান স্বামী-স্বত বলে লব্ধ) যে তিন তালাকের কথা আমরা বললাম সেটাই যখন পরিণতি হিসেবে সাব্যস্ত হলো আর নিঃশর্ত তিন তালাক প্রদানের মাধ্যমে সেটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেননা তিন তালাক প্রদান বিবাহের বা তালাকের ক্ষেত্রে হওয়ার যোগ্যতাই বাতিল করে দেয়। সুতরাং শর্ত বাক্যের কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকবেনা। পক্ষান্তরে (এক দুই তালাকের মাধ্যমে) বিচ্ছেদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা 'ক্ষেত্র' হওয়ার স্বভাবযোগ্যতা বিদ্যমান থাকার কারণে পরিণতির কার্যাকারিতাও বিদ্যমান থাকবে।

আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তাহলে তোমার উপর তিন তালাক, অতঃপর তার সাথে সহবাস করলো, তাহলে দুই যৌনাংগ যখন 'মিলিত' হবে তখনই তিন তালাক হয়ে যাবে। এ অবস্থায় সে যদি কিছু সময় থাকে তবে সে কারণে স্বামীর উপর 'মাহরে মেছেল' ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে যৌনাঙ্গ বের করে পুনঃপ্রবেশ করায়, তাহলে মাহরে মেছেল ওয়াজিব হয়ে যাবে। একই হুকুম হবে যদি মনিব তার দাসীকে বলে, যদি তোমার সাথে সহবাস করি তাহলে তুমি আযাদ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম ছূরতেও তিনি মাহরে মেছেল ওয়াজিব বলেছেন।

কেননা (প্রবিষ্ট করণের মাধ্যমে তালাক হওয়ার পর) 'স্থায়িত্ব' দ্বারা সহবাস সাব্যস্ত হয়েছে; তবে অভিন্ন ক্রিয়া হওয়ার কারণে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।

যাহিরে রেওয়ায়েতের দলীল এই যে, সহবাস অর্থ হলো 'গুপ্তাংগে গুপ্তাংগ প্রবিষ্টকরণ'। আর প্রবিষ্টকরণ ক্রিয়াটির স্থায়িত্ব নেই। পক্ষান্তরে বের করার পর পুনঃপ্রবিষ্টকরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে তালাকের পর প্রবিষ্ট করণ সংঘটিত হয়েছে। তবে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা (উভয় ক্রিয়ার) মজলিস এবং উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ার কারণে ক্রিয়া দুটিতেও অভিন্নতার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আর যখন হদ্দ ওয়াজিব হবে না তখন মাহর অবশ্যই ওয়াজিব হবে। কেননা কোন সহবাস হদ্দ ও মাহর দুটির উভয়টি থেকে মুক্ত হতে পারে না।

(উপরোক্ত মাসা'আলায়) তালাক যদি রিযা হয়ে থাকে তাহলে আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে স্থায়িত্ব দ্বারা রিযা'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কারণ সকাম স্পর্শ পাওয়া গেছে। ইমাম মুহম্মদ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আর যদি বের করে পুনরায় প্রবেশ করায় তাহলে সর্বসম্মতভাবেই সে রিযা'আতকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা স্বতন্ত্র সহবাস পাওয়া গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যতিক্রম জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার উপর তালাক, 'ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা' এ-কথাটি সে সংলগ্নভাবে বলে, তাহলে তালাক হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من حلف بطلاق او عتاق وقال ان شاء الله تعالى متصلا به لا حنث عليه

কেউ যদি (স্ত্রীর উদ্দেশ্যে) তালাক কিংবা (দাস-দাসীর উদ্দেশ্যে) আযাদ শব্দ প্রয়োগ করে এবং তার সংলগ্ন করে ইনশা আল্লাহ্ বলে তাহলে তা কার্যকর হবে না।

যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, বাহ্যতঃ সে শর্তের রূপ ব্যবহার করেছে। সুতরাং এদিক থেকে তা শর্তযুক্ত বাক্য হলো। এর অর্থ হলো শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টিকে অস্তিত্বহীন রাখা। আর এখানে শর্ত (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছে) সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তা মূলতঃ অস্তিত্বহীন পণ্য হবে। আর এটি বাহ্যতঃ শর্ত রাখার কারণেই অন্য সকল শর্তের ন্যায় এটিরও বক্তব্যের সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক।

আর যদি (তোমার তালাক বলে কিছুক্ষণ) **চুপ থাকে**। (অতঃপর ইনশা আল্লাহ্ বলে) তাহলে প্রথম বক্তব্য কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং এরপর ব্যতিক্রমবাচক বা শর্তবাচক শব্দ ব্যবহারের অর্থ হবে প্রথম বক্তব্য থেকে ফিরে আসা।

তদ্রূপ (তালাক হবে না) **যদি স্বামী ইনশা আল্লাহ্ উচ্চারণের পূর্বে স্ত্রী মারা যায়।**

কেননা ব্যতিক্রমবাচক শব্দ ব্যবহারের কারণে তার বক্তব্যটি কার্যকর হওয়া থেকে সরে এসেছে আর মৃত্যু কার্যকরীতার অন্তরায় বাতিলকারী নয়।

প্রক্ষান্তরে (ব্যতিক্রমজ্ঞাপক বাক্য উচ্চারণের) পূর্বে যদি স্বামী মারা যায় (তবে তালাক হবে না)। কেননা তখন ব্যতিক্রমজ্ঞাপক বাক্যটি মূল বক্তব্যের সাথে যুক্ত হয়নি।

আর স্বামী যদি বলে, তোমার উপর তিন তালাক, কিন্তু একটি বাদ, এতে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে। আর যদি বলে, তোমার উপর তিন তালাক, কিন্তু দুটি বাদ। তাহলে এক তালাক হবে।

এ মাসা'আলার ভিত্তি এই যে, ব্যতিক্রমজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারের অর্থ হলো ব্যতিক্রমনের পর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ। এটিই বিশুদ্ধ মত। এর মর্ম হল, ব্যতিক্রমের পর যা অবশিষ্ট থাকে, সে তাই উচ্চারণ করছে। কেননা 'অমুক আমার কাছে এক দিহরাম পাবে।' আর 'নয় কম দ'শ দিহরাম পাবে'- এ বাক্য দু'টির মর্মে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং সমগ্র থেকে অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া শুদ্ধ হবে। কেননা এরপর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ বহাল থাকবে। তবে সমগ্র থেকে সমগ্রকে বাদ দেয়া শুদ্ধ হবে না। কেননা এরপর এমন কোন অংশ অবশিষ্ট থাকছেনা, যার দিকে মূল শব্দটিকে প্রত্যাবর্তন করানো যায় এবং বক্তাকে ঐ অংশের মর্মে শব্দটিকে উচ্চারণকারী বলা যায়। বলা বাহুল্য যে, ব্যতিক্রম জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা মূল বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত হবে। এর কারণ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এই নীতি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন প্রথম ছূরতে ব্যতিক্রম অবশিষ্ট হচ্ছে দুই তালাক। সুতরাং তা পতিত হবে। আর দ্বিতীয় ছূরতে অবশিষ্ট হচ্ছে এক (তালাক) সুতরাং একই তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে যদি 'তিন তালাক' উচ্চারণের পর বলে, 'এ থেকে তিন বাদ' তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা এতে হচ্ছে সমগ্র থেকে সমগ্রের ব্যতিক্রম সুতরাং এ ব্যতিক্রম শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

باب طلاق المريض

অধ্যায় ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক

অধ্যায় ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক

পুরুষ যদি তার মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে বায়ন তালাক দেয়, তারপর সে স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে স্ত্রী তার মীরাছ পাবে, আর যদি ইদ্দতপূর্ণ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্ত্রীর কোন মীরাছ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই মীরাছ পাবে না।

কেননা এই উদ্ভূত অবস্থার কারণে বিবাহ বন্ধন বাতিল হয়ে গেছে। অথচ এটাই ছিলো মীরাছ লাভের ভিত্তি। এই বিবাহ সম্পর্ক বাতিল হওয়ার কারণেই তো স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী তার মীরাছের অধিকারী হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় বিবাহ সম্পর্ক স্ত্রীর মীরাছ লাভের কারণ। আর স্বামী সেই কারণটি বিনষ্ট করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং স্ত্রীর স্বার্থহানি রোধ করার জন্য ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত তার পদক্ষেপের কার্যকারিতা বিলম্বিত করার মাধ্যমে তার ইচ্ছাকে প্রতিহত করা হবে। আর তা সম্ভব। কেননা কোন কোন বিষয়ে ইদ্দতের সময় সীমার ভিতরে বিবাহকে বিদ্যমান গণ্য করা হয়। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর মীরাছ লাভের ক্ষেত্রেও বিবাহকে বহাল বিবেচনা করা বৈধ।

তবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (বিবাহকে বহাল বিবেচনা করার) কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ অবস্থায় বিবাহ-সম্পর্ক স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর মীরাছ লাভের কারণ নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে মীরাছের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। বিশেষতঃ সে যখন (স্বেচ্ছায় তালাক প্রদানের মাধ্যমে) তাতে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

আর যদি স্ত্রীকে তারই অনুরোধে তিন তালাক প্রদান করে কিংবা যদি তাকে বলে, তুমি (নিজের ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো আর সে তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো কিংবা স্ত্রী তার কাছ থেকে (অর্থের বিনিময়ে) খোলা তালাক নিল। অতঃপর ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী মারা গেলো তাহলে স্ত্রী স্বামীর মীরাছ পাবে না।

কেননা স্ত্রী নিশ্চয়ই মীরাছের হক বাতিল করার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেছে। অথচ বিলম্বিতকরণ হয়েছিলো তার হক রক্ষার জন্য।

আর যদি স্ত্রী বলে, আমাকে তালাকে রাজয়ী দাও, কিন্তু স্বামী তাকে তিন তালাক দিল, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মীরাছ পাবে। কেননা তালাকে রাজয়ী বিবাহকে বিলুপ্ত করে না। সুতরাং তালাকে রাজয়ী চাওয়া দ্বারা নিজের হক বাতিলের ব্যাপারে সম্মতি প্রমাণিত হয় না।

আর যদি মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে বলে, সুস্থ অবস্থায় আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিলাম এবং তোমার ইদ্দতও পূর্ণ হয়ে গেছে। আর স্ত্রীও তার বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করে,

তারপর স্বামী তার অনুকূলে কিছু ঋণ স্বীকার করলো কিংবা তার অনুকূলে কোন অছিয়ত করলো, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে মীরাছ এবং ঋণ অছিয়তের মধ্যে যেটি নিম্নতর পরিমাণের, সেটিই স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে স্বামীর ঋণ স্বীকার এবং অছিয়ত বৈধ হবে।

আর যদি স্বামী তার মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীর অনুরোধে তিন তালাক দেয় তারপর (ইদ্দতের মধ্যে) স্বামী তার অনুকূলে ঋণ স্বীকার করে কিংবা কোন অছিয়ত করে তাহলে সকলেরই মতে এ দু'টি এবং মীরাছের মধ্যে নিম্নতর পরিমাণেরটি স্ত্রীর অনুকূলে প্রাপ্য হবে।

তবে ইমাম যুফার (র) এর মতে স্ত্রী অছিয়ত এবং ঋণের সবটুকুই লাভ করবে।

কেননা স্ত্রী তালাক চাওয়া দ্বারা যখন তার মীরাছের অধিকার বাতিল হয়ে গেলো তখন ঋণ স্বীকার এবং অছিয়তের প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়ে গেলো।

প্রথমোক্ত মাস'আলায় ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, তালাক ও ইদ্দত পূর্তির ব্যাপারে তারা যখন পরস্পর একমত হলো তখন স্বামীর জন্য সে বেগানা স্ত্রীলোক হয়ে গেলো। এ জন্যই তো স্ত্রীলোকটির বোনকে এ অবস্থায় বিবাহ করা বৈধ। সুতরাং (একজন ওয়ারিছকে অন্যদের উপর অধিক প্রদানের) অভিযোগের অবকাশ রহিত হয়ে গেলো। এ কারণেই তো স্ত্রীলোকটির অনুকূলে তার সাক্ষ্য তখন গ্রহণযোগ্য এবং স্ত্রীলোকটিকে যাকাত দেওয়া বৈধ হয়।

দ্বিতীয়োক্ত মাস'আলাটি ভিন্ন। কেননা তখনও ইদ্দত বর্তমান রয়েছে, আর সেটাই হলো অভিযোগের কারণ আর অভিযোগের অনুকূল প্রমাণের উপরই সিদ্ধান্ত আবর্তিত হয়। এ কারণেই স্ত্রীত্ব ও আত্মীয়তার উপর সিদ্ধান্ত আবর্তিত হয়। আর প্রথমোক্ত মাস'আলায় ইদ্দত নেই। (তাই অভিযোগের অবকাশ নেই।)

উভয় মাস'আলায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, অভিযোগ ও সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা ঋণ স্বীকার এবং অছিয়ত প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করার জন্য কোন কোন সময় স্ত্রী স্বেচ্ছায় তালাকের সম্মতি প্রকাশ করতে পারে, যাতে তার প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তালাক ও ইদ্দতপূর্তি স্বীকার করার ব্যাপারে একমত হতে পারে, যাতে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রাপ্য মীরাছের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান পূর্বক অনুগ্রহ করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই অভিযোগ ও সন্দেহ হচ্ছে মীরাছের চেয়ে অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে। তাই সেটি আমরা রদ করেছি। পক্ষান্তরে মীরাছের সম পরিমাণের ক্ষেত্রে এ সন্দেহ নেই। তাই সেটি আমরা বৈধ বিবেচনা করেছি।

যাকাত, ভগ্নি-বিবাহ এবং সাক্ষীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মতৈক্যের কৌশল অবলম্বন করা হয় না। সুতরাং এ সকল বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কেউ যদি অবরুদ্ধ অবস্থায় কিংবা রণাংগনে সৈন্য দায়িত্বে থাকে এবং সে অবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে সে স্বামীর পক্ষ থেকে মীরাছ পাবে না। পক্ষান্তরে যদি

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় কিংবা কিছাস বা রজম হিসাবে কতল করার উদ্দেশ্যে হাজির করা হয়, (আর এ অবস্থায় তিন তালাক দেয়) তাহলে স্ত্রী মীরাছ পাবে, যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় বা নিহত হয়।

(অধ্যায়ের শুরুতে) আমরা এর মূল কারণ বর্ণনা করেছি যে, امرأة الفرار বা (মীরাছ) ফাঁকি দাতার স্ত্রী সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী অনুযায়ী মীরাছ পাবে। আর فرار বা 'ফাঁকিদান' সাব্যস্ত হবে স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর মীরাছের অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। আর এটা সম্পৃক্ত হবে এমন কোন রোগে আক্রান্ত হওয়া দ্বারা, যাতে মৃত্যুর আশংকা প্রবল হয়। যেমন এরকম শয্যাশায়ী হয়ে গেলো যে, সুস্থ লোক যেমন অভ্যস্ত সেভাবে নিজের প্রয়োজন নিজে সে সারতে পারে না। অবশ্য প্রবল মৃত্যু আশংকার ক্ষেত্রে রোগসমতুল্য অন্যান্য বিষয় দ্বারাও 'ফাঁকিদান' সাব্যস্ত হয়।

পক্ষান্তরে যে অবস্থায় নিপাপত্তার সম্ভাবনা প্রবল, সে অবস্থা দ্বারা 'ফাঁকিদান' সাব্যস্ত হবে না। এ মূলনীতির আলোকে বলা যায়, (দুর্গে) অবরুদ্ধ এবং রণাংগনে সৈন্যদের সারিতে অবস্থানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সম্ভাবনাই প্রবল। কেননা দূর্গ হচ্ছে শত্রুর হামলা প্রতিহত করার জন্য। 'সৈন্যবল' সম্পর্কেও একই কথা। সুতরাং এ দুটি অবস্থা দ্বারা 'ফাঁকিদান' সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কিংবা যাকে হত্যা করার জন্য হাজির করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে যেহেতু মৃত্যুর আশংকা প্রবল, সেহেতু এ অবস্থায় (তালাক দেওয়া দ্বারা মীরাছের ব্যাপারে) ফাঁকিদান সাব্যস্ত হবে। আলোচ্য মূলনীতির ভিত্তিতে এ জাতীয় আরো কিছু অনুসিদ্ধান্ত বের হয়।

যদি ঐ অস্থায় মারা যায় কিংবা নিহত হয়, কথাটা প্রমাণ করে যে, ঐ কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে মৃত্যু হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। যেমন রোগের কারণে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি যখন নিহত হয়।

স্বামী যদি সুস্থ্য অবস্থায় স্ত্রীকে বলে, যখন মাস শুরু হবে কিংবা যখন তুমি এই গৃহে প্রবেশ করবে, কিংবা যখন অমুক যোহর নামায পড়বে কিংবা অমুক যখন এই গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমার উপর তালাক, অতঃপর স্বামীর রোগাক্রান্ত হওয়ার পর এ সকল শর্ত সম্পন্ন হল তাহলে স্ত্রী মীরাছ পাবে না।

পক্ষান্তরে এ সকল শর্তারোপ যদি রোগশয্যার অবস্থায় হয় তাহলে স্ত্রী মীরাছ পাবে। তবে 'তুমি যদি এই গৃহে প্রবেশ করো' এই শর্তের বিষয়টি ব্যতিক্রম।

আলোচ্য মাসআলার ছূরতেহাল কয়েক প্রকার। যেমন তালাককে সময়ের আগমনের সাথে কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির কার্যের সাথে কিংবা নিজের কোন কার্যের সাথে কিংবা স্ত্রীর কোন কার্যের সাথে সম্পৃক্ত করা। প্রতিটি আবার দুই অবস্থা। প্রথমত: শর্তারোপ হবে সুস্থাবস্থায় এবং শর্ত সম্পন্ন হবে অসুস্থাবস্থায়। দ্বিতীয়ত: উভয়টি হবে অসুস্থাবস্থায়। প্রথম দুই ছূরতে অর্থাৎ সময়ের আগমনের সাথে শর্তারোপ করা, যেমন যখন মাস শুরু হবে তখন তোমার উপর তালাক কিংবা কোন ব্যক্তির কার্যের সাথে শর্তারোপ করা। যেমন অমুক যখন

গৃহে প্রবেশ করবে। কিংবা যোহর সালাত আদায় করবে (তখন তুমি তালাক)। উভয় ছুরতে শর্তারোপ ও শর্তের অস্তিত্ব দুটোই যদি অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হয় তাহলে স্ত্রী মীরাছ পাবে। কেননা স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক ও অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার অবস্থায় শর্তারোপের মাধ্যমে ফাঁকি দানের ইচ্ছা সাব্যস্ত হয়েছে। আর শর্তারোপ যদি সুস্থাবস্থায় হয় এবং শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হয় তাহলে স্ত্রী মীরাছ পাবে না। ইমাম যুফার (র) বলেন, মীরাছ পাবে। কেননা শর্তযুক্ত তালাক শর্তটি সম্পন্ন হওয়ার সময় ঠিক সেভাবেই পতিত হয়, যেভাবে নিঃশর্ত তালাক পতিত হয়। সুতরাং এটি অসুস্থাবস্থায় তালাক দেওয়া বলে গণ্য হবে।

আমাদের দলীল এই যে, পূর্বের শর্তারোপকৃত তালাক-বাক্যটি শর্তের অস্তিস্ত লাভ কালে তালাক দেওয়া বলে সাব্যস্ত হয় কার্যকরী ভাবে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে নয়। আর ইচ্ছা ছাড়া জুলুম সাব্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং তার সে কর্মকে রদ করা যায় না।

আর তৃতীয় ছুরতটি অর্থাৎ স্বামী যখন নিজের কোন কার্যের সাথে সম্পৃক্ত করে তখন চাই শর্তারোপ সুস্থাবস্তায় এবং শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থাবস্থায় হোক কিংবা উভয়টি অসুস্থাবস্থায় হোক এবং কার্যটি অপরিহার্য কর্ম হোক কিংবা পরিহার সম্ভব কর্ম হোক, সর্বাবস্থায় সে ফাঁকি দানকারী বলে গণ্য হবে। কেননা অসুস্থাবস্থায় শর্তারোপ দ্বারা কিংবা শর্তটিকে সম্পন্ন করা দ্বারা স্ত্রীর হক নষ্ট করার ইচ্ছা সাব্যস্ত হয়েছে। যদি বলা হয় যে,শর্তটি এমন যে, তা না করে উপায় ছিল না, তাহলে বলবো, এমন শর্ত আরোপ না করার তো হাযারো উপায় ছিলো। সুতরাং স্ত্রীলোকটির ক্ষতি রোধ করার জন্য তার কর্মকে রদ করা হবে।

আর চতুর্থ ছুরতটি অর্থাৎ যখন তালাককে স্ত্রীর কোন কার্যের সাথে সম্পৃক্ত করল, তখন যদি শর্তারোপ ও শর্ত দুটোই অসুস্থাবস্থায় হয় এবং কার্যটিও স্ত্রীর পক্ষে পরিহার করা সম্ভব হয়, যেমন যায়দের সাথে কথা বলা ইত্যাদি; তাহলে সে মীরাছ পাবে না। কেননা বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে সে সম্মত আছে। পক্ষান্তরে কার্যটি যদি পানাহার, ফরয নামায এবং পিতা মাতার সাথে কথা বলা জাতীয় অপরিহার্য হয় তাহলে সে মীরাছ পাবে। কেননা উক্ত কর্ম সমূহ সম্পাদনে সে মজবুর, এইজন্য যে, এগুলি না করলে দুনিয়াতে কিংবা আখেরাতে 'হালাক' হওয়ার আশংকা রয়েছে।

আর মজুরীর ব্যাপারে সম্মতি সাব্যস্ত হয় না। আর শর্তারোপ যদি সুস্থাবস্থায় এবং শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থাবস্থায় হয়, আর কার্যটি যদি এমন হয় যা পরিহার করা সম্ভব; তাহলে তো তার মীরাছ না পাওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। পক্ষান্তরে কার্যটি যদি অপরিহার্য হয় তাহলেও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর সিদ্ধান্ত হলো মীরাছ না পাওয়া। ইমাম যুফার (র)-এর একই মত। কেননা স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত হওয়ার পর স্বামীর পক্ষ থেকে কোন আচরণ ও কর্ম পাওয়া যায়নি। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে স্ত্রী মীরাছ পাবে। কেননা স্বামী কার্যটি করার জন্য তাকে বাধ্যতায় ফেলেছে। সুতরাং কার্যটি স্বামীর প্রতিই সম্পৃক্ত হবে। স্ত্রী যেন তার জন্য যন্ত্রবৎ ছিলো। যেমন বল প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করানোর হুকুম।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন, মৃত্যুরোগ শয্যায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় পরে সুস্থতা লাভ করে, অতঃপর মারা যায় তাহলে সে মীরাছ পাবে না।

ইমাম যুফার (র) বলেন, মীরাছ পাবে। কেননা অসুস্থাবস্থায় তালাক দেওয়ার মাধ্যমে সে ফাঁকি দানের ইচ্ছা করেছে, এবং ইদ্দতের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু আমরা বলি, অসুস্থতার পর যদি সুস্থতা লাভ হয়, তাহলে তা হল সুস্থতারই সামীল। কেননা এই সুস্থতা দ্বারা মৃত্যুরোগ শয্যা রহিত হয়ে যায়। ফলে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর কোন হক সম্পর্কিত হয়নি। সুতরাং (এই তালাকের দ্বারা) স্বামী ফাঁকি দানকারী হবে না।

মৃত্যুরোগ শয্যায় স্বামী তালাক প্রদানের পর আল্লাহ না করুন যদি স্ত্রীলোকটি মোরতাদ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে অতঃপর স্বামী মৃত্যুরোগ শয্যা থেকেই মৃত্যু বরণ করে আর এসব কিছু ইদ্দতের মধ্যেই ঘটে থাকে, তাহলে সে মীরাছ পাবে না। পক্ষান্তরে মোরতাদ না হয়ে যদি সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ প্রদান করে তাহলে মীরাছ পাবে।

উভয় অবস্থার পার্থক্যের কারণ এই যে, ধর্মত্যাগের মাধ্যমে ওয়ারিশ হওয়ার যোগতা নষ্ট করে দিয়েছে। কেননা ধর্মত্যাগী মোরতাদ কারো ওয়ারিশ হতে পারে না। আর যোগ্যতা ছাড়া মীরাছের অধিকার থাকে না। পক্ষান্তরে যৌনাচারের সুযোগ দানের দ্বারা (ওয়ারিছ হওয়ার) যোগ্যতা বিনষ্ট করেনি। কেননা (এ আচরণ দ্বারা উভয়ের মাঝে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়)।

এই হুরমত উত্তরাধিকারের পথে অন্তরায় নয়। (বরং তা বিবাহের পরিপন্থী) আর এ কর্মটির সময় শুধু উত্তরাধিকারই অবশিষ্ট রয়েছে, সুতরাং তা বহাল থাকবে। আর বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সৎপুত্রকে সুযোগ দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ আচরণ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, স্ত্রীলোকটি উত্তরাধিকারের কারণ ও সূত্রটি বিনষ্ট করতে সম্মত রয়েছে। পক্ষান্তরে তিন তালাক প্রদানের পর এ কর্মটি দ্বারা বিবাহের হুরমত (হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হয় না। (বরং তালাক দ্বারাই তা সাব্যস্ত হয়)। কেননা তালাক উক্ত কর্ম থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং উভয় অবস্থা ভিন্ন হয়ে গেলো।

কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করে আর অসুস্থতার অবস্থায় লি'আন (অভিশম্পাত বিনিময়) করে, তাহলে স্ত্রী মীরাছের অধিকারী হবে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মীরাছ পাবে না। পক্ষান্তরে অভিযোগ যদি অসুস্থতার অবস্থায় আরোপ করে তাহলে তাদের সকলেরই মতে মীরাছ পাবে।

এটা মূলতঃ অপরিহার্য কোন কার্য দ্বারা শর্তায়িত করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা স্ত্রী এখানে যিনার অপবাদ রহিত করার জন্য বিবাদে যেতে বাধ্য। অপরিহার্য শর্তের প্রসংগে আমরা কারণটি বর্ণনা করেছি।

আর যদি সুস্থ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে ঈলা[১] করে থাকে। অতঃপর এই ঈলা এর কারণে অসুস্থতার অবস্থায় বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়, তাহলে মীরাছ পাবে না। আর 'ইলা' ও বিচ্ছেদ উভয়টি যদি অসুস্থতার অবস্থায় হয় তাহলে মীরাছ পাবে।

কেননা 'ঈলা' মূলতঃ সহবাসমুক্ত চারমাস অতিক্রম দ্বারা তালাককে সত্যয়িত করার সমার্থক। সুতরাং এটা নির্ধারিত সময়ের আগমনের সাথে সত্যয়িত করার পর্যায়ভুক্ত। আর এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে তালাকের পর স্ত্রীকে রিজায়াতের অধিকার থাকে সে ক্ষেত্রে সকল ছুরতেই স্ত্রী মীরাছের অধিকারী হবে।

কেননা আমরা বলে এসেছি যে, তালাকে রাজয়ী বিবাহকে বিলুপ্ত করে না। সে কারণেই সহবাসের বৈধতা থাকে। সুতরাং উত্তরাধিকারের কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

যত স্থানে আমরা উল্লেখ করেছি যে, স্ত্রী মীরাছ পাবে, সর্বত্রই এর অর্থ এই যে, স্বামী ইদ্দতের মধ্যে মারা গেলে তবেই সে মীরাছ পাবে। অধ্যায়ের শুরুতে আমরা তা বলে এসেছি।

১। অর্থাৎ আল্লাহর নামে কসম করে বলা যে, চার মাস আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো না।

باب الرجعة

অধ্যায় ঃ রাজা'আত

[illegible]

অধ্যায় ঃ রাজা'আত

পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাকে রাজয়ী প্রদান করে তাহলে ইদ্দতের ভিতরে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে। তাতে স্ত্রী সম্মত থাকুক কিংবা না থাকুক।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ -তাদেরকে যথাবিধি রেখে দিবে। এখানে স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতির মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইদ্দতে বিদ্যমান থাকা জরুরী। কেননা ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো স্বামী-স্বত্ব অব্যাহত রাখা। দেখুন না, কোরআনে এটাকে امساك। বা ধরে রাখা বলা হয়েছে। সুতরাং ধরে রাখা বা অব্যাহত রাখা ইদ্দতের সময়ের ভিতরেই শুধু সম্ভব। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমানই থাকে না। **রাজা'আতের পদ্ধতি এই যে, সে বলল, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম, কিংবা আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম।** এ হলো রাজা'আতর ব্যাপারে স্পষ্ট পদ্ধতি। এর বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, কিংবা সে স্ত্রীর সাথে সংগম করল কিংবা তাকে চুম্বন করল কিংবা তাকে উত্তেজনাসহ স্পর্শ করল কিংবা তার যৌনাংগের দিকে উত্তেজনাসহ দৃষ্টিপাত করল।

এটা আমাদের মত। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বাক ক্ষমতা থাকা অবস্থায় উচ্চারণ যোগেই শুধু রাজা'আত সহী হবে। কেননা এটা নতুন বিবাহের সম পর্যায়ের। এ জন্যই ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া তার সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ।

আমাদের মতে এটা হচ্ছে বিবাহকে অব্যাহত রাখা। যেমন আমরা আগে বলে এসেছি। ইনশা আল্লাহ্ পরবর্তীতে তা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

আর (উচ্চারণের মত) কর্মও কখনো কখনো অব্যাহত রাখার প্রমাণ হয়ে থাকে। (ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) খেয়ার বা ইচ্ছাধিকার রহিত করণের বিষয়টি যেমন[১] আর রাজা'আত এমন কোন কর্ম দ্বারাই সাব্যস্ত হবে, যা বিবাহের সাথে বিশিষ্ট। আর উপরোক্ত কর্মগুলো বিশেষতঃ স্বাধীন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে বিবাহের সাথে বিশিষ্ট।[২]

উত্তেজনা ব্যতীত স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের হুকুম এর বিপরী। কেননা এটা বিবাহ ছাড়াও বৈধ হতে পারে। ধাত্রী, চিকিৎসক ও এ জাতীয় অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেমন।

আর গুপ্তাংগ ছাড়া অন্যত্র দৃষ্টিদান একত্র বসবাসকারীদের মাঝে হয়েই থাকে। আর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তার সাথে বসবাস করে থাকে। সুতরাং যদি সে কর্ম দ্বারা রাজা'আত সাব্যস্ত হয়, তবে অবশ্যই সে তাকে তালাক দিবে। এতে স্ত্রীলোকটির ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যাবে।

১। কেউ যদি তিন দিনের ইচ্ছাধিকারসহ কোন দাসী ক্রয় করে অতঃপর তার সাথে সহবাস করে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায়।

২। বিবাহ ছাড়া স্বাধীন স্ত্রীলোককে সম্ভোগের অন্য কোন পথ নেই। পক্ষান্তরে দাসীকে বিবাহ সূত্রে যেমন তেমনি মালিকানা সূত্রে সম্ভোগ করা যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, রাজা'আতের উপর দুজন সাক্ষী রাখা মুসতাহাব। তবে সাক্ষী না রাখলেও রাজা'আত শুদ্ধ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দুটি মতের একটিতে শুদ্ধ হবে না। এটা ইমাম মালেক (র) এরও মত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে নাও।)

আর আদেশবাচক ক্রিয়া ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করে। আমাদের দলীল এই যে, কুরআন হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্য সাক্ষীর শর্ত থেকে মুক্ত রয়েছে। তাছাড়া এটা হচ্ছে বিবাহকে অব্যাহত রাখা আর বিবাহের অব্যাহততার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য শর্ত নয়। যেমন ঈলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে। তবে অধিক সতর্কতার জন্য সাক্ষী রাখাই উত্তম, যাতে এ নিয়ে সমালোচনার সুযোগ না থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর পেশকৃত আয়াতটি উত্তমতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দেখুন, সাক্ষী রাখার বিষয়টিকে বিচ্ছেদের সংগেও যুক্ত করা হয়েছে। অথচ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা সকলের মতেই মুস্তাহাব মাত্র। তবে স্ত্রীকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া উত্তম, যাতে (স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়নি ভেবে অন্যত্র বিবাহ করা এবং দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস করার মাধ্যমে) সে গোনাহে লিপ্ত না হয়ে যায়।

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী যদি বলে, আমি তাকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছি আর স্ত্রীও তার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে এ রাজাআত গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামীর কথা অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা স্বামী এমন একটি বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছে, যা তার ইচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থায় সম্পন্ন করার অধিকার সে রাখে না। সুতরাং এ বিষয়ে তার উপর অভিযোগ আসতে পারে। তবে স্ত্রীর সত্যায়ন দ্বারা অভিযোগ দূর হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে হবে না। এ হলো সেই বিখ্যাত ছয় মাসআলার একটি, যা'তে শপথ গ্রহণের প্রশ্নে মতভিন্নতা রয়েছে। এর বিবরণ নিকাহ্ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে রাজাআত করলাম; এর উত্তরে স্ত্রী তাকে বললো, আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে রাজা'আত শুদ্ধ হবে না। ছাহেবায়ন বলেন, শুদ্ধ হবে। কেননা যেহেতু (ইদ্দত শেষ হওয়া সম্পর্কে) স্ত্রীর সংবাদ প্রদান পর্যন্ত ইদ্দত বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক, সেহেতু রাজা'আত ইদ্দতের সাথে মিলিত হয়েছে। কেননা তা সংবাদ প্রদানের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

এ কারণেই স্বামী যদি উক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে বলে, তোমাকে আমি তালাক দিলাম, আর স্ত্রী উত্তরে বলে, আমার ইদ্দত তো শেষ হয়ে গেছে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, রাজা'আত ইদ্দতের সমাপ্তির সাথে মিলিত হয়েছে। কেননা ইদ্দতের সমাপ্তি সম্পর্কে অবহিত করার ক্ষেত্রে স্ত্রীই আমানতদার (অর্থাৎ সে ছাড়া তা জানার অন্য কোন উপায় নেই)। সুতরাং সে যখন খবর দিল তখন বোঝা গেলো যে, খবর

প্রদানের অগ্রে ইদ্দতের সমাপ্তি হয়েছে। আর সমাপ্তির নিকটতম সময় হলো স্বামীর উপরোক্ত বক্তব্য উচ্চারণের সময়।[১] আর তালাকের মাস'আলাটির মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। যদি মতৈক্যপূর্ণ হয়েও থাকে তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, তালাক তো ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে রাজা'আত স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। (সুতরাং উভয় অবস্থায় মতভেদ হয়ে গেলো)।

দাসীর স্বামী যদি তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বলে, আমি তাকে ইদ্দতের মধ্যেই রাজাআত করেছি আর দাসীর মনিব তার কথাকে সত্য বলে স্বীকার করে, কিন্তু দাসী মিথ্যা বলে প্রত্যাখান করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ছাহেবায়ন বলেন, মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা ইদ্দতের পর দাসীর সম্ভোগ অংগের মালিকানা হলো মনিবের। সুতরাং মনিব তার নিজস্ব হক স্বামীর অনুকূলে স্বীকার করেছে। সুতরাং দাসীর বিপক্ষে বিবাহের স্বীকারোক্তি প্রদানের সমতুল্য হলো।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, রাজা'আতের হুকুমের ভিত্তি হলো ইদ্দতের উপর। আর ইদ্দতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইদ্দতের উপর নির্ভরশীল বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে।

আর বিষয়টি যদি বিপরীত হয় (অর্থাৎ মনিব প্রত্যাখান করে আর দাসী সমর্থন করে) তাহলে ছাহেবায়নের মতে মনিবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। বিশুদ্ধমতে ইমাম ছাহেবেরও একই সিদ্ধান্ত। কেননা বর্তমানে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত। আর এতদ্বারা মনিবের সম্ভোগ অধিকার সাব্যস্ত রয়েছে। আর মনিবের অধিকার রদ করার ব্যাপারে দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি ভিন্ন। কেননা রাজা'আতের সময় দাসীর ইদ্দত বিদ্যমান থাকার বিষয়টি মনিব স্বীকার করে নিচ্ছে। আর ইদ্দত বিদ্যমান অবস্থায় মনিবের সম্ভোগ অধিকার প্রকাশ পায় না।

দাসী যদি বলে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, অন্যদিকে স্বামী ও মনিব বলে; শেষ হয়নি, তাহলে দাসীর কথাই গ্রহণ যোগ্য।

কেননা এ বিষয়ে সে-ই আমানতদার। কারণ এ বিষয়ে একমাত্র সেই অবগত।

তৃতীয় হায়যের রক্তস্রাব যদি দশদিনের মাথায় বন্ধ হয় তাহলে গোসল না করলেও ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দশদিনের কমে বন্ধ হলে গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত কিংবা একটি নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রহিত হবে না।

কেননা হায়যের সময় সীমা দশদিনের বেশী হতে পারে না। সুতরাং দশদিনের মাথায় রক্ত স্রাব বন্ধ হওয়া মাত্র সে হায়যমুক্ত হয়ে যাবে। ফলে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং রাজা'আতের অধিকার রহিত হবে। পক্ষান্তরে দশদিনের কম সময়ে পুনঃ রক্ত স্রাবের সম্ভাবনা

১। অর্থাৎ যেহেতু ইদ্দত শেষ হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় প্রমাণসহ জানা নেই, সুতরাং নিকটতম সময়টিকেই সমাপ্তিকাল ধরে নেয়া হবে।

থাকে। সুতরাং যথারীতি গোসল করার মাধ্যমে কিংবা হায়যমুক্ত নারীদের উপর যে সকল আহকাম কার্যকর হয়, সালাতের সময় অতিক্রমের মাধ্যমে সে ধরনের একটি হুকুম কার্যকর হওয়া দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধের বিষয়টি দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

পক্ষান্তরে স্ত্রী কিতাবী নারী হলে হুকুম ভিন্ন। কেননা (সালাত বা গোসলের প্রশ্ন না থাকা) তার ক্ষেত্রে রক্তস্রাব বন্ধের অতিরিক্ত কোন আলামত আশা করা যায় না। সুতরাং তার জন্য শুধু রক্তস্রাব বন্ধই যথেষ্ট। গোসলের বদলে তায়াম্মুম দ্বারা সালাত আদায় করলেও আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর মতে রাজা'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, শুধু তায়াম্মুম করলেই রহিত হয়ে যাবে। এটা হলো সাধারণ কিয়াসের দাবী।

কেননা পানির অবিদ্যমান অবস্থায় তায়াম্মুম হচ্ছে (গোসলের মতই) পূর্ণ তাহারাত। তাই গোসল দ্বারা যে সকল হুকুম সাব্যস্ত হয়, তায়াম্মুম দ্বারাও সে সকল হুকুম সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তায়াম্মুম হবে গোসলের সমপর্যায়ের।

শায়খানের দলীল এই যে, মাটি হচ্ছে কদর্যকারী, পবিত্রতাকারী নয়। ওয়াজিব ও ফরয যাতে ক্রমবর্ধিত না হয়ে যায় সে প্রয়োজনে শুধু মাটি দ্বারা তাযাম্মুম করাকে তাহারাত বলে গণ্য করা হয়েছে।[১] আর এ প্রয়োজন সালাত আদায়ের সময় শুধু সাব্যস্ত হয়। এর পূর্ববর্তী সময়ে সাব্যস্ত হয় না। আর যে সকল হুকুম তায়াম্মুম দ্বারা সাব্যস্ত হয় সেগুলোও অনিবার্য প্রয়োজনের দাবী রূপেই স্বীকৃত।[২]

কেউ কেউ বলেন, শায়খায়নের মতে সালাত শুরু করা মাত্র রাজা'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আবার কেউ কডে বলেন, সালাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর রহিত হবে। যাতে সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার হুকুমটি স্থিরিকৃত হয়ে যায়।

যদি গোসল করে এবং ভুলে শরীরের কোন অংশে পানি না পৌছে আর তা পূর্ণ এক অংগ কিংবা তার বেশী হয়, তবে রাজা'আতের অধিকার রহিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি এক অংগের কম হয় তবে রাজা'আতের অধিকার রহিত হবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ হল সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পূর্ণ অংগের শুষ্কতার ক্ষেত্রে সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো রাজা'আতের অধিকার না থাকা। কেননা সে অধিকাংশ শরীর ধুয়েছে। পক্ষান্তরে এক অংগের কমের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবী হচ্ছে রাজা'আতের অধিকার বহাল থাকা। কেননা জানাবাত ও হায়যের হুকুম খন্ডিত হয় না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, পূর্ণ অংগ ও খন্ড অংগ-এ উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণও এটাই-এক অংগের কম হলে অল্প পরিমাণ হওয়ার কারণে অতি দ্রুত শুকিয়ে যায়। সুতরাং ঐ অংশে পানি না পৌছার কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না। তাই আমরা সতর্কতার ভিত্তিতে বলেছি যে, রাজা'আতের অধিকার রহিত হবে। অন্য স্বামীকে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

১। কেননা পানি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে বহু ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যেতে পারে, যা পরে আদায় করতে কষ্ট হবে। আর শরীয়ত বান্দার কষ্ট লাঘব করতে চায়, বাড়াতে চায় না।

২। মুহম্মদ (র) বলেছিলেন, গোসল দ্বারা যেমন মসজিদে প্রবেশের, কোরআন তেলাওয়াতের এবং সিজদায়ে তেলাওয়াতের বৈধতা রয়েছে, তেমনি তায়াম্মুম দ্বারাও সেগুলো আদায় করা বৈধ। এর উত্তরে শায়খানের বক্তব্য হলো, এগুলোও মূলতঃ নামায জায়েয হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনের দাবীতে বৈধতা লাভ করেছে। কেননা মসজিদ তো নামাযের স্থান আর কিরাত ছাড়া নামায হয় না আবার কিরাতে সিজদার আয়াত আসা স্বাভাবিক।

পূর্ণ অংগের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা এত দ্রুত শুকিয়ে যায় না। এবং সাধারণতঃ মানুষ তা ভুলে যায় না। সুতরাং উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেলো।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়া তরক করা পূর্ণ অংগ ছেড়ে দেয়ার মত।

ইমাম আবূ ইউসুফের আরেকটি বর্ণনা মতে, আর তা ইমাম মুহম্মদ (র) এরও মত- এটি এক অঙ্গ থেকে কমের পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ দুটির ফরয হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য অংগ ধোয়া ফরয হওয়ার ব্যাপারে মতভিন্নতা নেই।

কেউ যদি স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় তালাক প্রদান করে, কিংবা স্বামীর ঔরসের সন্তান প্রসব করার পর তালাক প্রদান করে আর বলে, আমি তার সাথে সহবাসই করিনি, তাহলে তার রাজা'আতের অধিকার বহাল থাকবে।

কেননা যখন এতটা সময়ের মধ্যে গর্ভ প্রকাশ পায়, যাতে স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভ সঞ্চার কল্পনা করা যায়, তখন এটাকে তার সঞ্চারিত গর্ভ বলেই ধরা হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الولد للفراش। -শয্যা যার, সন্তান তার।

আর এটা তার পক্ষ হতে সহবাসের অস্তিত্বের প্রমাণ। তদ্রূপ যখন সন্তানের পিতৃ পরিচয় তার সংগে যুক্ত হবে তখন তাকে সহবাসকারী গণ্য করা হবে। আর যখন সহবাস প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন স্বামী স্বত্ব ও অধিকার দৃঢ় হয়ে যাবে। আর সুদৃঢ় অধিকারের অবস্থায় তালাক প্রদান করলে তা রাজা'আতের অধিকার সহ সাব্যস্ত হয়।

আর সহবাস না করার ধারণা শরীয়তের পক্ষ থেকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখানের কারণে রদ হয়ে যাবে। এ তো জানা কথা। উপরোক্ত সহবাস দ্বারা إحصان (বিবাহিত হওয়ার শাস্তি প্রযোজ্য হওয়া) সাব্যস্ত হয়।[1] সুতরাং রাজা'আতের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া তো আরো স্বাভাবিক।

সন্তান প্রসবের মাস'আলাটির ব্যাখ্যা এই যে, তালাক দেওয়ার পূর্বে প্রসব হয়। কেননা পরে প্রসব হলে তো প্রসব দ্বারাই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং রাজা'আতের বিষয় কল্পনা করা যাবে না।

আর যদি দরজা বন্ধ করে কিংবা পর্দা টানিয়ে স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় আর বলে যে, আমি সহবাস করিনি; অতঃপর তালাক প্রদান করে, তাহলে রাজা'আতের অধিকার থাকবে না।

কেননা স্বামী-স্বত্ব সুদৃঢ় হয় সহবাসের মাধ্যমে। আর এখানে স্বামী তা অস্বীকার করছে। সুতরাং নিজের হক ও অধিকারের ক্ষেত্রে তো তার সত্যতা স্বীকার করা হবে। আর রাজা'আত তার নিজের হক। এদিকে শরীয়তের দিক থেকেও তার বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। কিন্তু মাহরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নির্ধারিত মাহর সুদৃঢ় হওয়া নির্ভর করে বিনিময়কৃত অংগ সমর্পণের মাধ্যমে, স্বামীর পক্ষ থেকে হস্তগত করার মাধ্যমে নয়। প্রথমোক্ত বিষয়টি ভিন্ন।

১। বিবাহিত ব্যক্তি যিনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বলা যায় যে, একটা রক্ষা কবচ লাভ করেছে, কেননা সে কামবৃত্তি চরিতার্থ করার শরীয়ত সম্মত উপায় লাভ করেছে। তবে সহবাস করার পরই একথা বলা যায়। শরীয়তের পরিভাষায় একে إحصان বলে।

তবুও যদি সে রাজাআত করে নেয় অর্থাৎ একান্তে মিলিত হওয়ার পর এবং সহবাস করিনি বলার পর অতঃপর দু'বছরের একদিন কম সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে পূর্বের সেই রাজা'আত সহীহ হয়।

কেননা স্ত্রী যেহেতু ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেনি আর সন্তান এই পরিমাণ সময় গর্ভে অবস্থান করতে পারে, সেহেতু সন্তানটির পিতৃ পরিচয় সেই স্বামীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং তাকে তালাকের পূর্বে সহবাসকারী ধরা হবে। তালাকের পরে সহবাস হলে তো পূর্বে সহবাস না হওয়ার কারণে (ইদ্দতের অপেক্ষা ছাড়া) শুধু তালাকেই বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ সহবাস হারাম হয়ে যাবে। আর মুসলমান হারাম কাজ করবে না। (এটা-ই স্বাভাবিক)

স্বামী যদি তাকে বলে, সন্তান প্রসব করলে তোমার উপর তালাক। আর সে সন্তান প্রসব করলো। অতঃপর দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করলো, তাহলে রাজা'আত সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় গর্ভ সঞ্চারের মাধ্যমে আর তা হবে ছয় মাসের পর, যদিও তা দু'বছরের বেশী হয়, আর স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার না করে।

কেননা প্রথম প্রসব দ্বারা তো তালাক সাব্যস্ত হয়েছে এবং ইদ্দত অবশ্যক হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় সন্তানটি স্বামীর পক্ষ থেকে ইদ্দতকালীন গর্ভসঞ্চার দ্বারা প্রমাণিত হবে। কেননা স্ত্রী এখনো ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেনি। সুতরাং স্বামী রাজা'আতকারী সাব্যস্ত হবে।

আর যদি বলে, যখনই তুমি কোন সন্তান প্রসব করবে তখনই তোমার উপর তালাক। আর সে স্বতন্ত্র গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করলো, তাহলে প্রথম সন্তান দ্বারা এক তালাক হবে এবং দ্বিতীয় সন্তান দ্বারা রাজা'আত সাব্যস্ত হবে, তদ্রূপ তৃতীয় সন্তান দ্বারাও।

কেননা প্রথম সন্তান প্রসব হওয়া দ্বারা তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী ইদ্দত পালনকারী হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রসব দ্বারা রাজা'আত সাব্যস্ত হবে। কারণ আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ইদ্দতের মধ্যে নতুন সহবাস দ্বারা গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে ধরা হবে। দ্বিতীয় সন্তান দ্বারা দ্বিতীয় তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা كلما (যখনই) শব্দ দ্বারা সত্যায়ন হয়েছে, তার পর ইদ্দত সাব্যস্ত হবে। আবার তৃতীয় সন্তান দ্বারা একই কারণে সে বিবাহ পুনঃবহালকারী হবে। এবং তৃতীয় তালাকও সাব্যস্ত হবে তৃতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা। তবে এবার হায়য দ্বারা ইদ্দত আবশ্যক হবে। কেননা এই গর্ভবতী স্ত্রীলোকটি তালাক সাব্যস্ত হওয়ার সময় ঋতুবতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী লোক সাজগোজ ও প্রসাধন করতে পারে। কেননা উভয়ের মাঝে বিবাহ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে স্বামীর জন্য সে হালাল। তদুপরি রাজা'আত করে নেওয়াই হলো মুস্তাহাব। আর সাজগোজ সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী। সুতরাং তা শরীয়তসম্মত হবে।

তবে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব তার ঘরে প্রবেশ না করা, যতক্ষণ না তার অনুমতি নেয় অথবা তার পদধ্বনি দ্বারা তাকে অবহিত করে।

অর্থাৎ যদি রাজা'আতের ইচ্ছা তার না থাকে। কেননা হয়ত সে বিবস্ত্র হয়ে থাকতে পারে।

ফলে এমন স্থানে দৃষ্টি পড়তে পারে, যাতে রাজা'আতকারী হয়ে যায়। তখন সে তাকে পুনঃ তালাক প্রদান করবে, এভাবে তার ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যাবে।

রাজা'আতের ব্যাপারে সাক্ষী না রেখে এই স্ত্রীকে নিয়ে সফর করা তার জন্য জায়েয নয়। ইমাম যুফার (র) বলেন, তার জন্য তা জায়েয। কেননা বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই তো আমাদের মতে সে তার সাথে সহবাস করতে পারে।

আমাদের দলীল হলো আয়াত– وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ -তাদের ঘর থেকে বের করো না।

তাছাড়া এই জন্য যে, বিবাহ সম্পর্ক বাতিলকারী (তালাকের) কার্যকারিতা বিলম্বিত করা হয়েছে রাজা'আতের (সুযোগ দানের) প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে; কিন্তু যখন সে রাজা'আত করল না, এমনকি ইদ্দত শেষ হয়ে গেল, তখন প্রকাশ পেয়ে গেল যে, এ ব্যাপারে তার প্রয়োজন নেই। এবং এ-ও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিবাহ বাতিলকারী তালাক অস্তিত্ব লাভের শুরু থেকেই তা কার্যকরী হয়েছে। এ কারণেই পিছনের হায়যগুলোকে ইদ্দতের হিসাবে ধরা হয়। তাই রাজা'আতের ব্যাপারে সাক্ষী না রেখে স্বামী তাকে নিয়ে সফরে বের হতে পারে না। (বরং আগে সাক্ষী রেখে ফিরিয়ে নিতে হয়) যাতে ইদ্দত বাতিল হয়ে যায় এবং স্বামীর অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অবশ্য আমরা আগেই বলে এসেছি যে, সাক্ষী রাখার বিষয়টি হলো মুস্তাহাব ভিত্তিক। (আসল কথা হলো ফিরিয়ে নেয়া)।

রাজয়ী তালাক সহবাস হারাম করে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তালাকে রাজয়ী তা হারাম করে। কেননা কর্তনকারী তালাক সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বিবাহ-সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, সম্পর্ক এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তো স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াই সে তার সাথে রাজা'আত করতে পারে।

কেননা রাজা'আতের অধিকার মূলতঃ স্বামীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করেই সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে অনুশোচনা দেখা দেয়ার সময় বিষয়টি সংশোধন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় আর এ উদ্দেশ্যটি রাজা'তের ব্যাপারে স্বামীর একক ক্ষমতা দাবী করে। আর এটা প্রমাণ করে যে, রাজাআতের অর্থ হলো স্বত্ব অব্যাহত ও বহাল রাখা। নতুন ভাবে স্বত্ব সৃষ্টি করা নয়। কেননা দলীল এর বিপরীতমুখী।

আর কর্তনকারী কার্যকারিতা একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে কিংবা তার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে বিলম্বিত করা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ: তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায়

তিনের কমে বায়ন তালাক হলে স্বামী তাকে ইদ্দতের ভিতরে এবং ইদ্দতের পরে বিবাহ করতে পারবে।

কেননা হালাল হওয়ার ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। কারণ তা বিলুপ্ত হওয়া তৃতীয় তালাকের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এর পূর্বে তার বিলুপ্তি ঘটে না।

ইদ্দতের মধ্যে অন্যকে বিবাহ করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে পিতৃ পরিচয় সন্দেহযুক্ত হওয়া। আর তার জন্য বৈধতা প্রদানে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ নেই। (কেননা এখানে তো প্রক্ষিপ্ত বীর্য অভিন্ন হবে।)

আর যদি স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিন তালাক এবং দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুই তালাক হয় তাহলে যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিশুদ্ধরূপে বিবাহ করবে এবং উক্ত স্বামী তার সাথে সহবাস করবে অতঃপর তাকে তালাক প্রদান করবে কিংবা তাকে রেখে মারা যাবে, ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

এ মাসআলার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

—এরপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে 'নিকাহ' করে।

এখানে তালাক দ্বারা তৃতীয় তালাক উদ্দেশ্য। আর দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকই স্বাধীন স্ত্রীলোকের তিন তালাকের সমতুল্য।

কেননা উছূল শাস্ত্রে এটা স্থির হয়েছে যে, দাসত্ব 'ক্ষেত্রের' হালালত্বকে অর্ধেক করে দেয়। আর হালাল না হওয়ার সীমা হলো দ্বিতীয় স্বামীকে বিবাহ করা আর সেটি নিঃশর্ত রয়েছে। আর নিঃশর্ত বিবাহ সম্পর্ক বিশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়।

আর দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসের শর্তটি আয়াতের ইংগিতার্থ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা এভাবে যে, আয়াতে উল্লেখিত نكاح কে সহবাস অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাতে অর্থের পুনরুক্তির পরিবর্তে নতুন অর্থ সাব্যস্ত হয়। কেননা زوج (স্বামী) শব্দটি দ্বারাই আকদে নিকাহ এমনি বোঝা যায়। সুতরাং 'নিকাহ' শব্দকে 'আকদ' এর অর্থে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

কিংবা বলা যায় যে, মশহুর হাদীছ দ্বারা কোরআনের আয়াতে অতিরিক্ত শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। হাদীছটি হচ্ছে—

لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الاخر

প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না,-যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীর মধুরতার স্বাদ গ্রহণ না করবে।

হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এ শর্তটির ব্যাপারে সাইদ ইবনুল মুসাইয়েব (র) ছাড়া অন্য কারো বিরোধ নেই। কিন্তু (মশহুর হাদীসের পরিপন্থী হওয়ার কারণে) তাঁর মত গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি কাযী তার মত অনুযায়ী ফায়সালা করলে তা কার্যকর হবে না।

শর্ত হচ্ছে লিংগ প্রবেশ করানো, বীর্য স্খলন নয়। কেননা এটা হচ্ছে সহবাসের পূর্ণতাও চরমত্ব। আর পূর্ণতা হল অতিরিক্ত শর্ত।

প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে বয়ঃসন্দিক্ষণের কিশোর পূর্ণবয়স্কের সমতুল্য।

কেননা এখানে বিশুদ্ধ নিকাহ্র মাধ্যমে সহবাস বিদ্যমান আর নাছ দ্বারা এ-ই শর্ত। আর ইমাম মালিক (র) এ বিষয়ে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। আর তার বিপক্ষে আমাদের দলীল হল, পূর্বে যা আমরা উল্লেখ করেছি।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর-এর ব্যাখ্যায় ইমাম মুহম্মদ (র) জামে ছাগীর কিতাবে বলেছেন, যে বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, কিন্তু তার মত বালক সহবাস করতে পারে, এমন বালক যদি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে তাহলে স্ত্রীলোকটির উপর গোসল ওয়াজিব হবে এবং প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে বালকটির 'লিংগোত্থান ও কামেচ্ছা' হয়।

স্ত্রী লোকটার উপর গোসল ওয়াজিব হচ্ছে লিংগদ্বয়ের মিলনের কারণে। কেননা সেটা স্ত্রীলোকটির বীর্যস্খলনের কারণ। আর তার ক্ষেত্রেই গোসল ওয়াজিব করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অবশ্য বালকটির উপর গোসল ওয়াজিব নয়। যদিও অভ্যাস ও শিক্ষার জন্য তাকে গোসল করতে বলা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাসীর সংগে মনিবের সহবাস (প্রথম দাসীর জন্য) তাকে হালাল বানাবে না। কেননা আয়াতে বর্ণিত সীমা হচ্ছে স্বামীর সাথে 'নিকাহ' আর যদি স্ত্রীলোকটিকে হালাল করার শর্তে বিবাহ করে তবে তা মাকরূহ হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لعن الله المحلل والمحلل له

যে হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করা হয়-তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর লা'নত।

আর আকদের সময় হালাল করার শর্তারোপই হচ্ছে হাদীসটির প্রয়োগ ক্ষেত্র।

তবে (শর্তারোপের পরও) যদি সহবাসের পর তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যাবে।

কেননা বিশুদ্ধ বিবাহে সহবাস হয়েছে। কেননা (তালাকের) শর্ত আরোপ দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না।

ইমাম আবু ইউসূফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটা বিবাহকে ফাসিদ করবে। কেননা এটা সাময়িক বিবাহের সমার্থক। আর (যেহেতু বিশুদ্ধ বিবাহ হচ্ছে শর্ত, সেহেতু) ফাসিদ হওয়ার কারণে এই বিবাহটি স্ত্রীলোকটাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে না। আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে বিবাহ তো শুদ্ধ হয়ে যাবে, তবে তা প্রথম স্বামীর জন্যে স্ত্রীলোকটাকে হালাল করবে না। কেননা শরীয়ত যেটাকে বিলম্বিত করেছে সেটাকে সে তাড়াহুড়া করে পেতে চেয়েছে। সুতরাং তার উদ্দেশ্যকে বিরত রেখে তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। যেমন যার থেকে মীরাছ পাবে (ওয়ারিছ কর্তৃক) তাকে হত্যা করার বিষয়টি।[১]

স্বাধীন স্ত্রীকে যদি এক তালাক বা দুই তালাক দেয় আর তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, অতঃপর সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, এরপর সে (তালাকের মাধ্যমে) প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসে তাহলে সে নতুন তিন তালাকের অধিকার সহ ফিরে আসবে। এবং দ্বিতীয় স্বামী পূর্ববর্তী তিন তালাককে যেমন বিলুপ্ত করে, তেমনি তিনের কম তালাককেও বিলুপ্ত করে দেয়। এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর মত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তিনের কম তালাককে বিলুপ্ত করবে না।

১। সে ক্ষেত্রে ওয়ারিছ মীরাছ থেকে মাহরূম হয়।

কেননা নাছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্বামী হচ্ছে হারাম হওয়ার সীমা। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী হবে হুরমতকে বিলুপ্তকারী। আর সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে হুরমতের বিলুপ্তির প্রশ্ন আসে না।

শায়খাইনের দলীল এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لعن الله المحلل والمحلل له। এখানে দ্বিতীয় স্বামীকে মুহাল্লিল বা হালালকারী বলা হয়েছে। সুতরাং সে হালাল সাব্যস্তকারী হবে।

আর স্বামী যদি তাকে তিন তালাক দেয় অতঃপর স্ত্রী বলে যে, আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে এবং আমি বিবাহ করেছি আর দ্বিতীয় স্বামী আমার সাথে সহবাস করে আমাকে তালাক দিয়েছে অতঃপর আমার ইদ্দতও শেষ হয়েছে। আর অতিক্রান্ত সময় এর সম্ভাবনাও রাখে তাহলে স্বামী তার দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে। যদি বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তার প্রবল ধারণা হয়।

কেননা বিবাহ বিষয়টি হয় দুনিয়াবী মুআমালা (কেননা সম্ভোগ অংগের বিনিময়ে মাল ধার্য হয়েছে) কিংবা তা একটি দ্বীনী বিষয়। যেহেতু তার সাথে সম্ভোগ হালাল হওয়ার বিষয় রয়েছে আর উভয় ক্ষেত্রেই এক জনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া স্ত্রী লোকটির দাবী অস্বাভাবিকও নয়। কেননা অতিক্রান্ত সময়টির সে সম্ভাবনা রাখে।

সম্ভাব্যতার সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইদ্দত অধ্যায়ে আমরা তা বিস্তারিত বলব।

অধ্যায় ঃ ঈলা

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হবো না কিংবা বলে, আল্লাহর কসম, চার মাস পর্যন্ত আমি তোমার সাথে মিলিত হবো না, তাহলে সে ঈলাকারী হয়ে গেল।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে-তাদের জন্য হুকুম হলো চারমাস অপেক্ষা করা।

এই চারমাসে যদি সে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার ইয়ামীন ভংগ হয়ে যাবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা ইয়ামীন ভংগ হওয়ার অনিবার্য হুকুম হলো কাফফারা।

তবে ঈলা এর দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। কেননা ইয়ামীন ভংগের মাধ্যমে তা রহিত হয়।

আর যদি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত না হয়, এমন কী চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে তার প্রতি এক তালাক বায়ন পতিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কাযীর বিচ্ছেদের রায় ঘোষণার মাধ্যমে তার প্রতি তালাকে বায়ন পতিত হবে।[১]

কেননা সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত হকের ব্যাপারে স্বামী বাধা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বিচ্ছেদের ব্যাপারে কাযী তার স্থলবর্তী হবে না। যেমন কর্তিত লিংগ ও নপুংসকের ক্ষেত্রের হুকুম।

আমাদের দলীল এই যে, সহবাসের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দ্বারা স্বামী তার উপর অবিচার করেছে। সুতরাং এই সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহের নেয়ামত বিলুপ্তির মাধ্যমে শরীয়ত তাকে (বিচ্ছেদের) শাস্তি দিয়েছে। হযরত ওছমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও জাবির ইবন সাবিত (র) থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। আর অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে তাঁরাই যথেষ্ট।

তাছাড়া জাহেলীযুগে এটা (তৎক্ষণিক) তালাক রূপে গণ্য হতো। শরীয়ত শুধু নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বিলম্বিত করার হুকুম দিয়েছে।

১। অর্থাৎ এ সময় অতিক্রান্ত হওয়া দ্বারা বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে না। বরং সময় পার হওয়ার পর ফিরিয়ে নেয়া কিংবা তালাক দেয়া দুটির কোনটি সে করে, তার অপেক্ষা করা হবে। যদি সে কোন কিছু করতে অস্বীকৃত হয় তাহলে কাযী বিচ্ছেদের রায় দেবেন এবং এটাই হবে তালাক প্রদান।

যদি চার মাসের কসম করে থাকে তাহলে ইয়ামীন শেষ হয়ে যাবে। কেননা, তা ছিল চার মাসের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর যদি চির জীবনের জন্য শপথ করে থাকে তাহলে ইয়ামীন অব্যাহত থাকবে।

কেননা ইয়ামীনটি এখানে নিঃশর্ত; আর ইয়ামীন ভংগের কর্ম পাওয়া যায় নি, যাতে তা দ্বারা ইয়ামীন প্রত্যাহৃত হতে পারে। অবশ্য পুনঃ বিবাহের পূর্বে নতুন তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা বিচ্ছেদের পর সহবাস অধিকার ক্ষুণ্ন করা পাওয়া যায়নি।

আর যদি স্বামী তাকে পুনঃবিবাহ করে তাহলে বিদ্যমান ঈলা ফিরে আসবে। সুতরাং যদি সে (নির্ধারিত সময়ে) তার সাথে সহবাস করে (তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে)। অন্যথায় চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরেকটি তালাক হবে।

কেননা সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে ইয়ামীন অব্যাহত রয়েছে। এবং (পুনঃ) বিবাহের কারণে স্ত্রীর সহবাস অধিকারও স্থাপিত হবে। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে অবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর বিবাহের শুরু থেকে এই ঈলার সূচনা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

যদি তৃতীয় বার তাকে বিবাহ করে তাহলে বিদ্যমান ঈলা পুনঃক্রিয়াশীল হবে। এবং যদি সহবাস না করে তাহলে চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরেকটি তালাক সাব্যস্ত হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যদি অন্য স্বামীর সহিত বিবাহের পর সে তাকে বিবাহ করে তাহলে ঐ ঈলা দ্বারা আর কোন তালাক হবে না।

কেননা, এটা বর্তমান স্বামীস্বত্বের তালাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। এই হচ্ছে (ইয়ামীনের পর) তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রদানের বিরোধপূর্ণ মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। পূর্বে এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

তবে ইয়ামীন বহাল থাকবে

সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে এবং ভংগকারী না থাকার কারণে।

এখন যদি সে সহবাস করে তাহলে তার কাফফারা আদায় করতে হবে, কসম ভংগ হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার কারণে।

যদি চার মাসের কমে কসম করে তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না।

কেননা ইবনে আব্বাস (র) বলেছেন, لا ايلاء فيما دون اربعة اشهر

চারমাসের কমে কোন ঈলা নেই।

তাছাড়া মেয়াদের অধিকাংশ সময় সহবাস থেকে বিরত থাকা কোন বাধাদানকারী ব্যতীত হচ্ছে। আর এ ধরনের বিরত থাকা দ্বারা তালাকের হুকুম সাব্যস্ত হয় না।[১]

কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম, দু'মাস এবং এ দু'মাসের পর আরো দু'মাস তোমার সাথে মিলিত হবো না, তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে।

১। অর্থাৎ যদি কসম খায় যে, এক মাস কাছে যাবো না তবে এক মাসের অতিরিক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে সহবাস থেকে বিরত থাকাটা ইয়ামীন ছাড়া হবে।

কেননা একত্র করার হরফের মাধ্যমে উভয় সময়কে একত্রিত করে ফেলেছে। সুতরাং একবাক্যে একত্রিত করার (চারমাস উল্লেখের) সমার্থক হবে।

যদি একদিন পর বলে, আল্লাহর কসম প্রথম দু'মাসের পর আরো দু'মাস তোমার সাথে মিলিত হব না, তাহলে ঈলা হবে না।

কেননা দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে নতুন ইয়ামীনের সূচনা। অথচ প্রথম বক্তব্যের পর দু'মাসের জন্য সে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে। (আর প্রথম দু'মাসের সাথে সম্পৃক্ত) দ্বিতীয় বক্তব্যের পর চার মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হলো; তবে যেই দিন বাদ গেলো সেদিন মাঝখানে সে অপেক্ষা করেছে। ফলে নিষেধের মেয়াদ (চারমাস) পূর্ণ হলো না।

আর যদি বলে, আল্লাহর কসম, এক দিন ছাড়া এক বছর তোমার সাথে মিলিত হবো না তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ব্যতিক্রম দিনটিকে তিনি বছরের শেষে যুক্ত করেন এবং ইজারার উপর সেটিকে কেয়াস করেন। সুতরাং নিষেধের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়।

আমাদের দলীল এই যে, ঈলাকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার পক্ষে কাফফারা প্রদান ছাড়া চার মাসের ভিতরে স্ত্রী সহবাস করা সম্ভব নয়। অথচ এখানে তা সম্ভব। কেননা এখানে অনির্ধারিত একটি দিনকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

ইজারার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে উক্ত দিনকে বছরের শেষে যুক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজারাকে বিশুদ্ধতা ও বৈধতা দান করা। কারণ অনির্ধারিত অবস্থায় ইজারা বৈধ হয় না। পক্ষান্তরে ইয়ামীনেরও অবস্থা তা নয়।

আর যদি (বছরের) একদিন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় অতঃপর চার মাস বা তার বেশী সময় অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে ঈলাকারী হবে।

কেননা ইসতিসনা রহিত হয়ে গেছে।

যদি সে বলে অথচ সে বসরায় অবস্থান করছে ঃ আল্লাহর কসম, আমি কুফায় প্রবেশ করবো না। এ সময় তার স্ত্রী কুফায় রয়েছে, তাহলে সে ঈলাকারী হবে না।

কেননা, স্ত্রীকে কুফা থেকে বের করে এনে কাফফারা অনিবার্যকরণ ছাড়াই সে সহবাস করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি (সহবাসের বিষয়টিকে) হজ্জ, কিংবা সিয়াম কিংবা ছাদাকা, কিংবা গোলাম আযাদ করা কিংবা তালাক প্রদানের সাথে সম্পর্কিত করে কসম খায় তাহলে সে ঈলাকারী হবে।

কেননা শর্ত ও পরিণতি উল্লেখের মাধ্যমে ইয়ামীন হওয়ায় সহবাস থেকে বাধা দানকারী সাব্যস্ত হয়েছে। আর এই পরিণতিগুলো কষ্টকর হওয়ার কারণে বাধা দানকারী বিবেচিত হবে। (গোলাম) আযাদ করার সাথে কসমকে সম্পর্কিত করার ছুরত এই যে, সে বলে ঃ স্ত্রীর সাথে

সহবাস করলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তার পক্ষে গোলামকে বিক্রি করে অতঃপর সহবাস করা সম্ভব। তখন তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানীফা ও মুহম্মদ (র) বলেন, গোলাম বিক্রির বিষয়টি তো অনিশ্চিত। সুতরাং এই অনিশ্চিত সম্ভাবনা ঈলার ক্ষেত্রে এটার বাধাদানকারী হওয়া রহিত করবে না।

তালাক দ্বারা সত্যায়িত করার অর্থ স্ত্রীর নিজের কিংবা তার সতীনের তালাকের সাথে সহবাসকে সত্যায়িত করা। দুটোই বাধাদানকারী রূপে বিবেচিত হবে।

রাজয়ী তালাক প্রাপ্তার ব্যাপারে ঈলা করলে সে ঈলাকারী হবে। পক্ষান্তরে বায়ন তালাক প্রাপ্তার ব্যাপারে ঈলা করলে ঈলাকারী হবে না।

কেননা রাজয়ী তালাকের ছূরতে বিবাহ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে আর নাছ ও আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আমাদের স্ত্রীরাই হলো ঈলার ক্ষেত্র।

আর যদি ইলার ইদ্দত বা মেয়াদ তালাকে রাজয়ীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শেষে হয়ে যায় তাহলে 'ক্ষেত্র' না থাকার কারণে ঈলা রহিত হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন বেগানা স্ত্রীলোককে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার কাছে যাবো না, কিংবা তুমি আমার জন্য অমার আম্মার পিঠের মত, অতঃপর তাকে বিবাহ করলো, তাহলে ঈলাকারী বা যিহারকারী হবে না।[১]

কেননা ক্ষেত্র বিদ্যমান না থাকার কারণে উচ্চারণকালেই বক্তব্যটি বাতিল হয়েছে। সুতরাং পরবর্তীতে (ক্ষেত্র বিদ্যমান হলেও) তা বিশুদ্ধ রূপে পরিবর্তিত হবে না।[২]

এ অবস্থায় যদি তার সাথে সহবাস করে তবে কাফ্ফারা সাব্যস্ত হবে ইয়ামীন ভংগ হওয়ার কারণে। কেননা ইয়ামীনকে সংঘটিত বিবেচনা করা হয়।

দাসীর ক্ষেত্রে ঈলা এর মেয়াদ হলো দু'মাস। কেননা এটা হলো বিবাহ বিচ্ছেদের নির্ধারিত মেয়াদ। সুতরাং দাসত্বের কারণে তা অর্ধেক হয়ে যাবে, যেমন ইদ্দতের মেয়াদের ক্ষেত্রে।

ঈলাকারী যদি সহবাস সম্ভব নয় এমন অসুস্থ হয় কিংবা স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় কিংবা যদি যৌনাংগে প্রতিবন্ধকতা থাকে, কিংবা সহবাস সম্ভব নয় এমন অল্প বয়স্কা হয় কিংবা উভয়ের মাঝে এতটা দূরত্ব থাকে যে, ঈলা এর নির্ধারিত সময়ে সেখানে পৌছা সম্ভব নয়, তাহলে তার জন্য ঈলা প্রত্যাহার করার উপায় হলো ঈলা এর মেয়াদের মধ্যে মুখে একথা বলা যে, আমি আমার স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। একথা বলা দ্বারা ঈলা রহিত হয়ে যাবে।

১। যিহার অধ্যায় দেখুন।

২। কেননা ভংগ হওয়ার ব্যাপারটি কসমকৃত কর্মটির স্থূল অস্তিত্ব সম্ভব হওয়াই যথেষ্ট। কর্মটি হালাল কি হারাম, তার উপর তা নির্ভর করে না। যেমন বললো, আল্লাহর কসম, আজ আমি মদ পান করবো। অতঃপর পান করলো না। এ অবস্থায় সে দিন অতিবাহিত হলে কসম ভংগ করা হবে। অথচ কর্মটি হারাম।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সহবাস ছাড়া ঈলা প্রত্যাহারের কোন পথ নেই। ইমাম তাহাবীও (র) এ মত গ্রহণ করেছেন। কেননা এটা প্রত্যাহার করা যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে حنث বা ঈলা ভংগ করাও সাব্যস্ত হবে।[১]

আমাদের দলীল এই যে, সহবাস থেকে বাধা দানকারী বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দিয়েছে, সুতরাং (প্রত্যাহারের) মৌখিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করাই হবে তার দায়িত্ব। যখন যুলুম দূর হয়ে গেলো তখন তালাক সাব্যস্ত করণের মাধ্যমে তাকে তালাকের দ্বারা বদলা দেওয়া যায় না।

অতঃপর মেয়াদের মধ্যেই যদি সহবাস করতে সক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে মৌখিক প্রত্যাহারের গ্রহণযোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে। আর সহবাসই হবে তার ঈলা প্রত্যাহারের পথ।

কেননা সে বিকল্প পন্থা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই প্রত্যাহারের মূল পন্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। **উনার স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম, তাহলে তাকে তার নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি বলে যে, আমি মিথ্যা বলার নিয়ত করেছি তাহলে সে যেমন বলেছে তেমনই ধরে নেয়া হবে।** কেননা সে তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থই নিয়ত করেছে।

কোন কোন মতে আদালতে বিচারের প্রশ্ন এলে তার ব্যাখ্যা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা স্পষ্টতঃই এটা ইয়ামীন হয়েছে (কারণ হারাম শব্দ ইয়ামীনের জন্য ব্যবহার হয়)।

আর সে যদি বলে, আমি তালাকের নিয়ত করেছি, তাহলে এটা দ্বারা একটি বায়েন তালাক হবে। অবশ্য তিনের নিয়ত করলে তিন তালাক হবে।

অস্পষ্ট বাচক শব্দের তালাক প্রসংগে বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি।

আর যদি বলে, আমি যিহারের নিয়ত করেছি তাহলে এটা দ্বারা যিহার-ই হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র) এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মাহরাম স্ত্রীলোক (যেমন মা) এর সাথে তুলনার উল্লেখ না থাকার কারণে এটা যিহার হতে পারে না। কেননা এটা হলো যিহার এর রুকন। শায়খায়নের বক্তব্য এই যে, হারাম হওয়ার বিষয়টিকে সে সাধারণভাবে ব্যবহার করেছে আর (হুরমতের বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে যিহার হলো একটি প্রকার। কেননা) যিহার এর মাঝে এক প্রকার হুরমত রয়েছে আর সাধারণ নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

১। অর্থাৎ প্রত্যাহার দ্বারা দুটি হুকুম সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক। একটি হল কাফফারা, অন্যটি হল বিচ্ছেদ রহিত হওয়ায় মৌখিক প্রত্যাহার দ্বারা যেহেতু কাফফারা সাব্যস্ত হয় না, সেহেতু বিচ্ছেদ রহিত হওয়াও সম্ভব নয়।

আর সে যদি বলে যে, আমি 'হারাম' সাব্যস্ত করার নিয়ত করেছি কিংবা কোন নিয়ত করিনি, তাহলে এটা ইয়ামীন হবে এবং সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে।

কেননা আমাদের মতে হালালকে হারাম করা মূলতঃ ইয়ামীন। ইয়ামীন অধ্যায়ে ইনশাল্লাহ তা আলোচনা করবো।

কোন কোন মাশায়েখ অবশ্য সাধারণ প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে হুরমত বাচক শব্দকে নিয়ত না করা সত্ত্বেও তালাকের অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক অবগত।

অধ্যায় ঃ খোলা[১]

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে যদি ফাটল ধরে আর উভয়ে এমন আশংকা করে যে, (পারস্পরিক হক আদায়ের ক্ষেত্রে) আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তারা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর আত্ম মুক্তি অর্জনে কোন বাধা নেই। এ অর্থের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীকে 'খোলা' করে দেবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيْمَاافْتَدَتْ بِهٖ

—বন্ধনমুক্তির জন্য স্ত্রী যে অর্থ প্রদান করবে, তাতে (প্রদানে ও গ্রহণে) তাদের কোন গোনাহ নেই।

স্বামী যখন এটা করবে তখন খোলা এর মাধ্যমে একটি বায়ন তালাক সাব্যস্ত হবে। এবং উক্ত অর্থ আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় লাযিম হবে।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الخلع تطليقة بائنة —খোলা হল একটি বায়ন তালাক।

তাছাড়া এই জন্য যে, 'খোলা' শব্দে তালাকের সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে। এ কারণেই শব্দ অস্পষ্ট বাচক তালাক শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অস্পষ্ট বাচক শব্দের দ্বারা বায়ন তালাক পতিত হয়।

অবশ্য এখানে অর্থের উল্লেখ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দিয়েছে। তাছাড়া আত্ম-অধিকার নিষ্কন্টক করার জন্যই স্ত্রী অর্থ প্রদান করছে আর তা বায়ন তালাকের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

অন্যায় আচরণ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করা স্বামীর জন্য মাকরূহ।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَاتَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

—আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও ..... তাদের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করো না।

তাছাড়া এই কারণে যে, পরিবর্তন দ্বারাই স্ত্রীকে সে উত্যক্ত করেছে। সুতরাং অর্থ গ্রহণ দ্বারা তার উত্যক্ততা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে অন্যায় আচরণ স্ত্রীর পক্ষ থেকে হলে প্রদত্ত (মাহর) পরিমাণের অধিক অর্থ গ্রহণ করা স্বামীর জন্য আমরা মাকরূহ মনে করি।

১। خلع عن بدنه এর আভিধানিক অর্থ হলো খুলে ফেলা। বলা হয় خلع দেহ থেকে বস্ত্র খুলে ফেলল। পরিভাষায়, খোলা শব্দ ব্যবহার করে স্বামীসত্ত্ব ত্যাগের বিনিময়ে স্ত্রী কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা।

জামে ছাগীরের বর্ণনা মতে অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণও বৈধ। এর দলীল **শুরুতে আমরা** যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তার নিঃশর্ততা। অপর মতটির দলীল ছাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস এর স্ত্রী প্রসংগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ বলেছেন, وأما الزيادة فلا, তবে অতিরিক্ত পরিমাণ তা গ্রহণ করবে না।

অথচ এ ক্ষেত্রে অন্যায় ছিলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে। **(মাহরের) অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করলে আদালতের বিচারে তা বৈধ।** তদ্রূপ অন্যায় স্বামীর পক্ষ থেকে হলেও একই কথা।

কেননা আমাদের পেশকৃত আয়াতের দাবী হলো দুটি; আইনগত বৈধতা, দ্বিতীয় হল মোবাহ। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আয়াতের উপর আমল পরিহার করা হয়েছে। কেননা বিরুদ্ধ হাদীস রয়েছে, সুতরাং অবশিষ্ট ক্ষেত্রেই শুধু আয়াতটি কার্যকরী হবে। **আর যদি অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় আর স্ত্রী তা গ্রহণ করে তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর সে অর্থ লাযিম হবে।**

কেননা স্বামী নিঃশর্ত ও শর্তযুক্ত উভয় প্রকার তালাক প্রদানের একক অধিকারী। আর এখানে তালাককে সে স্ত্রীর আর্থিক দায় গ্রহণের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। আর স্ত্রীর যেহেতু 'আত্ম-অধিকার' রয়েছে, সেহেতু আর্থিক দায় গ্রহণের ক্ষমতা তার রয়েছে। আর বিবাহ স্বত্ব মাল না হলেও তার বিনিময় গ্রহণ বৈধ, যেমন কিসাস (এর বেলায়)। **আর প্রদত্ত তালাকটি বায়ন হবে।** এর কারণ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

তাছাড়া বিষয়টি হচ্ছে আত্ম-অধিকারের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ। আর স্বামী দুটি বিনিময়ের একটি বুঝে পেয়েছে, সুতরাং স্ত্রী অপর বিনিময়টির অবশ্যই অধিকারী হবে, যাতে বিনিময়ের সমতা নিশ্চিত হয়। আর সেই অপর বিনিময়টি হচ্ছে তার 'আত্ম অধিকার'।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, খোলার ক্ষেত্রে উল্লেখকৃত বিনিময়টি যদি বাতিল সাব্যস্ত হয়, যেমন কোন মুসলমান মদ বা শূকর বা মৃত পশুর বিনিময়ে খোলা করলো, তাহলে স্বামী কিছুই পাবে না। অর্থাৎ বিচ্ছেদটি 'বায়ন তালাক' বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে উল্লেখকৃত বিনিময়টি বাতিল সাব্যস্ত হলে তালাকটি রাজয়ী বলে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর সম্মতির সহকারে বিচ্ছেদকে শর্তযুক্ত করা।

পক্ষান্তরে হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, বিনিময়টি বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রথম ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল শব্দটি হচ্ছে খোলা। আর সেটা হচ্ছে তালাকের অস্পষ্ট শব্দ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল শব্দ হচ্ছে তালাকের স্পষ্ট শব্দ। আর স্পষ্ট তালাক শব্দের পরিণতি হচ্ছে রাজয়ী তালাক।

আর স্বামীর অনুকূলে স্ত্রীর উপর কোন বিনিময় সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ এই যে, স্ত্রী তো স্বামীর কাছে মুসলমানের জন্য মুল্য আছে, এমন কোন মালের উল্লেখ করেনি, যাতে স্বামীর কাছে সে প্রতারণাকারী হতে পারে।

তাছাড়া ইসলামের (নিষেধাজ্ঞার) কারণে উল্লেখকৃত বস্তু সাব্যস্ত করার কোন উপায় নেই। আর অন্য কিছু সাব্যস্ত করারও উপায় নেই। কেননা স্ত্রী সেটার দায় গ্রহণ করেনি।

পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত কোন সিরকার বিনিময়ের খোলা করে, কিন্তু পরে দেখা গেলো যে; তা মদ, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা স্ত্রীর (মূল্যবান) মালের উল্লেখ করার কারণে স্বামী প্রতারিত হয়েছে।

মদের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি করার কিংবা দাস আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে দাসের মূল্য সাব্যস্ত হবে। কেননা দাসের উপর মনিবের মালিকানা হচ্ছে মূল্যওয়ালা। আর মনিব বিনিময় ছাড়া মালিকানা পরিত্যাগে সম্মত হয়নি। পক্ষান্তরে বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ অংগের মালিকানা মূল্যসম্পন্ন নয়। এর কারণ এখনই আমরা উল্লেখ করব। আর (মদের মাহরানার ভিত্তিতে) বিবাহের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা দাম্পত্য বন্ধনের সূচনাকালে সম্ভোগ অংগ মূল্য সম্পন্ন রূপে বিবেচিত। এর রহস্য এই যে, (শরীয়তের দৃষ্টিতে) সম্ভোগ অঙ্গ অতি মর্যাদা পূর্ণ। সুতরাং মর্যদা প্রকাশের জন্য বিনিময় ছাড়া এর মালিকানা লাভ শরীয়ত সম্মত নয়।

পক্ষান্তরে সম্ভোগ অংগের মালিকানা পরিত্যাগের বিষয়টি স্থানীয় ভাবেই মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং (মর্যাদা প্রকাশের জন্য) মাল ধার্য করার প্রয়োজন নেই। ইমাম কুদুরী (র) বলেন **বিবাহের ক্ষেত্রে যা মাহর রূপে বৈধ, খোলার ক্ষেত্রে তা বিনিময় রূপে বৈধ।**

কেননা যেটা মূল্য সম্পন্ন জিনিসের (সম্ভোগ অংগের) বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেটা মূল্যহীন জিনিসের সম্ভোগ অংগের মালিকানা পরিত্যাগের বিনিময় আরো স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারবে।

স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আমার হাতে যা আছে, তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা কর। তখন সে তাকে খোলা করলো কিন্তু দেখা গেলো তার হাতে কিছু নেই, তাহলে স্ত্রীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

কেননা সে কোন মাল উল্লেখ করে স্বামীকে প্রতারণা করেনি।

আর যদি বলে, আমার হাতে যে মাল আছে, তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা করো। অতঃপর সে তার সাথে খোলা করলো। কিন্তু দেখা গেলো যে, তার হাতে কিছু নেই, তাহলে তার মাহরানা স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

কেননা সে যখন 'মাল' উল্লেখ করেছে তখন বোঝা গেলো যে, কোন বিনিময় ছাড়া মালিকানা পরিত্যাগে স্বামী সম্মত নয়। অথচ উল্লেখকৃত বস্তু কিংবা তার মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ সম্ভোগ অংগের মূল্য তথা মাহরে মেছেল সাব্যস্ত করাও সংগত নয়। কেননা বিচ্ছেদকালে তা মূল্যসম্পন্ন নয়। সুতরাং স্বামীর ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার জন্য (সম্ভোগ অংগের মালিকা লাভের জন্য) যে পরিমাণ অর্থ স্বামীর ব্যয় হয়েছে, সেটা ওয়াজিব করাই নির্ধারিত হবে।

আর যদি বলে, আমার হাতে যে দিরহাম সমূহ রয়েছে, তার বিনিময়ে আমাকে বসার্থে খোলা কর, আর সে তাই করলো। কিন্তু দেখা গেলো যে, তার হাতে কিছু নেই। তখন স্ত্রীর উপর তিন দিরহাম আদায় করা লাযিম হবে।

কেননা সে বহুবচনের শব্দ উল্লেখ করেছে। আর বহুবচনের সর্ব নিম্ন সংখ্যা (আরবীতে) হলো তিন। আরবী ব্যবহারে (من دراهم এর) من অব্যয়টি এখানে বর্ণনার জন্য এসেছে, বিভাজনের জন্য নয়। কেননা এ অব্যয় ব্যতীত বাক্য ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

যদি স্ত্রী তার কোন পলাতক গোলামের বিনিময়ে খোলা গ্রহণ করে এই শর্তে যে, স্ত্রী ঐ গোলামের জামানত থেকে মুক্ত, তাহলে স্ত্রী জামানত মুক্ত হবে না। বরং সক্ষম হলে স্বয়ং গোলামকে অপর্ণ করতে হবে। আর অক্ষম হলে তার মূল্য প্রদান করবে।

কেননা এটা হচ্ছে বিনিময় চুক্তি। সুতরাং তা বিনিময়টি অর্পণ দাবী করে। আর বিনিময়ের ব্যাপারে দায়মুক্ত হওয়ার শর্ত হল ফাসেদ শর্ত। সুতরাং তা বাতিল হবে। তবে খোলা ফাসেদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না।

বিবাহের ব্যাপারের হুকুমও অনুরূপ।[১]

আর যদি স্ত্রী বলে, আমাকে এক হাযযের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করো। আর স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে, তাহলে স্ত্রীকে হাযারের তিনভাগের একভাগ আদায় করতে হবে।

কেননা এক হাযারের বিনিময়ে তিন তালাক দাবী করার অর্থ হলো প্রতিটি তালাক এক হাযারের তিনভাগের এক ভাগের বিনিময়ে দাবী করা। কারণ 'বিনিময়' অব্যয় বদলে প্রদত্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয়। আর এ বদল যে বস্তুর বিনিময়ে প্রদত্ত, তার অনুপাতে বিভাজ্য হয়।

আর অর্থের বিনিময়ে হওয়ার কারণে এটা বায়ন তালাক হবে।

আর যদি বলে এক হাযারের শর্তে আমাকে তিন তালাক প্রদান করো আর সে তাকে এক তালাক প্রদান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে স্ত্রীর উপর কোন কিছুই লাযিম হবে না এবং স্বামী রাজা'আতের অধিকারী হবে। সাহেবায়ন বলেন, এক হাযারের তিন ভাগের এক ভাগের বিনিময়ে তার উপর বায়ন তালাক হবে।

কেননা লেনদেনের ব্যাপারে (শর্তবোধক) অব্যয় على (বিনিময় বোধক) باء অব্যয়ের স্থলবর্তী।

এমনকি লোকদের এ উক্তি "তুমি এ খাদ্য-বোঝা এক দিরহামের বিনিময়ে অথবা (বলে) এক দিরহামের শর্তে বহন কর"–উভয়টি সমান হবে। ইমাম আবূ হানিফা (র) এর দলীল হল على অব্যয়টি শর্তের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا এমনি কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে انت طالق على ان تدخلى الدار এখানে শর্তের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। আর তা এ জন্য যে, على অব্যয়টি প্রকৃতপক্ষে লাযিম হওয়ার জন্য আর তা শর্তের জন্য গৃহীত হয়।

কেননা, শর্তের সাথে (جزاء) লাযিম হয়ে থাকে। আর যখন এ অব্যয়টি শর্তের জন্য সাব্যস্ত সুতরাং শর্তের অংশ বিশেষের উপর শর্ত-যুক্ত বিষয় বিভাজ্য হবে না। (বিনিময় অব্যয়) باء এর হুকুম এর বিপরীত। কেননা তা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যখন মাল ওয়াজিব হল না তখন তালাকটি স্বতন্ত্র তালাক হবে। এ জন্য স্বামী রাজা'আতের অধিকারী হবে।

১। অর্থাৎ স্বামী যদি তার পলাতক গোলামকে মাহর সাব্যস্ত করে বিবাহ করে এবং গোলামকে অর্পণের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করে তাহলে দায়িত্বমুক্ত হবে না। বরং হয় গোলাম কিংবা তার মূল্য অর্পণ করতে হবে।

আর যদি স্বামী বলে, এক হাযারের বিনিময়ে কিংবা এক হাযারের শর্তে নিজেকে তিন তালাক প্রদান করে। আর স্ত্রী এক তালাক প্রদান করে, তাহলে কোন তালাক সাব্যস্ত হবে না।

কেননা স্বামী তার জন্য পূর্ণ এক হাযার নিশ্চিত হওয়া ছাড়া বিচ্ছেদের ব্যাপারে সম্মত নয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক হাযারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রার্থনা করার বিষয়টি বিপরীত। কেননা সে যখন এক হাযারের বিনিময়ে বিচ্ছেদ গ্রহণে সম্মত রয়েছে, তখন তার অংশবিশেষের বিনিময়ে অধিকতর সম্মত হবে।

স্বামী যদি বলে তুমি এক হাযারের শর্তে তালাক আর স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর জন্য এক হাযার আদায় করা লাযিম হবে। এটা 'তুমি এক হাযারের বিনিময়ে তালাক' এই বক্তব্যের সমার্থক।

উভয় বক্তব্যের ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্মতি প্রকাশ আবশ্যক। ....

কেননা প্রথমত: সম্মতি ছাড়া বিনিময় বাধ্যতামূলক হয় না। দ্বিতীয়ত: এক হাযারের দায়িত্ব গ্রহণ হচ্ছে শর্ত। আর শর্তের অস্তিত্ব ছাড়া শর্তায়িত বিষয় সাব্যস্ত হয় না। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে এটা বায়ন তালাক সাব্যস্ত হবে।

আর যদি সে তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক (আর) তোমার উপর এক হাযার। আর সে সম্মত হলো। কিংবা মনিব তার গোলামকে বললো, তুমি আযাদ তোমার উপর এক হাযার। আর সে তা কবুল করলো। তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে তাদের উভয়ের উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। অদ্রূপ তারা সম্মত না হলেও একই হুকুম হবে। সাহেবায়ন **বলেন, উভয়ের প্রত্যেকের উপর উল্লেখিত এক হাযার আদায় করা লাযিম হবে, যদি তারা সম্মত হয়ে থাকে।** পক্ষান্তরে তারা সম্মত না হলে তালাক ও আযাদী সাব্যস্ত হবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, এ ধরনের বাক্য বিনিময় বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, এ বোঝাটা বহন করে নাও, তোমার জন্য এক দেরহাম— এ কথাটি এক দেরহামের বিনিময়ের সমতুল্য।

ইমাম আবূ হানিফার দলীল এই যে, (তুমি এক হাযার দেবে কিংবা তোমাকে এক হাযার দিতে হবে) এ ধরনের বাক্যগুলো পূর্ণাংগ বাক্য। সুতরাং উপযুক্ত কারণ ছাড়া এটা পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না। কেননা স্বাতন্ত্রই হলো এ বাক্যের মৌলিক প্রকৃতি। আর এখানে (সম্পৃক্তির) উপযুক্ত কোন কারণ নেই। কেননা 'অর্থ ও বিনিময়'-এর সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও তালাক ও আযাদ হয়ে থাকে। বিক্রি ও ভাড়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বিনিময় ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না।

স্বামী যদি বলে, তুমি এক হাযারের শর্তে তালাক, তবে শর্ত এই যে, আমার তিন দিনের এখতিয়ার রয়েছে; কিংবা (বললো) তোমার তিন দিনের এখতিয়ার রয়েছে। আর স্ত্রী তা গ্রহণ করলো, তবে স্বামীর এখতিয়ার হলে তা বাতিল হবে (এবং তালাক সাব্যস্ত হবে)। পক্ষান্তরে স্ত্রীর এখতিয়ার হলে তা বৈধ হবে। অতঃপর স্ত্রী যদি তিন দিনের মধ্যে এখতিয়ার প্রত্যাখান করে তাহলে তালাক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এখতিয়ার

প্রত্যাখান না করে তবে তালাক হয়ে যাবে এবং উল্লেখিত এক হাযার তার উপর লাযিম হবে। এই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, (এখতিয়ার যে পক্ষেরই হোক) উভয় অবস্থায় এখতিয়ার বাতিল হবে এবং তালাক সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রীর উপর এক হাযার দিরহাম লাযিম হবে।

কেননা (শরীয়তের পক্ষ হতে) এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সংঘটিত হওয়ার পর তা রহিত করার জন্য, সংঘটন রোধ করার জন্য নয়। আর এখানে স্বামীর প্রস্তাব এবং স্ত্রীর গ্রহণ, এ কার্যদ্বয় উভয় পক্ষ হতেই রহিতযোগ্য নয়। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে এই হচ্ছে ইয়ামীন। পক্ষান্তরে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এ হচ্ছে উক্ত ইয়ামীন এর শর্ত। আর ইয়ামীন ও শর্ত কোনটাই রহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলা হচ্ছে বিক্রয় সমতুল্য। এমনকি স্ত্রীর জন্য তার প্রস্তাব থেকে (স্বামীর গ্রহণের পূর্বে) ফিরে যাওয়া সহীহ রয়েছে। আর তা মজলিসের পরে বহাল থাকে না। সুতরাং 'খোলা'- এর ক্ষেত্রে এখতিয়ারে শর্তারোপ বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে স্বামীর দিক থেকে এটা হচ্ছে ইয়ামীন। এ কারণেই তা থেকে তার সরে যাওয়া বৈধ নয়। এবং মজলিসের পরেও তা বহাল থাকে। এবং ইয়ামীন জাতীয় বক্তব্যে এখতিয়ার থাকে না। আর মুক্তির ক্ষেত্রে দাসের অবস্থা তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুরূপ।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, গতকাল তোমাকে এক হাযার দিরহামের শর্তে তালাক দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি কবুল করোনি। তখন স্ত্রী বললো, আমি কবুল করেছিলাম, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কাউকে বলে, গতকাল এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে এই গোলামটি তোমার কাছে বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু তুমি গ্রহণ করোনি; কিন্তু ক্রেতা বলল, আমি গ্রহণ করেছি, তখন ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

(তালাক ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) পার্থক্যের কারণ এই যে, অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদান স্বামীর দিক থেকে ইয়ামীন রূপে বিবেচ্য। সুতরাং পূর্ববর্তী ইয়ামীন স্বীকার করার অর্থ শর্ত বিদ্যমান হওয়ার স্বীকৃতি নয়। কেননা শর্তের বিদ্যমানতা ছাড়া ইয়ামীন সম্পন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে অপর পক্ষ গ্রহণ ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং বিক্রয় স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে এ জিনিস স্বীকার করে নেওয়া, যা ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং (তুমি গ্রহণ করোনি বলে) অপরপক্ষের গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে বিক্রয়ের স্বীকৃতি থেকে সরে আসা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (পরস্পরকে দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান) 'খোলা' এর সমতুল্য। দুটোই স্বামী-স্ত্রীর একের উপর অপরের বিবাহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রাপ্য হক রহিত করে দেয়। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রে যে সকল হকের উল্লেখ করবে, শুধু সেগুলোই রহিত হবে। 'খোলা' এর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ইমাম মুহম্মদ (র) এর সমর্থক। আর দায় মুক্তি ঘোষণার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর সমর্থক।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, খোলা ও পরস্পর দায়মুক্তি দুটোই হচ্ছে পারস্পরিক বিনিময়। আর এ ক্ষেত্রে শুধু নির্ধারিত শর্তগুলোই বিবেচ্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, পরস্পর দায়মুক্তির শব্দ مفاعلة এর مصدر হিসেবে উভয় পক্ষ হতে দায়মুক্তি দাবী করে। আর দায়মুক্তির বিষয়টি আলোচ্য ক্ষেত্রে নিঃশর্ত হলেও উদ্দেশ্যগত প্রমাণের[১] বিচারে আমরা 'বিবাহ সংশ্লিষ্ট হক' দ্বারা দায়মুক্তির বিষয়টিকে আবদ্ধ করেছি।

পক্ষান্তরে 'খোলা' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রত্যাহার। আর তা বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যায়। এতে বিবাহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধান রহিত করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, খোলা শব্দটি (মূলগত ভাবে) 'বিচ্ছিন্নকরণ' এর অর্থ প্রকাশ করে। এই মূলগত অর্থ সূত্রেই বলা হয় خلع النعل (জুতা খুলল অর্থাৎ পা থেকে বিচ্ছন্ন করল)। এবং خلع العمل (চাকুরী থেকে বরখাস্ত করলো)। আর যেহেতু মুবারাআর ন্যায় খোলাও শর্তমুক্ত রূপে উচ্চারিত হয়েছে, সেহেতু উভয়টি শর্তমুক্ত অবস্থা বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধান সমূহ ও হকসমূহের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

কেউ যদি আপন না-বালিকা কন্যার পক্ষ হতে কন্যার অর্থের বিনিময়ে খোলা সম্পন্ন করে, তবে তা কন্যার উপর কার্যকর হবে না।

কেননা খোলা করণে এত কন্যার কোন কল্যাণ নেই। কারণ বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ অংগ 'মূল্যবান বস্তু' হিসেবে গণ্য নয়। অথচ প্রদত্ত বিনিময়টি হচ্ছে মূল্যবান বস্তু।

বিবাহের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিবাহের অধিকারে প্রবেশের সময় সম্ভোগ অংগ হচ্ছে মূল্যসম্পন্ন। এ কারণেই স্ত্রীলোক মৃত্যু শয্যায় খোলা সম্পন্ন করলে সেটা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে মৃত্যু শয্যায় পুরুষ মাহরে মেছেলের উপর বিবাহ করলে সেটা তার সমগ্র সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে।

যাই হোক খোলা যখন কার্যকর হলো না তখন মাহর রহিত হবে না এবং স্বামী (খোলা বাবদ উল্লেখকৃত) স্ত্রীর মালের হকদার হবে না।

এক বর্ণনামতে তালাক পতিত হবে। আর এক বর্ণনামতে তালাক পতিত হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধ। কেননা এটা হচ্ছে পিতার সম্মতির শর্তে শর্তায়িত বাক্য। সুতারং তা অন্যান্য শর্তে শর্তায়িত বাক্যের পর্যায়ে বিবেচিত হবে।

আর যদি পিতা কন্যার পক্ষে এক হাযারের শর্তে খোলা করে এই শর্তে যে, পিতা উল্লেখিত অর্থ নিজে আদায় করবে তাহলে খোলা সাব্যস্ত হবে এবং উক্ত এক হাযার পরিশোধ করার দায় পিতার উপর বর্তাবে।

কেননা খোলার বিনিময় অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ধার্য করা বৈধ রয়েছে। সুতরাং পিতার উপর ধার্য করা অধিকতর বৈধ হবে।

আর স্ত্রীর মাহর রহিত হবে না। কেননা মাহর পিতার কর্তৃত্বাধীন নয়।

আর যদি স্বামী এক হাযার দিরহামের শর্ত নাবালিকা স্ত্রীর উপর আরোপ করে আর যদি সে গ্রহণ করার (আইনগত) যোগ্যতার অধিকারিণী[২] হয় তাহলে সেটা তার গ্রহণ করার উপর নির্ভরশীল হবে। যদি সে গ্রহণ করে তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে।

১। বিবাহ সংশ্লিষ্ট হক বলতে মাহর, বকেয়া খোরপোষ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। ইদ্দতকালীন খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকার এ দ্বারা ব্যহত হবে না।

২। অর্থাৎ নাবালিকা হওয়া সত্ত্বেও যদি সে লেন-দেন এবং ভাল-মন্দ বুঝবার মতো বুদ্ধিসম্পন্না হয়।

কেননা শর্ত অস্তিত্ব লাভ করেছে।

তবে অর্থ আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা নাবালিকা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) অর্থ দন্ড গ্রহণের যোগ্য নয়।

আর যদি পিতা তার পক্ষ থেকে উক্ত দায় গ্রহণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে।[১]

তদ্রূপ যদি স্বামী তার স্ত্রীর মাহরের অর্থের বিনিময়ে তার সাথে খোলা করে আর পিতা মাহরানার দায় গ্রহণ না করে তাহলে উক্ত নাবালিকা স্ত্রীর গ্রহণের উপর তা নির্ভরশীল হবে। যদি সে গ্রহণ করে তাহলে তালাক পতিত হবে। কিন্তু মোহরানা রহিত হবে না।[২]

আর যদি পিতা তার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তাহলে এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত দুটি বর্ণনা রয়েছে।

আর যদি পিতা মোহরানার অর্থ আদায়ে দায় গ্রহণ করে আর (উদাহরণ স্বরূপ) তার পরিমাণ হলো এক হাযার দিরহাম, তাহলে তালাক পতিত হবে।

কেননা পিতার পক্ষ হতে গ্রহণ পাওয়া গেছে আর সেটাই ছিলো শর্ত।

আর পিতার উপর পাঁচশ দিরহাম সাব্যস্ত হবে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে[৩]। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দৃষ্টিতে এক হাযার লাযিম হয়।

আলোচ্য মাসাআলার মূল উৎস হচ্ছে, সাবালিকা স্ত্রী সহবাসপূর্ব অবস্থায় এক হাযার দিরহামের শর্তে খোলা করেছে। আর তার মোহরানা ছিলো এক হাযার। এ অবস্থায় সাধারণ কিয়াসের দাবী মতে স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত পাঁচশ দিরহাম অবশ্য ধার্য হবে[৪]। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর কোন কিছু লাযেম হবে না।[৫]

কেননা (মোহরানারা বিনিময়ে সাব্যস্ত) খোলা দ্বারা সাধারণত: ঐ পরিমাণ অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা স্ত্রীর অনুকূলে লাযিম হয়।

১। এক বর্ণনা মতে পিতার দায় গ্রহণ বৈধ হবে। কেননা এতে কন্যার আগাগোড়া কল্যাণ নিহিত। কেননা অর্থ ব্যয় ছাড়াই সে বন্ধনমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পিতার পক্ষ হতে এ দায়গ্রহণ বৈধ হবে। যেমন কারো পক্ষ হতে কন্যাকে প্রদত্ত হাদিয়া পিতা গ্রহণ করতে পারে। অন্য বর্ণনা মতে তা বৈধ হবে না। কেননা এটা হচ্ছে ইয়ামীন বাবের দায়গ্রহণের মত। আর ইয়ামীনের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা গ্রহণযোগ্য নয়।

২। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাবালিকা অর্থ দায় গ্রহণের উপযুক্ত নয়।

৩। কেননা মাসআলাটির কল্পিত ক্ষেত্র হচ্ছে ঐ স্ত্রী, যার সাথে স্বামীর একান্ত মিলন হয়নি। আর মাহর ধার্য হয়েছিলো এক হাযার। আর খোলাকে মোহরানার সংগে সম্পৃক্ত করা দ্বারা এ মোহরানাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা বিবাহের কারণে স্ত্রীর অনুকূলে অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। আর সহবাসপূর্ব তালাকের ক্ষেত্রে বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর অনুকূলে অর্ধেক মাহর সাব্যস্ত হয়। এখানে তা হচ্ছে পাঁচশ দিরহাম। সুতরাং যেন পাঁচশ দিরহামের উপর খোলা হয়েছে।

৪। কেননা, মোহরানার পাঁচশ দিরহাম তো সহবাসপূর্ব তালাক দ্বারাই রহিত হয়ে গেছে। অথচ স্ত্রী এক হাযার দিরহাম আদায়ের দায় গ্রহণ করেছে। আর 'কাটাকাটি' হিসাবে পাঁচশ দিরহাম থেকে সে দায়মুক্ত হয়েছে। কেননা স্বামীর কাছে অর্ধেক মোহরানা হিসাবে পাঁচশ পাওনা ছিলো। সুতরাং খোলার বিনিময় যে এক হাযার, তা পূর্ণ করার জন্য পাঁচশ দিরহাম তাকে আদায় করতে হবে।

৫। কেননা স্বামীর উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ মাহর থেকে দায়মুক্ত হওয়া। আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং স্বামীর অনুকূলে স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত অর্থ লাযিম হবে না।

كتاب الظهار

অধ্যায় ঃ যিহার

অধ্যায় ঃ যিহার[১]

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার আম্মার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, তাহলে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তার সাথে সহবাস, তাকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা হালাল হবে না যতক্ষণ না যিহারের কাফফারা আদায় করে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে অতঃপর যা বলেছে তা সংশোধন করতে চায় তাহলে পরস্পর 'স্পর্শ' করার পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করা কর্তব্য।

জাহেলিয়াতের যুগে যিহার তালাক রূপে প্রচলিত ছিলো, শরীয়ত এর মূল বিষয়টিকে বহাল রেখেছে তবে এর হুকুম বিবাহ বিলুপ্তি সাব্যস্ত না করে কাফফারার সময়সীমা পর্যন্ত হারাম হওয়া দ্বারা পরিবর্তন করেছে।

এর কারণ এই যে, এটি একটি অপরাধ। কেননা তা ধিকৃত ও মিথ্যা বক্তব্য। সুতরাং এর শাস্তি রূপে সাময়িক হুরমত (হারাম হওয়া) সাব্যস্তকরণ এবং কাফফারার মাধ্যমে তার মোচন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর 'সংগম' যখন হারাম হবে তখন সংগমোদ্দীপক বিষয়গুলোসহ হারাম হওয়াই স্বাভাবিক, যাতে সংগমে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। যেমন হুকুম ইহরামের ক্ষেত্রে। হায়য ও রোযার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ দুটিই সচরাচর ঘটে থাকে। সুতরাং সংগম অনুষংগগুলোও যদি হারাম করা হয় তাহলে তা কষ্টকর বিষয়ে পর্যবসিত হবে। আর যিহার ও ইহরাম এরূপ নয়।

যদি কাফফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে ইসতিগফার করবে। তবে প্রাথমিক ওয়াজিব কাফফারা ছাড়া অন্যকিছু তার উপর লাযিম হবে না। অবশ্য কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত পুনরায় সহবাস করবে না।

কেননা যে ছাহাবী যিহার করার পর কাফফার আদায়ের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেছিলেন তাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন استغفر الله ولا تعد حتى تكفر -তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং কাফফারা আদায় করার পূর্বে পুনরায় তা কর না।

১। আভিধানিক সূত্রে ظهار অর্থ স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার আম্মার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়। ফিকহের পরিভাষায় যিহার অর্থ, যে সকল মহিলা চিরস্থায়ীভাবে হারাম, এমন কোন মাহরামের সঙ্গে আপন স্ত্রীকে তুলনা করা।

বলাবাহুল্য যে, অন্য কিছু ওয়াজিব হলে অবশ্যই নবী (স) তা বয়ান করতেন।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ বাক্যটির অর্থ যিহার ছাড়া অন্য কিছু হবে না। কারণ এটি যিহারের স্পষ্ট শব্দ।

আর যদি এটা দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য করে থাকে তবু তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা এ বাক্যটা দ্বারা তালাক হওয়ার বিষয়টি (শরীয়তে) রহিত হয়েছে। সুতরাং এটি প্রয়োগ করে তালাকের অর্থ গ্রহণের তার এখতিয়ার হবে না। **আর যদি বলে, তুমি আমার জন্য আমার আম্মার উদরতুল্য, কিংবা তার উরুদেশতুল্য কিংবা তার লজ্জাস্থান তুল্য তাহলে সে যিহারকারী হবে।**

কেননা যিহার অর্থই হলো হালাল স্ত্রীকে হারাম স্ত্রীলোকের সাথে তুলনা করা। আর এই তুলনা বাস্তবায়িত হয় এমন অংগের সাথে (তুলনা করলে) যার দিকে নজর করা জায়েয নেই।

তদ্রূপ যিহার হবে যদি স্ত্রীকে সে আপন কোন মাহরাম স্ত্রীলোকের সাথে তুলনা করে, যার (সতর সমূহের) দিকে তাকানো স্থায়ীভাবেই তার জন্য জায়েয নেই। যেমন তার বোন কিংবা ফুফু কিংবা দুধমা।

কেননা স্থায়ী হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এরা সকলে মায়ের মতই।

একইভাবে যিহার সাব্যস্ত হবে যদি স্ত্রীকে সে বলে, তোমার মাথা আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত। কিংবা তোমার লজ্জাস্থান কিংবা তোমার মুখমন্ডল কিংবা তোমার গর্দান কিংবা তোমার অধিকাংশ কিংবা তোমার তৃতীয়াংশ (আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত)। কেননা লোক প্রচলন হিসাবে এ সকল অংগ দ্বারা সম্পূর্ণ দেহ বোঝানো হয়ে থাকে এবং হুকুম সাব্যস্ত হয়।

(হুরমতের হুকুম প্রথমে অনির্ধারিত অংশে সাব্যস্ত হবে)। অতঃপর অনিবার্যভাবে সমগ্র দেহে তা বিস্তার লাভ করবে। যেমন তালাক প্রসংগে বর্ণনা করেছি।

আর যদি বলে, আমার জন্য তুমি আমার মাতাতুল্য অথবা আমার মায়ের মত, তাহলে তার নিয়তের দিকে ফিরে যেতে হবে, যাতে বক্তব্যটির হুকুম পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি সে বলে যে, আমি সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, তাহলে সে যেমন বলেছে তাই হবে।

কেননা কথাবার্তার ক্ষেত্রে তুলনার মাধ্যমে মর্যাদা প্রকাশ করার প্রচলন রয়েছে।

আর যদি বলে যে, আমি যিহার উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে তা যিহার রূপেই গণ্য হবে।

কেননা মায়ের পূর্ণ দেহের সংগে তুলনার মধ্যে তার একটি অংগের সাথে তুলনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যেহেতু তা স্পষ্ট নয় সেহেতু নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে।

আর যদি বলে, আমি তালাক উদ্দেশ্য করেছি তাহলে তা বায়ন তালাক হবে।

কেননা এখানে হুরমতের ক্ষেত্রে মায়ের সংগে তুলনা রয়েছে। সুতরাং যেন সে "তুমি আমার জন্য হারাম" বলেছে এবং তালাকের নিয়ত করেছে।

আর যদি তার কোন নিয়তই না থেকে থাকে তাহলে কিছুই হবে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত। কেননা তুলনাটিকে মর্যাদার অর্থে গ্রহণের সম্ভাব্যতা রয়েছে। ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে এতে যিহার হবে।

কেননা আম্মার একটি অংগের সাথে তুলনা করা যদি যিহার হয় তাহলে পূর্ণ আম্মার সংগে তুলনা করা আরো অধিকভাবে যিহার হবে।

আর যদি বলে যে, শুধু হারাম সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য করেছি, অন্য কিছু নয়। তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে তা ঈলা হবে, যাতে বক্তব্যটির দ্বারা দুটো হুরমতের নিম্নতরটি সাব্যস্ত হয়[১]।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে তা যিহার হবে। কেননা তুলনাবাচক كاف অব্যয় যিহারের জন্যই নির্ধারিত।

আর যদি বলে, তুমি আমার জন্য আমার আম্মার মত হারাম আর একথা দ্বারা যিহার কিংবা তালাকের নিয়ত করে তাহলে তার নিয়ত অনুসারেই হুকুম হবে।

কেননা এখানে দুটো দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ তুলনা বিদ্যমান থাকায় যিহারের এবং হারাম শব্দটি বিদ্যমান থাকায় তালাকের সম্ভাবনা রয়েছে। তখন তুলনার উদ্দেশ্য হবে হারামকে অধিকতর জোরদার করা।

আর যদি তার কোন নিয়ত না থাকে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে তা ঈলা হবে। এবং ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে তা যিহার হবে। আর উভয় মতামতের কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, আমার জন্য তুমি আমার আম্মার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় হারাম। আর এ কথা দ্বারা তালাক কিংবা ঈলা এর নিয়ত করলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যিহার ছাড়া অন্য কিছু হবে না। আর সাহেবায়ন বলেন, সে যা নিয়ত করেছে তাই হবে। কেননা (এইমাত্র) আমরা বর্ণনা করেছি যে, হারাম শব্দটি উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে। তবে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে, যখন তালাকের নিয়ত করবে তখন যিহার সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে তালাক ও যিহার দুটোই হবে। যথাস্থানে (মাবছূত কিতাবে) বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এটি যিহারের স্পষ্ট অর্থ দানকারী শব্দ। সুতরাং এখানে অন্য অর্থের সম্ভাব্যতা থাকবে না।

তাছাড়া এটি হচ্ছে দ্ব্যর্থতামুক্ত। সুতরাং হারাম শব্দটিকে যিহারের অর্থেই গ্রহণ করা হবে। **ইমাম মুহম্মদ (জামে ছগীর কিতাবে) বলেছেনঃ আর স্ত্রী ব্যতীত কারো প্রতি যিহার হয়না। সুতরাং কেউ যদি দাসীর সাথে যিহার করে তবে সে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে না।** কেননা (যিহার সম্পর্কিত আয়াতে) আল্লাহ তা'আলা من نسائهم (তাদের স্ত্রী[২]দের সাথে) বলেছেন। তাছাড়া দাসীর ক্ষেত্রে সম্ভোগ বৈধতা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বের অনুগত। সুতরাং বিবাহিত স্ত্রীর সংগে সম্পৃক্ত হতে পারে না। তাছাড়া যিহার হচ্ছে তালাকের পরিবর্তে ব্যবহৃত। আর দাসীর ক্ষেত্রে তালাকের কোন অবকাশ নেই।

কোন স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া যদি কেউ তাকে বিবাহ করে অতঃপর তার সাথে যিহার করে তারঃপর স্ত্রী লোকটি বিবাহ অনুমোদন করে তাহলে উক্ত যিহার বাতিল হবে।

১। কেননা বক্তব্যটির দাবী হচ্ছে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া। আর যিহারের তুলনায় ঈলার হুরমত হচ্ছে লঘুতর। আর লঘুতরটির নিয়ত থাকা নিশ্চিত। কাজেই তাই গ্রহণীয় হবে।

২। نساء শব্দটি মূলতঃ امرأة এর বহুবচন, যা সকল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত। তবে ভাষার প্রয়োগিক দিক এবং আয়াতের উদ্দেশ্যগত দিক বিবেচনা করে স্ত্রীগণ অর্থ করা হয়েছে, আহলে তাফসীর এ বিষয়ে একমত।

কেননা যিহার প্রয়োগের সময় এই তুলনার বিষয়ে সে সত্যবাদী। সুতরাং এটা নিন্দনীয় ও মিথ্যা ভাষণ ছিলো না।

আর যিহার বিবাহের অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, যার জন্য (বিবাহের সাথে) যিহারও ঝুলন্ত থাকবে। পক্ষান্তরে জবর দখলকারীর নিকট থেকে গোলাম খরিদকারীর গোলাম আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুক্তিদান হচ্ছে মালিকানার অন্যতম অধিকারভুক্ত বিষয়।

আর যদি কেউ তার সকল স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা সকলে আমার জন্য আমার আম্মার পৃষ্ঠদেশ সমতুল্য, তাহলে সে সকলের ক্ষেত্রে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে।

কেননা যিহারকে সে সকলের সংগে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তা সকলের সংগে তালাক সম্পৃক্ত করার মত হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রীর বিপরীতে তার উপর একটি কাফফারা সাব্যস্ত হবে।

কেননা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হুরমত সাব্যস্ত হবে। আর কাফফারা হচ্ছে হুরমত বিলুপ্তির কাম্য। সুতরাং হুরমতের (ক্ষেত্র) একাধিক হওয়ার কারণে কাফফারাও একাধিক হবে।

পক্ষান্তরে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে ঈলা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে কাফফারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (আল্লাহর) নামের হুরমত রক্ষা করা আর নাম উচ্চারণ একাধিবার হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ কাফফারা প্রসংগে

যিহারের কাফফারা হচ্ছে একটি গোলাম আযাদ করা। গোলাম না পেলে দুই মাস লাগাতার সিয়াম পালন করা আর তা করতে সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার দান করা।

কেননা এ প্রসংগ সম্বলিত আয়াতে কাফফারার এই পর্যায়ক্রমই বর্ণনা করা হয়েছে। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এসবই স্ত্রী স্পর্শের পূর্বে হতে হবে।**

মুক্তিদান ও সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে তো আয়াতেই বিষয়টি সুস্পষ্ট আছে। আহার দানের ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে। কেননা যিহারের কারণে কাফফারা হচ্ছে হুরমত অবসানকারী। সুতরাং সেটাকে সহবাসের উপর অগ্রবর্তী করা অপরিহার্য, যাতে সহবাস হালাল হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে কাফের ও মুসলিম, নারী পুরুষ এবং সাবালক ও নাবালেগ যে-কোন গোলাম যথেষ্ট হবে।

কেননা আয়াতে বিদ্যমান رقبة (গর্দান) শব্দটি উল্লেখিত সকলের উপর প্রযুক্ত হয়। কেননা رقبة অর্থ মালিকানাধীন সত্তা, যা সর্বদিক থেকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ[১]।

ইমাম শাফেয়ী (র) কাফের দাস-দাসী সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, কাফফারা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হক। সুতরাং এটাকে আল্লাহর শত্রুর অভিমুখী করা যায় না, যেমন যাকাতের হুকুম।

আমাদের দলীল এই যে, আয়াতের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে গোলাম আযাদ করা। আর এখানে তা সাব্যস্ত হয়েছে।

আর মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে আযাদ করার অর্থ হলো (গোলামকে স্বাধীনভাবে) আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ দান। কিন্তু তার পরেও নাফরমনির সাথে সম্পৃক্ত থাকা, সে নিজে মন্দ পথ বেছে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। **অন্ধ এবং হাতকাটা বা পা কাটা দাস আযাদ করা যথেষ্ট হবে না।**

কেননা এখানে অঙ্গের উপকারিতা অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি, ধরার শক্তি, চলার শক্তি পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। আর এটিই হলো কাফফারার প্রতিবন্ধকতা।

পক্ষান্তরে যদি উপকারিতায় শুধু ত্রুটি আসে তবে তা কাফ্ফারার জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। সুতরাং এক চক্ষু বিশিষ্ট এক হাত ও এক পা বিপরীত দিক থেকে কাটা গোলাম আযাদ করা বৈধ হবে। কেননা এ অবস্থায় পূর্ণ উপকারিতা বিনষ্ট হয়নি, বরং ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।

পক্ষান্তরে এক পার্শ্বের হাত ও পা কর্তিত গোলাম আযাদ করা জায়েয হবে না। কেননা হাঁটার পূর্ণ উপকারিতা বিনষ্ট হয়েছে। কেননা এ অবস্থায় হাঁটা দুঃসাধ্য।

১। এ কারণেই কিতাবত চুক্তিবদ্ধ যে গোলাম কোন অর্থ এখনো পরিশোধ করেনি, তাকে কাফফারা হিসাবে আযাদ করা বৈধ। কিন্তু মুদাব্বার (মালিকের মৃত্যু সাপেক্ষে মুক্তির প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত) গোলামকে কাফফারা হিসাবে আযাদ করা সহী নয়। কেননা তার দাসত্ব সার্বিক নয়, বরং মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বধির গোলাম আযাদ করা জায়েয হবে। অবশ্য কিয়াসের দাবী হলো জায়েয না হওয়া এবং এটা نوادر গ্রন্থের বর্ণনা।

কেননা এখানেও উপকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। তবে আমরা সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবেক বৈধতার রায় দিয়েছি। কেননা মূল উপকারিতা তা এখনো বহাল রয়েছে। এ কারণেই তার কানের কাছে চিৎকার করলে সে শুনতে পায়। তবে যদি জন্মবধির হয়, যে কোন শব্দই শুনতে পায় না, তাহলে তাকে আযাদ করা যথেষ্ট হবে না।

যার উভয় হাতের বৃদ্ধাংগুলি কর্তিত, তাকে আযাদ করা জায়েয হবে না।

কেননা বৃদ্ধাংগুলি দ্বারাই ধরার শক্তি লাভ হয়। সুতরাং এ দুটো বিনষ্ট হওয়া দ্বারা উপকারিতার একটি প্রকার পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

যে পাগল জ্ঞান রাখে না তাকে আযাদ করা জায়েয হবে না।

কেননা অংগ প্রত্যংগ দ্বারা উপকার লাভ বিবেক ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং সে সকল উপকারিতা রহিত ব্যক্তি হয়ে গেল। **যে ব্যক্তি কখনো পাগল এবং কখনো সুস্থ হয়, তাকে আযাদ করা যথেষ্ট হবে। কেননা এরূপ ত্রুটি প্রতিবন্ধক নয়।**

মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করা জায়েয নয়।

কেননা একদিক থেকে তারা মুক্তির হকদার হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের মাঝে দাসত্ব গুণের দুর্বলতা রয়েছে।

তদ্রূপ যে মুকাতাব ধার্য অর্থের অংশবিশেষ আদায় করেছে, তাকে আযাদ করা যথেষ্ট হবে না।

কেননা তার মুক্তিদান হবে বিনিময় গ্রহণসহ। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সর্বদিক থেকে দাসত্ব গুণটি যেহেতু বিদ্যমান, সেহেতু তাকে আযাদ করা গ্রহণযোগ্য হবে। দাসত্ব গুণ সার্বিকভাবেই বিদ্যমান বলেই কিতাবত চুক্তি গোলামের পক্ষ হতে প্রত্যাহারযোগ্য। আর উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের হুকুমটি এর বিপরীত। কারণ এ দুটি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রাখে না।

আর যদি এমন মুকাতাবকে আযাদ করে, যে কোন অর্থ পরিশোধ করেনি, তাহলে তা জায়েয হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, কিতাবত চুক্তির দিক থেকে সে মুক্তির হকদার হয়ে গেছে। সুতরাং সে মুদাব্বারের সদৃশ হয়ে গেলো।

আমাদের দলীল এই যে, মুকাতাব গোলামের দাসত্ব গুণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি। তাছাড়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المكاتب عبد ما بقى عليه درهم

একটি দিরহাম পরিশোধ করা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মুকাতাব গোলাম রূপেই গণ্য হবে।

আর কিতাবত চুক্তি দাসত্ব গুণের পরিপন্থী[১] নয়।

১। এটা স্বতন্ত্র যুক্তি। অর্থাৎ কিতাবত চুক্তির পূর্বে তো মুকাতাব অবশ্যই গোলামে ছিলো। সুতরাং এই দাসত্ব এখনো বহাল থাকবে। কেননা কোন গুণ তার বিপরীত গুণের উপস্থিতি ছাড়া বিলুপ্ত হয় না। আর কিতাবাত চুক্তি দাসত্ব গুণের বিপরীত গুণ নয়।

কেননা কিতাবত অর্থ হলো স্বকীয় কার্যক্ষমতার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। যেমন গোলামকে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অবশ্য কিতাবাত ক্ষেত্রে এটা হয় বিনিময়ের মাধ্যমে, তাই মনিবের দিক থেকে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে।

আর যদি ধরেও নেই যে, কিতাবাত চুক্তি দাসত্ব গুণের প্রতিবন্ধক, তাহলে যেহেতু এটি প্রত্যাহার যোগ্য, সেহেতু মুক্তিদানের অনিবার্য দাবী রূপে প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে।

তবে তার উপার্জন ও সন্তান সন্ততি তারই অনুকূলে সংরক্ষিত থাকবে। কেননা 'ক্ষেত্রটিতে' মুক্তি সাব্যস্ত হচ্ছে কিতাবাতের দিক থেকে।

কিংবা বলা যায় যে, কিতাবাত চুক্তির প্রত্যাহার হচ্ছে অনিবার্য প্রয়োজন জনিত। সুতরাং সন্তান ও উপার্জনের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না।

আর যদি কাফফারা বাবদ আযাদ করার নিয়তে আপন পিতা বা পুত্রকে খরিদ করে তাহলে কাফফারা হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জায়েয় হবে না। কসমের কাফফারা সম্পর্কেও একই পার্থক্য রয়েছে। ইয়ামীন অধ্যায়ে এ মাসআলা ইনশাআল্লাহ আলোচিত হবে।

যদি সচ্ছল ব্যক্তি শরীকানা গোলামের অর্ধেক আযাদ করে আর বাকি অর্ধেকের মূল্য (শরীকদারকে) দিয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা জায়েয হবে না। সাহেবায়নের মতে জায়েয হবে।

কেননা অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে শরীকদারের অংশেরও সে মালিক হয়ে যায়। সুতরাং সে পুরো গোলামকেই কাফফারা বাবদ আদায়কারী হলো। এমন অবস্থায় যে, গোলামটি তারই মালিকানাভুক্ত।

পক্ষান্তরে মুক্তিদানকারী অসচ্ছল হলে কাফফারা হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তখন গোলামের অবশ্য কর্তব্য হবে শরীকদারের হিসাবের ব্যাপারে উপার্জন ও শ্রমে আত্মনিয়োগ করা। এমতাবস্থার বিনিময় ভিত্তিক মুক্তিদান হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, শরীকদারের হিসাব তার মালিকানায় থাকা অবস্থাতেই ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর অর্থ পরিশোধের ও জামানাতের মাধ্যমে মালিকানা তার দিকে হস্তান্তরিত হয়। আর এরূপ হওয়া কাফফারার জন্য প্রতিবন্ধক।

আর যদি নিজের গোলামকে কাফফারা বাবদ প্রথমে অর্ধেক আযাদ করে অতঃপর বাকি অর্ধেক কাফফারা বাবদই আদায় করে তাহলে জায়েয হবে।

কেননা (ছুরতে হাল এই যে,) দুটি স্বতন্ত্র বাক্য উচ্চারণ করে সে যেন তাকে আযাদ করেছে আর ক্রটি তার নিজের মালিকানাতেই সাব্যস্ত হয়েছে এবং কাফফারা বাবদ আযাদ করার কারণেই হয়েছে। আর এ ধরনের ক্রটি (কাফফারার জন্য) প্রতিবন্ধক নয়। যেমন কোরবানীর জন্য বকরী শোয়াল। আর তখন চোখে ছুরি লেগে গেলো।

পূর্ববর্তী ছুরতটি ভিন্ন। কেননা সেখানে 'ক্রটি' শরীকদারের মালিকানায় সাব্যস্ত হয়েছে।

এ হুকুম হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মূলনীতি অনুযায়ী। আর সাহেবায়নের মতে মুক্তিদান আংশিকতা গ্রহণ করে না। সুতরাং অর্ধেক আযাদ করার অর্থ পূর্ণ গোলামকেই আযাদ করা। তাই দুই বাক্যে আযাদ করা নয়, বরং এক বাক্যে।

আর যদি কাফফারা বাবদ আপন গোলামের অর্ধেক আযাদ করে তারপর যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অতঃপর অবশিষ্টাংশ আযাদ করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা জায়েয হবে না।

কেননা তাঁর মতে মুক্তিদান আংশকিতা গ্রহণ করে না। অথচ 'মিলনের' পূর্বে মুক্তিদানের শর্ত নছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এখানে অর্ধেক গোলামের মুক্তি সম্পন্ন হয়েছে 'মিলন' এর পরে।

পক্ষান্তরে সাহেবায়নের মতে যেহেতু অংশবিশেষ মুক্তিদানের অর্থ পূর্ণ গোলামকেই মুক্তিদান; সেহেতু পূর্ণ গোলামের মুক্তি সহবাসের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

যিহারকারী যদি আযাদ করার মত গোলাম না পায় তাহলে তার কাফফারা হলো দু'মাস লাগাতার সিয়াম পালন। তন্মধ্যে রমযান মাস, দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীক থাকতে পারে না।

লাগাতার শর্ত এ কারণে যে, তা নছ দ্বারা প্রমাণিত। আর রমযান মাস তো যিহারের সিয়াম হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা তাতে আল্লাহ পাক যা ওয়াজিব করেছেন, তা বাতিল করা হয়। পক্ষান্তরে ঐ সকল সিয়াম পালন নিষিদ্ধ। সুতরাং এই সিয়াম পূর্ণ ওয়াজিবের স্থলবর্তী হতে পারে না।

যদি এই দুই মাসের রাত্রে ইচ্ছাক্রমে কিংবা দিনে ভুলক্রমে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে নতুন ভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে না।

কেননা এই সহবাস ধারাবাহিকতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কারণ এ দ্বারা তো সিয়াম ফাসেদ হচ্ছে না। আর ধারাবাহিকতাই হচ্ছে কাফফারার সওমের শর্ত।

আর সহবাসকে সিয়ামের উপর অগ্রবর্তী করা যদিও শর্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তাতে সিয়ামের অন্তত: কিছু অংশকে সহবাসের উপর অগ্রবর্তী করা হয়। পক্ষান্তরে আপনাদের গৃহীত মতে তো সমগ্র সিয়ামকে সহবাসের পশ্চাদ্‌বর্তী করা হয়।

শায়খায়নের দলীল এই যে, কাফফারার সিয়াম ক্ষেত্রে শর্ত হলো সিয়াম গুলো সহবাসের পূর্বে হওয়া এবং সগবাস থেকে মুক্ত হওয়া। এই দ্বিতীয় শর্তটি হল আয়াতের অনিবার্য দাবী। আর মধ্যবর্তী সহবাস দ্বারা এই শর্তটি অস্তিত্বহীন হচ্ছে। সুতরাং সিয়াম নতুনভাবে পালন করতে হবে।

আর যদি কোন ওজরের কারণে কিংবা বিনা ওজরে ঐ দুইমাসের একদিনও সিয়াম পালন না করে তাহলে নতুনভাবে সওম রাখতে হবে। কেননা সাধারণতঃ সক্ষম হওয়া

সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে। গোলাম যদি যিহার করে তাহলে তার কাফফারা **সিয়াম ছাড়া অন্য কিছু জায়েয নয়।**

কেননা কোন সম্পদের উপর তার মালিকানা সেই। সুতরাং সে মাল দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার যোগ্য হতে পারে না। আর যদি গোলামের পক্ষ থেকে তার মনিব কোন গোলাম আযাদ করে দেয় বা মিসকীনকে খাওয়ায় তাহলে তা জায়েয হবে না।

কেননা সে মালিক হওয়ার যোগ্যই নয়। সুতরাং মনিব তাকে কোন সম্পদের মালিক বানালেও সে মালিক হবে না।

যিহারকারী যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

আর যে (রোযা রাখতে) সক্ষম হল না, তার কর্তব্য হলো যাটজন মিসকীনকে আহার দান করা।

প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ ছা' গম কিংবা এক ছা' খেজুর বা জব কিংবা সেগুলোর মূল্য প্রদান করবে।

কেননা আওস ইবনে ছামিত ও সাহল ইবন ছাখর সম্পর্কিত হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মিসকীনের জন্য অর্ধ ছা' গম। তাছাড়া এই কারণে যে, আসল বিচার্য হলো প্রত্যেক মিসকীনের একদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়া। সুতরাং এটাকে ছাদাকাতুল ফিত্র এর উপর কিয়াস করা হবে।

আর মূল্য পরিশোধের বৈধতার বিষয়টি হলো আমাদের মাযহাব। যাকাত অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

আর যদি ছা-এর চতুর্থাংশ গম এবং তার অর্ধ ছা খেজুর বা জব দেয় তবে জায়েয হবে। কেননা এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে এবং এগুলির মৌলিক শ্রেণী অভিন্ন। **যদি অন্য কাউকে তার যিহারের কাফফারা বাবদ তার পক্ষ হতে আহার দান করতে বলে আর সে তা করে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তা জায়েয হবে।**

কেননা গুণগতভাবে এটা হচ্ছে ঋণ গ্রহণ। আর দরিদ্র ব্যক্তিটি হচ্ছে প্রথমে আদেশ দাতার পক্ষ থেকে অতঃপর নিজের জন্য হস্তগতকারী। সুতরাং আদেশদাতার পক্ষ থেকে মালিকানা গ্রহণ অতঃপর দরিদ্রকে মালিকানা দান সাব্যস্ত হয়েছে।

যদি তাদের সকাল-বিকাল খাবার খাইয়ে দেয় তাহলে জায়েয হবে। অল্প আহার করুক, কিংবা বেশী।[১]

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মালিক বানিয়ে দেওয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। তিনি যাকাত ও ছাদাকাতুল ফিতরের উপর কিয়াস করেন।

১। শুধু এক বেলা খাবার খাওয়ানো যথেষ্ট নয়। তদ্রূপ ষাটজনকে দুপুরের খাবার এবং অন্য ষাটজনকে রাতের খাবার খাওয়ানো যথেষ্ট নয়।

আর তা এ জন্য যে, মালিকানা প্রদান হচ্ছে অধিকতর প্রয়োজন নিবারক। সুতরাং إباحة। (শুধু খাওয়ার অনুমতি প্রদান) তার স্থলবর্তী হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, আয়াতে বর্ণিত শব্দ হচ্ছে طعام। আর এর মূল অর্থ হচ্ছে আহার গ্রহণের সুযোগ-প্রদান। আর إباحة। (বা বসে যত ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি প্রদান) এর মধ্যে তা পাওয়া যাচ্ছে, যেমন পাওয়া যাচ্ছে মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যাকাতের ক্ষেত্রে (নস এর শব্দ) ايتاء। (প্রদান) এবং ছাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে اداء। ওয়াজিব। আর এ দুটি শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মালিক বানানো।

আহার গ্রহণকারীদের মাঝে যদি দুধ ছাড়ার বয়সের শিশু থাকে তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা সে পূর্ণ আহার্য খেতে পারে না।

জবের রুটির ক্ষেত্রে সালন দেওয়াও জরুরী, যাতে তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারে। আর গমের রুটির ক্ষেত্রে সালন দেওয়া শর্ত নয়।

যদি একজন মিসকীনকে ষাট দিন খাদ্য দান করে তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু একদিনে একজনকে ষাট জনের পরিমাণ দান করলে তা একদিনের অধিকের জন্য যথেষ্ট হবে না।

কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাব গ্রস্তের অভাব মিটান। আর প্রয়োজন প্রতিদিন নবায়িত হয়। সুতরাং দ্বিতীয় দিন একই ব্যক্তিকে দান করা অন্য একজনকে দান করার মত হবে।

إباحة (আহার গ্রহণের অনুমতি দান) এর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। পক্ষান্তরে একজন মিসকীনকে একদিনে দফায় দফায় মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন, গ্রহণযোগ্য আবার কেউ কেউ বলেন, গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা একই দিনের মালিকানা প্রদানের প্রয়োজন নবায়িত হতে পারে[১]। পক্ষান্তরে একই দিনে (একই মিসকীনকে) এক দফায় একাধিক পরিমাণ প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আলাদাভাবে প্রদান 'নস' দ্বারা ওয়াজিব।

যদি আহার দানের মধ্যবর্তী অবস্থায় যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে নতুনভাবে আহার দান করতে হবে না।

কেননা আহার দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সহবাসের পূর্বে হওয়ার শর্ত আরোপ করেন নি। তবে আহার দান সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তাকে সহবাস করা থেকে নিষেধ করা হয়। কেননা হতে পারে যে, ইতিমধ্যে সে গোলাম আযাদ করতে কিংবা সওম পালনে সক্ষম হয়ে যাবে। তখন গোলাম আযাদ করা ও সিয়াম পালন সহবাসের পরে হয়ে যাবে।

আর অন্য কোন কারণে নিষিদ্ধ হওয়া সত্তাগত বৈধতাকে বিলুপ্ত করে না।

১। কেননা মানুষের প্রয়োজন বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। সুতরাং একই দিনে বিভিন্ন দফায় যদি প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন বিভিন্ন দিনে একই জনকে প্রদান করলে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে একজন মিসকীনের এক দফা শুধু আহার গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সুতরাং একবার যখন (সকাল সন্ধ্যা) সে আহার গ্রহণ করলো তখন সেদিনের প্রয়োজন তার শেষ হয়ে গেলো। পরবর্তী দিনের পূর্বে এই প্রয়োজন নতুন ভাবে আর দেখা দেবে না।

যদি দুটি যিহার বাবদ ষাটজন মিসকীনকে আহার দান করে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক ছা' পরিমাণ গম দান করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর মতে দুটির মধ্যে শুধু একটি যিহারের জন্য তা যথেষ্ট হবে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, উভয় যিহারের জন্য যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যিহারকারী ব্যক্তি যদি একটি রোযা ভংগের কাফফারা এবং একটি যিহারের কাফফারা বাবদ উক্ত পরিমাণ আহার প্রদান করে, তাহলে (সর্বসম্মতিক্রমে) উভয় কাফফারা বাবদ তা যথেষ্ট হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, আদায়কৃত খাদ্যদ্রব্য পরিমাণের দিক থেকে দুটি যিহারের জন্য যথেষ্ট। আর যাদের মাঝে ব্যয় হরা হয়েছে তারা দুটি যিহারের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুতরাং তা দুটি যিহারের জন্য সাব্যস্ত হবে। যেমন যদি দুটি কাফফারার সূত্র ভিন্ন হয়, কিংবা দুই অর্ধ ছা' আলাদা করে প্রদান করা হয় (তবে তা জায়েয)।

শায়খায়নের দলীল এই যে, একই 'জিনস' এর ক্ষেত্রে (পৃথকীকরণের) নিয়ত করা অর্থহীন। পক্ষান্তরে ভিন্ন জিনস-এর ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য।[১]

আর নিয়ত যখন বাতিল হলো এবং আদায়কৃত পারিমাণও একটি কাফফারার জন্য পর্যাপ্ত। কেননা অর্ধ ছা' তো নিম্নতম পরিমাণ। সুতরাং এর চাইতে কম পরিমাণ নিষিদ্ধ হবে। অধিক পরিমাণ নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং আদায়কৃত পরিমাণ একটি কাফফারায় সাব্যস্ত হবে; যেমন যদি শুধু কাফফারার নিয়ত করে।

পক্ষান্তরে দুই অর্ধ ছা' আলাদাভাবে প্রদান করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দ্বিতীয় দফা প্রদান অন্য মিসকীনকে প্রদানের হুকুমে গণ্য।

কারো উপর দুটি যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হলো আর সে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন একটির নিয়ত না করে দুটি গোলাম আযাদ করলো তাহলে দুটি কাফফারাই আদায় হয়ে যাবে। অদ্রূপ যদি চারমাস সাওম করে কিংবা একশ বিশজন মিসকীনকে আহার প্রদান করে তবে তা জায়েয।

কেননা এখানে জিনস অভিন্ন। সুতরাং নির্দিষ্টতাবে নিয়তের প্রয়োজন নেই।

আর যদি উভয় কাফফারার জন্য একটি গোলাম আযাদ করে কিংবা দুই মাস সিয়াম পালন করে তবে তার এটাকে দুটির যে কোন একটির জন্য নির্ধারণ করার অধিকার আছে।

আর যদি যিহারের এবং হত্যার কাফফারা বাবদ (একটি গোলাম) আযাদ করে তাহলে দু'টি কাফফারার কোনটিই আদায় হবে না।

ইমাম যোফার (র) বলেন, উভয় ছূরতেই দু'টি কাফফারার কোনটি আদায় হবে না।

১। কেননা নিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা। আর এখানে তো অভিন্ন শ্রেণীর জিনিস। যেমন দেখুন, কারো যদি রমযানের কয়েকটি রোযা কাযা হয়ে থাকে তাহলে শুধু কাযা রোযার নিয়ত করাই যথেষ্ট। নির্ধারিত দিনের রোযার নিয়ত করা জরুরী নয়। পক্ষান্তরে যদি রমযানের কাযা এবং মান্নতের রোযা হয়, তাহলে রমযান অথবা মান্নত দুটির কোনটি রাখা হচ্ছে, তা নিয়তের মাধ্যমে পৃথক করতে হবে। কেননা দুটি সওব ভিন্ন শ্রেণীর।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ছূরতের মধ্যেই দুটি কাফফারার যে কোনটির জন্য এটাকে সে নির্ধারণ করতে পারে।

কেননা (পাপ মোচনের) উদ্দেশ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে সকল কাফফারা অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত।

ইমাম যোফার (র) এর দলীল এই যে, প্রতিটি যিহার বাবদ সে অর্ধেক গোলাম আযাদ করেছে। সুতরাং দু'টির পক্ষ থেকে আযাদ করার পর যে কোন একটির জন্য নির্ধারণ করার অধিকার তার থাকতে পারে না। কেননা বিষয়টি তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

আমাদের দলীল এই যে, অভিন্ন জিনসের ক্ষেত্রে নির্ধারণের নিয়ত করা অর্থহীন। সুতরাং তা বাতিল হবে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে তা অর্থবহ।

আর এখানে হুকুম তথা কাফফারার ক্ষেত্রে কিসাসের ভিন্নতা কারণের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল।

প্রথমটির উদাহরণ এই যে, রমযানের দু'দিনের কাযার নিয়তে একদিন সিয়াম করলো তাহলে তা একদিনের কাযার জন্য যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ শ্রেণী ভিন্নতার) উদাহরণ এই যে, যদি কাযার রোযা এবং মান্নতের রোযা ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে (কোন্‌টি আদায় করা হচ্ছে) তা নিয়তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা জরুরী। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

باب اللعان
অধ্যায় ঃ লি‘আন

অধ্যায় ঃ লি'আন[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দেয় আর তারা উভয়ে সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত[২] হয় এবং স্ত্রী লোকটি এমন হয়, যার অপবাদকারীর উপর হদ্দ কায়েম হয়[৩] কিংবা স্বামী (প্রসবের পর পর) স্ত্রীর সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করে আর স্ত্রী যদি অপবাদের 'প্রতিবিধান' দাবী করে তবে স্বামীর উপর লি'আন প্রবর্তিত হবে।

মূলত: আমাদের মতে লি'আন হলো কসম দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এবং অভিসম্পাত শব্দযোগে উচ্চারিত সাক্ষ্যসমূহ। স্বামীর ক্ষেত্রে এ হল হদ্দের স্থলবর্তী আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যতিচারের হদ্দের স্থলবর্তী। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

—আর যারা আপন স্ত্রীগণকে (ব্যভিচারের অভিযোগে) অভিযুক্ত করে অথচ তাদের কোন সাক্ষী নেই নিজেরা ব্যতীত। (এখানে নিজেদেরকে সাক্ষীদল থেকে 'ইসতিছনা' বা ব্যতিক্রম করা হয়েছে।) আর নিয়ম অনুযায়ী ইসতিসনা হয়ে থাকে সমশ্রেণী থেকে। আবার আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

তখন তাদের কোন একজনের সাক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নামে চারবার স্যাক্ষ্য।

এ আয়াতে সাক্ষ্য ও কসমের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। তাই আমরা বলি যে, কসম দ্বারা জোরদারকৃত সাক্ষ্যই হলো লি'আনের রোকন। অতঃপর রোকনের সাথে স্বামীর দিকে লা'নাত বাক্য যুক্ত করা হয়েছে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় আর এটি হল অপবাদের হদ্দের স্থলবর্তী। পক্ষান্তরে স্ত্রীর দিকে থেকে (আল্লাহর) গজব বাক্য যুক্ত করা হয়েছে; আর এটি হল যিনার হদ্দের স্থলবর্তী।

এটি যখন সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলি যে, যেহেতু লি'আনের রোকনই হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদান সেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তদ্রূপ স্ত্রীকেও এমন হতে হবে, যার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগকারীর উপর হদ্দ কায়েম করা হয়। কেননা স্বামীর ক্ষেত্রে লি'আন হচ্ছে অপরাধের হদ্দের স্থলবর্তী। সুতরাং স্ত্রী محصنة (সতী) হওয়া জরুরী।

সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করা দ্বারাও লি'আন সাব্যস্ত হয়। কেননা স্ত্রীর সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করার অর্থ স্পষ্টতঃ তার উপর যিনার অপবাদ আনা। এই সম্ভাবনাকে বিবেচনায়

১। لعان এর শাব্দিক অর্থ হলো বিতাড়ন ও দূরীকরণ। শরীয়তের পরিভাষায় লি'আন অর্থ স্বামীর পক্ষ হতে অপবাদ আরোপের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অভিসম্পাত ও গজব শব্দ যোগে অনুষ্ঠিত কাজের বিনিময়।

২। এ জন্যই দাস-দাসীর উপর লি'আন নেই।

৩। স্ত্রীলোকটি যদি পিতৃপরিচয়হীন কোন সন্তানের মা হয়ে থাকে তবে তার নামে অপবাদকারীর উপর লি'আন সাব্যস্ত হয় না।

আনা হবে না যে, (স্বামী হয়ত দাবী করেছে যে,) সন্তানটি 'সন্দেহমূলক সহবাসের' কারণে অন্য কারো ঔরসে হয়েছে। যেমন যদি কোন বক্তি সন্তানের স্বীকৃত পিতা থেকে ঔরসজাত হওয়া অস্বীকার করে (তাকে অপবাদাকরী গণ্য করা হয়)।

আর এর কারণ এই যে, বিশুদ্ধ শয্যাই হলো নসব ছাবিতের মূল বিষয়। আর শরীয়তে ফাসিদ শয্যাকে বিশুদ্ধ শয্যার সংগে যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বিশুদ্ধ শয্যা থেকে সন্তানের নসব ও পিতৃপরিচয় অস্বীকার করার অর্থই হলো ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ, যতক্ষণ না ফাসেদ শয্যা হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে লি'আনের দাবী করার শর্ত এ জন্য যে, এটি তার হক। সুতরাং তার পক্ষ থেকে হকের দাবী উত্থাপন জরুরী। যেমন অন্য সকল হকের ক্ষেত্রে। **স্বামী যদি লি'আন থেকে বিরত থাকে তাহলে বিচারক তাকে আটক করবে, যাতে হয় সে লি'আন করবে,না হয় নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে নিবে।**

কেননা এটা তার উপর ওয়াজিব একটি হক, যা সে পূর্ণ করতে সক্ষম। সুতরাং তাকে আটক করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে তার উপর ওয়াজিব বিষয়টি সম্পন্ন করে কিংবা নিজেকে মিথাবাদী বলে স্বীকার করে, যাতে লি'আনের কারণ দূরীভূত হয়।

স্বামী যদি লি'আন সম্পন্ন করে তাহলে স্ত্রীর উপরও লি'আন ওয়াজিব হবে।

প্রমাণ হলো ইতিপূর্বে আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত। তবে স্বামীকে দিয়ে লি'আনের সূচনার কারণ এই যে, স্বামীই হচ্ছে বাদী।

স্ত্রী যদি (লি'আন থেকে) বিরত থাকে তাহলে বিচারক তাকে আটক করে রাখবে, যতক্ষণ না সে লি'আন করে কিংবা স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

কেননা এই লি'আন হচ্ছে স্ত্রীর উপর স্বামীর ওয়াজিব হক। আর সে তা আদায় করতে সক্ষম। সুতরাং এই হক আদায়ের ব্যাপারে তাকে আটক করা হবে।

স্বামী যদি দাস হয় কিংবা কাফের হয় কিংবা ইতিপূর্বে অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্ত হয় আর সে আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে।

কেননা তার দিক থেকে উদ্ভূত করণে (অর্থাৎ সে সাক্ষী-প্রমাণের উপযুক্ত না হওয়ার কারণে) লি'আন দুষ্কর হয়েছে। সুতরাং অপবাদ আরোপের মূল অনিবার্য ফল যা সেদিকেই রুজু করা হবে। আর তা হলো নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হদ্দে কযফ,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ

(যারা সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মারো।)

আর লি'আন হল তার স্থলবর্তী। **পক্ষান্তরে স্বামী যদি সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, আর স্ত্রী দাসী কিংবা কাফির কিংবা অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্তা হয়, কিংবা এমন স্ত্রীলোক হয়, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীর উপর হদ্দ কায়েম হয় না।**

যেমন নাবালিকা হলো কিংবা বিকৃত মস্তিষ্কা হলো কিংবা ব্যভিচারিণী হলো—**তাহলে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং লি'আনও নয়।**

কেননা স্ত্রীর দিক থেকে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নেই এবং সে মুশরিক নয়। আর লি'আন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে স্ত্রীর দিক থেকে উদ্ভূত করণে। সুতরাং হদ্দ রহিত হয়ে যাবে যেমন স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলে। দলীল হল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ

اربعة لا لعان بينهم و بين ازواجهم اليهودية والنصرانية

تحت المسلم والمملوكة تحت الحر و الحرة تحت المملوك

(চার প্রকার স্ত্রীলোক এবং তাদের স্বামীদের মাঝে লি'আন প্রয়োগ হয় না। মুসলিমের বিবাহাধীন ইহুদী ও নাসরানী স্ত্রী। স্বাধীন লোকের বিবাহাধীন দাসী স্ত্রী, দাসের বিবাহাধীন স্বাধীন স্ত্রী।) আর যদি উভয়ে অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে।

লি'আনের বিবরণ এই যে, বিচারক স্বামীকে দিয়ে শুরু করবে এবং চারবার তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে, প্রতিবার স্বামী একথা বলবে, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে আমি সত্যবাদী। পঞ্চমবার বলবে, তার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে যদি সে (নিজে) মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত হোক। প্রতি বারই সে স্ত্রীর দিকে ইংগিত করবে।

অতঃপর স্ত্রী চারবার সাক্ষ্য প্রদান করবে। প্রতিবার বলবে, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সে আমার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে বলবে, যদি আমার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সে সত্যবাদী হয় তাহলে তার (অর্থাৎ আমার) উপর আল্লাহর গজব হোক।

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো ইতিপূর্বে আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত।

ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে হযরত হাসান (র) বর্ণনা করেছেন যে, সম্বোধনের সর্বনাম ব্যবহার করে এভাবে বলবেঃ "আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের যে অভিযোগ এনেছি।" কেননা তা ভিন্ন সম্ভাবনার অধিক নিরসনকারী।

কুদূরীতে উল্লেখিত বর্ণনার কারণ এই যে, তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহারের সংগে যখন তার প্রতি ইংগিত যুক্ত হয় তখন ভিন্ন সম্ভাবনার অবকাশ রহিত হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী বলেন, যখন তারা লি'আন করবে তখন বিচ্ছেদ ঘটবে না যতক্ষণ না কাযী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের রায় দেন।

ইমাম যুফার (র) বলেন, উভয়ের লি'আন সম্পন্ন হওয়া দ্বারাই বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, লি'আন (উভয়ের মাঝে) স্থায়ী হুরমত সাব্যস্ত করে।

আমাদের দলীল এই যে, হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সদাচারের সংগে স্ত্রীকে কাছে রাখার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং স্বামীর কর্তব্য হলো উত্তম পন্থায় তাকে মুক্ত করে দেয়া। এখন যদি সে তা থেকে বিরত থাকে তাহলে কাযী অন্যায় রোধ করার উদ্দেশ্যে স্বামীর স্থলবর্তী হবেন (এবং বিচ্ছেদ কার্যকরী করবেন।)

এর সমর্থন পাওয়া যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে লি'আনকারীর এ উক্তি দ্বারা ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার নামে মিথ্যা বলেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে তাকে রেখে দাও।" সে বলল ঃ "যদি তাকে রাখি তাহলে সে তিন তালাক।"এ কথা সে লি'আনের পরে বলেছিল।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে এ বিচ্ছেদ হবে তালাকে বায়ন। কেননা কাযীর কার্য স্বামীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে যেমন পুরুষত্বহীন স্বামীর ব্যাপারে (কাযীর ফয়সালা তালাকে বায়ন গণ্য হয়)। **স্বামী যদি নিজের মিথ্যার স্বীকারোক্তি করে তাহলে তরফায়নের মতে (অন্য যে কোন পুরুষের মত) সেও বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে।**

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, লি'আন দ্বারা স্থায়ী ভাবে হারাম হয়। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, المتلاعنان لايجتمعان ابداً। লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী কখনো একত্র হতে পারবে না। এ হাদীস স্থায়ী হুরমতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

তারফায়নের দলীল এই যে, মিথ্যার স্বীকারোক্তির অর্থ হলো সাক্ষ্য প্রত্যাহার। আর প্রত্যাহারের পর সাক্ষ্যের বিধানগত কোন অস্তিত্ব থাকে না।

আর (হাদীসের ব্যাপারে ব্যাখ্যা এই যে,) তারা লি'আনকারী থাকা অবস্থায় একত্র হতে পারবেনা। আর এখানে মিথ্যার স্বীকারোক্তির পর লি'আন ও তার হুকুম বিদ্যমান থাকবে না; সুতরাং তারা পুনঃ বিবাহের মাধ্যমে একত্র হতে পারবে।

আর যদি সন্তানের পরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে অপবাদ আরোপ হয়, তাহলে বিচারক (পিতার সাথে) সন্তানের বংশ সম্পৃক্ত নাকচ করে দিয়ে মায়ের সংগে সম্পৃক্ত করে দেবে।

এ ক্ষেত্রে লি'আনের ছূরত হবে এই যে, বিচারক লোকটিকে এরূপ বলতে আদেশ করবেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,সন্তানের পরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উথাপন করেছি, সে বিষয়ে আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

স্ত্রীর পক্ষ থেকেও এরূপ (সন্তানের কথা উল্লেখসহ) বলা হবে।

আর যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং সন্তানকে অস্বীকার করে তবে লি'আনের সময় উভয় বিষয় উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর কাযী সন্তানের পিতৃপরিচয় নাচক করে তাকে আপন মাতার সংগে সম্পৃক্ত করে দেবেন।

কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীর সন্তানের পরিচয়কে হিলাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন মাতার সংগে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, এই লি'আনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান অস্বীকার করা। তাই স্বামীর অনুকূলে তার উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা হবে। সুতরাং কাযীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের ঘোষণা সন্তানের পরিচয় নাচক করাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিচ্ছেদ ঘোষণার সংগে কাযী এ কথাও বলবেন যে,তাকে পিতার বংশ পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে মায়ের সংগে জড়িত করে দিলাম।

কেননা লি'আন সংশ্লিষ্ট বিচ্ছেদ থেকে সন্তানের পিতৃপরিচয় বাতিলের বিষয়টি (কখনো কখনো) পৃথকও হয়ে থাকে[১]। সুতরাং সন্তানের উল্লেখ জরুরী।

লি'আনের পর স্বামী যদি ফিরে আসে এবং নিজের মিথ্যাবাদিতা স্বীকার করে তাহলে কাযী তার উপর অপবাদের হদ্দ কায়েম করবে।

কেননা সে হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে।

তারফায়নের মতে এখন তার জন্য ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। কেননা অপবাদের কারণে যখন তার উপর হদ্দ কায়েম হলো তখন সে ভবিষ্যতের জন্য লি'আনের যোগ্য থাকল

১। কেননা লি'আনের মাধ্যমে বিচ্ছেদের জন্য সন্তানের পিতৃপরিচয় নাচক হওয়া অনিবার্য নয়। যেমন সন্তান যদি ইতিমধ্যে মৃত্যু বরণ করে তাহলে লি'আনের মাধ্যমে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সন্তানের পিতৃপরিচয় নাচক হবে না।

না। সুতরাং লি'আনের সাথে সম্পৃক্ত হারাম হওয়ার হুকুমও প্রত্যাহৃত হবে। **একই হুকুম হবে (অর্থাৎ পুনঃ বিবাহের যোগ্যতা লাভ করবে) যদি অন্য কাওকে অপবাদ দানের অপরাধের হদ্দ প্রাপ্ত হয়।**

এর কারণ এই মাত্র বর্ণনা করেছি।

তদ্রূপ যদি স্ত্রী লোকটি ব্যভিচার করে হদ্দ প্রাপ্ত হয়।

কেননা স্ত্রীর দিক থেকে লি'আনের যোগ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে।

যদি নাবালিকা কিংবা বিকৃতমস্তিষ্কা স্ত্রী বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে তাহলে উভয়ের মাঝে লি'আন হবে না।

কেননা তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী যদি অন্য কোন ব্যক্তি হতো তাহলে তার উপর অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ হয় না। সুতরাং স্বামীর জন্যও লি'আন আবশ্যক হবে না। কেননা লি'আন উক্ত হদ্দের স্থলবর্তী।

তদ্রূপ লি'আন হবে না যদি স্বামী নাবালক কিংবা পাগল হয়। কেননা এদের সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নেই।

বোবা ব্যক্তির অপবাদ আরোপের সংগে লি'আনের সম্পর্ক নেই।

কেননা হদ্দে কযফের মতো লি'আনের সম্পর্ক হচ্ছে স্পষ্ট উচ্চারণের সংগে। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে,এ অপবাদ সন্দেহমুক্ত নয়। আর সন্দেহের কারণে হদ্দ প্রত্যাহৃত হয়ে যায়।

স্বামী যদি বলে, তোমার গর্ভ আমার দ্বারা নয় তাহলে লি'আন লাযিম হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মত। কেননা গর্ভ বিদ্যমান থাকা সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং সে অপবাদ আরোপকারী হবে না। আর সাহেবায়ন বলেন, 'গর্ভ' অস্বীকার করলে যদি সে ছয় মাসের দ্বারা লি'আনের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তবে লি'আন ওয়াজিব হবে। মাবছূতে বলা হয়েছে, তার অর্থ। কেননা এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপের সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি। সুতরাং অপবাদ সাব্যস্ত হবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, (গর্ভ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি এই মুহূর্তে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে) তার উপরোক্ত বক্তব্য তাৎক্ষণিত ভাবে যখন 'অপবাদ' হল না, তখন তা শর্তের সাথে ঝুলন্ত বক্তব্যের ন্যায় হলো। সুতরাং যেন সে বললো, যদি তোমার গর্ভে সন্তান থেকে থাকে তাহলে তা আমার নয়। আর অপবাদ শর্তের সাথে যুক্ত করা সহীহ নয়। **যদি স্ত্রীকে সে বলে, তুমি যিনা করেছো আর এ গর্ভ যিনা দ্বারা সঞ্চারিত, তাহলে উভয়কে লি'আন করতে হবে।** কেননা 'যিনা'এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকার কারণে 'অপবাদ' পাওয়া গিয়েছে।

তবে কাযী 'গর্ভ পরিচয়' নাচক করবেন না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা নাচক করবেন। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটির পিতৃপরিচয় হিলাল বিন

উমাইয়া থেকে নাচক করেছিলেন,অথচ হিলাল তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গর্ভাবস্থায় অপবাদ এনেছিলেন। আমাদের দলীল এই যে,গর্ভস্থ সন্তান জন্ম লাভের পরেই তার উপর বিধান প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা জন্মলাভের পূর্বে বিষয়টি সম্ভাবনা গ্রস্ত। আর হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে গর্ভের অস্তিত্বের কথা জেনে ছিলেন।

জন্মের পরপর কিংবা অভিনন্দন গ্রহণ সময়কালে কিংবা প্রসবের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম খরিদের সময়কালে স্বামী যদি তার স্ত্রীর সন্তানের পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করে তাহলে তা সহীহ হবে এবং এ কারণে লি'আন করবে। পক্ষান্তরে যদি এই সময়কালের পরে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন করতে হবে। কিন্তু সন্তানের পিতৃপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, নেফাসের মেয়াদকালে অস্বীকার করা সহীহ হবে।

কেননা (মূলনীতি এই যে,) অল্প সময়ের ভিতরে অস্বীকার করা শুদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরে তা শুদ্ধ নয়। সুতরাং নেফাসের মেয়াদকে উভয় মেয়াদের মাঝে আমরা পার্থক্যকারী সাব্যস্ত করেছি। কারণ নেফাস হচ্ছে প্রসবের চিহ্ন। (সুতরাং চিহ্ন থাকা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় ধরা হবে।)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সময়সীমা নির্ধারণের কোন অর্থ নেই। কেননা সময়টুকু হলো চিন্তাভাবনার অবকাশ প্রদানের জন্য। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবগত অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই আমরা এমন বিষয়কে বিবেচনায় এনেছি, যা সন্তানের পিতৃপরিচয় স্বীকার করা বোঝায়। আর তা হলো অভিনন্দন গ্রহণ করা কিংবা অভিনন্দন জ্ঞাপনের সময় নীরবতা অবলম্বন করা। কিংবা প্রসবকালীন সরঞ্জাম খরিদ করা কিংবা সন্তান অস্বীকার থেকে বিরত অবস্থায় এতটুকু সময় পার হয়ে যাওয়া।

আর যদি অনুপস্থিতির কারণে স্বামী সন্তানের জন্ম সংবাদ না জেনে থাকে তাহলে তার আগমনের পর উল্লেখিত দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে সময় নির্ধারণ করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি একই গর্ভে দুটি সন্তান জন্ম লাভ করে আর প্রথমটিকে অস্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে তাহলে উভয়ের পিতৃপরিচয় সাব্যস্ত হবে।

কেননা এরা উভয়ই যমজ সন্তান একই বীর্য থেকে সৃষ্ট।

আর স্বামীকে অপবাদের হদ্দ লাগানো হবে। কেননা দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করার কারণে নিজেকে সে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছে।

আর যদি প্রথমটিকে স্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করে তাহলে পূর্বোল্লিখিত কারণে উভয়ের পিতৃপরিচয় সাব্যস্ত হবে। তবে লি'আন করতে হবে।

কেননা দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করার কারণে সে অপবাদকারী হয়েছে, আর সে তো প্রত্যাহার করেনি। আর এখানে সতীত্বের স্বীকৃতি অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে হয়েছে। সতুরাং যেন সে তার স্ত্রীকে প্রথমে সতী বলল, এরপর বলল সে ব্যভিচারিণী। আর এ ক্ষেত্রে লি'আন সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এখানেও তা হবে।

অধ্যায়ঃ পুরুষত্বহীনতা ও অন্যান্য প্রসংগ

স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয় তাহলে বিচারক তাকে এক বছরের অবকাশ প্রদান করবেন। এ সময়ের ভিতর যদি সে তার সাথে সহবাসে সক্ষম হয় তাহলে তো ভাল। অন্যথায় স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ দাবী করে তাহলে বিচারক উভয়কে জুদা করে দিবেন।

হযরত উমর, আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এ কারণে যে, স্ত্রীর অনুকূলে সহবাস লাভের অধিকার সাব্যস্ত রয়েছে। আর সহবাস থেকে বিরত থাকাটা সাময়িক কোন অসুস্থতার কারণে হতে পারে। আবার মৌলিকভাবে বিপদ গ্রস্ত কারণেও হতে পারে। আর তা বোঝার জন্য একটা সময়ের অবকাশ জরুরী। এবং সময়াবকাশ আমরা এক বছর নির্ধারণ করেছি। কেননা তাতে চারটি পরিবর্তনশীল মওসুম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি সে সহবাসে সক্ষম না হয় তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এ অক্ষমতার মৌলিক বিপদগ্রস্ততার কারণে ফলতঃ সদাচারের সথে স্ত্রীকে রাখা সম্ভব হয়নি; সুতরাং উত্তম পন্থায় স্ত্রীকে মুক্ত করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর স্বামী যদি তা করা থেকে বিরত হয় তাহলে কাযী তার স্থলবর্তী হয়ে উভয়কে জুদা করে দিবেন। তবে স্ত্রীর বিচ্ছেদ দাবী করা শর্ত। কেননা বিচ্ছেদ গ্রহণ হল তার নিজের হক।

এ বিচ্ছেদ তালাকে বায়ন রূপে গণ্য হবে। কেননা কাযীর কার্য স্বামীর কার্যের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যেন স্বামী নিজেই তাকে তালাক দিয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ বিচ্ছেদ হল বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ করা। কিন্তু আমাদের মতে (আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর) বিবাহ বন্ধন ভগ্নযোগ্য নয়। আর 'বায়ন' হওয়ার কারণ এই যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অবিচার রোধ করা। আর তা তালাকে বায়ন ছাড়া অর্জিত হবে না। কেননা তালাকটি যদি বায়ন না হয়,তাহলে তো স্বামী কর্তৃক রাজা'আতের মাধ্যমে সে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যাবে। **যদি স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস হয়ে থাকে তাহলে সে পূর্ণ মাহর পাবে।** কেননা পুরুষত্বহীন স্বামীর নির্জন বাস গ্রহণযোগ্য। আর স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে, যার কারণ আমরা পূর্বে মাহর অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি।

(একবছরের অবকাশ প্রদানের) এই বিধান হলো তখন, যখন স্বামী সহবাস না হওয়ার কথা স্বীকার করে। **পক্ষান্তরে স্বামী ও স্ত্রী যদি সহবাস হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী কথা বলে তাহলে অকুমারীর ক্ষেত্রে কসমসহ স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।**

কেননা সে স্ত্রী বিচ্ছেদের অধিকার লাভে বিষয়টি অস্বীকার করছে। আর জন্মগত ভাবে পুরুষত্বশক্তি অক্ষুণ্ন থাকাই হলো আসল অবস্থা।

যদি সে কসম করে বলে যে, আমি তার সাথে সংগম করেছি, তাহলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ লাভের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হবে।

আর যদি স্ত্রী কুমারী হয় তাহলে অভিজ্ঞ নারীরা তার গুপ্তাংগ দেখবে। দেখে যদি কুমারী বলে, তাহলে এক বছরের অবকাশ প্রদান করা হবে।

কেননা তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। **আর যদি সে নারীরা বলে যে, সে কুমারী নয়, তাহলে স্বামী কসম করবে। যদি সে কসম করে তাহলে স্ত্রীর (বিচ্ছেদ লাভের) অধিকার নেই। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হবে।**

আর যদি স্বামীর পুরুষাংগ কর্তিত হয় তাহলে উভয়কে পৃথক করে দেওয়া হবে— যদি স্ত্রী এ দাবী করে। কেননা এ ক্ষেত্রে অবকাশ প্রদানের কোন সার্থকতা নেই। আর খাসীকৃত ব্যক্তির বেলায় অবকাশ দেওয়া হবে, যেমন পুরুষত্বহীন বক্তিকে অবকাশ দেওয়া হয়। কেননা তার পক্ষ থেকে সহবাসের সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরুষত্বহীনকে এক বছরের অবকাশ প্রদানের পর যদি সে বলে যে, আমি তার সাথে সংগম করেছি আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তাহলে অভিজ্ঞ নারীরা তার গুপ্তাংগ দেখার পর যদি বলে যে, সে কুমারী, তাহলে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে।

কেননা তাদের সাক্ষ্য একটি অনুকূল অবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে কুমারিত্ব। **আর যদি স্ত্রীলোকেরা কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে স্বামীকে কসম করে বলতে হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে।** কেননা অস্বীকারের কারণে স্ত্রীর দাবী সমর্থিত হয়েছে।

আর যদি সে কসম করে তাহলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার থাকবে না। আর যদি মূলত: অকুমারী হয় তাহলে কসমসহ স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। **যদি স্ত্রী ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বামীকে গ্রহণ করে তাহলে পরবর্তীতে তার কোন অধিকার থাকবে না।** কেননা সে স্বেচ্ছায় আপন অধিকার বাতিল করতে রাযী হয়েছে।

অবকাশ প্রদানের ক্ষেত্রে চান্দ্র বছর বিবেচনা করা হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। ঋতুস্রাবের দিনগুলো এবং রমযান মাস ঐ বছরের মধ্যেই গণ্য হবে। কেননা এক বছরের মধ্যে ঐ দুটোর বিদ্যামানতা অনিবার্য। পক্ষান্তরে স্বামীর বা স্ত্রীর অসুস্থাতার দিনগুলো বছরের মধ্যে গণ্য করা হবে না। কেননা বছর কাল অসুস্থতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

স্ত্রীর মধ্যে যদি কোন আয়েব থাকে তবে সে কারণে স্বামীর এখতিয়ার থাকবেনা। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পাঁচটি দোষের কারণে বিবাহ রদ করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে কুষ্ঠ রোগ, ধবল রোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, সংগম পথ বন্ধ থাকা, যোনিপথে হাড় বের হয়ে থাকা। কেননা এগুলো বাস্তবত: কিংবা রুচিগত প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভোগ সুখ লাভে বাধাদান করে। আর রুচির দিকটা শরীয়ত কর্তৃত সমর্থিত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فر من المجذوم فرارك من الاسد

সিংহ থেকে যেমন পলায়ন করো, কুষ্ঠরোগী থেকে তেমনি পলায়ন করো।

আমাদের দলীল এই যে ,মৃত্যুর মাধ্যমে সম্ভোগ সুখ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধন প্রত্যাহার সাব্যস্ত করে না। সুতরাং এ সকল দোষের কারণে সম্ভোগ সুখের ব্যাঘাত স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহ বন্ধন প্রত্যাহার সাব্যস্ত করবে না।

এ দোষগুলো বিবাহ প্রত্যাহারকে অনিবার্য না করার কারণ এই যে, সম্ভোগ সুখ তো হচ্ছে বিবাহ দ্বারা লব্ধ সুফল (আর সুফল হাত ছাড়া হওয়া বিবাহ বন্ধন কে প্রভাবিত করতে পারে না।) স্বামীর প্রাপ্য হচ্ছে সম্ভোগের অধিকার। আর তা এখানে অর্জিত রয়েছে।

স্বামীর যদি মস্তিক জনিত, কিংবা ধবলরোগ কিংবা কুষ্ঠরোগ থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে স্ত্রীর বিবাহ প্রত্যাহারের অধিকার থাকবেনা। **আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার এখতিয়ার হাসিল হবে,** যাতে তার ক্ষতি রোধ হয়। যেমন লিংগ কর্তিত ও পুরুত্বহীনতার ক্ষেত্রে। স্বামীর দিকটি ভিন্ন। কেননা সে তালাকের মাধ্যমে ক্ষতি রোধ করতে সক্ষম। শায়খায়নের যুক্তি এই যে, এখতিয়ার না থাকাই হলো মূল অবস্থার দাবী । কেননা এতে স্বামীর অধিকার বাতিল করা হয়।

তবে লিংগ কর্তিত ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে এখতিয়ার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, এ দুটি দোষ সেই উদ্দেশ্যকেই পন্ড করে, যে জন্য শরীয়তে বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সকল দোষ উক্ত উদ্দেশ্যকে পন্ড করে না। সুতরাং উভয় প্রকার দোষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

باب العدة
অধ্যায় ঃ ইদ্দত

অধ্যায় ঃ ইদ্দত

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়ন বা তালাকে রেজয়ী দেয় কিংবা তালাক ছাড়া অন্য কোন কারণে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে আর স্ত্রী যদি স্বাধীনা ও ঋতুবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন হায়য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরু পর্যন্ত নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে।

আর তালাক ছাড়া অন্য মাধ্যমে বিচ্ছেদ তালাকেরই সমপর্যায়ের। কেননা ইদ্দত অবশ্য পালনীয় হয়েছে, বিবাহের মাঝে উদ্ভূত বিচ্ছেদের পর,গর্ভাশয় মুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আর এ প্রয়োজন অন্যান্য বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।

আমাদের মতে আয়াতে উল্লেখিত قروء শব্দের অর্থ হলো হায়য। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ঋতুস্রাব মুক্ত তুহ্র। অবশ্য শব্দটি বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক এবং উভয় অর্থের ক্ষেত্রেই শব্দটি হাকীকত বা মৌলিক। ইবনুস সুকায়ত এ কথা বলেছেন। আর একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের একই সাথে একাধিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। আর হায়যের অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর উত্তম, যাতে শব্দটির বহুবচনত্ব অক্ষুণ্ন থাকে[১]।

কেননা শব্দটিকে যদি তোহর অর্থে গ্রহণ করা হয়, আর তালাক তোহরের সময়েই দেওয়া হয়ে থাকে, তখন বহুচবনের অর্থ অক্ষুণ্ন থাকে না।

কিংবা কারণ এই যে, হায়যই হচ্ছে গর্ভমুক্ত থাকার পরিচায়ক। আর সেটাই হচ্ছে ইদ্দতের উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় দলীল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী ঃ وعدة الامة حيضتان (দাসীর ইদ্দত হলো দুই হায়য)। সুতরাং এই হাদীস কোরআনে উল্লেখিত শব্দের ব্যাখ্যা রূপে যুক্ত হবে।

আর যদি অল্প বয়স্কতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে সে ঋতুবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন মাস। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ, তাদের বিষয়ে যদি সন্দিহান হও তাহলে তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।

তদ্রূপ যারা বয়স গণণা দ্বারা সাবালিকা হয়েছে কিন্তু এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি (তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস)।

১। قروء শব্দটি বহুবচন আর বহুবচনের সর্ব নিম্ন সংখ্যা হলো তিন। স্রাবমুক্ত তুহর বা পবিত্র অবস্থায় তালাক প্রদান করা হলো সুন্নত আর যে তোহরে তালাক প্রদান করা হবে, তাদের মতে সে তোহরটিও ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে। এতে করে ইদ্দত হচ্ছে দুই তোহর এবং এক তোহরের অংশ বিশেষ। পক্ষান্তরে হায়য অর্থ গ্রহণ করলে যে তোহরে তালাক দেয়া হবে, তারপর তিনটি হায়য ইদ্দত রূপে গণ্য হবে।

২। وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ (আর যাদের ঋতুস্রাব হয়নি) এ অংশটি কে وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ অংশের উপর عطف (সংযুক্ত) করা হয়েছে এবং উভয় অংশের জন্য অভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে।

আর এর প্রমাণ হলো উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশ[২]। **আর যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভ প্রসব করা হলো তার ইদ্দত।** কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

আর যারা গর্ভবতী, তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ হলো গর্ভ প্রসব করা। **আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যদি দাসী হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো দুই হায়য।**

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان

দাসীর তালাক হলো দুই তালাক আর তার ইদ্দত হলো দুই হায়য। তাছাড়া এই যে,দাসত্ব হলো অর্ধেককারী।

আর এক হায়য খণ্ডিত হয় না। কাজেই পূর্ণ ধরা হবে; অতঃপর দুই হায়য হয়ে যাবে। এদিকে ইংগিত করেই হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا (যদি পারতাম তাহলে তার ইদ্দত এক হায়য এবং অর্ধ হায়য নির্ধারণ করে দিতাম)।

আর যদি দাসী ঋতুবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত-হবে এক মাস ও অর্ধ মাস।

কেননা মাস খন্ডন গ্রহণ করে। সুতরাং দাসত্বের ভিত্তিতে মাসের অর্ধেকীকরণ সম্ভব। **স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন।**

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, সেই স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন নিজেদের আবদ্ধ রাখবে। **আর দাসীর ইদ্দত হলো দু'মাস পাঁচ দিন।** কেননা দাসত্ব হলো অর্ধেককারী।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো গর্ভ প্রসব করা।

কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ব্যাপক রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, কেউ ইচ্ছা করলে এ দাবীর সপক্ষে আমি তার সাথে মুবাহালা করতে রাজী আছি যে, সংক্ষিপ্ততম সূরাতুন নিসা, যাতে وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ আয়াতটি রয়েছে, তা সূরাতুল বাকারার পরে নাযিল হয়েছে। আর হযরত ওমর (রা) বলেছেন, যদি মৃত স্বামী জানাযার খাটে শায়িত অবস্থায় স্ত্রী প্রসব করে তাহলে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং তার জন্য অন্যত্র বিবাহ করা হালাল হবে। **মৃত্যু শয্যায় অসুস্থ ব্যক্তির তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যখন নারীদের অধিকারিণী হয়[১] তখন তার ইদ্দত হবে দু মেয়াদের দীর্ঘতমটি।**

১। এখানে امرأة الفار বা মীরাছ বঞ্চনাকারীর স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করার জন্য মৃত্যু শয্যায় তিন তালাক বা এক তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায় তাহলে মীরাছের অধিকার লাভ করবে। এ বিষয়ে হানাফী ইমামগণ একমত। তবে তার ইদ্দতের মেয়াদ সম্পর্কে মতভিন্নতা রয়েছে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন,তার ইদ্দত হবে তিন হায়য।

তবে এই মতভিন্নতা হবে যদি বায়ন তালাক কিংবা তিন তালাক প্রদত্ত হয়; পক্ষান্তরে রাজয়ী তালাক প্রদত্ত হলে সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধব্যের ইদ্দত পালন করা তার উপর ওয়াজিব।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দলীল এই যে, মৃত্যুর পূর্বে তালাকের মাধ্যমেই বিবাহ কর্তিত হয়ে গেছে এবং তার উপর তিন হায়যের ইদ্দত পালন আবশ্যকীয় হয়ে গেছে। আর বৈধব্যের ইদ্দত সাব্যস্ত হয়ে থাকে যদি মৃত্যুর মাধ্যমে বিবাহের সমাপ্তি ঘটে।

তবে মীরাছের অধিকার লাভের ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ক্রিয়া বহাল রয়েছে। কিন্তু ইদ্দত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নয়। পক্ষান্তরে তালাকে রাজয়ীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিবাহ সর্বদিক থেকেই বহাল রয়েছে।

তার কারণের দলীল এই যে, মীরাছের অধিকার লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু বিবাহ বন্ধন বহাল রয়েছে, সেহেতু সর্তকতা হিসেবে ইদ্দতের ক্ষেত্রেও বহাল গণ্য করা হবে। সুতরাং উভয় উদ্দতের উপর একত্র আমল করা হবে।

মুরতাদ যদি ধর্মত্যাগের কারণে কতল হয় এবং স্ত্রী তার মীরাছ লাভ করে তাহলে তার ইদ্দত সম্পর্কেও একই মতভিন্নতা হবে।

অবশ্য কথিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতি ক্রমেই তার ইদ্দত তিন হায়য দ্বারা পালিত হবে।

কেননা এ ক্ষেত্রে মীরাছের অধিকার লাভের ব্যাপারেও মৃত্যু পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনকে বহাল গণ্য করা হবে না। কেননা মুসলিম নারী কাফিরের মীরাছ লাভ করে না।

দাসীকে যদি তালাকে রাজয়ী পরবর্তী ইদ্দত পালনের সময় আযাদ করা হয় তাহলে তার ইদ্দত স্বাধীন স্ত্রীলোকের ইদ্দতে পরিবর্তিত হবে। কেননা সর্বদিক থেকে বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি বায়ন তালাক কিংবা তিন তালাকের ইদ্দত পালন অবস্থায় কিংবা বৈধব্যের ইদ্দত পালন অবস্থায় আযাদ হয় তাহলে তার ইদ্দত স্বাধীন স্ত্রীলোকদের ইদ্দতে পরিবর্তিত হবে না।

কেননা বিচ্ছেদের মাধ্যমে কিংবা মৃত্যুর মাধ্যমে বিবাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তালাকপ্রাপ্তা যদি ঋতুনিরাশ স্ত্রীলোক হয় আর মাস হিসেবে ইদ্দত পালন শুরু করে কিন্তু পরবর্তীতে স্রাব দেখতে পায় তাহলে যতটুকু ইদ্দত পার হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে নতুন করে হায়য দ্বারা ইদ্দত শুরু করতে হবে।

উপরোল্লেখিত বক্তব্যের মর্ম এই যে, 'যদি পূর্ব অভ্যাসের অনুরূপ (স্বাভাবিক মাত্রার) স্রাব দেখতে পায়।'

কেননা পুনঃ স্রাব ঋতুনিরাশ অবস্থাকে বাতিল করে দেয়। এই বিশুদ্ধ মত। সুতরাং এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মাসের ইদ্দত হায়যের ইদ্দতের স্থলবর্তী হতে পারেনি।

কেননা স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো ঋতুনিরাশ সুনিশ্চিত হওয়া। আর তা হবে মৃত্যু পর্যন্ত এই ঋতুনৈরাশ্যের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে।যেমন শায়খে ফানি (জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের) ক্ষেত্রে ফিদয়ার অনুমতির বিষয়টি।

দুটি হায়য হওয়ার পর যদি ঋতুনৈরাশ্য ঘটে তাহলে (নতুন করে) মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। যেন মূল ও স্থলবর্তীর একত্র সমাবেশ না ঘটে। **নিকাহে ফাসেদ দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রী আর সন্দেহমূলক সংগম-পীড়িতার[১] জন্য বিচ্ছেদ ও মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রে ইদ্দত হবে তিন হায়য**। কেননা এ দুজনের ইদ্দত হচ্ছে শুধুই গর্ভমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। বিবাহের হক আদায় করার উদ্দেশ্য নয়। আর হায়যই হচ্ছে গর্ভমুক্তির পরিচায়ক।

'উম্মে ওয়ালাদ' এর মনিব যদি মৃত্যু বরণ করে কিংবা মনিব যদি তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন হায়য।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার ইদ্দত হল এক হায়য। কেননা উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত সাব্যস্ত হয় মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং তা استبراء (গর্ভমুক্তি পরিচায়ক) এর সদৃশ হবে।

আমাদের দলীল এই যে, মনিবের 'শয্যাবাস' বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এটা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা বিবাহের ইদ্দতের সদৃশ হলো। এ ব্যাপারে ওমর (রা) হলেন আমাদের আদর্শ। তিনি বলেছেন, উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত হলো তিন হায়য।

আর যদি তার ঋতুস্রাব না হয় তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন মাস।

যেমন বিবাহের ইদ্দতের ক্ষেত্রে **নাবালক যদি গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায় তাহলে ইদ্দত হবে গর্ভ প্রসব**।

এটা হলো ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তার ইদ্দত চার মাস দশদিন। ইমাম শাফেয়ীরও (র) এই মত।

কেননা এই গর্ভস্থ সন্তানের বংশ সম্পর্ক মৃতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং মৃত্যুর পর সাঞ্চরিত গর্ভের অনুরূপ হলো।

তরফাইনের দলীল এই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَاُولاَتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হচ্ছে নিঃশর্ত (অর্থাৎ সঞ্চারিত গর্ভ স্বামীর ঔরসজাত হওয়ার শর্ত নেই।)

তাছাড়া এই জন্য যে, স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দত গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে প্রসবের সময় কাল দ্বারা নির্ধারিত। সে সময়কাল দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত। এই ইদ্দত গর্ভ মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য নয়। কেননা ঋতুস্রাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরীয়ত এই ইদ্দতকে মাস ভিত্তিক অনুমোদন করেছে। সুতরাং বোঝা গেলো যে, এটা শুধু বিবাহের হক আদায়ের জন্য আর বিবাহের হক আদায় করার পর বিষয়টি নাবালক স্বামীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যদিও সঞ্চারিত গর্ভ তার না-ও হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে মৃত্যু পরবর্তী গর্ভ সঞ্চারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে মাস ভিত্তিক ইদ্দত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং নতুন গর্ভ সঞ্চারের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে ইদ্দত যখন সাব্যস্ত হয়েছে তখন গর্ভকাল দ্বারা নির্ধারিত অবস্থাই সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দুটো বিষয় পৃথক হয়ে গেলো।

১। স্ত্রী মনে করে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে অথচ স্ত্রী ছিলনা।

সাবালক স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি এখানে আপত্তিযোগ্য নয়।[১] কেননা এই গর্ভস্থ সন্তানের বংশ সম্পৃক্ত হয় উক্ত স্বামীর সাথেই। সুতরাং হুকুম ও বিধানগত ক্ষেত্রে সাঞ্চরিত গর্ভ মৃত্যুর সময় বিদ্যমান ছিলো বলেই গণ্য হবে।

উভয় অবস্থায়[২] সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না।

কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্কের বীর্য নেই। সুতরাং তার দ্বারা গর্ভ সঞ্চার কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর বিবাহকে বীর্যের স্থলবর্তী গণ্য করা হয় কল্পনা-সম্ভব স্থানে।

স্বামী যদি স্ত্রীকে হায়যের অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে যে হায়যটিতে তালাক সম্পন্ন হয়েছে, সেটিকে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করা হবে না।

কেননা ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়য দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং তার থেকে কমানো যাবেনা।

ইদ্দতরত অবস্থায় যদি স্ত্রী লোকটি সন্দেহমূলক সংগম পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে তার উপর আরেকটি ইদ্দত অবশ্য সাব্যস্ত হবে এবং দুটি ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। এবং (পরবর্তীতে) যে ঋতু স্রাব দেখা যাবে, সেটা উভয় ইদ্দত থেকেই গণ্য হবে। যখন প্রথম ইদ্দতটি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দ্বিতীয় ইদ্দতটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তখন দ্বিতীয় ইদ্দতটি পূর্ণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে।

এ হলো আমাদের মত। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, দুই ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে না। কেননা মূলত: ইদ্দভ হচ্ছে ইবাদত। অর্থাৎ গৃহ থেকে বের না হওয়া এবং বিবাহ পরিহার করার ইবাদত। সুতরাং তা পরস্পর প্রবিষ্ট হতে পারে না। যেমন একই দিনে দুটি রোযা হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, ইদ্দতের উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভাশয় মুক্ত থাকার পরিচয় লাভ আর সেটা একটি ইদ্দত দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং পরস্পর প্রবিষ্ট হতে (উদ্দেশ্যগত দিক থেকে) কোন বাধা নেই।

আর ইবাদতের দিকটি এখানে আনুষঙ্গিক। এ জন্যই স্ত্রীলোকটির অজান্তেও ইদ্দত আদায় হয়ে যেতে পারে এবং গৃহত্যাগ ও বিবাহ থেকে সংযম ছাড়াও ইদ্দত সম্পন্ন হতে পারে।[৩]

বৈধব্যের ইদ্দত পালন রত অবস্থায় যদি সন্দেমূলক সংগম পীড়িতা হয়ে পড়ে তাহলে যথারীতি মাসভিত্তিক ইদ্দত পালন করে যাবে এবং ঐ মাসগুলোতে যে ঋতুস্রাব দেখা যাবে সেগুলোকে নতুন ইদ্দত হিসাবে গণ্য করা হবে।

যাতে যতদূর সম্ভব উভয় ইদ্দতের পরস্পর প্রবিষ্টতা সাব্যস্ত হয়।

১। একটি প্রশ্নের উত্তর। ধরুন বয়স্ক স্বামীর মৃত্যুর সময় গর্ভ ছিলোনা। ফলে তার জন্য আমরা মাস ভিত্তিক ইদ্দত সাব্যস্ত করলাম। পরে গর্ভ সঞ্চার হলো। এমতাবস্থায় তার ইদ্দত গর্ভপ্রসব দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে যা ইদ্দত পরিবর্তিত হওয়ার নামান্তর। অথচ বলে আসা হয়েছে যে, একবার মাস দ্বারা ইদ্দত সাব্যস্ত হওয়ার পর গর্ভ প্রসব দ্বারা ইদ্দত পরিবর্তিত হতে পারে না-এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হলো।

২। অর্থাৎ নাবালক স্বামীর মৃত্যুর সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকুক কিংবা মৃত্যুর পর গর্ভ সঞ্চারিত হোক— উভয় অবস্থায়।

৩। সুতরাং যদি ইদ্দতের মাঝে ঘর থেকে বের হয় কিংবা অন্য স্বামীকে বিবাহ করে তাহলে সকলের মতেই তাতে ইদ্দত বাতিল হবে না।

আর তালাকের ইদ্দত তালাকের পর থেকে এবং মৃত্যুর ইদ্দত স্বামী মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ হবে। যদি তালাকের কিংবা স্বামীর মৃত্যুর বিষয় অবগত না থাকে এবং এ অবস্থায় ইদ্দত পার হয়ে যায় তাহলে তার ইদ্দত সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কেননা ইদ্দত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে তালাক কিংবা মৃত্যু। সুতরাং কারণ বিদ্যমান হওয়ার সময় থেকেই ইদ্দতের আরম্ভ বিবেচ্য হবে।

আমাদের মাশায়েখগণ তালাকের ক্ষেত্রে ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, যখন তালাকের কথা স্বীকার করবে তখন থেকে ইদ্দত শুরু হবে, যাতে পরস্পর যোগসাজসের অভিযোগ বিদূরিত হয়।[১]

নিকাহে ফাসেদ এর ক্ষেত্রে ইদ্দত শুরু হবে (কাযী কর্তৃক) বিচ্ছেদ ঘোষণার পর থেকে কিংবা সহবাসকারীর সহবাসের ইচ্ছা পরিত্যাগের ঘোষণার পর থেকে। ইমাম যোফার (র) বলেন, শেষবার যখন সহবাস করেছে তখন থেকে ইদ্দত হবে।

কেননা সহবাসই হচ্ছে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

আমাদের দলীল এই যে, আকদে ফাসেদ (বা অসংগত বিবাহ চুক্তির) ক্ষেত্রে সমস্ত সহবাসকে একটি মাত্র সহবাসের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। কেননা, সমস্ত সহবাস একটি আকদ-এর হুকুমকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করছে। এ কারণেই সমস্ত সহবাসের জন্য একটি মাত্র মাহর যথেষ্ট হচ্ছে।

সুতরাং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা কিংবা সংযম বর্জনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করার পূর্বে ইদ্দত সাব্যস্ত হবে না। কেননা অন্য সহবাসে অস্তিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, (বৈধতার) সন্দেহের ভিত্তিতে লব্ধ সহবাস সক্ষমতাকে প্রকৃত সহবাসের স্থলবর্তী করা হয়েছে। কেননা প্রকৃত সহবাসের বিষয়টি গোপনীয় আর ইদ্দতের হুকুম জানার প্রয়োজনীয়তা অন্যের ক্ষেত্রে। **ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীলোক যদি বলে, আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে আর স্বামী তার কথা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে কসমসহ স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।**

কেননা (বিষয়টি জানার একমাত্র মাধ্যম হওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে) সে হচ্ছে এ বিষয়ে আমানতদার আর সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তাকে কসম করে বলতে হবে, যেমন ঐ ব্যক্তির বিষয়টি, যার কাছে কোন দ্রব্য আমানত রাখা হয়েছে।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়ন প্রদান করে অতঃপর ইদ্দতের ভিতরে তাকে বিবাহ করে এবং সহবাসের পূর্বেই পুনঃ তালাক প্রদান করে তাহলে স্বামীর উপর পূর্ণ মাহর সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর আলাদা ইদ্দত অবশ্য পালনীয় হবে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, **স্বামীর উপর অর্ধেক মাহর সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রীর উপর প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে।**

১। কেননা হতে পারে যে, মৃত্যুর শয্যায় স্ত্রীর জন্য মীরাছের অধিক সম্পদ অছিয়ত করার জন্য দুজনে মিলে তালাক ও ইদ্দত শেষ হওয়ার বিষয়টি সাজিয়েছে। কিংবা অর্থের বিনিময়ে নিজের তালাক ও ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা মেনে নিতে রাজি হয়েছে, যাতে এখনই তার বোনকে বিয়ে করতে পারে ইত্যাদি।

কেননা এটা হচ্ছে সহবাস বিহীন তালাক, সুতরাং তা পূর্ণ মাহর এবং নতুন ইদ্দত সাব্যস্ত করবে না। আর প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করার আবশ্যকতা হচ্ছে প্রথম তালাকটির কারণে। তবে বিবাহের বিদ্যমান অবস্থায় তা প্রকাশ পায়নি। যখন দ্বিতীয় তালাক দ্বারা তা বিলুপ্ত হলো তখন প্রথম তালাকের বিধান পুনঃপ্রকাশ পায়নি; যেমন অন্য কারো উম্মে ওয়ালাদকে খরিদ করল তার পর তাকে আযাদ করে দিল।

শায়খায়নের দলীল এই যে, প্রথম সহবাসের কারণে প্রকৃতই সে স্বামীর অধিকারে রয়েছে। এবং প্রথম সহবাসের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে ইদ্দত। সুতরাং আপন অধিকারে থাকা অবস্থায় যখন নতুন বিবাহ সম্পন্ন হলো তখন প্রথম সহবাস দ্বারা লব্ধ অধিকার এই বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য অধিকারের স্থলবর্তী হবে। (সুতরাং দ্বিতীয় তালাকটি যেন দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা কৃত সহবাসের পর সাব্যস্ত হলো)।

যেমন জবর দখলকারী দখলকৃত দ্রব্যটি খরিদ করল। এখন শুধু বিক্রয় চুক্তি হওয়া দ্বারাই বিক্রিত বস্তুর দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ ছিনতাই কালে লব্ধ দখল বিক্রয় চুক্তি দ্বারা প্রাপ্য দখলের স্থলবর্তী হবে।)

এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রদত্ত তালাক সহবাস পরবর্তী তালাক রূপেই সাব্যস্ত।

ইমাম যুফার (র) বলেন, এখন তার উপর কোন ইদ্দত নেই। কেননা প্রথমটি তো দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা প্রত্যাবর্তন করবে না। আর সহবাস না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় ইদ্দতও সাব্যস্ত হবে না।

তার বক্তব্যের জবাব সেটাই, যা ইতিপূর্বে আমরা বলেছি।

যিম্মি পুরুষ যদি যিম্মি নারীকে তালাক প্রদান করে তাহলে তার উপর কোন ইদ্দত নেই।

তদ্রূপ দারুল হরবের কোন নারী যদি মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে (দারুল ইসলামে) চলে আসে (এবং ইদ্দত পালন না করেই) বিবাহ করে তাহলে তা বৈধ হবে, যদি না সে গর্ভবতী হয়। এসব ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন, তার উপর এবং যিম্মি নারীর উপর ইদ্দত আবশ্যক হবে।

যিম্মি নারীর ইদ্দতের ব্যাপারে যে মতবিরোধ, তা যিম্মীদের বারবার মাহরাম বিবাহ করা সম্পর্কিত মত বিরোধের সদৃশ। বিবাহ অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর এই ফায়সালা ঐ ক্ষেত্রে, যখন তাদের ধর্মমতে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন আবশ্যকীয় না হয়ে থাকে।

আর হিজরত করে আসা নারীর ক্ষেত্রে সাহেবাইনের বক্তব্যের দলীল এই যে, (দারুল হরব ও দারুল ইসলামের ভিন্নতা ছাড়া) অন্য কোন কারণে যদি বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয় তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হয়। সুতরাং বাসস্থানের ভিন্নতার কারণে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাতেও ইদ্দত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে স্ত্রীকে দারুল হরবে রেখে স্বামীর দারুল ইসলামে হিজরত করে আসার বিষয়টি ভিন্ন। (অর্থাৎ তার জন্য ইদ্দত জরুরী নয়)। কেননা শরীয়তের বিধান তার কাছে পৌছেনি।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

তাদেরকে বিবাহ করাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই[১]। তা ছাড়া এই জন্য যে, যেখানেই ইদ্দত সাব্যস্ত হয় সেখানে মানুষের হক রক্ষার বিষয়টি জড়িত থাকে। আর কাফের তো জড় বস্তুর সমতুল্য। তাই সে (দাসত্বের মাধ্যমে) অন্য মানুষের মালিকানার ক্ষেত্র হয়ে থাকে।

তবে গর্ভবতীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সাব্যস্ত নসবের সন্তান তার গর্ভে রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তাকে বিবাহ করা তো জায়েয হবে। তবে স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না, যেমন ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতীর ক্ষেত্রে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

পরিচ্ছেদ ঃ

ইমাম কুদূরী বলেন, বায়ন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী এবং সদ্য বিধবা স্ত্রী যদি প্রাপ্ত বয়স্কা ও মুসলিম হয় তাহলে ইদ্দত কালে শোক পালন করা তার উপর ওয়াজিব।

বিধবার ক্ষেত্রে প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ দাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

আল্লাহ ও আখেরাতর প্রতি ঈমান রয়েছে, এমন কোন নারীর জন্য কোন মৃত ব্যক্তির স্মরণে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে তার স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক করবে।

আর বায়ন তালাপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে এ হলো আমাদের মত। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার জন্য কোন শোক নেই।

কেননা শোক প্রকাশ ওয়াজিব হয়েছে ঐ স্বামীর বিয়োগের উপর দুঃখ প্রকাশ করার জন্য, যে স্বামী তার মৃত্যু পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে।

অথচ এই স্বামী তাকে বায়ন তালাকের মাধ্যমে অস্বস্তিতে ফেলেছে। সুতরাং তাকে হারানোর জন্য কোন শোক হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো এই বর্ণিত হাদীছ যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদ্দত ওয়ালী স্ত্রীলোককে মেহদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, মেহদি হলো একটি খুশবু।

তাছাড়া এই জন্য যে, যে বিবাহ ছিলো স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষার ও ভরণ পোষণের মাধ্যম সেই নেয়ামত বিলুপ্ত ওয়ার উপর দুঃখ প্রকাশের জন্য ইদ্দত কালীন শোক প্রকাশ ওয়াজিব

১। এখানে মুহাজির নারীদেরকে বিবাহ করার নিঃশর্ত বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ইদ্দত পালনের শর্তারোপের অর্থ হবে আয়াতে অতিরিক্ত সংযোজন।

হবে। আর তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদন এই নিয়ামতকে মৃত্যুর চেয়ে অধিক কর্তনকারী। এ কারণেই স্ত্রী তার স্বামীকে বিচ্ছেদের পূর্বে গোসল দান করতে পারে, কিন্তু (তালাক দ্বারা) বিচ্ছেদনের পর গোসল দিতে পারে না। আর حداد (শোক প্রকাশ) আরবীতে একে احداد ও বলা হয়। এ দুটি পরিভাষা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আর এটি দ্বারা খোশবু ব্যবহার, সাজসজ্জা গ্রহণ, সুরমা ব্যবহার, সুগন্ধি তেল ও সাধারণ তেল ব্যবহার বর্জন করা, তবে ওজরের কারণে হলে ভিন্ন কথা। জামে ছগীর কিতাবে ওযর চিহ্নিত করে বলা হয়েছে "তবে ব্যাথা বেদনার জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হল ভিন্ন কথা।

এগুলো ব্যবহার বর্জন আবশ্যকীয় হওয়ার দুটি কারণ। একটি হলো শোকের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এগুলো স্ত্রীলোকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকারী আর ইদ্দতকালে সে বিবাহ থেকে নিষেধ প্রাপ্তা। সুতরাং সে এগুলো পরিহার করে চলবে, যাতে হারাম বিবাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম না হয়ে দাঁড়ায়।

আর বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদ্দত পালনকারীকে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন নি।

আর যে কোন তেল কোন প্রকার সুগন্ধ থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া এতে চুলের সজ্জা হয়। এ কারণেই ইহরামের অবস্থায় তেল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়।

ইমাম কুদূরী (র) ওযরের বিষয়টিকে ব্যতিক্রম করেছেন। কেননা তাতে প্রয়োজন রয়েছে। যেন ঔষধ ব্যবহার উদ্দেশ্য, সজ্জা উদ্দেশ্য নয়।

যদি সে স্ত্রীলোক তেল ব্যবহারে এত অভ্যস্ত হয়ে থাকে যে, তা ব্যবহার না করলে ব্যথা হওয়ার আশংকা হয়। আর এ অবস্থা প্রবল হয়, তাহলে তার জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ হবে। কেননা যার সম্ভাবনা প্রবল তা বাস্তব তুল্য।

অদ্রূপ কোন ওযরের কারণে প্রয়োজন হলে রেশমি পোশাক পরা যায়। তাতে কোন দোষ নেই।

আর মেহদি দ্বারা রঞ্জিত করবে না।

এর দলীল ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। **আর কুসুম বা জাফরান দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরবে না।**

কেননা তা থেকে সুবাস ছড়ায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অমুসলিম নারীর জন্য শোকের বিধান নেই, কেননা শরীয়তের হক সমূহ আদায় করার ব্যাপারে সে সম্বোধন পাত্রী নয়।

আর অপ্রাপ্ত বয়স্কার জন্যও শোকের বিধান নেই। কেননা তার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান মুলতবী রাখা হয়েছে।

দাসীর জন্য শোকর পালন আবশ্যক।

কেননা সে আল্লাহর ঐ সকল হক আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট, যাতে মালিকের হক নষ্ট করা হয় না। বাড়ী থেকে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে মনিবের হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক অগ্রবর্তী। কারণ সে হাযতমন্দ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত এবং নিকাহে ফাসেদের ইদ্দতে শোক প্রকাশ নেই।

কেননা উভয়ের কেউ বিবাহের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়নি, যার উপর সে শোক প্রকাশ করবে। আর অনুমতি থাকাই হল আসল বিষয়।

ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীলোককে বিবাহের সরাসরি প্রস্তাব করা সংগত নয়। অবশ্য পরোক্ষ প্রস্তাবে কোন দোষ নেই।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ইদ্দত পালন অবস্থায় স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দান সম্পর্কে ইংগিত করাতে কিংবা অন্তরে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের আলোচনা করবে, (তা করো) কিন্তু তাদর সাথে গোপন বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়া-নেয়া করবে না। তবে সুসংগত কোন কথা বলতে পারো।

আয়াতে। سر শব্দের অর্থ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এর অর্থ হলো বিবাহ।

আর ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইংগিত করার অর্থ এ ধরনের কথা বলা যে, আমি বিবাহ করার ইচ্ছা রাখি। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র) বলেছেন, সুসংগত কথা এই যে, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী, আমরা একত্র হতে চাই। (কিংবা এ জাতীয় কোন কথা)

রাজয়ী (বা সাময়িক) তালাক এবং বায়ন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের রাত্রে কিংবা দিনে গৃহ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। আর যার স্বামী বিয়োগ ঘটেছে, তার পক্ষে দিনে এবং রাতের কিছু অংশে বের হওয়া জায়েয রয়েছে; তবে নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র রাত যাপন করবে না।

তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে উক্ত বিধানের প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী -

وَلَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বের করোনা, এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়। তবে যদি স্পষ্ট লজ্জাহীনতার কোন কাজ করে। (তাহলে অন্য কথা।) কোন কোন মতে ঘর থেকে বের হওয়াই লজ্জাহীনতার কাজ। অন্য মতে সেটা হচ্ছে যিনা। তবে তাদের উপর হদ্দ কায়েম করার প্রয়োজনে তাদের বের করা যাবে।

বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বের হওয়ার অনুমতির কারণ এই যে, তার তো খরচ পাওনা নেই। সুতরাং জীবিকার সন্ধানে তাকে দিনে বের হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর কাজ দীর্ঘায়িত হয়ে রাত এসে যেতে পারে।

তালাক প্রাপ্তার বিষয়টি তেমন নয়। কেননা তার খরচ স্বামীর সম্পদ থেকেই তার উপর ব্যবহৃত হবে। সুতরাং যদি ইদ্দতকালীন খরচের বিনিময়ে খোলা করে তাহলে কারো কারো মতে দিনে বের হতে পারবে। কারো মতে বের হতে পারবেনা। কেননা সে স্বেচ্ছায় নিজের হক রহিত করেছে। সুতরাং সে কারণে তার উপর সাব্যস্ত হক বাতিল হবেনা।

স্বামীর মৃত্যুর সময় এবং বিচ্ছেদ ঘটার সময় বসবাসের উদ্দেশ্যে যে ঘর তার দিকে সম্পৃক্ত হতো, সে ঘরে ইদ্দত পালন করা তার কর্তব্য।

কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করোনা।

আর তার দিকে সম্পৃক্ত ঘর সেটাই, যে ঘরে বসবাস করতো। এ কারণেই যদি সে আপন পরিবার পরিজনের কাছে বেড়াতে এসে থাকে আর তখন স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে তার কর্তব্য হলো বসবাসের ঘরে ফিরে আসা এবং সেখানে ইদ্দত পালন করা।

স্বামী নিহত হয়েছিলো এমন স্ত্রীলোককে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ইদ্দতের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার গৃহেই বাস করো।

যদি মৃত স্বামীর বাড়ীতে তার প্রাপ্য হিসসা তার বসবাসের জন্য যথেষ্ট না হয় আর অন্যান্য ওয়ারিসান তাকে তাদের হিসসা থেকে বের করে দেয় তাহলে সে স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

কেননা এই স্থান পরিবর্তন হচ্ছে ওযরের কারণে। আর ইবাদত সমূহের ক্ষেত্রে ওযরসমূহ কার্যকরী হয়ে থাকে।

এটা সেই অবস্থার মত হলো, যখন স্ত্রী লোকটি নিজের সামান পত্র নষ্ট হওয়ার কিংবা বাড়ী ধ্বসে পড়ার আশংকা করে, কিংবা ভাড়া বাড়ীতে ছিলো, এখন ভাড়া পরিশোধের সামর্থ্য নেই।

আর যদি তালাকে বায়ন বা তিন তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তাহলে উভয়ের মাঝে (পর্যাপ্ত) পর্দার ব্যবস্থা থাকা জরুরী। অতঃপর (এক ঘরে বসবাস করায়) কোন দোষ নেই।

কেননা স্বামী তো স্বীকার করে যে, এই স্ত্রী তার জন্য হারাম। তবে যদি লোকটি ফাসেক হয় এবং তার পক্ষ থেকে স্ত্রী লোকটার প্রতি আশংকা থাকে তাহলে সে অন্যত্র চলে যাবে। কেননা এটা ওযর। তবে যেখানে স্থানান্তরিত হবে যেখান থেকে আর বের হবে না। অবশ্য সর্বোত্তম হলো স্ত্রীকে থাকতে দিয়ে স্বামীর নিজের বের হয়ে যাওয়া।

আর উভয়ে যদি নিজেদের মাঝে এমন কোন নির্ভরযোগ্য স্ত্রীলোককে এনে রাখে, যে উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হওয়ার সামর্থ্য রাখে, তবে তা উত্তম। আর যদি বাড়ীর পরিসর উভয়ের জন্য অকুলান হয় তাহলে স্ত্রী অন্যত্র চলে যাবে। অবশ্য স্বামীর চলে যাওয়াই উত্তম।

আর যদি এমন হয় যে, স্ত্রী তার স্বামীর সংগে মক্কার পথে বের হয়, আর সে তাকে নগরের বাইর কোন স্থানে তিন তালাক দিলো কিংবা মৃত্যুবরণ করলো, এ অবস্থায় যদি তার ও তার বসবাসের শহরের মাঝে তিন দিনের কম দুরত্ব হয় তাহলে নিজের শহরে ফিরে আসবে।

কেননা এটা মূলতঃ নতুন করে বের হওয়া নয় বরং পূর্ববর্তী বের হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে তিন দিনের দুরত্ব হলে নিজের শহরে ফিরেও আসতে পারে আবার গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে। তার সাথে কোন অভিভাবক থাকুক কিংবা না থাকুক।

অর্থাৎ গন্তব্যস্থলও যদি তিন দিনের দূরত্বে হয়, কেননা উক্ত স্থানে থাকা তার জন্য বের হওয়ার চেয়ে বেশী আশংকাজনক। তবে শহরে ফিরে আসাই উত্তম, যাতে স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করা হয়।

(জামে ছগীর কিতাবে) ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তবে যদি কোন নগরীতে অবস্থান কালে স্বামী তালাক দেয় কিংবা তাকে রেখে মারা যায় এবং তার সাথে কোন মাহরাম থাকে তাহলে ঐ নগরীতে ইদ্দত শেষ না করে বের হবে না, ইদ্দতের পর বের হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ বলেন, যদি তার সাথে কোন মাহরাম থাকে তাহলে ইদ্দতের পূর্বে উক্ত শহর থেকে বের হওয়ায় কোন দোষ নেই।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, নগর ত্যাগের বিষয়টি মূলত: বৈধ, যাতে নিঃসংগতা ও প্রবাসের কষ্ট দূর হয়। আর এটা ওযর হিসেবে গণ্য। আর নিষেধাজ্ঞা ছিল সফরের কারণে।

আর তা মাহরামের উপস্থিতির কারণে বিদূরিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, মাহরামের অনুপস্থিতির চেয়ে ইদ্দতের বিষয়টি বোঝানোর ব্যাপারের নিষিদ্ধতা অধিকতর গুরুতর। কেননা সাধারণ স্ত্রীলোক সফরের কম দুরত্বে মাহরাম ছাড়া বের হতে পারে, কিন্তু ইদ্দতরত স্ত্রীলোক তা পারেনা। সুতরাং মাহরাম ছাড়া সফরে বের হওয়া যদি তার হারাম হয়ে থাকে তাহলে ইদ্দত অবস্থায় হারাম হওয়া তো আর স্বাভাবিক।

باب ثبوت النسب

অধ্যায় ঃ নসব প্রমাণ প্রসংগে

অধ্যায় ঃ নসব প্রমাণ প্রসংগে

কেউ যদি বলে, অমুক স্ত্রীলোকটিকে যদি আমি বিবাহ করি তাহলে সে তালাক। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল এবং বিবাহের দিন থেকে ছয় মাসের মাথায় স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করলো, তাহলে এ সন্তান ঐ পুরুষের হবে এবং তার উপর মাহর ওয়াজিব হবে।

নসব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, স্ত্রীলোকটি হচ্ছে তার (বৈধ) শয্যা (সংগিনী)। কেননা বিবাহের সময় থেকে ছয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করার অর্থ হলো তালাকের মুহূর্ত থেকে ছয় মাসের কম সময়ে প্রসব করা। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, তালাকের পূর্বে বিবাহ অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। আর এটায় সম্ভাব্যতা এভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, স্ত্রীলোকটির সাথে মিলনরত অবস্থায় (পর্দার আড়ালে সাক্ষীর উপস্থিতিতে) তাকে বিবাহ করলো এবং বিবাহ ও বীর্যস্খলন একই সময়ে হলো, আর (বিষয়টি কষ্ট কল্পিত হলেও) নসব প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাই বিধেয়।

আর মাহর ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, ঐ স্বামীর সাথে যখন নসব সাব্যস্ত হলো তখন (শরীয়ত) আইনত: তাকে সহবাসকারী সাব্যস্ত করা হলো।

সুতরাং সহবাস দ্বারা মাহর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, রাজয়ী তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যদি দুই বছর বা তদূর্ধ্ব সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে, যতক্ষণ না স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়।

কেননা ইদ্দতের সময় (সহবাস বৈধ হওয়ার কারণে) গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার তোহর প্রলম্বিত হওয়াও জায়েয।

আর যদি (তালাকের সময় থেকে) দুই বছরের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে (প্রসব দ্বারা) ইদ্দত শেষ হওয়ার কারণে সে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ প্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা বিবাহের অবস্থায় কিংবা ইদ্দতের সময় গর্ভ সঞ্চার হয়েছে।

তবে এর দ্বারা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা এই গর্ভসঞ্চার তালাকের পূর্বে এবং পরে দুটোই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহের কারণে রেজা'আত সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি দুই বছরের বেশী সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে এটা দ্বারা রেজা'আত সাব্যস্ত হবে।

কেননা এখানে গর্ভ সঞ্চার তালাকের পরে হয়েছে, আর স্ত্রীর প্রতি যিনার তোহমত না থাকার কারণে দৃশ্যত: স্বামী দ্বারাই গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। সুতরাং সহবাস দ্বারা স্বামী রাজ'আতকারী সাব্যস্ত হবে।

বায়ন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যদি দুই বছরের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে।

কেননা তালাকের সময় সন্তান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ; সুতরাং গর্ভ সঞ্চারের পূর্বে শয্যা বৈধতা বিলুপ্ত হওয়া নিশ্চিত নয়। সুতরাং সতর্কতা হিসাবে নসব সাব্যস্ত হবে।

আর যদি বিচ্ছেদের সময় থেকে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে তাহলে নসব ছাবিত হবেনা।

কেননা এখানে গর্ভ সঞ্চার তালাকের পরে হয়েছে (বলেই স্পষ্ট)। সুতরাং এ গর্ভ স্বামী দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা তার সাথে সহবাস করা তো হারাম। **কিন্তু স্বামী যদি তা দাবী করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে।**

কেননা সে নিজে নসব দায় গ্রহণ করেছে। এবং তার গ্রহণযোগ্য কারণও রয়েছে। এভাবে যে, ইদ্দতের সময়কালে সন্দেহ বশতঃ ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে।

বায়ন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যদি সহবাস সম্ভব এমন অল্পবয়স্ক হয় আর সে (তালাকের সময় থেকে) নয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করে তাহলে তার নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না। তবে নয় মাসের কম সময়ে হলে সাব্যস্ত হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, (তালাকের সময় থেকে) দুই বছরের ভিতরে প্রসব হলে সন্তানের পিতৃপরিচয় স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

কেননা সে এমন ইদ্দতওয়ালী, যার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেনি। সুতরাং সে বয়স্কা স্ত্রীর সদৃশ হলো।

তরফাইনের দলীল এই যে, (অল্প বয়স্কা হওয়ার কারণে) তার ইদ্দত শেষ হওয়ার একটি দিক নির্ধারিত রয়েছে। আর তা হল (তিন) মাস গণনা। সুতরাং ঐ (তিন) মাস গুলি অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে শরীয়ত তার ইদ্দত শেষ হওয়ার হুকুম দিবে।

আর প্রমাণের ক্ষেত্রে শরীয়তের সিদ্ধান্ত তার স্বীকারোক্তির চেয়ে অধিকতর প্রবল। কেননা শরীয়তের হুকুম বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, পক্ষান্তরে (স্ত্রীলোকটির) স্বীকারোক্তি এর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে[১]।

এই অল্প বয়স্কা যদি রাজয়ী তালাক প্রাপ্তা হয় তাহলে তরফাইনের নিকট একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে (তালাকের সময় থেকে) সাতাশ মাস পর্যন্ত প্রসব হলে নসব সাব্যস্ত হবে।

কেননা তাকে ইদ্দতের শেষ প্রান্তে—আর তা হলো তিন মাস—সহবাসকারী ধরা হবে অতঃপর এই মেয়ে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদে অর্থাৎ দুই বছরের মধ্যে সন্তান প্রসব করল।

আর যদি এই অল্প বয়স্ক ইদ্দতের সময় গর্ভবতী হওয়ার দাবী করে তাহলে তার ও বয়স্ক স্ত্রীর ক্ষেত্রে অভিন্ন হুকুম হবে। কেননা তার স্বীকারোক্তির কারণে তার প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে।[২]

১। অথচ এই মেয়ে যদি মাস দ্বারা ইদ্দত শেষ হওয়া স্বীকার করে অতঃপর ছয় মাসের মাথায় প্রসব করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হয় না, সুতরাং শরীয়ত কর্তৃক ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা হলেও একই হুকুম হবে।

২। কেননা নিজের ইদ্দতের ব্যাপারে সে-ই অধিক অবগত। সুতরাং বায়ন তালাকের ক্ষেত্রে দু'বছরের কম সময়ে প্রসব হলে এবং রিজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে সাতাশ মাসের কম সময়ে প্রসব হলে তার সন্তানের নসব ও পিতৃ পরিচয় সাব্যস্ত হবে।

যে স্ত্রীর স্বামী বিয়োগ হয়েছে, সে যদি মৃত্যুর সময় থেকে দু বছরের ভিতরে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার নসব সাবিত হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের মাথায় যদি সন্তান প্রসব করে তাহলে তার নসব সাবিত হবে না।

কেননা ইদ্দত শেষ হওয়ার দিক নির্ধারিত থাকার কারণে শরীয়ত মাস দ্বারা তার ইদ্দত শেষ হওয়ার হুকুম দিয়েছে। সুতরাং সে নিজে ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারোক্তি করার মতই হলো, যেমন অল্প বয়স্কা স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমরা বর্ণনা করেছি।

ইদ্দত শেষ হওয়ার অন্য একটি দিক রয়েছে, আর তা হল গর্ভ প্রসব। পক্ষান্তরে অল্প বয়স্কার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে গর্ভ না থাকাই হলো আসল কারণ। বালিগ হওয়ার পূর্বে সে গর্ভ সঞ্চারের পাত্রী নয়। আর বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। **ইদ্দতওয়ালী যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারোক্তি করে অতঃপর ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানের নসব সাবিত হবে।**

কেননা সুনিশ্চিতভাবে তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। **আর যদি ছয় মাসের পর প্রসব করে তাহলে নসব সাবিত হবে না।**

কেননা তার স্বীকারোক্তির অসারতা আমাদের কাছে নিশ্চিত নয়। কারণ ইদ্দতের পরে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে।

আর এই স্বীকারোক্তি ব্যাপক হওয়ার কারণে যে কোন ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(আর ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীলোক যদি কোন সন্তান প্রসব করে তাহলে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা তার প্রসবের পক্ষে সাক্ষ্য) প্রদান ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে সন্তানের নসব সাবিত হবে না। তবে গর্ভাবস্থায় যদি দৃশ্যমান হয় এবং স্বামীর পক্ষ থেকে যদি স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষ্য ছাড়াই নসব সাবিত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) বলেন, সকল ক্ষেত্রেই একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ছাড়া সাব্যস্ত হবে।

কেননা ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কারণে শয্যাবাসের বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। আর তাই নসব সাব্যস্তকারী। এখন প্রয়োজন শুধু এটা নির্ধারণ করা যে, এই সন্তানটি তার গর্ভজাত, আর তা একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হবে।

যেমন বিবাহ বিদ্যমান অবস্থায় হুকুম।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, স্ত্রীলোকটির প্রসবের স্বীকারোক্তি দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে আর যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা প্রমাণ হতে পারে না।

সুতরাং নসব সাবিত করার জন্য নতুন ভাবে প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে পূর্ণ প্রমাণের শর্ত আরোপিত হবে। পক্ষান্তরে গর্ভ দৃশ্যমান হওয়া কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি আসার বিষয় ভিন্ন। কেননা এখানে প্রসবের পূর্বেই নসব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর সন্তানের নির্ধারণটি একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা সাবিত হবে।

আর যদি সে স্বামী বিয়োগের ইদ্দতরত হয় (এবং দু'বছরের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে) এবং ওয়ারিছগণ সন্তান প্রসবের সত্যতা স্বীকার করে তাহলে তিন ইমামের সকলেরই মতে কেউ জন্মের সাক্ষ্য প্রদান না করলেও সন্তান মৃত ব্যক্তিরই সন্তান রূপেই গণ্য হবে।

উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে (ওয়ারিশদের স্বীকৃতি দ্বারা সন্তানত্ব সাব্যস্ত হওয়ার) এই হুকুমটি তো স্পষ্ট। কেননা এটা সম্পূর্ণতঃ তাদেরই হক। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাদের সত্যায়ন গ্রহণ করা হবে। অবশ্য নসব সম্পর্কে প্রশ্ন হলো, তা অন্যের ব্যাপারে সাবিত হবে কিনা।

ফকীহগণ বলেছেন, সত্যায়নকারীরা যদি সাক্ষী দানের যোগ্য হয় তাহলে প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে অন্যদের জন্যও তার নসব সাবিত হবে।

এ কারণেই কেউ কেউ বলেন সাক্ষ্য শব্দটি ব্যবহার করা শর্ত। আবার কেউ বলেছেন, তা শর্ত নয়। কেননা অন্যদের (অর্থাৎ অস্বীকার কারীদের) ক্ষেত্রে নসব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকারকারীদের স্বীকৃতি দ্বারা তাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত হওয়ার অনুগামী।

আর যা অনুগামী রূপে সাব্যস্ত হয়, তার জন্য যাবতীয় শর্তের বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়।

কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে আর সে বিবাহের দিন থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তাহলে সন্তানের নসব তার সাথে সাবিত হবে না।

কেননা (নিশ্চতরূপেই) এ গর্ভ সঞ্চার বিবাহের পূর্বেকার। সুতরাং তা স্বামীর পক্ষ থেকে হতে পারেনা।

পক্ষান্তরে যদি ছয়মাসের মাথায় কিংবা তার পরে প্রসব করে তাহলে স্বামী স্বীকার করুক কিংবা নিরব থাকুক, সন্তানের নসব তার সাথে সাবিত হবে।

কেননা শয্যা বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে এবং সময়কালও পূর্ণ রয়েছে।

যদি স্বামী প্রসবের বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে প্রসবের সপক্ষে একজন স্ত্রীলোকের (ধাত্রীর) সাক্ষ্য দ্বারা নসব সাবিত হবে। এমন কি স্বামী যদি সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে তার উপর লি'আন প্রযোজ্য হবে।

কেননা বিদ্যমান শয্যা বৈধতা দ্বারা নসব সাবিত হয়। আর লি'আনতো ওয়াজিব হয় অপবাদ আরোপের কারণে। আর অপবাদ আরোপের জন্য সন্তানের উপস্থিতি অনিবার্য নয়। কেননা সন্তান ছাড়াও ব্যভিচারের অপবাদ সাব্যস্ত হতে পারে।

সন্তান প্রসবের পর যদি স্বামী স্ত্রীতে মতবিরোধ দেখা দেয় অর্থাৎ স্বামী বলে মাত্র চারমাস হলো তোমাকে বিবাহ করেছি, আর স্ত্রী বলে ছয় মাস হয়ে গেছে, তাহলে স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সন্তান স্বামীরই হবে। কেননা বাহ্যিক অবস্থা স্ত্রীর অনুকূলে সাক্ষী। কারণ বাহ্যতঃ এটাই সত্য যে, স্ত্রীলোকটি যিনার মাধ্যমে নয়, বরং বিবাহের মাধ্যমই সন্তান জন্ম দিয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) এখানে কসম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি। এটি মত-পাথর্ক্যপূর্ণ।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি সন্তান প্রসব করো তাহলে তোমার প্রতি তালাক। অতঃপর একজন স্ত্রীলোক (ধাত্রী) সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য দান করলো, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তালাক হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) এর মতে তালাক হয়ে যাবে।

কেননা সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ধাত্রীর সাক্ষ্য (শরীয়তের দৃষ্টিতে) গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه

যে সকল বিষয় পুরুষরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রী লোকদের সাক্ষ্য বৈধ।

তাছাড়া এই যে, সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে যখন ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তার উপর ভিত্তিকৃত হুকুমের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা হলো তালাক।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, স্ত্রী মূলতঃ ইয়ামীন ভংগ হওয়ার দাবী করছে। সুতরাং তা পূর্ণ প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। এটা এ কারণে যে, স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে তো অনিবার্য। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা (সন্তান প্রসবের সাথে তালাকের অনিবার্য কোন সম্পর্ক নেই, বরং) তালাক সন্তান প্রসব থেকে পৃথকও হতে পারে।

আর স্বামী যদি গর্ভসঞ্চারের বিষয় স্বীকার করে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কোন সাক্ষ্য ছাড়াই তালাক হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে ধাত্রীর সাক্ষ্য প্রদান শর্ত।

কেননা ইয়ামীন ভংগ হওয়া সম্পর্কিত স্ত্রীর দাবীর সপক্ষে প্রমাণ অপরিহার্য। আর প্রথমোক্ত মাসআলায় আমাদের উপস্থাপিত বক্তব্য মুতাবিক এ ক্ষেত্রে ধাত্রীর সাক্ষ্য প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, গর্ভ সঞ্চারের বিষয় স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ তার চূড়ান্ত পরিণতি তথা প্রসবের বিষয়টিও স্বীকার করে নেওয়া। তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল এই যে, স্বামী এ কথা স্বীকার করেছে যে, স্ত্রী আমানত ধারণকারিণী (অর্থাৎ সে যেন বলেছে আমার সন্তান তার গর্ভে আমানত রয়েছে) সুতরাং আমানত ফেরতদানের ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল হল দু'বছর।

কেননা আয়েশা (রা) বলেছেন, গর্ভে সন্তান দুই বছরের অধিক একমুহূর্ত অবস্থান করতে পারে না, যদিও ঘূর্ণিত চরকির ছায়ার সমপরিমাণ সময়ও হয়। **আর তার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস।** কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

(সন্তান গর্ভে ধারণ করা এবং তাকে স্তন্য ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশমাস)। পরে বলা হয়েছে وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ (তাদের স্তন্য ছাড়ানো হবে দু'বছরে) সুতরাং গর্ভ ধারণের সময়কাল অবশিষ্ট থাকছে ছয়মাস।

ইমাম শাফেয়ী (র) গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় চার বছর নির্ধারণ করেছেন। তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বর্ণিত হযরত আয়েশা (র) এর হাদীছ। আর এটাই স্বাভাবিক যে, আয়েশা (র) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে) শুনে তা বলেছেন। কেননা বুদ্ধি বিচার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

কেউ যদি দাসীকে বিবাহ করে এবং (সহবাসের পর) তাকে তালাক প্রদান করে; অতঃপর তাকে খরিদ করে, এখন এই দাসী যদি খরিদ করার দিন থেকে ছয় মাসের কম

সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথে অবশ্য সাব্যস্ত হবে, অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না।

কেননা প্রথম ছুরতে সে হচ্ছে ইদ্দতওয়ালীর সন্তান আর গর্ভসঞ্চার ক্রয় থেকে অগ্রবর্তী।[১]

আর দ্বিতীয় ছুরতের কারণ এই যে, (স্ত্রীর নয় বরং) দাসীর সন্তান। কেননা গর্ভঞ্চারকে নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। আর এখানে নিকটতম সময় হচ্ছে দাসী হওয়ার সময়। সুতরাং মনিবের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন জরুরী।

এই সিদ্ধান্ত ঐ সময়ের জন্য, যখন একটি বায়ন তালাক হয় কিংবা খোলা হয় কিংবা তালাকে রাজয়ী হয়।

পক্ষান্তরে যদি দুই তালাক হয় তাহলে তালাকের সময় থেকে দু'বছর পর্যন্ত প্রসব হলে নসব সাবিত হবে।

কেননা (দুই তালাকের মাধ্যমে) দাসী তার জন্য চূড়ান্ত ভাবে হারাম হয়েছে। সুতরাং গর্ভ সঞ্চারকে অনিবার্যভাবেই তালাকের পূর্ববর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা এই খরিদ করার দ্বারা দাসী তার জন্য হালাল হবে না।

কেউ যদি তার দাসীকে বলে, তোমার গর্ভে কোন সন্তান থাকলে তা আমার। অতঃপর একজন স্ত্রীলোক (ধাত্রী) সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য দান করলো তাহলে এই দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

কেননা এখন প্রয়োজন শুধু সন্তান নির্ধারণ করা আর তা সর্বসম্মত ভাবেই ধাত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

কেউ যদি কোন বালক সম্পর্কে বলে, এ আমার পুত্র, অতঃপর সে মারা যায়। তারঃপর বালকের মা এসে বললো, আমি তার স্ত্রী, তাহলে স্ত্রী লোকটি তার স্ত্রী এবং বালকটি তার পুত্র হবে এবং মাতা পুত্র উভয়ে তার ওয়ারিছ হবে।

نوادر গ্রন্থে রয়েছে যে, ইমাম মুহম্মদ (র) এটাকে সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত বলেছেন। সাধারণ কিয়াসের দাবী মতে স্ত্রীলোটি মীরাছ পাবে না।

কেননা নসব যেমন শুদ্ধ বিবাহ দ্বারা সাধিত হয় তেমনি ফাসেদ বিবাহ দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ সন্দেহমূলক সহবাস এবং মালিকানা সূত্রের সহবাস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং লোকটির উক্ত বক্তব্য বিবাহের স্বীকারোক্তি নয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, আলোচ্য মাসআলাটি ঐ ক্ষেত্রে যেখানে বালকের মাতা স্বাধীন নারী রূপে এবং বালকটির মাতা রূপে সুপরিচিত।

আর শরীয়তের নির্ধারণ হিসাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা হিসাবে শুদ্ধ বিবাহই সন্তান গ্রহণের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

যদি স্ত্রীলোকটি স্বাধীন নারী হিসাবে পরিচিত না হয় আর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছরা বলে যে, তুমি তো উম্মে ওয়ালাদ, তাহলে সে মীরাছ পাবে না।

কেননা দারুল ইসলামের বিবেচনায় স্বাধীনতার প্রকাশ্য হওয়া প্রমাণ গণ্য করা হবে শুধু দাসিত্ব আরোপ রোধ করার জন্য, মীরাছের হক সাব্যস্তের জন্য নয়।

১। ক্রয়ের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করেছে। আর বিধানগতভাবে শয্যা বৈধতা বিদ্যমান থাকার কারণে ইদ্দতওয়ালীর সন্তানের ন্যায় দাবী উত্থাপন ছাড়া সাব্যস্ত হয়।

অধ্যায় ঃ সন্তান প্রতিপালন এবং কে এর অধিক হকদার

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে মা অধিক হকদার।

কেননা বর্ণিত আছে যে, (তালাক প্রাপ্তা) জনৈকা স্ত্রীলোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ পুত্রের জন্য আমার উদর ছিলো আধার এবং আমার কোল ছিল তার জন্য আশ্রয় স্থল এবং আমার স্তন ছিলো তার জন্য পানপাত্র; অথচ তার বাপ বলছে যে, আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

انت أحق به مالم تتزوجى যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে ততক্ষণ তার ব্যাপারে তুমি অধিক হকদার।

তাছাড়া এই জন্য যে, মা হলো অধিক স্নেহময়ী এবং প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিক সক্ষম। সুতরাং তার হাতে সমর্পণ করা অধিক কল্যাণজনক। এদিকে ইংগিত করেই আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেছিলেন,

ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر

হে ওমর" তোমার কাছের শহদ-মধুর চেয়ে তার মুখের থুথু তার জন্য অনেক ভালো।

হযরত ওমর (রা) ও তার স্ত্রীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটেছিলো তখন বহু সাহাবার উপস্থিতিতে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন।

আর সন্তানের (যাবতীয়) খরচ পিতার দায়িত্বে থাকবে। যেমন আমরা পরবর্তীতেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করব। আর প্রতিপালনের বিষয় মাতাকে বাধ্য করা যাবেনা।

কেননা হয়ত কোন কারণে প্রতিপালনে সে অক্ষম থাকতে পারে।

মা যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে দাদীর তুলনায় নানী অধিক হকদার, যদিও নানী অধস্তন স্তরের হয়।

কেননা এই প্রতিপালন অধিকার মাতৃত্বের দিক থেকে লাভ হয়।

যদি নানী না থাকে তাহলে দাদী বোনদের চেয়ে অধিক হকদার।

কেননা দাদীও মাতৃত্বের শ্রেণীভূক্ত। এ কারণেই তারা ছয়ভাগের একভাগ মীরাছ লাভ করে। তাছাড়া জন্মদান সম্পর্কের কারণে তিনি অধিকতর স্নেহ-মমতার অধিকারিণী হবেন।

দাদী যদি না থাকেন তাহলে বোনেরা ফুফুদের ও খালাদের চেয়ে বেশী হকদার।

কেননা তারা একই মা-বাবার সন্তান। এ কারণেই মীরাছে তাদের অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

কোন বর্ণনা মতে আপন খালা সৎ বোনের চেয়ে বেশি হকদার। কেননা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খালা হচ্ছে মাতা সদৃশ, আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ورفع ابويه على العرش (ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে অসীন করলেন) কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর খালা।

বাপ শরীক ও মা-শরীক বোনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা এরূপ বোন অধিক স্নেহময়ী হবে। এর পর মা-শরীক বোন, এরপর বাপ শরীক বোন হকদার হবে।

কেননা এ হক লাভ হয় মাতৃত্বের দিক থেকে।

অতঃপর মাতৃত্বের আত্মীয়কে অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে খালারা ফুফুদের চেয়ে বেশী হকদার হবে। এবং বোনদেরকে যেভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা হয়েছে তাদেরকে সেভাবে করা হবে। অর্থাৎ দুই দিকের আত্মীয়তার অধিকারিণীকে অতঃপর মায়ের দিকের আত্মীয়তার অধিকারীণীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

অতঃপর ফুফুদের সেইভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে। আর এই স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে যে কেউ বিবাহ করবে, তার প্রতিপালন অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

প্রমাণ হলো ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এই কারণে যে, সৎ পিতা অপরিচিত ও অনাত্মীয় হলে সে তো খরচ করবে অল্প আর তার দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ণ। সুতরাং কল্যাণের আশা নেই। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে শিশুটির দাদা যদি হয় নানীর (নতুন) স্বামী তাহলে নানীর অধিকার বহাল থাকবে।**

কেননা স্নেহশীলতায় দাদা শিশুটির বাবার স্থলবর্তী হবে। সুতরাং তার ভালো-মন্দের দিকে নযর রাখবে। **একই হুকুম হবে যদি কোন শিশুর (অতি নিকটাত্মীয়) মাহ্‌রামের সাথে ঐ স্ত্রীলোকটির বিবাহ হয়।**

কেননা নিকটাত্মীয়তার কারণে স্নেহ বিদ্যমান থাকবে। **বিবাহের কারণে যে স্ত্রীলোকের প্রতিপালন অধিকার রহিত হয়েছে, বিবাহ সম্পর্ক রহিত হলে সে অধিকার সে ফিরে পাবে।**

কেননা প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে।

শিশুটির নিকটাত্মীয় কোন স্ত্রী লোক যদি না থাকে আর পুরুষেরা তার প্রতিপালকত্ব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে তাহলে আছাবা হিসাবে নিকটতম যে, সেই হবে অধিকতর হকদার।

কেননা অভিভাবকত্ব নিকটতম আত্মীয়ের জন্যই সংরক্ষিত আর আছাবাদের পর্যায়ক্রম যথা স্থানে বিবৃত হয়েছে।[১]

তবে বালিকা শিশুকে না-মাহরাম আছাবার হাতে অর্পণ করা হবে না। যেমন আযাদ কারী মনিব (মাওলা ইতাকা) এবং চাচাত ভাই। ফিতনার আশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

মা ও নানী বালক শিশুর লালন পালনে হকদার থাকবে, যে পর্যন্ত সে পানাহার, পোশাক পরিবর্তন, **ইসতিনজা ইত্যাদি কাজকর্ম একা একা করতে সক্ষম না হয়।**

জামে ছাগীর কিতাবের ভাষ্য হলো যে পর্যন্ত সে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত না হয় ; **অর্থাৎ একা একা পানাহার করতে এবং পোশাক পরিবর্তন করতে সক্ষম** হয়।

উভয় ভাষ্যের মর্মার্থ একই। কেননা নির্ভরশীলতা থেকে পূর্ণ মুক্ত হওয়া একা ইসতিঞ্জা করতে সক্ষমতার মাধ্যমেই হবে।

১। আছাবার পরিচয় ও পর্যায়ক্রম ফারায়েয ও নিকাহের অভিভাবক অধ্যায়ে দেখুন।

এই সীমা নির্ধারণের কারণ এই যে, এ সকল কাজকর্মে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে যখন সে মুক্ত হবে তখন পুরুষোচিত আখলাক ও আচার আচরণ শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে ; আর আদব-কায়দা ও শিক্ষা দীক্ষা দানের ব্যাপারে পিতাই অধিক সক্ষম।

আর আবু বকর খাস্সাফ (র) সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার বয়স নির্ধারণ করেছেন সাত বছর।

আর বালিকার ক্ষেত্রে ঋতুবতী হওয়া পর্যন্ত মা ও নানী লালন পালনের হকদার থাকবে।

কেননা (পানাহার ইত্যাদি ব্যাপারে) নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার পরও প্রয়োজন হলো নারী সুলভ আদব কায়দা ও শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করা। আর এ বিষয়ে স্ত্রী লোকই অধিক সক্ষম।

আর বালেগ হওয়ার পর প্রয়োজন হলো তার নিরাপত্তা বিধান ও বিবাহ দান। আর এ বিষয়ে পিতা অধিক সক্ষম এবং অধিক বিচক্ষণ।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বালিকা যখন কামাকর্ষণের বয়সে উপনীত হবে তখনই তাকে পিতার হাতে সোপর্দ করতে হবে। কেননা তখনই নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন।

মা ও নানী ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোক কামার্কষণের বয়স পর্যন্ত বালিকার ব্যাপারে অধিক হকদার। পক্ষান্তরে জামে ছাগীর কিতাবের ভাষ্যমতে সীমা হলো আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত।

কেননা তাতে তাদের সেবা কাজে ব্যবহার করার অধিকার তাদের নেই। এ কারণেই তারা তাকে অন্যত্র পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং (শিক্ষা দীক্ষা দানের) উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

মা ও নানীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শরীয়তের বিধানমতে বালিকাকে তারা কাজে ও সেবায় নিয়োজিত করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যখন তার দাসীকে আযাদ করে দেবে এবং উম্মে ওয়ালাদ যখন আযাদ হয়ে যাবে, তখন শিশুর প্রতিপালনের হকদার হওয়ার ব্যাপারে তারা স্বাধীন স্ত্রীলাকের মত হবে।

কেননা হকদার সাব্যস্ত ওয়ার সময় তারা স্বাধীন। কিন্তু মুক্তিলাভের পূর্বে সন্তানের প্রতিপালনে তাদের কোন হক নেই।

কেননা মনিবের সেবায় ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুর লালন পালনে তারা অক্ষম।

আর যিম্মী নারী তার মুসলিম সন্তানের প্রতিপালনের অধিক হকদার যতদিন না সে ধর্ম পার্থক্য বোঝার আকল-বুদ্ধি সম্পন্ন হয় কিংবা কুফরীর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার আশংকা হয়।

কেননা এর পূর্বে মায়ের কাছে রাখাতেই কল্যাণ এবং এর পরে ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান। **মা বাবার কোন একজনকে পছন্দ করার এখতিয়ার বালক ও বালিকার নেই।**

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাদের সে অধিকার রয়েছে। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন।

আমাদের দলীল এই যে, সে তার বুদ্ধির ত্রুটি ও স্বল্পতার কারণে তাকেই গ্রহণ করবে যার কাছে আরাম রয়েছে, যাতে তাকে খেলাধূলার জন্য অবাধে ছেড়ে দেয়। এভাবে তার কল্যাণ সাধিত হবে না।

আর এটা সহীহ্রূপে প্রমাণিত যে, ছাহাবা কেরাম শিশুকে এখতিয়ার প্রদান করেননি।

আর হাদীস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। ফলে নবী সাল্লাল্লাহুর দু'আর বরকতে অধিকতর কল্যাণের দিকটি গ্রহণ করার তাওফিক তার হয়েছিলো, কিংবা এই ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে, যখন সন্তান সাবালক হয়ে যায়।

পরিচ্ছেদ ঃ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে নিয়ে শহর থেক অন্যত্র যেতে চায় তাহলে তার এ অধিকার নেই।

কেননা এতে সন্তানের পিতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। তবে যদি সে তাকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চায় আর স্বামী তাকে সেখানেই বিবাহ করেছিলো (তাহলে অনুমতি রয়েছে।)

কেননা শরীয়তের বিধান এবং রেওয়াজ অনুযায়ী সে যেখানে বসবাস নিজের উপর আরোপ করে নিয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من تاهل ببلدة فهو منهم

কেউ যদি কোন শহরে বিবাহ করে তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কারণেই দারুল হরবের কোন পুরুষ বা নারী দারুল ইসলামে বিবাহ করলে যিম্মী হয়ে যায়।

আর যদি স্ত্রী নিজে বাড়ি ছাড়া অন্য কোন শহরে নিতে চায় আর সেখানেই তাদের বিবাহ হয়েছিলো, কুদূরীতে ইংগিত করা হয়েছে যে, এ অধিকার তার নেই। এটা হলো মাবসূতের তালাক অধ্যায়ের বর্ণনা।

আর জামে ছাগীর কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন, তার এ অধিকার হবে।

কেননা যখন কোন স্থানে তার আকদে নিকাহ হয়, তখন তার বিধান সমূহ সেখানেই কার্যকর হবে। যেমন, বিক্রয়ের ব্যাপারে বিক্রয় স্থানে বিক্রিত দ্রব্য অর্পণ করা ওয়াজিব হয়। আর আকদে নিকাহের বিধান সমূহের অন্যতম হলো সন্তানকে কাছে রাখার অধিকার।

প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, প্রচলিত রেওয়াজ আনুযায়ী প্রবাসে বিবাহ অনুষ্ঠানের অর্থ সেখানে বসবাসের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ নয়। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

মোটকথা, স্বদেশ এবং বিবাহ অনুষ্ঠান দুটো বিষয় এক স্থানে হওয়া আবশ্যক। এ সকল বিধান হলো ঐ সময়, যখন উভয় শহরের মাঝে বেশী দূরত্ব হয় (যাতে দিনে এসে দিনে ফিরে যাওয়া পিতার জন্য কষ্টকর) পক্ষান্তরে যদি এতটা কাছাকাছি হয়, যাতে পিতার পক্ষে সন্তানকে এসে দেখে শুনে নিজের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে সেখানে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই। দুই গ্রামের ক্ষেত্রেও এরূপ হুকুম।

আর যদি শহরের পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে শহরে চলে যায় তাহলে কোন আপত্তি নেই। কেননা এতে শিশুর কল্যাণ রয়েছে এই হিসাবে যে, সে শহরের আদব-কায়দায় গড়ে উঠবে। আর পিতারও তাতে কোন ক্ষতি নেই। এর বিপরীত অবস্থায় শিশুর ক্ষতি রয়েছে। কেননা তখন সে গ্রাম্য চরিত্রে গড়ে উঠবে। সুতরাং মায়ের জন্য সে অধিকার নেই।

باب النفقه

অধ্যায় ঃ ভরণ-পোষণ

অধ্যায় ঃ ভরণ-পোষণ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ পোষণ আবশ্যক, স্ত্রী মুসলমান হোক কিংবা কাফের। স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামী গৃহে সমর্পণ করবে তখন স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে।

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

পিতার কর্তব্য হলো স্ত্রীদের খোরপোশ সদাচারের সংগে প্রদান করা।

আর বিদায় হজ্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

তোমাদের উপর স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো সদাচারের সংগে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা।

তাছাড়া এই জন্য যে, ভরণ পোষণ হচ্ছে আবদ্ধ থাকার প্রাপ্য। আর যে কোন ব্যক্তি অন্য কারো উদ্দিষ্ট হক আদায় করার জন্য আবদ্ধ থাকবে, তার ভরণ পোষণ ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে। এর আসল হলো কাযী ও যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তি (এরা মুসলমানদের সেবায় আবদ্ধ থাকার কারণে তাদের জীবিকা বায়তুল মাল হতে আদায় করা হয়ে থাকে)।

উল্লেখিত প্রমাণগুলাতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম স্ত্রী এ বিষয়ে সমান হবে।

আর এ বিষয়ে উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা হবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম খাচ্ছাফ (র) এর গৃহীত মত। আর এর উপরই ফতোয়া। এর ব্যাখ্যা এই যে, উভয় যদি সচ্ছল হয় তাহলে সচ্ছলতাপূর্ণ ভরণ পোষণ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে অসচ্ছল হলে অসচ্ছলতা অনুপাতে ভরণ পোষণ ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রী অসচ্ছল এবং স্বামী সচ্ছল হয় তাহলে তার খোরপাশ হবে সচ্ছল নারীদের চেয়ে নিম্নমানের এবঙ অসচ্ছল নারীদের চেয়ে উঁচু মানের। আর ইমাম কারখী (র) বলেন, এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করা হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ, (সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে)

প্রথম মতামতের কারণ হলো হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ,

خذى من مال زوجك مايكفيك وولدك بالمعروف

তুমি তোমার স্বামীর সম্পদ হতে সদাচারের সাথে ঐ পরিমাণ গ্রহণ করো, যা তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়।

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করেছেন। এই হলো ফিক্‌হী যুক্তির চাহিদা। কেননা খোরপোশ প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়াজিব। আর সচ্ছল নারীদের জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট, সে পরিমাণ দরিদ্র স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে না। সুতরাং অতিরিক্ত ধার্য করার কোন কারণ নেই।

আর আয়াতের দাবীর আলোকে আমরা বলব যে, স্বামীকে তার সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করতে বলা হবে এবং সামর্থ্যের অবশিষ্ট পরিমাণ তার দায়দায়িত্বে ঋণ হিসাবে থাকবে।

আর আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত بالمعروف (সদাচারের সঙ্গে) এর অর্থ হলো মধ্যম পন্থা। আর তা-ই হলো ওয়াজিব। আর এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (র) মত প্রকাশ করেছেন যে, সচ্ছল ব্যক্তির উপর দুই মুদ্দ (অর্ধছা' বা পৌনে দুই সের) এবং অসচ্ছল ব্যক্তির উপর এক মুদ্দ এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উপর দেড় মুদ্দ ধার্য হবে।

কেননা যা পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়, তা মূলত: শরীয়ত অনুযায়ী নির্ধরিত হয় না। **আর স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরানা আদায় না করা পর্যন্ত নিজেকে সমর্পণ করা হতে বিরত থাকে তাহলে সে খোরপোশ পাবে।**

কেননা নিজেকে এই বিরত রাখা একটি হক আদায় করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে। সুতরাং স্ত্রীর আবদ্ধতার অনুপস্থিতি স্বামীর পক্ষ থেকে সৃষ্ট কারণে হচ্ছে। সুতরাং আবদ্ধতা অবিদ্যমান বলে ধরা হবে না। **আর স্ত্রী যদি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাহলে গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খোরপোশ তার পাওনা নেই।**

কেননা আবদ্ধ থাকা তার দিক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। আর যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আবদ্ধ থাকাও বিদ্যমান হবে এবং খোরপোশও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে স্বামীর গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় সহবাসের সুযোগ দানে বিরত থাকার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আবদ্ধ থাকা বিদ্যমান রয়েছে, আর স্বামী বলপ্রয়োগ পূর্বক সহবাস করতে সক্ষম।

আর যদি স্ত্রী অল্প বয়স্কা হয়, যাকে সম্ভোগ করা যায় না, তাহলে তার জন্য খোরপোশ নেই।

কেননা সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা তার মধ্যের অবস্থাগত কারণে হয়েছে। আর খোরপোশ আবশ্যককারী আবদ্ধতা হচ্ছে তা যা বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম হয়। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে অসুস্থ স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। একটু পরে আমরা তা বর্ণনা করবো। শাফেয়ী (র) বলেন, অল্প বয়স্কার জন্য খোরপোশ সাব্যস্ত হবে। কেননা তাঁর মতে খোরপোশ হচ্ছে স্বামীর অধিকার লাভের বিনিময়। যেমন দাসীর ক্ষেত্রে তার দেহগত মালিকানার বিনিময়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বামী-সত্ত্ব লাভের বিনিময় হচ্ছে মোহরানা। আর একটি বিনিময়কৃত বস্তুর বিপরীতে দুটি বিনিময় একত্র হতে পারে না। সুতরাং অল্প বয়স্কার জন্য মোহরানা ওয়াজিব হবে, খোরপোশ নয়।

আর স্বামী যদি সহবাসে সক্ষম নয় এমন অল্প বয়স্ক হয় যে, আর স্ত্রী বয়স্কা হয় তাহলে স্বামীর সম্পদ থেকে সে খোরপোশ লাভ করবে।

কেননা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সমর্পণ সম্পন্ন হয়েছে। অক্ষমতা দেখা দিয়েছে স্বামীর পক্ষ থেকে। সুতরাং সে লিঙ্গ কর্তিত এবং পুরুষত্বহীন স্বামীর ন্যায় হলো।

কোন ঋণের কারণে যদি স্ত্রী বন্দী হয় তাহলে খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে না।

কেননা ঋণ আদায়ে গড়িমসির কারণে (স্বামীর কাছে আত্ম সমর্পণের) আবদ্ধতার অবিদ্যমানতা তার দিক থেকে এসেছে। আর যদি ঋণ আদায়ে গড়িমসি তারপক্ষ থেকে না হয়ে থাকে বরং তা আদায়ে অক্ষমতার কারণে তা আদায় করতে পারেনি, তবুও স্বামীর দিক থেকেও তা হয়নি। একই ভাবে খোরপোশ প্রাপ্য হবে না যদি কেউ স্ত্রীকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে। তবে ফতোয়া হল প্রথম মতামতের উপর। কেননা স্বামীর কাছে আবদ্ধতার অবিদ্যমানতা স্বামীর পক্ষ থেকে নয়, যাতে আইনগতভাবে তা বিদ্যমান গণ্য করা যেতে পারে।

তদ্রূপ (খোরপোশ প্রাপ্য হবে না) যদি স্বামী ছাড়া অন্য কোন মাহরামের সাথে হজ্জে যায়। কেননা আবদ্ধতার অবিদ্যমানতা স্ত্রীর দিক থেকে হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে। কেননা ফরয ইবাদত আদায় করা একটি ওযর। তবে গৃহবাসের পরিমাণ খোরপোশ ওয়াজিব হবে, সফরের পরিমাণ নয়। কেননা স্বামীর নিকট এ-ই তার প্রাপ্য।

যদি স্বামী তার সাথে সফর করে তাহলে সর্বসম্মত ক্রমেই খোরপোশ অবশ্য ওয়াজিব হবে। কেননা স্বামী তার সঙ্গে থাকার কারণে আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে গৃহবাসের পরিমাণ খরচ ওয়াজিব হবে। সফরের খরচ নয়।

আর যাতায়াত ভাড়া ওয়াজিব হবে না। এর কারণ আমরা আগেই বলেছি। **স্ত্রী যদি স্বামী-গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে।**

কিয়াসের দাবী এই যে, সহবাসে প্রতিবন্ধক কোন অসুস্থতা হলে খোরপোশ প্রাপ্য হবে না। কেননা সম্ভোগের জন্য আবদ্ধতা অবিদ্যমান হয়েছে।

সুক্ষ কিয়াসের দলীল এই যে, এই অবস্থায়ও আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা স্বামী তার সহবাসের শান্তি লাভ করছে আর তাকে স্পর্শ করছে। এবং স্ত্রী তার ঘরের হেফাজত করছে। আর প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে একটি আরোপিত ব্যাপার। সুতরাং তা হায়যের সদৃশ হলো।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী নিজেকে স্বামীর অধিকারে অর্পণ করার পর যদি অসুস্থ হয়, তাহলে খোরপোশ ওয়াজিব হবে। কেননা সমর্পণ সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে অসুস্থতার পর সমর্পণ করলে খোরপোশ ওয়াজিব হবে না। কেননা সমর্পণ বিশুদ্ধ হয়নি। ফকীহগণ বলেছেন, এ মতই উত্তম। আর ইমাম কুদূরীর ব্যবহৃত 'স্বামীগৃহে অসুস্থ হওয়া' শব্দে সেদিকে ইংগিত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামী যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার উপর স্ত্রীর খরচ এবং তার চাকরের খরচ ধার্য করা হবে।

এখানে অবশ্য চাকরের খরচ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। এ কারণেই কোন কোন ভাষ্যে শুধু এতটুকু আছে যে, স্বামী সচ্ছল হলে স্ত্রীর চাকরের খরচ তাকে দিতে হবে।

কারণ এই যে, স্ত্রীর পর্যাপ্ত খরচ প্রদান করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য, আর এর দ্বারাই প্রর্যাপ্ততার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেননা একজন চাকর থাকা স্ত্রীর জন্য জরুরী।

অবশ্য একজনের অধিক চারেরর খরচ ধার্য করা হবে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র.) এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, দু'জন চাকরের খরচ ধার্য করা হবে।

কেননা ভিতরের কাজকর্মের জন্য একজন এবং বাইরের কাজকর্মের জন্য আরেকজন প্রয়োজন। তারফায়নের বক্তব্য এই যে, একজন উভয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুতরাং দুজনের পয়োজন নেই।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, চাকরের খরচ প্রদানের পরিবর্তে স্বামী নিজে যদি তার প্রয়োজন সেরে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে সেটা যথেষ্ট হবে। সুতরাং এক জনকেই তার স্থলবর্তী করে দেওয়াও যথেষ্ট হবে। ফকীহগণ বলেছেন, সচ্ছল স্বামীর উপর চাকরের খরচ ঐ পরিমাণ আবশ্যক হবে, যা অচ্ছল ব্যক্তির উপর স্ত্রীর খোপোশ হিসাবে অবশ্যক হয়। আর সেটা হলো নিম্নতম পর্যাপ্ত পরিমাণ।

কুদূরীতে উল্লেখিত 'যদি সচ্ছল হয়' বক্তব্যে এদিকে ইংগিত রয়েছে যে, স্বামীর সচ্ছলতার সময় চাকরের খরচ তার উপর ওয়াজিব হবে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে ইমাম হাসান (র) এর বর্ণনা। আর এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। আর এটি ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতামত থেকে ভিন্ন।

কেননা অসচ্ছল স্বামীর উপর ওয়াজিব পর্যাপ্ততার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর কখনো স্ত্রী তার কাজ কর্মের ব্যাপারে নিজেই যথেষ্ট হতে পারে।

কেউ তার স্ত্রীর খোরপোশ চালাতে অসমর্থ হয়ে পড়লে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করা হবে না , বরং (কাযীর পক্ষ হতে) স্ত্রীকে বলা হবে তার নামে খরচ করে চালাতে থাকো।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করা হবে। কেননা সে সদাচারের সাথে তাকে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। সুতরাং কাযী বিচ্ছেদের ব্যাপারে তার স্থলবর্তী হবেন, যেমন কর্তিত লিঙ্গ ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বরং এ ক্ষেত্রে তা আরো জরুরী। কেননা খোর পোষের প্রয়োজন অধিক জরুরী।

আমাদের দলীল এই যে, বিচ্ছেদ দ্বারা স্বামীর হক বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর হক বিলম্বিত হবে। আর ক্ষতির দিক থেকে প্রথমটি অধিক গুরুতর। এটা এ জন্য যে, খোরপোশ তো কাযীর নির্ধারণের কারণে (স্বামীর যিম্মায়) ফরয হয়ে থাকবে। সুতরাং পরবর্তীতে তা পরিশোধ করা যেতে পারে।

আর অর্থ থেকে বঞ্চিত হওয়া কে— যা বিবাহের ক্ষেত্রে আনুসাঙ্গিক বিষয়-বিবাহের মূল উদ্দেশ্য বংশ বিস্তারে (অক্ষমতার) সাথে যুক্ত করা যায় না।

আর কাযীর পক্ষ হতে নির্ধারণের পর ফরয করার আদেশ দানের সার্থকতা এই যে পাওনাদারকে স্বামীর হাওয়ালা করে দেওয়া দতার পক্ষে সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহণ যদি কাযীর নির্দেশ ছাড়া হয়, তাহলে তাগাদার অধিকার স্ত্রীর কাছে হবে, স্বামীর কাছে নয়।

কাযী যদি স্ত্রীর জন্য অসচ্ছল অবস্থার খোরপোশ নির্ধারণ করে দেয় অতঃপর স্বামী সচ্ছল হয়ে যায়, আর স্ত্রী দাবী উথাপন করে তাহলে কাযী সচ্ছল ব্যক্তির অনুপাতে খোরপোশ পূর্ণ করে দেবেন।

কেননা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা হিসাবে খোরপোশের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর ইতিপূর্বে যে, ফায়সালা করা হয়েছিল, তা ছিলো এমন খোরপোশ নির্ধারণ, যা বর্তমানের জন্য সাব্যস্ত হয়। সুতরাং স্বামীর অবস্থা পরিবর্তনের পেক্ষিতে সে আপন হক পূর্ণ করার দাবী জানাতে পারে।

আর যদি কিছুকাল এমন ভাবে অতিবাহিত হয় যে, এর মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়নি এবং এরপর স্ত্রী তা দাবী করে, তাহলে কোন কিছু তার প্রাপ্য হবে না। হাঁ, তবে যদি কাযী স্ত্রীর জন্য খোরপোশ নির্ধারণ করে থাকেন। কিংবা যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে খোরপোশের একটি পরিমাণের সম্পর্কে সমঝোতা করে থাকে তবে কাযী স্ত্রীকে বিগত সময়ের খোরপোশ আদায়ের নিদের্শ দিবেন।

কেননা আমাদের মতে খোরপোশ হচ্ছে সৌজন্য দান, বিনিময় নয়, যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং আদালতের ফায়সালা ছাড়া তার ওয়াজিব হওয়া সুদৃঢ় হবেনা। যেমন-হেবা সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছাড়া মালিকানা সাবিত করেনা। আর তা হল কব্জা হাসিল হওয়া। আর সমঝোতা আদালতের ফায়সালার সমতুল্য। কেননা স্বামীর নিজের উপর নিজের অধিকার কাযীর অভিভাবকত্বের চেয়ে শক্তিশালী।

মোহরানার বিষয়টি ভিন্ন (সেটা সর্বাবস্থায় অবশ্য আদায় যোগ্য।) কেননা সেটা হচ্ছে (সম্ভোগ অংগের) বিনিময়।

খোরপোশ সম্পর্কে স্বামীর প্রতি আদালতের ফায়সালার পর যদি সে মারা যায় এবং কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে।

তদ্রূপ হুকুম হল স্ত্রী যদি মারা যায়। কেননা খোরপোশ হচ্ছে সৌজন্য দান। আর সৌজন্য মৃত্যুর কারণে-রহিত হয়ে যায়। যেমন কজার পূর্বে মৃত্যু হলে হেবা বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আদালতের ফায়সালার পূর্বেও উক্ত খোরপোশ ঋণ হিসাবে থেকে যাবে। এবং মৃত্যুর কারণে তা রহিত হবে না। কেননা তার মতে এটা হচ্ছে বিনিময়। সুতরাং এটা অন্য সকল ঋণের মতো হবে। এর উত্তর ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আর যদি এক বছরের খোরপোশ অগ্রীম প্রদান করে থাকে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্ত্রীর নিকট হতে কিছুই ফেরত নেওয়া যাবে না। এ হল ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র.) বলেন, তার জন্য বিগত সময়ের খোরপোশ হিসাব করা হবে আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা স্বামীর প্রাপ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এরও এই মত। আর পোশাকের ব্যাপারকেও এ মতপার্থক্য রয়েছে।

কেননা আবদ্ধতার কারণে স্বামীর নিকট যে বিনিময় স্ত্রীর প্রাপ্য হয় স্ত্রী তা আগাম নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আবদ্ধজনিত প্রাপ্যতা মৃত্যুর কারণে বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং বিনিময় সেই পরিমাণ বাতিল হয়ে যাবে যেমন কাযী ও মুজহিদদের অগ্রিম গৃহীত ভাতা। শায়খায়নের দলীল এই যে, এ হচ্ছে সৌজন্য দান এবং তার সাথে কবযা যুক্ত হয়েছে; আর সৌজন্য দান মৃত্যুর পর ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ নেই। কেননা তার লেনদেন শেষ হয়ে গেছে, যেমন হেবার ক্ষেত্রে। এ কারণেই স্ত্রী ইচ্ছাকৃত নষ্ট করা ছাড়া নিজে নিজে যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই কোন কিছু তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি স্ত্রী এক মাসের কিংবা তার কম সময়ের খোরপোশ কবযা করে থাকে তাহলে কোন কিছু ফেরত নেওয়া হবেনা। কেননা এটা অতি অল্প সময়, সুতরাং বর্তমানের অন্তর্ভুক্ত।

দাস যদি কোন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করে তাহলে তার খোরপোশ ঋণ হিসাবে দাসের যিম্মায় তাকবে। এবং ঐ খোরপোশ পরিশোধের জন্য (প্রয়োজনে) তাকে বিক্রি করা যাবে।

এ বক্তেব্যের অর্থ হলো, যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে থাকে। কেননা খোর পোশ হচ্ছে তার যিম্মায় ঋণ হিসেবে ওয়াজিব।

যেহেতু তা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ অর্থাৎ আকদ বিদ্যমান রয়েছে, আর মনিবের দায়িত্বেও ওয়াজিব হওয়া স্পষ্ট রয়েছে।

সুতরাং এই ঋণ তার দাস-সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেমন ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত দাণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ঋণ। আর মনিব চাইলে নিজের থেকে গোলামের মূল্য আদায় করতে পারে। কেননা স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে খোরপোশের উপর। দাস সত্তার উপর নয়।

আর যদি দাস মারা যায় তাহলে (পিছনের) খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ, বিশুদ্ধ মতে, নিহত হলেও রহিত হবে। কেননা এটা হচ্ছে সৌজন্য দান।

স্বাধীন ব্যক্তি যদি দাসী বিবাহ করে, আর তার মনিব তাকে স্বামীর সাথে গৃহে বাস করার সুযোগ দেয় তাহলে স্বামীর উপর খোরপোশ ওয়াজিব হবে।

কেননা আবদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছে। আর যদি **স্বামীর সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করে না দেয় তাহলে খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে না।** কেননা আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি।

আর মনিবের পক্ষ থেকে বসবাসের সুযোগ দানের অর্থ হল মনিব তাকে নিজের সেবায় আর নিয়োজিত করবেনা, বরং স্বামীর ঘরে স্বামীর সাথে থাকার অবাধ অনুমতি প্রদান করবে।

অনুমতি প্রদানের পর পুনরায় যদি তাকে নিজ খেদমতে নিয়ে আসে তাহলে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে

কেননা আবদ্ধতা বিলুপ্ত হয়েছে। আর বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামীর সাথে বসবাসের সুযোগ প্রদান মনিবের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

মনিবের তলব ছাড়া দাসী নিজেই যদি মাঝেমধ্যে মনিবের সেবা করে তাহলে খোরপোশ রহিত হবে না। কেননা মনিব নিজে তো তাকে সেবায় নিযুক্ত করেনি, যাতে প্রত্যাহার সাব্যস্ত হতে পারে।

আর মুদাব্বার দাসী এবং উম্মে ওয়ালাদ এক্ষেত্রে সাধারণ দাসীদের ন্যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ বাসস্থানের ব্যবস্থা

স্বামীর যিম্মায় হলো স্বতন্ত্র গৃহে স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, যেখানে স্বামীর কোন আত্মীয় স্বজন থাকবেনা। তবে স্ত্রী যদি (স্বেচ্ছায়) তা গ্রহণ করে নেয়।

কেননা বাসস্থান হলো তার পর্যাপ্ত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং খোরপোশের ন্যায় তার অনুকূলে সাক্ষীর উপর ওয়াজিব হবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা (এক কিরাত মতে) খোরপোশের সাথে সম্পৃক্ত রূপে এটিও ওয়াজিব করেছেন। যখন এটা তার অধিকার হিসেবে ওয়াজিব হলো তখন স্বামী অধিকার নেই সেখানে অন্য কাউকে শরীক করা। কেননা এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ সে নিজের সামান পত্রের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করবেনা এবং সে স্বামীর সাথে স্বাচ্ছন্দে বসবাস ও আনন্দ ভোগের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হবে। তবে স্ত্রী যদি পছন্দ করে তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা সে নিজেই তার হক ছাড় দিতে রাজী হয়েছে।

যদি স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত কোন সন্তান থাকে তাহলে স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীর সাথে সন্তানের থাকার ব্যবস্থা করা।

এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। যদি এক বাড়ীতে আলাদা ঘরে স্ত্রীকে বসবাস করায় এবং সে ঘরের আলাদা তালাচাবি থাকে তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

স্ত্রীর মা বাবাকে এবং তার অন্য স্বামীর ঔরষজাত সন্তানকে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

কেননা ঘরের মালিকানা তার। সুতরাং তার মালিকানায় প্রবেশে বাধাদানের অধিকার রয়েছে।

তবে তাদের পছন্দমত সময়ে তার সাথে দেখা ও কথা বলা থেকে বাধা দিতে পারবে না। কেননা এতে আত্মীয়তা ছিন্ন হয় (যা হারাম) আর এতটুকুতে স্বামীর কোন ক্ষতি নেই।

আর কেউ কেউ বলেন, গৃহে প্রবেশ ও কথাবার্তায় বাধা দিবে না। তবে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে বাধা দিতে পারে। কেননা দীর্ঘ অবস্থান ও দীর্ঘ কথাবার্তাই অনিষ্টের কারণ।

আবার কেউ কেউ বলেন, প্রতি সপ্তাহে একবার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যেতে এবং পিতামাতাকে তার কাছে আসতে বাধা দিবে না। অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়দের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় হলো এক বছর। এটাই বিশুদ্ধ মত।

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আর কোন লোকের হাতে তার সম্পদ বিদ্যমান থাকে, এবং ঐ লোক সম্পদ থাকার কথা এবং উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করে, তাহলে কাযী নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর, তার নাবালক সন্তানদের এবং পিতামাতার খোরপোশ ঐ সম্পদ থেকে নির্ধারণ করতে পারে। তদ্রূপ লোকটি স্বীকার না করলেও কাযী যদি তা অবগত হন (তাহলে নির্ধারণ করে দেবেন)।

কেননা লোকটি যখন দাম্পত্য সম্পর্ক ও গচ্ছিত সম্পদের কথা স্বীকার করল তখন সে স্ত্রীর গ্রহণের অধিকারও স্বীকার করে নিল। কেননা সে তো স্বামীর সম্পদ থেকে স্বামীর সম্মতি ছাড়াই নিজের হক উশুল করতে পারে। আর দখলদারের স্বীকারোক্তি তার নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য।

বিশেষত: আলোচ্য ক্ষেত্রে।[১]

কেননা লোকটি যদি দুটি বিষয়ের কোন একটি অস্বীকার করে তাহলে সে বিষয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্য পেশ করা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা যার নিকট সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে, সে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর স্ত্রী-সম্পর্ক প্রমাণ করার ব্যাপারে প্রতিপক্ষ নয়। তদ্রূপ স্ত্রী লোকটিও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির হক প্রমাণ করার ব্যাপারে প্রতিপক্ষ নয়।

সুতরাং যখন লোকটির ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি কার্যকর হলো, তখন তা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিও বর্তাবে।

তদ্রূপ লোকটির হাতে ঐ সম্পদ যদি মুদারাবা ভিত্তিতে রক্ষিত থাকে, ঋণের ক্ষেত্রেও একই কথা।[২]

এসকল হক তখন হবে, যখন উল্লেখিত সম্পদ স্ত্রীর হক তথা খোরপোষের সমশ্রেণীভুক্ত হয়।

১। অর্থাৎ অন্য ক্ষেত্রে দখলদারের স্বীকৃতির চেয়ে এক্ষেত্রে দখলদারের স্বীকৃতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। কেননা তার স্বীকারোক্তি ছাড়া হক সাব্যস্ত করার কোন উপায় নেই। কেননা লোকটি যদি গচ্ছিত সম্পদ কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক দু'টির কোন একটি অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে বাদি সাক্ষ্য পেশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা স্ত্রী যদি দাম্পত্য সম্পর্ক প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য পেশ করে তাহলে বলা হবে যে, লোকটি এ বিষয়ে বিবাদী নয়। আর যদি গচ্ছিত সম্পদ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য পেশ করে তাহলে বলা হবে যে, স্ত্রীলোকটি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা প্রমাণের জন্য বাদিনী নয়। যাইহোক নিজের বিপক্ষে নিজের স্বীকাররোক্তির মাধ্যমে যখন তার উপর হক সাব্যস্ত হবে তখন তা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিতে বর্তাবে। কেননা স্বীকারকৃত সম্পদ তার মীলকানাভুক্ত।

২। অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি যদি নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর দেনাদারকে কাযীর সামনে উপস্থিত করে। আর সে দাম্পত্য সম্পর্ক ও ঋণ স্বীকার করে তাহলে কাযী খোরপোষ নির্ধারণ করে দেবেন। আর যদি কোন একটি অস্বীকার করে তাহলে করবেন না।

অর্থাৎ দিরহাম দীনার কিংবা খাদ্য-দ্রব্য (চাল-গম) কিংবা তার প্রাপ্য পোশাক জাতীয় কোন বস্ত্র হয়। পক্ষান্তরে তার প্রাপ্য হকের ভিন্ন কিছু যদি হয়। (যেমন বাড়ী, দাস, বা সামানপত্র) তাহলে তাতে খোরপোশ নির্ধারণ করা যাবে না।

কেননা তখন বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেবে। আর সর্বসম্মতিক্রমেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির মাল বিক্রি করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, উপস্থিত ব্যক্তির মাল যখন বিক্রি করা যায় না তখন একই কারণে অনুপস্থিত ব্যক্তির মালও বিক্রি করা যাবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, উপস্থিত ব্যক্তির মাল যদিও বিক্রি করা যায়; কেননা প্রাপ্য হক আদায়ের ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি জানা যায়, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল বিক্রি করা যাবে না। কেননা তার অস্বীকৃতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থের দিক বিবেচনা করে কাযী স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন জামিন নির্ধারণ করবেন।

কেননা হতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ খোরপোশ গ্রহণ করেছে। কিংবা স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে আর ইদ্দতও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) আলোচ্য মাস'আলা এবং মীরাছের মাসআলার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্যের মাধ্যমে উপস্থিত ওয়ারিশদের মাঝে যদি মীরাছ বন্টন করা হয়ে যায়, আর তারা একথা না বলে যে, অন্য কোন ওয়ারিশের কথা আমাদের জানা নেই, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোন যামিন গ্রহণ করা হবে না। কেননা মীরাছের মাসআলায় মাকফূল লাহু—যার পক্ষ থেকে যামিন গ্রহণ করা হবে সে অজ্ঞাত; এবং এখানো তা জানা হয়েছে আর সে হল স্বামী।

অবশ্য কাযী স্বামীর স্বার্থ বিবেচনা করে স্ত্রীকে এই মর্মে কসম করাবে যে, আল্লাহর কসম সে তাকে খোরপোশ দিয়ে যায়নি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পদে উল্লেখিত লোকদের ছাড়া কাযী আর কারো খোরপোশের হুকুম দিবেন না। উল্লেখিত এই লোকদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, কাযীর ফায়সালা করার পূর্ব থেকেই উল্লেখিত লোকদের খোরপোশ তার উপর ওয়াজিব ছিল। এজন্যই তো কাযীর ফায়সালা ছাড়াও তাদের তা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। সতুরাং কাযীর ফায়সালা তাদের জন্য সহায়ক মাত্র।

পক্ষান্তরে অন্যান্য মাহরামদের খোরপোশ কাযীর ফায়সালার মাধ্যমে ওয়াজিব হয়। কেননা বিষয়টি বিতর্কিত। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালা প্রদান বৈধ্য নয়।

আর যদি কাযী দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয় অবগত না হন আর লোকটিও তা স্বীকার করে না, এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকটি দাম্পত্য সম্পর্কে সপক্ষে সাক্ষ্য পেশ করলো, কিংবা স্বামী কোন **মাল রেখে যায়নি আর স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করলো যাতে কাযী নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর তার খোরপোশ নির্ধারণ করে দেন এবং তাকে ঋণ গ্রহণের আদেশ দান করেন তাহলে কাযী তার পক্ষে ফয়সালা দিবেন না।** কেননা এটা হচ্ছে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান।

ইমাম যুফার (র) বলেন যে,কাযী তারপক্ষে ফায়সালা দিবেন। কেননা এতে স্ত্রীলোকটির স্বার্থ রক্ষা হয়। আবার অনুপস্থিত ব্যক্তিরও কোন ক্ষতি নেই।

কারণ সে ফিরে এসে যদি স্ত্রীর সত্যতা স্বীকার করে তাহলে তো স্ত্রী তার প্রাপ্যই নিয়েছে।

আর যদি স্ত্রীর দাবী স্বামী অস্বীকার করে তাহলে স্বামীকে কসম করতে বলা হবে। যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তো প্রকারান্তরে স্ত্রীর সত্যতা স্বীকার করে নিল। আর যদি স্ত্রী সাক্ষী পেশ করে তাহলে তার হক প্রমাণিত হয়ে গেলো। আর সাক্ষ্য পেশ করতে ব্যর্থ হলে কাফীল কিংবা স্ত্রী লোকটি যালিম হবে।

বর্তমানে এর উপরই বিচারকদের বিচার প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপরই বিচারকদের বিচার অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর খোরপোশ ধার্য করে দেয়া হবে, লোকদের প্রয়োজনের খাতিরে। আর বিষয়টিও বিতর্কিত। এই মাস'আলা সম্পর্কে আরো কিছু প্রত্যাহৃত মতামত রয়েছে। সে জন্য সেগুলো আমরা উল্লেখ করিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ

কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সে তার ইদ্দতকালে খোরপোশ ও বাসস্থানের অধিকারী হয়। তালাক রাজয়ী হোক কিংবা বায়ন।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বায়ন তালাক প্রাপ্তার জন্য খোরপোশ নেই, তবে যদি সে গর্ভবতী হয় (তা হলে সে পাবে)।

রাজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, এরপরও বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। বিশেষতঃ আমাদের মতে। কেননা ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর জন্য সহবাস হালাল।

বায়ন তালাকের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল হলো ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশ নির্ধারণ করেননি।

তাছাড়া এ জন্য যে, এই স্ত্রীর উপর স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান নেই। আর খোরপোশ স্বামী-স্বত্বের বিপরীতেই সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তার জন্য খোরপোশও ওয়াজিব হয় না। কেননা স্বামী সত্ব বিদ্যমান নেই।

পক্ষান্তরে গর্ভবতী স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে খোরপোশ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টিই আমরা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে জেনেছি।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে তাদের জন্য তোমরা খোরপোশ দাও।

আমাদের দলীল এই যে, আগেই আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, খোরপোশ হল আবদ্ধ থাকার বিনিময় আর এখানে প্রমন একটি হক আদায় বাবদ আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে, যা বিবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য; আর তা হচ্ছে সন্তান। কেননা সন্তানের বংশ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যই ইদ্দত ওয়াজিব। সুতরাং নাফকাও ওয়াজিব হবে। এ কারণেই তো সর্বসম্মতিক্রমে বাসস্থান তার প্রাপ্য হয়ে থাকে। এবং বিষয়টি গর্ভবতীর সদৃশ হলো।

আর ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) এর হাদীস হযরত ওমর (রা) রদ্দ করে বলেছেন,

لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندرى صدقت ام كذبت حفظت ام نسيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلث النفقة و السكنى مادامت فى العدة -

আমরা আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নত একজন নারীর কথায় ত্যাগ করতে পারি না। জানিনা সে নারী সত্য বলেছে না মিথ্যা বলেছে; স্মরণ রেখেছে না ভুলে গেছে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন তালাক প্রাপ্তার স্ত্রী খোরপোশ ও বাসস্থান পাবে; যতদিন সে ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।

যায়দ বিন ছাবিত, উসামা বিন যায়দ, জাবির ও আয়েশা (রা) ও উক্ত বর্ণনা রদ করেছেন।

যার স্বামী মারা গেছে সেও খোরপোশ পাবে না।

কেননা তার আবদ্ধ থাকা স্বামীর হক রক্ষার জন্য নয় বরং শরীয়তের হক হিসেবে। কেননা এই অপেক্ষা তার পক্ষ থেকে ইবাদত রূপে গণ্য। দেখুন না, গর্ভাশয়ের মুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার দিকটি এখানে বিবেচ্য নয়, যে জন্য এখানে হায়য শর্ত নয়। সুতরাং স্বামীর উপর তার নাফকাহ্ ওয়াজিব হবে না।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, নাফকাহ ক্রমেক্রমে ওয়াজীব হয়। অথচ মৃত্যুর পর (পরিত্যক্ত সম্পদে) স্বামীর মালিকানা নেই। সুতরাং ওয়ারিছগণের মালিকানায় তা ধার্য করার অবকাশ নেই।

যে কোন বিচ্ছেদ স্ত্রীর দিক থেকে নাফরমানির কারণে ঘটবে, যেমন ধর্মত্যাগ; স্বামীর পুত্রকে 'চুম্বন' ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে নাফকাহ তার প্রাপ্য হবে না। কেননা সে নাহকভাবে নিজেকে ইদ্দতে আবদ্ধ করেছে। সুতরাং সে অবাধ্য স্ত্রীর ন্যায় হয়ে গেল।

মোহরানার বিষয়টি ভিন্ন সহবাসের পর। কেননা মাহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সমর্পণ পাওয়া গিয়েছে- সহবাসের মাধ্যমে।

তদ্রূপ নাফরমানি ছাড়া স্ত্রীর দিক থেকে উদ্ভূত অন্য কোন কারণে সম্পর্ক বিচ্ছেদের বিষয়টিও ভিন্ন। যেমন স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার এবং বালিগ হওয়া জনিত ইচ্ছাধিকার এবং কুফূ না হওয়ার কারণে ঘোষিত বিচ্ছেদ। এ সকল ক্ষেত্রে যথাযথ কারণে সে নিজেকে ইদ্দতে আবদ্ধ রেখেছে। আর এই জাতীয় আবদ্ধতার কারণে নাফকাহ রহিত হয়না; যেমন যখন মোহরানা উশুলের উদ্দেশ্য নিজেকে আবদ্ধ রাখে।

আর স্বামী যদি তাকে তিন তালাক দেয় অতঃপর আল্লাহ না করুন সে ধর্মত্যাগ করে তাহলে তার (ইদ্দত কালীন) নাফকাহ রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামীর পুত্রকে সম্ভোগ সুযোগ দান করে তাহলে নাফকাহ তার প্রাপ্য হবে।

অর্থাৎ তালাকের পর যদি সম্ভোগ সুযোগ দান করে।

কেননা তিন তালাকের দ্বারাই তো বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয়ে যায়। ধর্মত্যাগের বা সম্ভোগ-সুযোগ দানের তাতে কোন ভূমিকা নেই। তবে ধর্মত্যাগিনীকে তাওবা করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হয়। আর বন্দীনীর কোন নাফকাহ নেই। পক্ষান্তরে সম্ভোগ সুযোগ দানকারিণীকে বন্দী করা হয় না। এ কারণেই উভয়ের মাঝে পার্থক্য হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ

নাবালক সন্তানদের খোরপোশ পিতার একক দায়িত্ব। এতে অন্য কেউ তার অংশীদার হবে না। যেমন স্ত্রীর খোরপোষের ক্ষেত্রে কেউ তার অংশীদার হয় না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

যার জন্য সন্তান জন্মদান করা হয়েছে, তার যিম্মায় রয়েছে সন্তানের মাতাদের ভরণ পোষণ। এই আয়াতে مولود له দ্বারা পিতা বুঝানো হয়েছে।[১]

ছোট শিশুটি যদি দুগ্ধপোষ্য হয় তাহলে তার মায়ের দায়িত্ব নয় তাকে দুগ্ধ দান করা। কেননা আমরা বর্ণনা করেছি যে, শিশুর প্রাপ্ত প্রয়োজন পূর্ণ করা পিতার দায়িত্ব। আর স্তন্য দানের পারিশ্রমিক ভরণপোষণের অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া হতে পারে যে, তার শারীরিক কোন ওযরের কারণে সে সন্তানকে স্তন্যদানে সক্ষম নয়। সুতরাং তাকে বাধ্য করার কোন যুক্তি নেই।

আর وَلَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

কোন জননীকে তার সন্তান দ্বারা কষ্ট দেয়া যাবে না।

আয়াতটি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, তার অর্থ হলো মাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্তন্যদানে বাধ্য করা।

আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা হল বিধানের বিবরণ। আর এটা তখনই কার্যকরী হবে যখন স্তন্যদানের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি স্তন্যদানের জন্য কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে শিশুকে অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পিতা এমন কোন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, যে শিশুকে মায়ের কাছে রেখে স্তন্যদান করবে।

যেহেতু পারিশ্রমিক পরিশোধ করা পিতার দায়িত্ব, সেহেতু পিতাই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানকারিণী নিযুক্ত করবে। আর 'মায়ের কাছে রেখে' কথাটির অর্থ হলো মা যদি এই দাবী জানায়। কেননা লালন পালন মায়ের অধিকার।

যদি স্বয়ং স্ত্রীকে স্ত্রী থাকা অবস্থায় কিংবা ইদ্দতের অবস্থায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য নিযুক্ত করে তাহলে তা জায়েয নয়।

কেননা স্তন্যদান হচ্ছে শরীয়তের বিধান হিসাবে মায়ের দায়িত্ব। আল্লাহ্ বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

মায়েরা তাদের সন্তানদের স্তন্যদান করবে।

তবে তার অক্ষমতার সম্ভাবনার কারণে তাকে অপারগ গণ্য করা হয়েছিলো। কিন্তু যখন সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানে অগ্রসর হয়েছে তখন তার সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এ কার্যটি তার জন্য অবশ্য করণীয় হবে। এবং সে জন্য স্বামীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হবে না।

১। প্রমাণের সূত্র এই যে, মাতাদের ভরণ-পোষণ যখন সন্তানের কারণে পিতার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হলো তখন সন্তানদের ভরণ পোষণ তো আরো উত্তম রূপেই সাব্যস্ত হবে।

রাজয়ী তালাকের কারণে ইদ্দত পালনকারীর ব্যাপারে এ হুকুম- সম্পর্কে একটি মাত্র রেওয়ায়েতই রয়েছে।

কেননা বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে। আর বায়ন তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ-ই হুকুম এবং বর্ণনা মতে তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা বৈধ।

কেননা বিবাহ বন্ধন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রথম বর্ণনাটির কারণ এই যে, কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন এখনও রয়েছে। যেমন ইদ্দত পালন ভরণ পোষণ ও বাসস্থানের প্রাপ্যতা, স্ত্রীকে স্বামীর যাকাত প্রদানের অবৈধতা ইত্যাদী। সুতরাং পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ হবে না।

স্ত্রী থাকা অবস্থায় কিংবা ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত তার সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে তাহলে তা জায়েয হবে।

কেননা এটা তার উপর সাব্যস্ত হক নয়।

আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে।

অর্থাৎ এই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য (তাহলে তা জায়েয হবে।) কেননা বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েগেছে। এবং অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়ে গেছে।

পিতা যদি বলে, একে আমি নিযুক্ত করবো না। অতঃপর সে অন্য স্ত্রী লোক নিয়ে এলো তখন মা বাইরের স্ত্রীলোকটার সমান পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে স্তন্যদানে সম্মত হয়, তাহলে মা অধিক হকদার হবে।

কেননা মা অধিকতর মমতাময়ী। সুতরাং তার হাতে অর্পণ করাতেই শিশুর কল্যাণ রয়েছে। **তবে যদি ভিন্ন স্ত্রীলোকটির চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দাবী করে তাহলে স্বামীকে তা প্রদানে বাধ্য করা যাবে না।**

উদ্দেশ্য হলো স্বামীর (আর্থিক) ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করা। আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে এদিকে ইংগিত রয়েছে,

وَلاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

জননীকে তার সন্তান দ্বারা এবং যার জন্য সন্তান জন্ম দান করা হয়েছে, তাকে তার সন্তান দ্বারা কষ্ট দেয়া যাবে না।

অর্থাৎ সন্তানের মাকে ভিন্ন স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দানে পিতাকে বাধ্য করা দ্বারা।

নাবালক সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পিতার, যদিও সে পিতার বিপরীত ধর্ম গ্রহণ করে নেয়।[১]

যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব বর্তায়, যদিও স্ত্রী ধর্ম বিশ্বাসে তার থেকে ভিন্ন হয়।

১। এর সুরত এই যে, (ধর্মবিশ্বাস বোঝার মত) বুদ্ধিসম্পন্ন নাবালক ইসলাম গ্রহণ করলো আর তার বাবা অমুসলমান থেকে গেলো। কিংবা আল্লাহ্ না করুন মুসলিম পিতার সন্তান মুরতাদ হয়ে গেলো। আমাদের মতে তার ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ দু'টোই কার্যকর।

সন্তানের ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ (যার ঔরষজাত সন্তান, তাদের ভরণপোষণ তার যিম্মায়) আয়াতটি নিঃশর্ত।

আর এই জন্য যে, সন্তান হলো পিতার দেহের অংশ। সুতরাং সন্তান পিতার সত্তারই নামান্তর হবে।

আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে কারণ এই যে, ভরণ-পোষণ আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে বিবাহের বিশুদ্ধ-আক্‌দ। কেননা ভরণ-পোষণ হচ্ছে বিবাহের মাধ্যমে বিদ্যমান আবদ্ধতার বিনিময়, আর মুসলিম ও কিতাবী নারীর মাঝে বিবাহের আকদ বিশুদ্ধ রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে আবদ্ধতা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ভরণ পোষণ ওয়াজিব হবে।

আমাদের উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে পিতার উপর ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে যদি নাবালক সন্তানের নিজস্ব মাল না থাকে; যদি থাকে তাহলে বড় হোক ছোট হোক, মানুষের ভরণপোষণ নিজস্ব মাল থেকে হওয়াই হলো আসল বিধান।

অনুচ্ছেদ ঃ

মানুষের কর্তব্য হলো তার দরিদ্র মা বাবা ও দাদা দাদীর ভরণ পোষণ করা, যদিও ধর্ম মতে তারা তার থেকে ভিন্ন হয়।

মা-বাবার ভরণ পোষণের আবশ্যকতার কারণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

দুনিয়াতে সদাচারের সংগে তাদের সাহচর্য রক্ষা করো।

এ আয়াত নাযিল হয়েছে কাফির পিতা-মাতা সম্পর্কে। আর এটা কোন সদাচার নয় যে, সন্তান আল্লাহ্‌র নেয়ামত-প্রাচুর্যের মাঝে বাস করবে অথচ পিতা-মাতাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যু মুখে ছেড়ে দিবে।

দাদা ও দাদীদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তারাও পিতা-মাতার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই পিতার অবর্তমানে দাদা তার স্থলবর্তী হয়ে থাকে।

তাছাড়া এরা তো লোকটির জীবন লাভের মাধ্যম। সুতরাং এখন তারা পিতামাতার পর্যায়ে তার নিকটে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার হকদার হবে।

ইমাম কুদূরী (র) দারিদ্র্যের শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা পিতা ধনবান হলে তার ভরণপোষণের ভার অন্যের মালের উপর আরোপ করার পরিবর্তে নিজের মালের উপর আরোপ করারই অগ্রাধিকার রয়েছে।

আর ধর্মমতের ভিন্নতার কারণে ভরণ পোষণ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। তার প্রমাণ আমাদের উপরোক্ত তেলাওয়াতকৃত আয়াত।

ধর্মমতের ভিন্নতা সত্ত্বেও শুধু স্ত্রী, পিতা-মাতা দাদা-দাদী এবং সন্তান ও সন্তানের সন্তান ব্যতীত আর কারো ভরণ পোষণ ওয়াজিব নয়।

স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হওয়ার কারণ আমরা বলে এসেছি যে, এটা তো অবশ্য সাব্যস্ত হয় বিবাহের আকদের কারণে। কেননা সে পুরুষের এমন একটি হক পূরণের জন্য আবদ্ধ থাকে, যা বিবাহ দ্বারা মূখ্য উদ্দেশ্য। আর তা ধর্মমতের অভিন্নতার সাথে সম্পর্কিত নয়।

আর স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দৈহিক আংশিকতা সাব্যস্ত রয়েছে। আর মানুষের অংশ তার সত্তারই সমার্থক। সুতরাং নিজের কুফুরীর কারণে মানুষের নিজের ভরণপোষণ যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তেমনি তার অংশের ভরণ পোষণও বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

তবে তারা যদি দারুল হরবের বাসিন্দা হয় তাহলে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে বাস করলেও মুসলমানের উপর তাদের ভরণ পোষণের কর্তব্য বর্তাবে না। কেননা ধর্মের প্রশ্নে যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে রত রয়েছে, তাদের সাথে সদাচার করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

খ্রীস্টানের জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের ভরণ পোষণ ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ মুসলমানের উপর খ্রীষ্টান ভাইয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়। কেননা কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ভরণ পোষণের সম্পর্ক হলো উত্তরাধিকারের সাথে আর মালিকানা লাভের সময় মাহরাম আত্মীয়দের মুক্ত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মুক্তির বিষয়টি আত্মীয়তা ও মাহরামের সাথে সম্পর্কিত।

তাছাড়া নিকটাত্মীয়তা সদয় সম্পর্ক রক্ষা দাবী করে। আর ধর্মমতের ঐক্যের সময় সে দাবী অধিকতর জোরদার হয়। অন্যদিকে দাসত্বগত মালিকানা অব্যাহত থাকা সম্পর্ক কর্তনের ক্ষেত্রে ভরণ পোষণের বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে গুরুতর। সুতরাং গুরুতর ক্ষেত্রে আমরা মূল কারণ বিবেচনা করেছি। আর লঘুতর ক্ষেত্রে অধিকতর জোরদার হওয়ার কারণটি আমরা বিবেচনা করেছি। সুতরাং এ কারণেই উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

পিতা মাতার ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে সন্তানের সাথে অন্য কেউ শরীক হবে না।

কেননা হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী সন্তানের সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু অন্য কোন আত্মীয়ের সম্পদে তাদের জন্য এ বিবরণ নেই।

তাছাড়া সন্তান পিতা মাতার নিকটতম জন। সুতরাং সন্তানের উপর তাদের ভরণ পোষণের হকের অগ্রাধিকার রয়েছে।

আর জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী পিতা-মাতার ভরণ পোষণ পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়ের উপর সমভাবে আরোপিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা হাদীসের ব্যাখ্যা উভয়কে সমভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর যে কোন মাহরাম আত্মীয়ের জন্য ভরণ পোষণ সাব্যস্ত হয়, যদি সে ছোট ও দরিদ্র হয়। কিংবা প্রাপ্ত বয়স্কা নারী দরিদ্র হয়। কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ দরিদ্র ও পঙ্গু বা অন্ধ হয়।

কেননা নিকটাত্মীয়তার ক্ষেত্রে সহানুভূতি ওয়াজিব, দূর আত্মীয়তার ক্ষেত্রে নয়। আর দূর ও নিকটের মাঝে পার্থক্যকারী হলো মাহরাম আত্মীয়তা।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

আর ওয়ারিসের উপর অনুরূপ ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে। আর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে রয়েছে وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك (সুতরাং বোঝা গেল যে, ওয়াজিব দ্বারা মাহরাম আত্মীয় উদ্দেশ্য।)

(নাফকাহ ওয়াজবি হওয়ার জন্য) অভাবগ্রস্ত হওয়া জরুরী। আর অল্পবয়স্কতা, নারিত্ব, পঙ্গুত্ব, ও অন্ধত্ব হলো অভাবগ্রস্ত হওয়ার আলামত। কেননা এগুলো দ্বারা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। কারণ উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তি তো তার উপার্জনের মাধ্যমে অভাবমুক্ত।

পিতামাতার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে তাদেরকে উপার্জনের কষ্ট ভোগ করতে হবে। অথচ সন্তান তাদের কষ্ট দূর করতে শরীয়তের পক্ষ হতে আদিষ্ট। সুতরাং উপার্জনক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের ভরণ পোষণ ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর নাফকাহ মীরাছের পরিমাণ অনুপাতে সাব্যস্ত হবে এবং তা প্রদানে বাধ্য করা হবে।

কেননা ওয়ারিছ শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ পরিমাণ অনুপাতের বিষয়টির সতর্ক করে। আর দায়-দায়িত্ব লাভ অনুপাতেই সাব্যস্ত হয়।

আর বাধ্য করার কারণ হলো যাতে সে পূর্ণ হক আদায় করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা এবং (প্রাপ্ত বয়স্ক) পঙ্গু পুত্রের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের পিতা মাতার উপর তিনভাগ ভিত্তিতে বর্তাবে অর্থাৎ পিতার দায়িত্ব হবে দুই তৃতীয়াংশ এবং মাতার দায়িত্ব হবে এক তৃতীয়াংশ।

কেননা তাদের জন্য মীরাছ এই অনুপাতেই সাব্যস্ত হয়।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী যা উল্লেখ করেছেন তা খাচ্ছাফ ও হাসান (র) এর বর্ণনা। পক্ষান্তরে যাহির রেওয়ায়েত মতে সম্পূর্ণ ভরণ পোষণ হলো পিতার দায়িত্বে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

যার জন্য সন্তান জন্মদান করা হয়েছে, তার কর্তব্য হলো তাদের ভরণ পোষণ।

এভাবে সে (প্রাপ্তবয়স্ক পঙ্গু পুত্র) অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সমতুল্য হয়ে গেল।

প্রথম বর্ণনা মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, ছোট সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা অভিভাবকত্ব ও দায়দায়িত্ব এ দুটোর একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এজন্যই ছোট সন্তানের ছাদাকাতুল ফিতর পিতার উপর ওয়াজিব। সুতরাং তার ভরণ পোষণের ক্ষেত্রেও পিতা একক হবেন। পক্ষান্তরে বয়স্ক পুত্র তেমন নয়। কেননা তার উপর অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং পিতার সংগে মাতাও অংশীদার হবে।

পক্ষান্তরে পিতা ছাড়া অন্যদের উপর ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে মীরাছের পরিমাণ অনুপাত বিবেচ্য।

সুতরাং মা ও দাদীর উপর শিশুর ভরণ পোষণ তিনভাগ ভিত্তিতে হবে।

দরিদ্র ভাইয়ের ভরণ পোষণ (আপন কিংবা বাপ শরীক কিংবা মা শরীক) বিভিন্ন প্রকার সাচ্ছল বোনদের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ পাঁচভাগ মীরাছের পরিমাণ অনুপাতে বর্তাবে। অর্থাৎ পাঁচভাগ ভিত্তিতে।[১]

১। অর্থাৎ আপন বোনের দায়িত্ব হবে পাঁচের তিন এবং বাপ শরীক বোনের দায়িত্ব হবে পাঁচের এক এবং মা শরীক বোনের হবে পাঁচের এক।

তবে বিবেচ্য হলো মীরাছ লাভের 'নীতিগত' যোগ্যতা, 'সংরক্ষিত' যোগ্যতা নয়। যেমন দরিদ্র লোকটির যদি সচ্ছল মামা এবং সচ্ছল চাচাত ভাই থাকে তাহলে ভরণ পোষণের দায়িত্ব হবে মামার। (কেননা মামা হলো মাহরাম আত্মীয়, চাচাত ভাই তা নয়।)

অথচ তার মীরাছ সংরক্ষণ করবে চাচাত ভাই।

ধর্মমতের ভিন্নতার অবস্থায় মাহরাম আত্মীয়ের ভরণ পোষণ ওয়াজিব নয়।

কেননা মীরাছের যোগ্যতা বাতিল হয়ে গেছে, অথচ তা বিবেচনায় রাখা জরুরী।

দরিদ্রের উপর ভরণ পোষণ ওয়াজিব নয়।

কেননা এটা তো সদয় আচরণ হিসাবে ওয়াজিব হয়। অথচ সে নিজেই অন্যের কিট ভরণ পোষণ লাভের অধিকারী। সুতরাং, তার উপর অন্যের ভরণ পোষণ কিভাবে সাব্যস্ত হতে পারে?

স্ত্রীর এবং ছোট সন্তানের ভরণ পোষণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিবাহের আকদ অনুষ্ঠানে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে সে ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্য সমূহ ভরণ পোষণ ছাড়া সুষ্ঠ হয় না। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে অসচ্ছলতা কার্যকরী হয় না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সচ্ছলতা নেছাব দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সচ্ছলতা নির্ধারণ করেছেন এমন পরিমাণ দ্বারা, যা তার নিজের পরিবার পরিজনের একমাসের ভরণ পোষণের পর উদ্বৃত্ত থাকে। কিংবা এমন পরিমাণ দ্বারা, যা নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের পর তার প্রতিদিনের স্থায়ী আয় থেকে উদ্বৃত্ত হয়।

কেননা হক্কুল-ইবাদের ক্ষেত্রে আসল বিবেচ্য হলো সামর্থ্য থাকা, নেছাব নয়। কেননা নেছাবের উদ্দেশ্য হলো সহজতা আনয়ন। অবশ্য ফতোয়া হলো প্রথমোক্ত মতের উপর। তবে নেছাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছাদকা, যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার নেছাব।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সম্পদ থাকলে তাতে পিতা মাতার নাফকাহ্ নির্ধারণ করা হবে।

এর কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি। পিতা যদি নিজ ভরণ পোষণের প্রয়োজনে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কোন মালসামান বিক্রি করে তবে তা জায়েয।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর মত। আর এ হল সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী।

কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না।

সাহেবায়নের মতে কোন ক্ষেত্রেই বিক্রী করা জায়েয হবে না এবং এই সাধারণ কিয়াসের দাবী।

কেননা বালেগ হওয়ার পর পুত্রের উপর পিতার অভিবাবকত্ব থাকে না। এ কারণেই পুত্রের উপস্থিতিতে পিতার তা করার অধিকার নেই। আর পুত্রের কাছে নফকা ছাড়া পিতার

প্রাপ্য ঋণ উশুলের জন্য পিতা তা বিক্রি করতে পারে না। তদ্রূপ মাতাও ভরণ পোষণের জন্য পুত্রের সামানপত্র বিক্রি করতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মাল হেফাজতের দায়িত্ব পিতার রয়েছে। লক্ষ্য করছনা যে,' অছী' এর সে অধিকার রয়েছে। সুতরাং পিতার স্নেহশীলতা আধিক্যের কারণে পিতা অধিকতর হকদার হবে। আর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা সংরক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি এরূপ নয়। কেননা তা স্বকীয় ভাবেই সংরক্ষিত।

আর পিতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায়ও মুলতঃই হস্তক্ষেপের কোন অধিকার তাদের নেই। আর প্রাপ্তবয়স্কতার পরও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের কোন অধিকার নেই।

আর পিতার জন্য যখন পুত্রের মালসামান বিক্রি করা জায়েয হলো আর মূল্য বাবদ লব্ধ অর্থ তার হক তথা নাফকার সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন তা থেকে হক উশুল করা তার জন্য বৈধ হবে। যেমন পূর্ণ অভিভাবকত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে। অতঃপর সে তার ভরণ-পোষণ বাবদ তা থেকে খরচ করতে পারে। কেননা সেটা তার হক এর সমশ্রেণীভুক্ত।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কোন মাল যদি পিতা-মাতার হাতে থাকে আর তা থেকে তারা খরচ করে, তাহলে তাদের এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

কেননা তারা তাদের প্রাপ্য হক উশুল করেছে। কারণ আদালতের ফাসালার পূর্বেই তাদের ভরণ পোষণ ওয়াজিব, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা তাদের হক এর সমশ্রেণীভুক্ত জিনিস নিয়েছে।

আর যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মাল থেকে থাকে; আর সে কাযীর অনুমোদন ছাড়া তা থেকে তার পিতা-মাতার জন্য খরচ করে তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কেননা এ হলো অভিভাবকত্বের অধিকার ছাড়াই অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা।

কারণ, সে তো শুধু সংরক্ষণের ব্যাপারেই তার স্থলবর্তী ছিলো, অন্য কিছুর জন্য নয়।

পক্ষান্তরে কাযী তাকে আদেশ দিয়ে থাকলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তার অভিভাবকত্ব ব্যাপক হওয়ার কারণে তার আদেশ অবশ্য কার্যকর।

আর ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর সে নফকা গ্রহণকারীর নিকট তা ফেরত দাবী করতে পারবে না। কেননা ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সে প্রদত্ত অর্থের মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, সে নিজের মাল থেকে তা স্বেচ্ছায় দান করেছে। **আর যদি কাযী সন্তান,**

পিতা-মাতা ও মাহরাম আত্মীয়দের জন্য নাফকা নির্ধারণ করে এবং এর পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়, তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে।

কেননা এদের নাফকাহ্ প্রয়োজন মিটানোর জন্য ওয়াজিব হয়। এ কারণেই তারা মালদার হলে ওয়াজিব হয় না। আর সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের অভাব শেষ হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে স্ত্রীর নাফকাহ্ (সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে রহিত হয় না) যদি কাযী তা নির্ধারণ করে থাকে। কেননা স্ত্রীর নাফকাহ তো তার সচ্ছলতা সত্ত্বেও ওয়াজিব হয়। সুতরাং অভাব মুক্ত থাকার কারণে বিগত সময়ের নাফকাহ্ রহিত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে কাযী যদি ঐ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে থাকেন, (তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে তা রহিত হবে না)।

কেননা কাযীর কর্তৃত্ব ব্যাপক রয়েছে; সুতরাং তাঁর অনুমতি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দেশ রূপে গণ্য হবে। তাই তার যিম্মায় ঋণ হিসাবে তা বিদ্যমান থাকবে, এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা রহিত হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ মনিবের যিম্মায় হলো আপন দাসী ও দাসের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করা

কেননা দাসদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انهم اخوانكم جعلهم الله تعالى تحت ايديكم اطعموهم مماتاكلون والبسوهم مما تلبسون ولاتعذبوا عباد الله

তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন। সুতরাং তোমরা যা আহার কর তাদের সেই আহার দান করবে, এবং তোমরা যা পরিধান কর তাদের সেই বস্ত্র দান করবে। আল্লাহ্র বান্দাদের আযাব দিবে না।

মনিব যদি খরচ দানে বিরত থাকে আর তারা উপার্জনক্ষম হয় তাহলে তারা উপার্জন করে নিজেদের জন্য ব্যয় করবে।

কেননা এতে উভয় পক্ষের কল্যাণ রক্ষা হয়। অর্থাৎ দাসের জীবন রক্ষা হবে এবং তার মাঝে মনিবের মালিকানাও বজায় থাকবে।

আর যদি দাস ও দাসী উপার্জনক্ষম না হয়, যেমন দাস পঙ্গু হয়, কিংবা দাসী এমন হয় যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে দেয়া যায় না, **তাহলে মনিবকে বাধ্য করা হবে তাদের বিক্রি করতে।**

কেননা তারা ভরণ পোষণের অধিকার প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আর বিক্রি করাতে তাদের হক পূর্ণ করা হবে, আবার স্থলবর্তী (মূল্যের) দ্বারা মালিকের হকও বহাল থাকবে।

কিন্তু স্ত্রীর ভরণ পোষণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নাফকাহ্ ঋণ হয়ে থাকবে। সুতরাং হক বিলম্বিত হবে মাত্র। যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

পক্ষান্তরে দাসের ভরণ পোষণ ঋণ হয়ে থাকবে না। ফলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

অন্যান্য প্রাণীদের খরচের বিষয়টিও ভিন্ন।

কেননা প্রাণীর অধিকারের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। সুতরাং সেগুলোর জন্য খরচ করতে মালিককে বাধা করা যাবে না। তবে আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝের সম্পর্কের দাবীতে তাকে খরচ করতে আদেশ করা হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণীদের কষ্ট দিতেও নিষেধ করেছেন। আর এতে তাদের কষ্ট রয়েছে।

আর সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আর তাতে সম্পদ নষ্ট করা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, মালিককে বাধ্য করা হবে। তবে আমরা উপরে যা বলেছি, তাই হল বিশুদ্ধতর। আল্লাহই অধিক অবগত।

كتاب العتاق

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

গোলাম আযাদ করা মুসতাহাব কাজ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أيما مسلم اعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو منه من النار

কোন মুসলমান যদি কোন মুমিন (দাসদাসী)কে আযাদ করে তাহলে আল্লাহ তার প্রতিটি অংগের বিনিময়ে আযাদকারীর (অনুরূপ) অংগকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন।

এ কারণেই কোন পুরুষের জন্য দাসকে আযাদ করা এবং মহিলার জন্য তার দাসীকে আযাদ করা ফকীহগণ মুস্তাহাব বলেছেন, যাতে 'অংগ বিনিময়' বিষয়টি পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি আপন মালিকানার গোলাম আযাদ করলে তা শুদ্ধ হবে।

আযাদকারীর স্বাধীন হওয়ার শর্ত এ কারণে যে, মালিকানা ছাড়া আযাদ করা বৈধ নয়; আর অন্যের মালিকানাধীন ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানা নেই।

প্রাপ্তবয়স্কতার শর্ত এ জন্য যে,গোলাম আযাদ করা বাহ্যতঃ (আর্থিক) ক্ষতির কারণ বিধায় নাবালক এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী নয়। এ কারণেই নাবালকের অভিভাবকও তা করতে পারে না।

সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়ার শর্ত এ জন্য যে, পাগল কোন ধরনের কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত নয়।

এ ধরণের শর্ত আরোপের কারণেই প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি নাবালক' অবস্থায় তাকে আযাদ করেছি তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

তদ্রূপ যদি বলে যে, আমি বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় আযাদ করেছি আর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রকাশ্য ছিল, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে আযাদ করার বিষয়টিকে বিপরীত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

তদ্রূপ নাবালক যদি বলে, যে গোলামের আমি মালিক, যখন আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হব তখন সেগুলো আযাদ। এই আযাদ করা সহীহ হবে না। কেননা 'দায়' সাব্যস্তকারী কোন বক্তব্য প্রদানের সে যোগ্য নয়। আযাদকৃত গোলাম নিজের মালিকানাধীন হওয়া জরুরী। সুতরাং অন্যের গোলাম আযাদ করলে তা কার্যকর হবে না। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم আদম সন্তান যার মালিক নয় তাকে আযাদ করা গ্রহণযোগ্য নয়। (আবু দাউদ)

যদি আপন দাস বা দাসীকে বলে যে, তুমি স্বাধীন কিংবা তুমি মুক্ত কিংবা তুমি বন্ধন মুক্ত, কিংবা তুমি আযাদ, তদ্রূপ যদি বলে, আমি তোমাকে আযাদ করলাম, কিংবা আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে, আযাদ করার নিয়ত করুক বা না করুক।

কেননা এগুলো হচ্ছে গোলাম আযাদ করার জন্য স্পষ্ট শব্দ। শরীয়ত ও প্রচলিত উভয় ক্ষেত্রেই শব্দগুলো এ অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং তা নিয়তের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত। আর যদিও কথাগুলো সংবাদ প্রদানের জন্য নির্ধারিত, তবু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীয়ত সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এগুলোকে কর্মসম্পাদক বাক্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন তালাক, ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে।

যদি সে বলে যে, (উপরোক্ত কথা দ্বারা) মিথ্যা সংবাদ প্রদানের নিয়ত করেছি কিংবা কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তির কথা বুঝিয়েছি, তাহলে দিয়ানাত হিসেবে (আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে) সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা কথাগুলো এ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু আইনতঃ সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

কেননা এটা বাহ্য অর্থের পরিপন্থী।

আর যদি দাস-দাসীকে হে স্বাধীন বা হে মুক্ত বলে ডাক দেয় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এখানে এমন শব্দযোগে আহ্বান করা হয়েছে, যা স্বাধীনতার স্পষ্ট অর্থ বহনকারী। আর আহবানের উদ্দেশ্য হলো আহবানকৃত ব্যক্তিকে উল্লেখিত গুণসহ (চিন্তায়) উপস্থিত করা। (কিংবা উল্লেখকৃত গুণে ভূষিত সাব্যস্ত করা) এটাই হচ্ছে আহ্বানের হাকীকত। সুতরাং উক্ত আহ্বান উল্লেখকৃত গুণের সাব্যস্ততা অনিবার্য রূপে দাবী করে। আর তা তার পক্ষ থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে।

সুতরাং মনিবের প্রদত্ত সংবাদের সত্যতা বিধানের জন্য উল্লেখকৃত গুণটি অনিবার্য রূপে সাব্যস্ত হবে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা পর্যালোচনা করব।

তবে যদি সে তার নাম রেখে থাকে 'স্বাধীন', তারপর তাকে 'স্বাধীন' বলে ডাক দেয় (তাহলে আযাদ হবে না)। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হলো তার নামবাচক শব্দ দ্বারা তাকে সম্বোধন করা।

আর যদি ফারসী (বা অন্য ভাষায়) ডাক দেয়, হে আযাদ, অথচ সে নাম রেখছিল 'হুর' তাহলে ফকীহগণের মতে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এটা নামবাচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন নয়। সুতরাং সাব্যস্তকৃত গুণ সম্পর্কে সংবাদ প্রদানের দিকটি বিবেচ্য হবে।

আর তেমনি যদি বলে, তোমার মাথা আযাদ, কিংবা তোমার চেহারা আযাদ, কিংবা তোমার গর্দান আযাদ, কিংবা তোমার দেহ আযাদ, কিংবা দাদীসে বললো, তোমার লজ্জাস্থান আযাদ (তাহলে আযাদ হয়ে যাবে)।

কেননা (লোক প্রচলনে) এসকল শব্দ দ্বারা সমগ্র ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। তালাক প্রসংগে এ কথা আলোচিত হয়েছে।

যদি আযাদ করার বিষয়টিকে অনির্ধারিত অংশের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে এ অংশে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হবে।

ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কিত মতপার্থক্য পরবর্তীতে আসছে।

আর যদি নির্দিষ্ট এমন কোন অংগের সাথে সম্পৃক্ত করে, যা দ্বারা সমগ্র মানুষ বোঝানো হয় না, যেমন হাত-পা, তাহলে আযাদ হবে না, আমাদের মতে।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। এ সম্পর্কিত বক্তব্য তালাক সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুরূপ। আর আমরা তা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

যদি বলে যে, তোমার উপর আমার কোন মালিকানা নেই, আর একথা দ্বারা আযাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। আর নিয়ত না করলে হবে না। কেননা উপরোক্ত কথার মধ্যে দুটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যথা, তোমার উপর কোন মালিকানা নেই, কেননা তোমাকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি, কিংবা তোমাকে আযাদ করে দিয়েছি। সুতরাং নিয়ত ছাড়া দুটি অর্থের কোন একটি উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হবে না।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, 'স্বাধীনতা' অর্থের ইংগিত সম্বলিত শব্দগুলো সম্পর্কেও একই হুকুম। যেমন বললো, তুমি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছো, কিংবা তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই, কিংবা তোমার উপর আমার কোন বন্ধন নেই, কিংবা তোমার পথ ছেড়ে দিয়েছি।

কেননা মালিকানা থেকে বের হওয়া, অধিকার শেষ হওয়া এবং পথ ছেড়ে দেয়া আযাদ করার মাধ্যমে হওয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি বিক্রির মাধ্যমে এবং কিতাবতের মাধ্যমে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং নিয়ত করা আবশ্যক।

অদ্রূপ যদি দাসীকে বলে যে, তোমাকে বন্ধন মুক্ত করলাম, (নিয়ত সাপেক্ষে আযাদ হবে) কেননা এটাও তোমার পথ ছেড়ে দিলাম এর সমপর্যায়ের। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে এ ধরণের মতামতই বর্ণিত হয়েছে। দাসীর উদ্দেশ্যে 'তোমাকে তালাক দিলাম' বক্তব্যটি এর বিপরীত। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে এ প্রসংগ আমরা আলোচনা করবো।

যদি বলে, তোমার উপর আমার কেন ক্ষমতা নেই, আর এ কথা দ্বারা আযাদ করার নিয়ত করে তাহলে আযাদ হবে না।

কেননা 'সুলতান' (ক্ষমতা) শব্দ নিয়ন্ত্রণ অধিকার বুঝায়। আর 'সুলতান' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কায়েম থাকার উপর। আর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যতীতও কখনো মালিকানা থাকতে পারে। যেমন মুকাতাবের (চুক্তিবদ্ধ দাসের) ক্ষেত্রে হয়।

'তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই' বক্তব্যটি এর বিপরীত। কেননা সঠিকভাবে অধিকার রহিত হওয়া, মালিকানা রহিত হওয়া দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। এজন্যই চুক্তিবদ্ধ গোলামের উপর মনিবের অধিকার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং একথা দ্বারা আযাদ করার অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি বলে যে, 'এ আমার পুত্র' অতঃপর এ দাবীর উপর সে অটল থাকে, তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, যদি গোলাম এমন হয়ে থাকে যে, ঔরসজাত হতে পারে, (বয়সগত দিক থেকে) আর বয়সগত দিক থেকে যদি এ ধরণের গোলাম তার ঔরসজাত হতে না পারে, তিনি এ মাস'আলাটি পরবর্তীতে উল্লেখক করেছেন।

আর যদি গোলামের প্রতিষ্ঠিত কোন বংশ পরিচয় না থাকে তাহলে বক্তব্যদাতার সাথে গোলামের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা মালিকানার কারণে ঔরশজাত হওয়ার দাবী করার অধিকার তার রয়েছে। আর গোলামটিতো বংশ পরিচয়ের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তার থেকে তার বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। আর বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হলে অনিবার্যভাবেই সে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা বংশের সূচনা গর্ভসঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

আর যদি গোলামের সুসাব্যস্ত বংশ পরিচয় থাকে তাহলে তার থেকে তার বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না। কেননা তা অসম্ভব।

তবে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা শব্দটিকে মূল ও প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা অসম্ভব হওয়ার ফলে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হবে। আর রূপক অর্থটির দৃষ্টিকোণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে উল্লেখ করবো।

আর যদি বলে, এ হলো আমার 'মাওলা' কিংবা হে আমার মাওলা, তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

প্রথমটির কারণ এই যে, (দাস-দাসীর প্রসংগে) মাওলা শব্দটি যদিও সাহায্যকারী,চাচাত ভাই ও ধর্ম ভাই অর্থে আসে এবং মনিব কিংবা আযাদকৃত দাস বা দাসীও বুঝায়। কিন্তু এখানে আযাদকৃত অর্থই নির্ধারিত হয়ে যাবে আর তা এজন্য যে, মনিব সাধারণতঃ তার দাস থেকে সাহায্য গ্রহণ করেনা। আর এ দাসের বংশ পরিচিত রয়েছে। সুতরাং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থটি রূপক হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তার বক্তব্য প্রকৃত অর্থে ধর্তব্য। আর এখানে আযাদকারী মনিব অর্থটি সম্ভাব্য না হওয়ার কারণ হচ্ছে গোলামের সাথে শব্দটির সম্বন্ধকরণ। সুতরাং শব্দটি স্বাধীনতার স্পষ্ট অর্থ ধারণকারী শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে গেলো। তেমনি যদি সে তার দাসীকে বলে, সে আমার মাওলা। কারণ আমরা উপরে বর্ণনা করেছি।

আর যদি সে বলে যে, মাওলা শব্দটি দ্বারা আমি ধর্মীয় বন্ধুত্ব বোঝাতে চেয়েছি, কিংবা শব্দটি মিথ্যাভাবে বলেছি, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর মধ্যে সত্য বলে গণ্য হবে, কিন্তু আদালতের দৃষ্টিতে সত্য বলে গ্রহণ করা হবেনা। কেননা তার এ দাবী শব্দটির বাহ্য অর্থের পরিপন্থি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে, শব্দটি যখন আযাদকৃত গোলাম অর্থে উদ্দেশ্য রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেলো তখন তা স্পষ্ট শব্দ হয়ে গেলো। আর স্পষ্ট শব্দ যোগে সম্বোধন করলে গোলাম স্বাধীন হয়ে যায়। যেমন সে ' হে স্বাধীন' কিংবা 'হে মুক্ত' বলে সম্বোধন করলো। সুতরাং আলোচ্য শব্দ যোগে সম্বোধন করার ক্ষেত্রের একই হুকুম হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আযাদ হবেনা। কেননা এমন সম্বোধন দ্বারা সম্মান প্রদার্শন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন, 'হে আমার সর্দার' বা 'হে আমার মালিক' সম্বোধন দ্বারা করা হয়ে থাকে।

আমাদের দলীল এই যে, বক্তব্য প্রকৃত অর্থে ব্যবহার্য। আর এখানে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র) কথিত সম্বোধন দুটি ভিন্ন। কেননা তাতে এমন কোন অর্থবহ শব্দ নেই, যা গোলাম আযাদ করার সাথে বিশিষ্ট। সুতরাং এটি নিছক সম্মান প্রদান অর্থেই হবে।

যদি সে বলে, হে আমার পুত্র কিংবা হে আমার ভাই, তাহলে আযাদ হবেনা।

কেননা নেদা বা আহবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহ্বানকৃত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করা।

তবে নেদা বা আহ্বান যদি এমন কোন গুণ উল্লেখপূর্বক হয়, আহ্বানকারীর দিক থেকে যা সাব্যস্ত করা সম্ভব। তখন আহ্বানের উদ্দেশ্য হবে সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে উক্ত গুণ সাব্যস্ত করা, এবং ঐ বিশেষ গুণে ভূষিত অবস্থায় তাকে উপস্থিত করা। আমাদের পূর্ব বলা অনুযায়ী 'হে স্বাধীন ব্যক্তি' এই সম্বোধনের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে।

পক্ষান্তরে আহ্বান যদি এমন কোন গুণ উল্লেখপূর্বক হয়, যা সম্বোধনকারীর দিক থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, তখন আহ্বানের উদ্দেশ্য হবে শুধু অবহিত করা। তার মাঝে কোন গুণ সাব্যস্ত করণ নয়। কেননা তা সম্ভব নয়।

আলোচ্য ক্ষেত্রে পুত্রত্বের গুণটি যেহেতু সম্বোধনের অবস্থায় সম্বোধনকারীর দিক থেকে সম্ভব নয়, কেননা যদি সে অন্যের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এই সম্বোধনের কারণে সে তার পুত্র হয়ে যাবে না। যেহেতু এই সম্বোধটি শুধু অবহিত করাই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবূ হানিফা (র) থেকে একটি বিরল বর্ণনা রয়েছে যে, উভয় সম্বোধন দ্বয়ের ক্ষেত্রে সে আযাদ হয়ে যাবে; অবশ্য যাহিরে রেওয়াতটি নির্ভরযোগ্য।

যদি বলে 'হে পুত্র' বা 'হে কন্যা' তাহলে আযাদ হবেনা। কেননা তার সম্বোধন বাস্তবানুগ হয়েছে। কারণ সে তার পিতার পুত্র বটে। আর তেমনি যদি বলে 'হে বৎস' বা 'হে বৎস' তাহলে (আযাদ হবেনা)। কেননা, এতে নিজের দিকে সম্বোধন না করে ছোট বেটা বেটি হিসেবে আহ্বার করেছে। আর বাস্তবেও তাই, যা সে বলেছে। আর যদি বয়সগত তার ঔরশ জাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন গোলামকে বলে যে সে আমার পুত্র তাহলে, সে আযাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানিফার মতে, সাহেবায়নের মতে আযাদ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ীর(র)এ মত ।

তাদের দলীল এই যে, প্রকৃত অর্থের দিক থেকে এটা অসম্ভব কথা। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল হবে। যেমন যদি সে বলল, আমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই কিংবা তুমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমি আযাদ করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, প্রকৃত অর্থের দিক থেকে এটা অসম্ভব হলেও রূপক অর্থে তা সঠিক। কেননা এর অর্থ হচ্ছে, মালিকানা লাভের মুহূর্ত থেকে 'সে স্বাধীন' -এ সংবাদ প্রদান করা।

এর কারণ এই যে, মালিকানাধীন গোলামের পুত্রত্ব তার স্বাধীনতা লাতের কারণ। কেননা এর উপর ইজমা বা উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে, কিংবা এটা আত্মীয়তার সৌজন্যের কারণে। আর রূপকভাবে কারণ উল্লেখ করে কার্য উদ্দেশ্য করার ভাষাগত বৈধতা রয়েছে।

তাছাড়া স্বাধীনতা হচ্ছে দাসের পুত্রত্ব সম্পর্কের অনিবার্য ফল, আর উসূল শাস্ত্র অনুযায়ী অনিবার্য গুণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হচ্ছে রূপক অর্থ গ্রহণের একটি পন্থা, সুতরাং 'হে আমার পুত্র' কথাটি স্বাধীনতার রূপক অর্থে গ্রহণ করা হবে, যাতে তা নিরর্থকতায় পর্যবসিত না হয়।

পক্ষান্তরে নযীর রূপে উল্লেখকৃত বক্তব্যটি ভিন্ন। কেননা (যেহেতু' আমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আযাদ করেছি'এই বক্তব্য দাসের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করেনা, সেহেতু) এখানে রূপক অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই। সুতরাং বক্তব্যটির অর্থহীনতা নির্ধারিত হয়ে গেলো।

আর যদি কাউকে সম্বোধন করে বলে যে, আমি তোমার হস্ত কর্তন করেছি, অথচ উভয় হস্ত অক্ষত দেখা গেলো, তখন এ বক্তব্য-কে রূপক অর্থে আর্থিক দায়ের স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করা হবেনা, যদিও হস্ত কর্তন আর্থিক দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ।

কেননা ভুলক্রমে হস্ত কর্তন বিশেষ ধরণের আর্থিক দায় তথা দিয়ত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ, আর গুণগতভাবে তা সাধারণ আর্থিক দায় থেকে ভিন্ন। এ কারণেই দিয়তের অর্থ-দন্ড দুই বছর সময় সীমায় عاقلة (আত্মীয় ও প্রতিবেশী) বর্গের উপর ওয়াজিব হয়। আর যা সাব্যস্ত করা সম্ভব, তার জন্য হস্ত কর্তন কারণ নয়।

আর স্বাধীনতা গুণটি সত্তাগত ও গুণগত ভাবে ভিন্ন নয়। সুতরাং -'আমার পুত্র'- এই বক্তব্যকে রূপক অর্থে মুক্তিদান সাব্যস্ত করা যায়।

আর যদি বয়সগত অসম্ভাব্যতা সত্ত্বেও তার দাস-দাসী সম্বন্ধে মনিব বলে যে, ইনি আমার পিতা বা মাতা, তাহলে উপরে বর্ণিত কারণে একই মতপার্থক্য রয়েছে।

আর যদি ছোট শিশু সম্বন্ধে বলে, এ আমার দাদা, তাহলে কারো কারো মতে (একই কারণে) একই মতপার্থক্য রয়েছে।

অন্য মতে এ বক্তব্য দ্বারা মুক্তিদান সাব্যস্ত না হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে।

কেননা পিতার মাধ্যম ছাড়া এ বক্তব্যের অর্থ মালিকানাধীন দাসের সাথে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব গুণ দুটি ভিন্ন। কেননা মালিকানাধীন দাসের মাঝে মাধ্যম ছাড়া প্রত্যক্ষ ভাবেই উক্ত গুণ দুটির জন্য স্বাধীনতার অনিবার্য ফল রয়েছে।

আর যদি বলে যে, এ আমার ভাই তাহলে যাহিরে রেওয়ায়েত মতে আযাদ হবেনা।

তবে ইমাম আবূ হানিফা (র) থেকে বর্ণিত একটি মতে আযাদ হয়ে যাবে। উভয় মতামতের কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি আপন দাস সম্পর্কে বলে যে, এ আমার কন্যা, তাহলে কোন কোন মতে এটিও ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সাহেবায়নের মাঝে মত পার্থক্যপূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে অন্য মতে আযাদ না হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত।

কেননা ইংগিতকৃত ব্যক্তি উল্লেখকৃত ব্যক্তির জাতির্ভুক্ত নয়। সুতরাং হুকুমের সম্পর্ক হবে উল্লেখকৃত ব্যক্তির সাথে আর তা অবিদ্যমান। সুতরাং বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য হবে না। বিবাহ অধ্যায়ের (মাহর প্রসংগে)বিষয়টি আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছি।

দাসীকে যদি(তালাক জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে) বলে, তুমি তালাক কিংবা তুমি বায়ন কিংবা তুমি ওড়না দ্বারা আবৃত কর; আর এসব কথা দ্বারা আযাদ করার নিয়ত করে তাহলে আযাদ হবেনা।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নিয়ত করলে আযাদ হবে। তালাকের যাবতীয় স্পষ্ট ও পরোক্ষ শব্দ সম্পর্কে এই মত পার্থক্য রয়েছে বলে শাফেয়ী মাযহাবের আলিমগণ বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, এমন অর্থই সে উদ্দেশ্যে করেছে, যা উল্লেখিত শব্দটি সম্ভাবনার পর্যায়ে ধারন করে। কেননা বিবাহ সূত্রের মালিকানা এবং দাসত্ব সূত্রের মালিকানার মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ উভয় সূত্রই ব্যক্তি সত্ত্বার মালিকানা সাব্যস্ত করে।

দাস সূত্রের মালিকানার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। বিবাহ সূত্রের মালিকানাও সত্তাগত মালিকানার পর্যায়ভুক্ত। এ কারণেই বিবাহের বৈধতার জন্য শর্ত হলো স্থায়ী হওয়া, এবং সাময়িকতার শর্ত বিবাহের বৈধতাকে নাকচ করে।

আর মুক্তিদান ও তালাক প্রদান উভয় প্রকার শব্দগুলোরই মূলক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া হলো (স্বামীর বা মনিবের) হক তথা মালিকানা রহিত করণ। এ কারণেই (তালাকের ন্যায়) মুক্তিদানকে শর্তযুক্ত করা বৈধ।

পক্ষান্তরে মুক্তিলাভের ফলশ্রুতিতে যে সকল হুকুম সাব্যস্ত হয় সেগুলো পূর্ব থেকে বিদ্যমান কারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো (মানুষ হওয়ার সূত্রে)উক্ত দাসের মুকাল্লাফ (হুকুম প্রয়োগের যোগ্য) হওয়া।

এ কারণেই মুক্তি ও স্বাধীনতার শব্দগুলো তালাকের ইংগিতার্থে ব্যবহার যোগ্য। বিপরীত ক্ষেত্রেও ব্যবহারযোগ্য হবে।

আমাদের দলীল এই যে , যে অর্থ সে উদ্দেশ্য করেছে, আলোচ্য শব্দগুলো সে অর্থের সম্ভাবনা ধারণ করেনা । কেননা মুক্তিদানের আভিধানিক অর্থ হলো শক্তি প্রতিষ্ঠা করা আর তালাক অর্থ বন্ধন মুক্ত করা। কেননা দাস তো জড় বস্তুর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিল, মুক্তিদানের মাধ্যমে যেন তাকে জীবন দান করা হয়েছে। ফলে সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে বিবাহিত স্ত্রী এমন নয়। কেননা সেও ক্ষমতার অধিকারিণী, তবে বিবাহ বন্ধন প্রতিবন্ধক হয়ে ছিলো। তালাকের মাধ্যমে প্রতিবন্ধক দূর হওয়ার পর উক্ত ক্ষমতা প্রকাশ লাভ করে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথমটি (মুক্তিদান) দ্বিতীয়টি (তালাক প্রদান) থেকে অধিকতর শক্তিশালী। তাছাড়া দাসত্ব সূত্রের মালিকানা বিবাহ সূত্রের মালিকানা থেকে উচ্চতর। সুতরাং দাসত্ব সূত্রের মালিকানা রহিতকরণ হলো অধিকতর শক্তিশালীপূর্ণ। আর যে কোন শব্দ তার চেয়ে নিম্নতর অর্থের জন্য রূপক হতে পারে, তার চেয়ে উচ্চতরের জন্য নয়। এ কারণেই বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রেই রূপক অর্থ নেওয়া বৈধ নয়, আর বিপরীত ক্ষেত্রে তা বৈধ।

যদি সে আপন দাসকে বলে, 'তুমি স্বাধীনের মত' তাহলে আযাদ হবেনা।

কেননা 'মত' শব্দটি প্রচলিত অর্থে আংশিক গুণের ক্ষেত্রে শরিকানা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং স্বাধীনতার বিষয়টি (উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে) সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেলো।

যদি বলে, তুমি স্বাধীন ছাড়া অন্য কিছু নও, তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা এ ধরনের না বাচক উক্তির বিপরীতে ইতিবাচক শব্দের ব্যবহার বক্তব্যকে জোরদার ভাবে সাব্যস্ত করে। যেমন কালিমায়ে শাহাদাতের ক্ষেত্রে।

যদি বলে যে, "তোমার মাথা তো স্বাধীন ব্যক্তির মাথার মতো" তাহলে আযাদ হবেনা।

কেননা এটা হলো উপমা অব্যয় উহ্য করে প্রদত্ত উপমা।

আর যদি বলে যে, 'তোমার মাথা স্বাধীন মাথা' তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা যেহেতু মাথা দ্বারা সমগ্র দেহ বোঝানো হয়, সেহেতু একথার অর্থ হলো গোলামের মাঝে স্বাধীনতা গুণ সাব্যস্তকরণ।

অনুচ্ছেদ ঃ

কোন ব্যক্তি মাহরাম[১] আত্মীয়ের মালিক হলে উক্ত মাহরাম তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। এ বাক্য (হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর মতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر

কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হলে সে আযাদ হয়ে যাবে (নাসাঈ)।

হাদীসে বর্ণিত মাহরাম শব্দটির অর্থের ব্যাপকতার কারণে জন্ম দান সূত্রের এবং অন্যান্য সূত্রের সকল স্থায়ী মাহরাম আত্মীয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (র) অন্যান্য সূত্রের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাঁর দলীল এই যে, মালিকের সম্মতি ছাড়া মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি কিয়াসের পরিপন্থী কিংবা কিয়াস তা দাবী করে না।

আর ভ্রাতৃসম্পর্ক ও অন্যান্য সম্পর্ক জন্মদান সূত্রের সম্পর্কের চেয়ে নিম্নস্তরের। সুতরাং অন্যগুলোকে এর সাথে সংযুক্ত করা এবং দলীল রূপে পেশ করা অগ্রাহ্য হবে। এজন্যই অন্যান্য সূত্রের মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে মুকাতাব গোলামের উপর অনিবার্য কিতাবাতের হুকুম আরোপিত হয়না। পক্ষান্তরে জন্মদান সূত্রের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে আরোপিত হয়[২]। আমাদের দলীল হলো ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এই জন্য যে, সে এমন আত্মীয়ের মালিক হয়েছে, যে আত্মীয়তা মাহরাম হওয়ার কারণ। সুতরাং মালিকের পক্ষ থেকে ঐ আত্মীয় আযাদ হয়ে যাবে। মূল মাসআলাটির ক্ষেত্রে এটাই হলো কার্যকরী, জন্মদান-সম্পর্কের বিষয়টি গৌণ। কেননা যে আত্মীয়তা মাহরাম সম্পর্কের কারণ, সেটাই রক্ষা করা এবং ছিন্ন করা হারাম। এ কারণেই ভরণপোষণ আবশ্যক হয়ে থাকে এবং বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে থাকে। মালিক (এবং ক্রীতদাস) দারুল ইসলামের বিদ্যমান অবস্থায় মুসলমান হোক কিংবা কাফির হোক তবে বিধানে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা (বিবাহ হারামকারী রক্ত সম্পর্কের) কারণটি উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর মুকাতাব গোলাম যদি তারপরই বা সমশ্রেণীর অন্য কোন আত্মীয়কে (গোলাম চাচা মামা ইত্যাদিকে) খরিদ করে তাহলে তার উপর অনিবার্য কিতাবাবের হুকুম আরোপিত হয় না। কেননা তার পুর্ণাংগ মালিকানা নেই, যা তাকে মুক্তি দানের অধিকারী করতে পারে। আর স্বাধীনতা অনিবার্য হয় যখন পূর্ণ ক্ষমতা থাকে।

জন্মদান সূত্রের সম্পর্কের বিষয়টি ভিন্ন[৩]। কেননা এক্ষেত্রে মুক্তি লাভ হচ্ছে কিতাবাত চুক্তির উদ্দেশ্যভুক্ত। সুতরাং (খরিদকৃত পিতা মাতা বা সন্তানকে) বিক্রি নিষিদ্ধ হবে বলে এবং কিতাবাতচুক্তির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে আযাদ হয়ে যাবে।

১। মাহরাম অর্থ এমন আত্মীয় যে, একজনকে পুরুষ এবং অন্যজনকে স্ত্রীলোক কল্পনা করলে উভয়ের মাঝে বিবাহ জায়েয নয়।

২। অর্থাৎ মোকাতাব গোলাম যদি পিতাকে বা পুত্রকে খরিদ করে তাহলে পিতা বা পুত্রও মুকাতাব হয়ে যায়। কিন্তু ভাইকে খরিদ করলে সে মুকাতাব হয়ে যায় না।

৩। কিতাবাত চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তিলাভের মাধ্যমে দাসত্বের লজ্জা দূরীকরণ। আর মানুষ নিজের দাসত্ব দ্বারা যেমন লজ্জার সম্মুখীন হয়, তেমনি পিতা বা পুত্রের দাসত্ব দ্বারা লজ্জার সম্মুখীন হয়। সুতরাং এদের মুক্তি হচ্ছে কিতাবাত চুক্তির উদ্দেশ্যভুক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে ভাইয়ের দাসত্বের কারণে লজ্জার সম্মুখীন হয় না। সুতরাং তার মুক্তিলাভ কিতাবতের উদ্দেশ্যভুক্ত নয়।

তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ভাই এর (ও অন্যান্য মাহরাম সম্পর্কের) ক্ষেত্রে কিতাবাতের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং এটা ছাহেবায়নের মত। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রের পার্থক্যের বিষয়টি আমরা অস্বীকার করতে পারি।

পক্ষান্তরে যদি সে আপন চাচাত বোনের মালিকানা লাভ করে, যে তার দুধবোনও বটে তাহলে এই বোন আযাদ হবে না। কেননা এখানে মাহরাম সম্পর্ক আত্মীয়তার কারণে সাব্যস্ত হয়নি (বরং দুধ সম্পর্ক দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে)।

বালক ও পাগল উভয়কে এক্ষেত্রে মুক্তিদানের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং (তাদের কোন পদক্ষেপ ছাড়া মীরাছ দান বা অন্য কোন সূত্রে) মালিকানা লাভের সময় ঐ নিকটস্থীয় তাদের পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এই মুক্তির সাথে বান্দার হক সম্পৃক্ত হয়েছে। সুতরাং এটা ভরণ পোষণের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ হলো[১]

কেউ যদি আল্লাহর নামে কিংবা শয়তানের নামে কিংবা দেবতার নামে কোন গোলাম আযাদ করে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা মুক্তিদানের মূল বক্তব্যটি যোগাযোগ সম্পন্ন ব্যক্তির (তথা সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির) পক্ষ থেকে এবং যথার্থ ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। আর প্রথম বক্তব্যে ছাওয়াবের গুণটি হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়। সুতরাং পরবর্তী বক্তব্য দুটিতে উক্ত গুণের অবিদ্যমানতার দ্বারা বিঘ্নিত হবে না।

নেশাগ্রস্ত ও বাধ্যকৃত ব্যক্তির মুক্তিদান কার্যকর হবে। কেননা মুক্তিদানের শব্দ যোগ্য বক্তির পক্ষ হতে যোগ্য পাত্রে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন তালাকের ক্ষেত্রে হয়। বিষয়টি ইতিপূর্বে (তালাক পর্বে) আমরা আলোচনা করেছি। **যদি মুক্তি দানের বিষয়টিকে মালিকানার সাথে কিংবা কোন শর্তের সাথে যুক্ত করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে, যেমন তালাকের ক্ষেত্রে হয়।**

মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তালাক পর্বে এটা আমরা বর্ণনা করেছি।

শর্তের সাথে যুক্ত করা এজন্য গ্রহণযোগ্য যে, মুক্তিদান অর্থ মালিকানা রহিত করণ। সুতরাং এতে শর্তায়ণ চলতে পারে। কিন্তু মালিকানা সাব্যস্ত করণে বিষয়গুলো ভিন্ন। যথাস্থানে (উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রে) তা আলোচিত হয়েছে।[২]

যদি মুসলমান হয়ে আমাদের নিকট (দারুল ইসলামে) চলে আসে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। কেননা তায়েফের দাসদল যখন মুসলমান হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে এসেছিলো তখন তিনি বলেছিলেন هم عتقاء الله তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মুক্তি প্রাপ্ত।

কেননা মুসলিম হয়ে নিজেকে সে সুরক্ষিত করেছে। আর কোন মুসলমানের উপর প্রাথমিক পর্যায়ে দাসত্ব আরোপ করা বৈধ নয়।

১। অর্থাৎ ভরণপোষণের বিষয়টি বান্দার হক হওয়ার কারণে মাহরাম আত্মীয়ের ভরণপোষণ তাদের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে একই কারণে তাদের বিপক্ষে উক্ত মাহরাম আত্মীয় আযাদ হয়ে যাবে।

২। এসকল ক্ষেত্রে শর্তায়ণ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা জুয়ার পর্যায়ে পড়ে এই হিসেবে যে, যে শর্তটি আদৌ সম্পন্ন হবে কি হবে না জানা নেই, তার সাথে মালিকানার বিষয়টিকে ঝুলন্ত করার মাঝে ঝুঁকি রয়েছে। হারবী গোলাম (দারুল হরবে অবস্থানকারী গোলাম)

যদি গর্ভবতী দাসীকে আযাদ করে তাহলে তার অনুগামী হিসেবে গর্ভস্থ সন্তানও আযাদ হয়ে যাবে। কেননা উক্ত গর্ভ তার সাথে (অংগের ন্যায়) সংযুক্ত।

আর যদি শুধু গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করে তাহলে গর্ভধারিণীকে বাদ দিয়ে শুধু গর্ভস্থ সন্তান আযাদ হবে।

কেননা যেহেতু গর্ভধারণকারিণীর সংগে মুক্তিদানকে সম্পর্কিত করেনি, সেহেতু স্বতন্ত্রভাবে তাকে আযাদ করা সম্ভব নয়। আবার অনুগামী রূপেও আযাদ করা সম্ভব নয়। কেননা তাতে প্রকৃত অবস্থানকে পাল্টে দেওয়া হয়।

গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করা বৈধ হলেও বিক্রি করা বা দান করা বৈধ নয়। কেননা দানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অর্পণ করা হলো শর্ত। আর বিক্রির ক্ষেত্রে অর্পণের সক্ষমতা থাকা শর্ত। অথচ গর্ভসন্তানের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে মুক্তিদানের ক্ষেত্রে এর কোনটিই শর্ত নয়। সুতরাং উভয় ক্ষেত্র পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

যদি গর্ভস্থ সন্তানকে মালের বিনিময়ে আযাদ করে তাহলে আযাদ করা বৈধ হবে; কিন্তু উল্লেখিত অর্থ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না।

কেননা গর্ভস্থ সন্তানের উপর যেহেতু অভিভাবকত্ব নেই, সেহেতু তার উপর অর্থের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার উপায় নেই। তদ্রূপ গর্ভাধারণ কারিণী মাতার উপরও আরোপ করার উপায় নেই। কেননা মুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত গর্ভস্থ সন্তান হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তা। আর মুক্তিপ্রাপ্ত সত্তা ছাড়া অন্য কারো উপর মুক্তির বিনিময় পরিশোধের শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। খোলা প্রসংগে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

আযাদ করার সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি জানা যাবে, যদি উক্ত সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে গর্ভধারিণী এ সন্তান প্রসব করে। কেননা এটাই হলো সর্বনিম্ন গর্ভে মুদ্দত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দাসীর গর্ভে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান স্বাধীন হিসেবে গণ্য।

কেননা সে মনিবের বীর্য দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং সে মনিবের পক্ষে আযাদ হয়ে যাবে। এটাই হল মূলনীতি। আর এতে বিপরীত কোন সম্ভবনা নেই। কেননা দাসীর সন্তান মনিবের পক্ষ থেকে। দাসীর সন্তান তার স্বামীর পক্ষ থেকে হলে সে তার মনিবের দাস বলে গণ্য হবে।

কেননা প্রতিপালনের অধিকার (মাতার, পিতার নয় এই দিক) বিবেচনা করলে মাতার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করে। কিংবা এ কারণে যে, স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের (ডিম্বের) মধ্যে বিলোপ হয়ে যায়। আর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে।

আর স্বামী সন্তানের পরিণতির উপর সম্মত রয়েছে।

প্রতারিত ব্যক্তির সন্তানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (যেহেতু স্বামী প্রতারিত হয় অর্থাৎ না জেনে বিবাহ করেছে সেহেতু বলা যায় যে,) সন্তানের এই পরিণতির ব্যাপারে সে সম্মত নয়।

স্বাধীন স্ত্রীলোকের সন্তান সর্বাবস্থায় স্বাধীন। কেননা (পূর্বোল্লেখিত কারণে) স্ত্রীর দিকটি প্রবল। সুতরাং স্বাধীনতা গুণের ক্ষেত্রে সন্তান তার অনুগামী হবে। যেমন দাস-হওয়ার ক্ষেত্রে মুদাব্বার হওয়ার ক্ষেত্রে, উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং কিতাবাতের ক্ষেত্রে সন্তান মাতার অনুগামী হয়।

باب العبد يعتق بعضه

অধ্যায় ঃ এমন দাস প্রসংগে যার কিছু অংশ আযাদ করা হয়

অধ্যায় ঃ এমন দাস প্রসংগে যার কিছু অংশ আযাদ করা হয়

মনিব যদি তার গোলামের কোন অংশ আযাদ করে তাহলে সেই পরিমাণ আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মনিবের অনুকূলে অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। এটা ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়নের মতে সম্পূর্ণই আযাদ হয়ে যাবে।

মতভিন্নতার মূল এই যে, ইমাম ছাহেবের মতে মুক্তিদান খন্ডিত হতে পারে। সুতরাং মনিব যতটুকু মুক্তি দান করবে, তা ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে মুক্তিদান বিভাজ্য নয়। ইমাম শাফেয়ী (র)- এর এই মত। সুতরাং গোলামের সাথে মুক্তিদানের আংশিক সম্বন্ধ তার সমগ্রের সাথে সম্বন্ধের সমতুল্য। এ কারণেই সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তাদের দলীল এই যে,মুক্তিদানের অর্থ দাসসত্তার মাঝে স্বাধীনতা গুণ সাব্যস্ত করণ। আর স্বাধীনতা হলো শরীয়তের একটি বিধানগত শক্তি। এই বিধানগত শক্তি সাব্যস্ত হতে পারে তার বিপরীত গুণ তথা পরাধীনতা দূরীকরণের মাধ্যমে। আর পরাধীনতা হচ্ছে বিধানসম্মত একটি দুর্বলতা। স্বাধীনতা ও পরাধীনতা গুণ বিভাজ্য হতে পারে না। সুতরাং মুক্তিদানের বক্তব্যটি তালাক প্রদান, কিছাছের দাবী মাফ করে দেওয়া এবং দাসীর উম্মে ওয়ালাদ বানানো এর মত হলো (এগুলো খন্ডিত ও বিভাজ্য হয় না।)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, মুক্তিদান অর্থ মালিকানা অপসারণের মাধ্যমে স্বাধীনতা সাব্যস্ত করণ কিংবা অর্থ হলো নিছক মালিকানা অপসারণ। কেননা মালিকানা হচ্ছে মুক্তিদানকারীর নিজস্ব হক ও অধিকার। পক্ষান্তরে দাসত্ব হচ্ছে শরীয়তের হক কিংবা সাধারণের হক। (মুক্তিদান হচ্ছে একটি হস্তক্ষেপ) আর কর্ম-সম্পাদনের হুকুম ঐ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, যা কর্ম সম্পাদনকারীর কর্তৃত্বাধীন থাকে। সুতরাং এখানে মুক্তিদানের অর্থ হলো তার নিজস্ব হক রহিতকরণ, অন্যের হক রহিতকরণ নয়।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে কোন কর্ম সম্পাদন সম্পর্কিত স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। সম্পর্ক বহির্ভূত স্থানে তার সম্প্রসারণ হয় অবিভাজ্যতার অনিবার্য প্রয়োজনে। আর মালিকানা যেহেতু বিভাজনযোগ্য বিষয়, যেমন বিক্রি ও দানের ক্ষেত্রে, সেহেতু এটা মূলনীতির উপর বহাল থাকবে।

উপার্জনপূর্বক পরিশোধ ওয়াজিব হবে, কেননা গোলামের নিকট আংশিক সত্ত্বাধিকার আবদ্ধ রয়েছে।

ইমমাম আবু হানীফা র) এর মতে উপর্জনের দায় আরোপকৃত গোলাম কিতাবত-চুক্তিতে আবদ্ধ গোলামের পর্যায়ভুক্ত। কেননা কিছু অংশের সাথে মুক্তিদানের সম্পর্ক গোলামের সমগ্র সত্তায় 'আত্ম মালিকানা' স্বত্ব সাব্যস্ত করে। অথচ কিছু অংশের উপর অন্যের মালিকানা মেটাতে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং আমরা উভয় দলীলের দাবী কার্যকর করছি তাকে

'কিতাবাত-চুক্তিবদ্ধ'-এর পর্যাভুক্ত করে। কেননা কিতাবাত চুক্তির গোলাম কর্মগত দিক থেকে আত্ম-অধিকার সম্পন্ন, সত্তাগত দিক থেকে নয়। আর শ্রমলব্ধ উপার্জন হবে কিতাবাত চুক্তির নির্ধারিত বিনিময়ের সমতুল্য। সুতরাং, মনিবের অধিকার থাকবে মূল্য উশুলের জন্য তাকে শ্রমে নিযুক্ত করার। আর তাকে আযাদ করে দেওয়ার অধিকারও তার রয়েছে। কেননা চুক্তিবদ্ধ গোলামও মুক্তিদানের উপযুক্ত পাত্র। তবে পার্থক্য এই যে, অংশত মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে দাস অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। কেননা (অংশত হলেও) মুক্তিদানের অর্থ হচ্ছে পক্ষবিহীন অবস্থায় মালিকানা পরিত্যাগ। (আর দুটি পক্ষ ছাড়া বিনিময় সাব্যস্ত হয় না) সুতরাং (বিনিময়হীনতার কারণে) তা রহিত যোগ্য হবে না।

উদ্দীষ্ট কিতাবাত চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা হচ্ছে বিনিময় চুক্তি। সুতরাং তা প্রত্যাহার ও রহিত যোগ্য।

তালাক প্রদান ও কিছাছ ক্ষমার ক্ষেত্রে যেহেতু মধ্যবর্তী অবস্থা নেই (মুক্তি ও দাসেত্বের মাঝে যেমন কিতাবত চুক্তির মধ্যবর্তী অবস্থা রয়েছে) সেহেতু হারামের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের নিমিত্ত তালাক ও কিছাছ ক্ষমাকে পূর্ণভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিভাজন যোগ্য। একারণেই শরীকানাধীন মুদাব্বার দাসীর গর্ভে একজন মীলক যদি সন্তান উৎপাদন করে বসে তাহলে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার বিষয়টি এই মালিকের অংশের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। (অপর মালিকের ক্ষেত্রে কথা পূর্ব মুদাব্বার থেকে যাবে)।

সাধারণ দাসীর ক্ষেত্রে (বিভাজিত না হওয়ার কারণ এই যে,) যেহেতু দাসীকে নষ্ট করার কারণে সন্তান উৎপাদনকারী ব্যক্তি অপর শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে, সেহেতু সে সমগ্র দাসীর মালিক হয়ে গেছে। ফলে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি পূর্ণ মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, (যেন সে আপন দাসীর গর্ভেই উৎপাদন করেছে)।

যদি কোন গোলাম দুই শরীকানাধীন হয় এবং এর মধ্যে একজন তার অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে ঐ অংশটুকু আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর আযাদকারী মালিক যদি সচ্ছল হয় তাহলে অপর শরীকের এখতেয়ার হবে। ইচ্ছা করলে নিজের অংশকে সে আযাদ করে দেবে। আবার ইচ্ছা করলে নিজের অংশের মূল্য পরিশাধের দায় আযাদ কারীর উপর আরোপ করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে। যদি আযাদ কারীর উপর দায় আরোপ করে, তাহলে আযাদকারী পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের নিকট থেকে উশুল করে নেবে। আর পরবর্তীতে 'ওয়ালা সম্পর্ক' আযাদ কারীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে।

আর যদি দ্বিতীয় শরীক তার অংশ আযাদ করে দেয় কিংবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করে তাহলে উভয়ের সাথে ওয়ালা সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে আযাদকারী অসচ্ছল হলে অপর শরীকের দুটি এখতেয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে আযাদ করে দেবে কিংবা গোলামকে উপর্জনে নিযুক্ত করবে। উভয় অবস্থায় ওয়ালা সম্পর্ক উভয় মনিবের সাথে হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

আর ছাহেবায়নের মতে সচ্ছলতার অবস্থায় ক্ষতিপূরণ আদায় এবং অসচ্ছলতার অবস্থায় উপার্জনে নিযুক্ত করা ছাড়া দ্বিতীয় শরীকের আর কোন সুযোগ থাকবেনা। আর আযাদকারী

পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের নিকট থেকে উশুল করতে পারবেনা। অবশ্য ওয়ালা সম্পর্ক আযাদকারীর সাথেই হবে।

আলোচ্য মাসআলাটির ভিত্তি হলো দুটি মুলনীতির উপর। প্রথমতঃ মুক্তিদান বিভাজ্য কি না, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে আযাদকারীর সচ্ছলতা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার বৈধতা রহিত করে না। কিন্তু ছাহেবায়নের মতে রহিত করে।

দ্বিতীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে ছাহেবায়নের দলীল এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাসাল্লাম আপন অংশ আযাদাকরী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যদি সে ধনী হয় তাহলে ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করবে; আর যদি অসচ্ছল হয় তাহলে অপর শরীকের অংশ পরিশোধে গোলাম উপার্জন করবে। মূল হাদীছ,

ان كان غنيا ضمن وانه كانه فقيرا السعى فى حصة الاخر (اضرجه الائمة الستة عن ابى هريرة)

এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি বিষয়কে (আযাদকারীর সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মাঝে) ভাগ করে দিয়েছেন। আর বিভাজন একত্রীকরণের পরিপন্থী। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, দ্বিতীয় শরীকের অংশের মূল্য গোলামের নিকট আবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং গোলামকে সে যামীন বানাতে পারে। যেমন কারো কাপড় বাতাসে উড়ে গিয়ে অন্য কারো রংয়ের পাত্রে পড়লো এবং রঞ্জিত হয়ে গেলো, সে অবস্থায় রঞ্জনের মূল্য কাপড় ওয়লার উপর সাব্যস্ত হয়। সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল এ কারণে, যা আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং এখানেও তাই হবে।[১] তবে গোলাম যেহেতু দরিদ্র, সেহেতু তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করা হবে।

আর সচ্ছলতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সচ্ছলতাই হলো বিবেচ্য। অর্থাৎ অপর শরীকের হিসসার মূল্যের সমপরিমাণ (উদ্বৃত্ত) অর্থসম্পদের মালিক হওয়া, প্রাচুর্যের সচ্ছলতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ন্যূনতম সচ্ছলতা দ্বারাই উভয় পক্ষের স্বার্থের সমন্বয় হয়। অর্থাৎ আযাদকারীর ছাওয়াব লাভের ইচ্ছা পূর্ণ করা এবং যে আযাদ করা থেকে নীরব রয়েছে, তার হকের বিনিময় তার হাতে পৌঁছানো। মুলনীতি অনুযায়ী যে হুকুম ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ছাহেবায়নের মত অনুযায়ী সুস্পষ্ট। কেননা আযাদকারী যে দায় পরিশোধ করেছে তা গোলামের কাছ থেকে ফেরত না নেয়ার কারণ এই যে, সচ্ছলতার অবস্থায় গোলামের উপর উপর্জনের দায়িত্ব নেই। আর ওয়ালা সম্পর্ক সর্বতোভাবে আযাদাকরীর সংগে সম্পৃক্ত হবে। কেননা যেহেতু মুক্তিদান বিভাজ্য নয় সেহেতু (প্রথমোক্ত মূলনীতির আলোকে) মুক্তিদান সম্পূর্ণরূপে তার পক্ষ হতেই সাব্যস্ত হচ্ছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত অনুযায়ী অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাখ্যা এই যে, যেহেতু গোলামের অবশিষ্ট অংশে অপর পক্ষের মালিকানা বহাল রয়েছে, সেহেতু তার আযাদ করার এখতেয়ার সাব্যস্ত হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফার মতে মুক্তি দান বিভাজনযোগ্য। আর মুক্তদাতার উপর অর্থ পরিশোধের মালিকানা আরোপের অধিকার এজন্য যে, মুক্তিদাতা

১। কেননা কাপড়ওয়ালা যেমন রঞ্জন দ্বারা উপকৃত হয়েছে, তদ্রূপ গোলাম মুক্তিলাভ দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

তার অংশের মালিকানা নষ্ট করার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। কারণ নিজের মালিকানাভুক্ত অংশকে আযাদ করা এবং এ জাতীয় কর্ম ব্যতীত বিক্রী. দান ইত্যাদি তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আর গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার লাভের কারণ ইতিপূর্বে আমরা বয়ান করেছি।

আর আযাদকারী পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের কাছ থেকে ফেরত নেবে এজন্য যে, দায় পরিশোধের মাধ্যমে সে নীরবতা অবলম্বন কারীর স্থলবর্তী হয়েছে। আর নীরবতা অবলম্বনকারীর উপার্জনে নিযুক্ত করার মাধ্যমে অর্থ উসূল করার অধিকার ছিলো। সুতরাং আযাদকারীর সে অধিকার থাকবে।

তাছাড়া সে তো দায় পরিশোধের মাধ্যমে প্রকারান্তরে গোলামের মালিকানা লাভ করেছে; সুতরাং যেন সম্পূর্ণ গোলামই তার মালিকানাধীন, এবং সে অবস্থায় সে গোলামের একাংশ আযাদ করেছে, সুতরাং অপরাংশ আযাদ করার কিংবা ইচ্ছা করলে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার তার রয়েছে।

আর (দায়পরিশোধের) এই ক্ষেত্রে ওয়ালা সম্পর্ক যুক্তিদাতার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা দায় পরিশোধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ গোলামের মালিক হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ মুক্তিদান তার পক্ষ থেকেই রয়েছে।

পক্ষান্তরে মুক্তিদাতার অসচ্ছলতার অবস্থায় নীরবতা অবলম্বনকারী ইচ্ছা করলে তার হিস্সা আযাদ করতে পারে। কেননা তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। আবার আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে পারে।

উভয় অবস্থায় ওয়ালা সম্পর্ক নীরবতা অবলম্বনকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা (অবশিষ্ট অংশের) মুক্তিদান তার পক্ষ হতে সাব্যস্ত হচ্ছে।

আর উপার্জনে নিযুক্ত গোলামের পরিশোধকৃত অর্থ আমাদের সকলের মতেই মুক্তিদাতার নিকট থেকে ফেরত পাবে না।

কেননা সে তো নিজের দাসত্ব মোচনের উদ্দেশ্যে উপার্জন করেছে। এবং মুক্তিদাতার উপর আরোপিত কোন ঋণ সে পরিশোধ করছেনা। কেননা অসচ্ছলতার কারণে তার উপর কোন ঋণ সাব্যস্ত হয়নি।

আর অসচ্ছল বন্ধকদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক বন্ধকী গোলাম আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে তো এমন সত্তার দায় পরিশোধ করছে, যে সত্তা মুক্তিলাভ করে ফেলেছে। কিংবা কারণ এই যে. সে তো বন্ধক দানকারী ঋণ পরিশোধ করছে। সুতরাং পরিশোধকৃত অর্থ সে তার কাছ থেকে ফেরত নিবে।

সচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত ছাহেবায়নের মতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে অসচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি বলেন, নীরব শরীকদারের হিসেবে তার মালিকানায় বহাল থাকবে এবং সেটা বিক্রি করা ও দান করা যাবে।

কেননা অসচ্ছলতার কারণে মুক্তিদাতা শরীকদারের উপর দায় আরোপ করার অবকাশ নেই। অদ্রূপ গোলামকে দায় পরিশোধে বাধ্য করার অবকাশ নেই। কেননা সে অপরাধী নয় এবং মুক্তি গ্রহণে রাযীও নয়। তদ্রূপ সম্পূর্ণ গোলামকে মুক্তিদানের অবকাশ নেই। কেননা তাতে নীরব পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। সুতরাং তা-ই নির্ধারিত হয়ে গেলো, যা আমরা বলেছি।

আমাদের বক্তব্য এই যে, গোলামকে শ্রমের মাধ্যমে দায় পরিশোধে নিযুক্ত করার অবকাশ রয়েছে। কেননা এটা অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার মুখাপেক্ষী নয় এবং এর ভিত্তি হচ্ছে অর্থমূল্য আবদ্ধ হয়ে থাকার উপর। সুতরাং একই ব্যক্তির সত্তায় মালিকানা সাব্যস্তকারী শক্তি এবং মালিকানা রহিতকারী দুর্বলতা একত্র করার পন্থা গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম কুদূরী বলেন, উভয় শরীকদার যদি অপরের বিপক্ষে উভয়ের প্রত্যেকের অনুকূলে তার অংশের অর্থ পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে, শরীকদ্বয় সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর একই হুকুম যদি একজন সচ্ছল হয় এবং অপর জন অসচ্ছল হয়।

কেননা উভয়ের প্রত্যেকের দাবী এই যে, অপর পক্ষ তার হিস্‌সা আযাদ করে দিয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই উক্ত গোলাম 'মুকাতাব' এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এবং তাকে গোলাম বানিয়ে রাখা তার জন্য হারাম হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার নিজের ব্যাপারে তাকে সত্যবাদী বিবেচনা করা হবে। এবং উক্ত গোলামকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তাকে বারণ করা হবে। অতঃপর গোলামকে সে দায় পরিশোধের জন্য উপার্জনে বাধ্য করবে।

কেননা সে সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী, উভয় অবস্থায় তার উপার্জনে বাধ্য করার অধিকার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। কেননা (নিজের দাবীতে সে সত্যবাদী হলে) গোলামটি তার মুকাতাব হবে। কিংবা (মিথ্যাবাদী হলে) তার মালিকানাধীন দাস হবে। সুতরাং উভয়ে তাকে উপার্জনে বাধ্য করতে পারবে। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে উক্ত হুকুম ভিন্ন হবে না। কেননা উভয় অবস্থায় মনিবের হক দুটির যে কোন একটিতে স্থির হবে। (অপর শরীককে দায়বদ্ধ করা) কিংবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা, কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে মুক্তিদাতার সচ্ছলতা উপার্জনে বাধ্য করার প্রতিবন্ধক নয়। এদিকে শরীকদারের অস্বীকৃতির কারণে একে যামীন করা সম্ভব নয়। সুতরাং অপর দিকটি অর্থাৎ উপার্জনে বাধ্য করার দিকটি নির্ধারিত হয়ে যাবে।

আর ওয়ালার হক উভয়ে লাভ করবে। কেননা উভয়ে এ দাবী করছে যে, আমার প্রতিপক্ষের হিস্‌সা তার মুক্তিদানের কারণে মুক্ত হয়ে গেছে এবং সে তার ওয়ালার অধিকারী হয়েছে। পক্ষান্তরে আমার হিস্‌সার মুক্তি উপার্জনের মাধ্যমে দায় পরিশোধ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার ওয়ালার হক আমার রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উভয়ে সচ্ছল হলে গোলামের জন্য উপার্জন আবশ্যক হবে না। কেননা শরীকদ্বয়ের উভয়ে অপর পক্ষের উপর দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবী করার মাধ্যমে গোলামকে উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। কেননা সাহেবায়নের মতে মুক্তিদাতার সচ্ছলতা গোলামকে

উপার্জনে বাধ্য করার প্রতিবন্ধক। তবে অপর পক্ষের অস্বীকারের কারণে উক্ত দাবী সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু উপার্জনের দায় থেকে মুক্ত ঘোষণা করা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এটা হচ্ছে নিজেরই বিপক্ষে নিজের স্বীকৃতি।

পক্ষান্তরে উভয়ে অসচ্ছল হলে গোলাম উভয়ের অনুকূলে উপার্জন করবে। কেননা উভয়ের প্রত্যেক গোলামের বিপক্ষে দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবী করছে। আপন বক্তব্যে তারা সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। কেননা মুক্তিদাতা অসচ্ছল। **আর যদি একজন সচ্ছল এবং অপরজন অসচ্ছল হয় তাহলে সচ্ছলজনের অনুকূলে গোলাম উপার্জনে নিযুক্ত হবে।**

কেননা অপর পক্ষ যেহেতু অসচ্ছল সেহেতু সে তার উপর দায়পরিশোধের আবশ্যকতা দাবী করছেনা, বরং গোলামের বিপক্ষে উপার্জন ও দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবী করছে তাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছে না।

অসচ্ছলজনের অনুকূলে গোলামকে উপার্জন করতে হবে না। কেননা যেহেতু অপর পক্ষ সচ্ছল, সেহেতু সে তার বিপক্ষে দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবী করছে। সুতরাং গোলামকে সে উপার্জনের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত ঘোষণাকারী সাব্যস্ত হবে।

সাহেবায়নের মতে এসকল ক্ষেত্রে ওয়ালার হক মওকূফ থাকবে।

কেননা উভয়ের প্রত্যেকে ওয়ালার হক অপর পক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ অপর পক্ষ নিজেকে তা থেকে মুক্ত বলে দাবী করছে। সুতরাং উভয়ে কোন একজনের মুক্তিদানের ব্যাপারে একমত হওয়া পর্যন্ত তা মওকুফ থাকবে।

শরীকদ্বয়ের একজন যদি বলে, অমুক গোলামটি যদি আগামীকাল এই ঘরে প্রবেশ না করে তাহলে সে আযাদ; পক্ষান্তরে অপরজন বলে, যদি সে প্রবেশ করে তাহলে আযাদ। অতঃপর আগামীকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলো কিন্তু জানা গেল না যে, সে প্রবেশ করেছে কি না, তাহলে অর্ধেক অংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং বাকী অর্ধেকের জন্য উভয়ের অনুকূলে উপার্জন করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন. সম্পূর্ণ মুল্য পরিশোধের জন্যই উপার্জন করবে।

কেননা উপার্জনে নিযুক্তির অধিকার রহিত হওয়ার ফয়সালা যায় বিপক্ষে দেয়া হবে, সে অজ্ঞাত আর অজ্ঞাত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালা প্রদান সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টি এমনই যে, অন্য একজনকে সে বললো, আমাদের দুজনের একজনের কাছে তুমি এক হাযার দিরহাম পাবে। এক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে কোন কিছুর ফয়সালা করা হবে না। সুতরাং এখানেও অনুরূপ হবে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের (র) দলীল এই যে, উপার্জনে দায়িত্ব অর্ধেক রহিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের কাছে নিশ্চিত। কেননা দুজনের একজনের শর্ত সুনিশ্চিত ভাবেই পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আর অর্ধেকের উপার্জন সুনিশ্চিত রহিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে পূর্ণ ওয়াজেব হওয়ার ফয়সালা দেওয়া যেতে পারে।

আর (মুক্ত অংশের) সার্বিকীকরণ এবং (অর্ধেক অধিকার রহিত হওয়ার বিষয়টিকে) বন্টনের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূরীভূত হবে।[১] যেমন কেউ অনির্ধারিত ভাবে দুটি গোলামের একটিকে আযাদ করলো কিংবা নির্ধারিত ভাবে আযাদ করার পর কোনটিকে করেছিলো তা ভুলে গেলো এবং স্মরণে আসার কিংবা নির্ধারণ করার পূর্বেই সে মারা গেলো। (তখন উভয় গোলামের অর্ধেক আযাদ হবে। এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য উভয়ে উপার্জনে নিযুক্ত হবে)।

মনিবের সচ্ছলতা উপার্জনের নিযুক্তির অধিকার রহিত করে কিনা, এ সম্পর্কে যে মত ভিন্নতা ইতিপূর্বে হয়েছে, তার ভিত্তিতে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত বের হবে। যদি দুই মনিব নিজ নিজ স্বতন্ত্র মালিকানায় দুই গোলামের সম্বন্ধে অনুরূপ শর্তযুক্ত কথা বলে (আর আগামীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রবেশ করা না করা জানা যায়নি) তাহলে দুই গোলামের একজনও আযাদ হবে না।

কেননা যার গোলাম আযাদ হওয়ার ফয়সালা করা হবে সে অজ্ঞাত। তদ্রূপ যে গোলামের অনুকূলে আযাদ হওয়ার ফয়সালা করা হবে সেও অজ্ঞাত। ফলে অজ্ঞতার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং ফয়সালা প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে (দুই শরীকানের) এক গোলামের ক্ষেত্রে যার অনুকূলে ফয়সালা হচ্ছে সে নির্ধারিত। ফলে নির্ধারিত ও জ্ঞাত বিষয় অজ্ঞাত বিষয়ের উপর প্রবল হয়ে যাবে।

দু ব্যক্তি যদি তাদের একজনের গোলাম পুত্রকে শরীকানায় খরিদ করে তাহলে তার পিতার হিস্যা আযাদ হয়ে যাবে। কেননা সে তার নিকট আত্মীয়ের অংশের মালিক হয়েছে। আর পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিকটাত্মীয়কে খরিদ করার পরিণতি মুক্তিদান করা।

আর পিতার উপর কোন দায় সাব্যস্ত হবে না, অপর পক্ষ একথা জানুক কিংবা না জানুক যে, এই গোলাম তার শরীকদারের পুত্র। তদ্রূপ একই হুকুম হবে যদি তারা দুজন ওয়ারিছ সূত্রে উক্ত গোলামের মালিক হয়। অপর শরীকের অধিকার রয়েছে, ইচ্ছা করলে নিজের অংশকে সে আযাদ করে দেবে। আবার ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। ছাহেবায়নের মতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচ্ছল হলে, পিতা সচ্ছলতার অর্ধেক মূল্য পরিশোধের যামিন হবে। পক্ষান্তরে পিতা অসচ্ছল হলে পুত্র তার পিতার শরীকদারের অনুকূলে নিজের অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে।

উভয়ে যদি দান বা ছাদকা অথবা ওয়াছিয়ত সূত্রে উক্ত গোলামের মালিক হয় তখনও অনুরূপ মতপার্থক্য হবে। তদ্রূপ একই হুকুম হবে যদি দুজন লোক একটি গোলাম খরিদ করে, অথচ তাদের একজন এমন শপথ করে রেখেছিলো যে, যদি সে উক্ত গোলামের অর্ধেক খরিদ করে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। ছাহেবায়নের দলীল এই যে, পুত্রকে খরিদ করার মাধ্যমে পিতা অপর শরীকদারের হিস্যা নষ্ট করে দিয়েছে। কেননা মাহরাম আত্মীয়কে খরিদ

১। এভাবে উভয় মনিব ফায়সালার পাত্র হবে। সুতরাং অজ্ঞতা দোষ থাকবে না। শুধু প্রশ্ন হতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে তো যে মুক্তিদাতা নয় তার থেকেও উপার্জন নিযুক্তির অধিকার আংশিক রহিত হলো। আবার মুক্তিদাতার জন্য উক্ত অধিকার আংশিক সাব্যস্ত হলো অর্থাৎ একপক্ষ বিনা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এর জবাব এই যে, গোলামের ক্ষতিরোধের অনিবার্য কারণে এটা মেনে নেয়া হয়েছে। কেননা মুহম্মদ (র)-এর মত গ্রহণ করলে গোলামের হক সম্পূর্ণ বাতিল হয়। পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করলে যে মুক্তিদাতা নয় তার হক আংশিক বাতিল হয়। সুতরাং এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

করার পরিণতি মুক্তিদান। বিষয়টি এমনই হলো যে, একটি গোলাম (ঐ গোলামের) দুই অনাত্মীয়ের শরীক মালিকানায় ছিলো। অতঃপর তাদের একজন নিজের অংশ আযাদ করে দিলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, অপর শরীকদারতো (যৌথ খরিদির সময় প্রকারান্তরে) প্রতিপক্ষ কর্তৃক তার হিস্যা নষ্ট করার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছে। সুতরাং সে পিতাকে যামীন বানাতে পারে না। যেমন পারে না যদি সে অনাত্মীয় শরীকদারকে তার হিস্যা আযাদ করার সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়।

আর নিজের হিস্যা নস্ট করার বিষয়ে তার সম্মতির প্রমাণ এই যে, তাকে সে এমন কাজে শরীক করেছে, যা মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। কেননা নিকটাত্মীয়কে খরিদ করার পরিণতি মুক্তিদান। একারণেই তো আমাদের মতে নিকটাত্মীয়কে খরিদ করা দ্বারা সে কাফ্ফারা থেকে দায়মুক্ত হতে পারে।

আর ছাহেবায়নের বক্তব্যের 'প্রকাশিত বর্ণনায়' এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটা হচ্ছে অপর পক্ষের মালিকানা নষ্ট করা জনিত ক্ষতিপূরণ। তাই সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে বিষয়টি ভিন্ন হয়। সুতরাং সম্মতি প্রকাশ পাওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণের দায় রহিত হবে। (পক্ষান্তরে মালিকানা অর্জনজনিত ক্ষতিপুরণ হলে সম্মতির কারণে তা রহিত হবে না)।

আর আত্মীয়তার বিষয়টি জানা ও না জানার কারণে সিদ্ধান্ত ভিন্ন হবে না। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত যাহিরে বেওয়ায়েত। কেননা বিধান আবর্তিত হয় কারণকে কেন্দ্র করে।

যেমন কেউ অন্য একজনকে বললো, তুমি এ খাবার খাও আর উক্ত খাদ্য আদেশ দাতার মালিকানাভুক্ত। কিন্তু আদেশদাতা তার মালিকানাভুক্তির কথা জানেনা। যদি অনাত্মীয় লোকটি প্রথমে (অপর পক্ষের পুত্রের) অর্ধেক খরিদ করে, অতঃপর তার পিতা অবশিষ্ট অর্ধেক খরিদ করে এবং পিতা সচ্ছল হয়, তাহলে অনাত্মীয় শরীকদার এখতেয়ার লাভ করবে। ইচ্ছা করলে সে পিতাকে যামীন বানাতে পারে।

কেননা সে তার নিজের হিস্যা (পরবর্তীতে খরিদকারী পিতা কর্তৃক) নষ্ট করার ব্যাপারে সম্মত ছিলো না। আর ইচ্ছা করলে পুত্রকে তার মূল্যের অর্ধেক পরিশোধের জন্য উপার্জনে বাধ্য করতে পারে। কেননা তার অর্থ গোলামের নিকট আবদ্ধ রয়েছে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

কেননা তাঁর মতে মুক্তিদাতার সচ্ছলতা উপার্জনে বাধ্য করার পথে প্রতিবন্ধক নয়। ছাহেবায়ন বলেন, তার-কোন এখতেয়ার থাকবে না। এবং পিতা অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য যামীন হবে। কেননা তাঁদের মতে মুক্তিদাতার সচ্ছলতা উপার্জনে বাধ্য করার পথে প্রতিবন্ধক।

কেউ যদি তার গোলাম পুত্রের অর্ধেক খরিদ করে আর সে সচ্ছল হয় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না। আর সাহেবায়ন বলেন, যদি সে সচ্ছল হয় তবে সে যামীন হবে।

অর্থাৎ যদি সে পুত্রের অর্ধেক অংশ এমন ব্যক্তি হতে খরিদ করে, যে সম্পূর্ণ গোলামের মালিক ছিলো[১]। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেবের মতে খরিদকারী পিতা ক্রেতাকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। এর কারণ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

আর যদি গোলাম তিনজনের শরীকানাধীন হয় এবং তাদের একজন সচ্ছল অবস্থায় গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করে অতঃপর অন্য একজন শরীকদার তাকে আযাদ করে এবং সেও সচ্ছল হয়। অতঃপর তারা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে চায় তাহলে নীরব পক্ষ মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে পূর্ণ গোলাম অবস্থায় তার মূল্যের এক তৃতীয়াংশের জন্য যামীন বানাবে। মুক্তিদানকারীকে যামীন বানাতে পারবে না। পক্ষান্তরে মুদাব্বার ঘোষণাকারী মুক্তিদানকারীকে মুদাব্বার অবস্থায় গোলামের মোট মূল্যের এক তৃতীয়াংশের জন্য যামীন বানাবে। কিন্তু সে নিজে যে তৃতীয়াংশের জন্য যামীন হয়েছে, তার দায় সে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর উপর আরোপ করতে পারবে না। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত।

সাহেবায়ন বলেন, সম্পূর্ণ গোলাম ঐ ব্যক্তির হবে, যে প্রথমে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে। আর সে সচ্ছল বা অসচ্ছল যাই হোক অপর দুই শরীকের অনুকূলে দুই তৃতীয়াংশের জন্য যামীন হবে।

এ মাসআলার মূল ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে মুক্তিদানের ন্যায় মুদাব্বার ঘোষণাও বিভাজন গ্রহণ করে। আর এতে সাহেবায়ন ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা মুদাব্বার ঘোষণাও মুক্তিদানের একটি (বিলম্বিত) প্রকার বিশেষ। সুতরাং একেও তার উপর কিয়াস করা হবে।

আর ইমাম সাহেবের মতে যেহেতু মুদাব্বার বানানো বিভাজনযোগ্য, সেহেতু তা তার অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যেহেতু সে মুদাব্বার ঘোষণার মাধ্যমে অপর দুই শরীকের অংশ নষ্ট করে দিয়েছে, সেহেতু এখন উভয়ের প্রত্যেকে নিজের অংশকে হয় মুদাব্বার ঘোষণা করবে কিংবা আযাদ করে দেবে কিংবা কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ করবে কিংবা মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে দায়বদ্ধ করবে কিংবা গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করবে কিংবা তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেবে।

কেননা দুজনের প্রত্যেকের অংশ নিজ মালিকানায় বহাল রয়েছে; তবে শরীকদার কর্তৃক বিনষ্ট করার কারণে বিনষ্ট অবস্থায় রয়েছে। কেননা বিক্রি ও দান করার মাধ্যমে ঐ গোলাম থেকে উপকৃত হওয়ার পথ তাদের জন্য সে রুদ্ধ করে দিয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর পরবর্তী দুই শরীকের একজন যখন মুক্তি দানকেই গ্রহণ করলো, তখন তার হক তাতেই নির্ধারিত হয়ে গেলো এবং অন্যান্য দিক গ্রহণের এখতেয়ার রহিত হয়ে গেলো। এখন (তৃতীয়) নীরব শরীকের দিকে অভিমুখী হলো ক্ষতিপূরণ গ্রহণের দুটি কারণ। প্রথমত: প্রথম শরীকের মুদাব্বার ঘোষণা, দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় শরীকের মুক্তিদান। কিন্তু সে শুধু মুদাব্বার ঘোষণাকারীকেই দায়বদ্ধ করতে পারবে, যাতে ক্ষতিপূরণটা বিনিময়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ হয়।

১। পক্ষান্তরে যদি দুই শরীকের একজনের কাছ থেকে তার হিস্যা খরিদ করে তাহলে সকলের মতেই নীরব পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কেননা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সেটাই হলো আসল। একারণেই আমাদের মূলনীতি মুতাবেক জবরদখল জনিত ক্ষতিপূরণকে বিনিময়ভিত্তিক ক্ষতিপুরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর মুদাব্বার ঘোষণার ফলে আরোপিত ক্ষতিপূরণকেই বিনিময়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা সম্ভব। কেননা মুদাব্বার ঘোষণার সময় উক্ত তৃতীয় শরীকের অংশটিকে এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় হস্তান্তরযোগ্য। কিন্তু মুক্তিদানের ক্ষেত্রে হস্তান্তর যোগ্য নয়। কেননা ভিন্ন দুটি মূলনীতির আলোকে আংশিক আযাদকৃত গোলাম হয় মুকাতাব নয় স্বাধীন। আর কিতাবাত নাকচ করার জন্য মুকাতাবের সম্মতি অপরিহার্য, যাতে হস্তান্তরের উপযুক্ত হয়। একারণেই নীরব পক্ষ (তথা তৃতীয় শরীক) মুদাব্বার ঘোষণাকারীকেই দায়বদ্ধ করবে।

অতঃপর মুদাব্বার ঘোষণাকারী মুদাব্বার অবস্থায় উক্ত গোলামের যে মূল্য তার তৃতীয়াংশের জন্য মুক্তিদানকারীকে দায়বদ্ধ করবে। কেননা সে মুদাব্বার গোলামের উপর তার বিদ্যমান মালিকানাকে নষ্ট করেছে।

আর ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় নষ্টকৃত বস্তুর মূল্যের ভিত্তিতে। আর কফীহগণের বক্তব্য মতে মুদাব্বার গোলামের মূল্য হচ্ছে নির্ভেজাল গোলামের মূল্যের এক তৃতীয়াংশ।

মুদাব্বার ঘোষণাকারী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে নীরব পক্ষের যে অংশের মালিকানা লাভ করেছিলো, তার জন্য মুক্তিদানকারীকে সে দায়বদ্ধ করতে পারবে না।

কেননা ক্ষতিপূরণকৃত অংশের মালিকানা মুদাব্বার ঘোষণার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সাব্যস্ত হবে। আর তা এক হিসাবে (অর্থ্যাৎ ক্ষতিপূরণ প্রদানের দিক লক্ষ্য করে) কার্যকর, কিন্তু অন্য হিসাবে (অর্থাৎ মুদাব্বার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে) কার্যকর নয়।সুতরাং এই বিঘ্নিত মালিকানা অন্যকে দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

আর ওয়ালার হক মুক্তিদানকারী ও মুদাব্বার ঘোষণাকারী উভয়ের মাঝে তিনভাগে বণ্টন করা হবে। দুই তৃতীয়াংশ মুদাববার ঘোষণাকারীর এবং এক তৃতীয়াংশ মুক্তিদানকারীর। কেননা গোলাম তাদেরই মালিকানাতেই এই হারে আযাদ হয়েছে।

তবে সাহেবায়নের মতে যেহেতু মুদাব্বার ঘোষণা বিভাজনযোগ্য নয়, সেহেতু সম্পূর্ণ গোলাম মুদাব্বার ঘোষণাকারীর মুদাব্বার রূপে গণ্য হবে। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে সে অপর দুই শরীকের হিস্যা বিনষ্ট করেছে। তাই সে উভয়ের হিসাবের জন্য দায়বদ্ধ হবে। আর ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে ভিন্ন হবে না।

কেননা এটা হচ্ছে মালিকানা লাভের ক্ষতিপূরণ। সুতরাং এটা সন্তান উৎপাদন জনিত ক্ষতিপূরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো। মুক্তিদানজনিত ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা হচ্ছে অপরাধের কারণে আরোপিত ক্ষতিপূরণ।

আর ওয়ালার হক সম্পূর্ণটুকু মুদাব্বার ঘোষণাকারীর হবে। এর কারণ সুস্পষ্ট।

দুই ব্যক্তির শরীকানায় যদি কোন দাসী থাকে আর একজন দাবী করে যে, উক্ত দাসী তার প্রতিপক্ষের উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা); কিন্তু প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করে, তাহলে একদিন সে (সেবা দায়িত্ব থেকে) বিরত থাকবে, আরেকদিন অস্বীকারকারীর সেবা করবে। এটা হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন বলেন, অস্বীকারকারী ইচ্ছা করলে দাসীকে তার অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জনের বাধ্য করতে

পারবে। অতঃপর সে আযাদ হয়ে যাবে। তার উপর স্বীকারকারী শরীকের কোন অধিকার থাকবে না।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, অপর পক্ষ যখন তার দাবীকে সত্য বলে স্বীকার করলো না তখন এই স্বীকারোক্তি স্বীকারকারীর প্রতি পাল্টে যাবে, যেন সেই তাকে সন্তানোৎপাদনে ব্যবহার করছে। যেমন ক্রেতা যদি বিক্রেতার বিপক্ষে দাবী করে যে, বিক্রির বিক্রেতা বিক্রিত দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছে, তখন সাব্যস্ত করা হয় যেন (একথা বলে) সে নিজে মুক্তিদান করেছে। এখানেও তাই হবে। সুতরাং সেবা গ্রহণের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর অস্বীকারকারীর অংশ আইনতঃ তার মালিকানায় বহাল রয়েছে। সুতরাং সে উপার্জনে বাধ্য করার মাধ্যমে মুক্তিদান পর্যন্ত উপনীত হবে, যেমন নাছরানীর উম্মে ওয়ালাদ যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, স্বীকারকারীর বক্তব্য যদি সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে অপর পক্ষের উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে সম্পূর্ণ সেবা অধিকার অপর পক্ষ লাভ করবে। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলে গ্রহণ করা হলে অপর পক্ষ অর্ধেক সেবার অধিকারী হবে। অর্থাৎ অর্ধেক সেবার অধিকার নিশ্চিত। সুতরাং তা অস্বীকারকারীর অনুকূলে সাব্যস্ত হবে।

অন্যদিকে স্বীকারকারী অপর শরীক সেবা অধিকার পাবে না এবং উপার্জনে নিযুক্ত করারও অধিকার পাবেনা। কেননা সে সন্তান উৎপাদনকারী এবং ক্ষতিপূরণের দাবী করে সব কিছু থেকেই অধিকার মুক্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রতিপক্ষের উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদানের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্বীকার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর তা অবশ্য সাব্যস্ত স্বীকৃতি, যা প্রত্যাহৃত হয় না।

সুতরাং স্বীকারকারী পক্ষকে সন্তানোৎপাদনকারীর সমপর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

দাসী যদি উভয় শরীকের উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যায় (যেমন উভয়ে দাসীর সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করলো) অতঃপর তাদের একজন সচ্ছল অবস্থায় নিজের অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। ছাহেবায়ন বলেন, সে দাসীর অর্ধেক মূল্যের ক্ষতি পূরণের দায়ী হবে।

কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে উম্মে ওয়ালাদ মূল্যযোগ্য সম্পদ নয়। পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে উম্মে ওয়ালাদও মূল্যযোগ্য সম্পদ।

এই মূলনীতির উপর কতিপয় মাসয়ালার ভিত্তি রয়েছে। যেগুলো আমি 'কেফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে উল্লেখ করেছি।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, উম্মে ওয়ালাদের দ্বারা উপকার হাসিল করা জায়েয রয়েছে— সেবা গ্রহণের মাধ্যমে এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেবায় নিয়োগ করার মাধ্যমে। আর তা মূল্যবান সম্পদ হওয়ার প্রমাণ আর বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তার মূল্যযোগ্যতা রহিত হয় না, যেমন মুদাব্বার গোলামের ক্ষেত্রে।

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, নাসরানীর উম্মে ওয়ালাদ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন উপার্জন করা তার জন্য আবশ্যক। আর এ হল মূল্য সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ।

অবশ্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত মতে তার অর্থমূল্য সাধারণ দাসী অবস্থার অর্থমূল্যের এক তৃতীয়াংশ। কেননা এখানে বিক্রয়যোগ্য হওয়ার সুবিধা এবং মনিবের মৃত্যুর পর (ওয়ারিছদের ও পাওনাদারদের অনুকূলে) উপার্জনের সুবিধা রহিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে মুদাব্বার গোলামের (অর্থমূল্য হচ্ছে সাধারণ দাস অবস্থার দুই তৃতীয়াংশ। কেননা) শুধু বিক্রয় যোগ্যতার সুবিধা রহিত হয়েছে ; কিন্তু উপার্জনে বাধ্য করার এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা বহাল রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, মূল্য সাব্যস্ত হয় অর্থ লাভের জন্য সংরক্ষণের মাধ্যমে। অথচ উম্মে ওয়ালাদ দাসীকে অর্থ লাভের জন্য নয় বরং বংশ রক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। অর্থ লাভের বিষয়টি এখানে গৌণ বা মূল উদ্দেশ্যের অনুগত। এ কারণেই (মনিবের মৃত্যুর পর) সে ওয়ারিছ বা পাওনাদার কারো অনুকূলে উপার্জনে বাধ্য নয়। আর মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন।

এই পার্থক্যের কারণ এই যে, উম্মে ওয়ালাদের মাঝে কারণটি বর্তমানেই বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হলা সন্তানের মাধ্যমে (উভয়ের মাঝে) অংশত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্পর্ক। যেমন বিবাহ বন্ধনের নিষিদ্ধতা প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সম্ভোগের প্রয়াজনের নিরিখে মালিকানা (রহিত করণের) ক্ষেত্রে কারণটির কার্যকারিতা প্রকাশ পায়নি। সুতরাং অর্থমূল্য রহিত করণের ক্ষেত্রে কারণটি কার্যকর (কেননা এক্ষেত্রে অনিবার্য কোন প্রয়োজন নেই।) আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে মনিবের মৃত্যুর পরই কারণটি সংঘটিত হয়।

আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের নিষিদ্ধতার কারণ হলো মুদাব্বার ঘোষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া। সুতরাং ক্ষেত্র দুটি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

আর নাসরাণী মনিবের (ইসলাম গ্রহণকারিণী) উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে আমরা 'মুকাতাব'[১] হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত করেছি উভয় পক্ষের ক্ষতি নিরসনের জন্য। আর কিতাবাতের বিনিময় সাবস্যস্ত হওয়ার জন্য অর্থমূল্য বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন নেই।

باب عتق احد العبدين

অধ্যায় ঃ দুই গোলামের একটিকে আযাদ করা

অধ্যায় ঃ দুই গোলামের একটিকে আযাদ করা

কারো যদি তিনটি গোলাম থাকে আর তাদের দুইটি তার সামনে উপস্থিত হয় আর সে বলে যে, তোমাদের একজন আযাদ। অতঃপর তাদের একজন বের হয়ে যায় এবং অন্য একজন প্রবেশ করে আর মনিব (পুনরায়) বলে যে, তোমাদের একজন আযাদ, অতঃপর বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পূর্বেই মনিব মৃত্যুবরণ করে, তাহলে যার উপস্থিতিতে বক্তব্যটি দু'বার উচ্চারিত হয়েছে তার চার ভাগের তিনভাগ এবং অপর গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক আযাদ হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র) (প্রথম ও দ্বিতীয় গোলামের ক্ষেত্রে) একই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তৃতীয় গালামের ক্ষেত্রে তাঁর মত এই যে, মাত্র এক চতুর্থাংশ আযাদ হবে।

নির্গমনকারী দ্বিতীয় গোলামের অর্ধেক আযাদ হওয়ার কারণ এই যে, প্রথম বক্তব্যটি তার এবং অবস্থানকারী গোলাম অর্থাৎ যার উপস্থিতিতে বক্তব্যটি দুবার উচ্চারিত হয়েছে, এ দুজনের মাঝে আবর্তিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম বক্তব্যটি উভয়ের মাঝে সমানভাবে একটি দাস সত্তার মুক্তিদান অবশ্য সাব্যস্ত করেছে, ফলে তা উভয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক অংশে কার্যকর হবে। তবে অবস্থানকারী দাস দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে আরো চতুর্থাংশের আযাদী অর্জন করবে। কেননা দ্বিতীয় বক্তব্যটি তার এবং প্রবেশকারী (তৃতীয়) দাসের মাঝে আবর্তিত। সুতরাং দ্বিতীয় বক্তব্যটি উভয়ের মাঝে অর্ধেকে খণ্ডিত হবে। তবে অবস্থানকারী দাস যেহেতু প্রথম বক্তব্য দ্বারাই অর্ধেক অংশের মুক্তির অধিকারী হয়েছে এবং দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে প্রাপ্য অর্ধেকের মুক্তি তার উভয় অর্ধেক ব্যাপ্ত হবে, সেহেতু যতটুকু প্রথম বক্তব্য দ্বারা মুক্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে, ততটুকু অকার্যকর থাকবে। (কেননা মুক্তকে পুনঃ মুক্তিদান সম্ভব নয়।) আর যতটুকু অমুক্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে, ততটুকু কার্যকর হবে। এভাবে তার অনুকূলে চতুর্থাংশের মুক্তি অর্জিত হবে। এবং সর্বোমোট তার তিন চতুর্থাংশের মুক্তি সম্পন্ন হবে।

তাছাড়া (দ্বিতীয় যুক্তি এই যে,) দ্বিতীয় বক্তব্যটি দ্বারা যদি তাকেই (অর্থাৎ অবস্থানকারী দাসকেই) উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে তাহলে তার অবশিষ্ট অর্ধেক আযাদ হবে আর যদি প্রবেশকারী (তৃতীয়) দাসকে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে তাহলে তার অবশিষ্ট অর্ধেক আযাদ হবে না। সুতরাং তা অর্ধাঅর্ধি হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা (অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক তথা) একচতুর্থাংশ আযাদ হবে। আর প্রথম বক্তব্য দ্বারা অর্ধেক আযাদ হবে।

প্রবেশকারী (তৃতীয়) দাসটি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দ্বিতীয় বক্তব্যটি যেহেতু তার ও অবস্থানকারী দাসের মাঝে আবর্তিত হয়েছে। আর অবস্থানকারী দাস এই বক্তব্য থেকে চতুর্থাংশ লাভ করেছে, সেহেতু (সমতার ভিত্তিতে) প্রবেশকারী দাসও চতুর্থাংশের আযাদী লাভ করবে।

শায়খায়ন বলেন, দ্বিতীয় বক্তব্যটি তাদের উভয়ের মাঝে আবর্তিত। আর আবর্তনের দাবী হলো অর্ধেকীকরণ। তবে অবস্থানকারী দাস যেহেতু প্রথম বক্তব্য দ্বারা অর্ধেক অংশের মুক্তির অধিকারী হয়েছে, সেহেতু তার ক্ষেত্রে এই বক্তব্যকে চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে প্রবেশকারী দাসের ইতিপূর্বে কোন প্রাপ্য হয়নি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে অর্ধেক সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ বলেন, আর যদি মনিবের এ বক্তব্য মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় হয়ে থাকে (আর এই তিনটি দাস ছাড়া অন্য কোন সম্পদ না থাকে) তাহলে এক তৃতীয়াংশকে এই হারে বণ্টন করা হবে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, আযাদকৃত হিসাবগুলো একত্র করা হবে। আর তা হলো সাত হিসসা সাহেবায়নের মতে। কেননা তিন চতুর্থাংশ নির্ধারণের প্রয়োজনে আমরা প্রত্যেক দাসকে চার হিসসায় ভাগ করবো। অতঃপর আমাদের বক্তব্য হবে এই যে, অবস্থানকারী দাসের তিন হিসসা আযাদ হবে এবং অপর দু'জনের প্রত্যেকের দুই হিসসা করে আযাদ হবে। এভাবে আযাদকৃত হিসসা সাত হবে।

আর মৃত্যুর শয্যায় থাকা অবস্থায় আযাদ করা অছিয়তের হুকুম রাখে। আর অছিয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র হলো একতৃতীয়াংশ। সুতরাং ওয়ারিছদের হিসসা তার দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। এ কারণে প্রত্যেক দাসকে সাত হিসসায় ভাগ করা হবে এবং সমগ্র সম্পদ হবে একুশভাগ। তখন অবস্থানকারী দাসের তিন হিসসা আযাদ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট চার হিসসার জন্য সে উপার্জনে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দু'জনের প্রত্যেকের দুই হিসসা আযাদ হবে এবং পাঁচ হিসসার জন্য উপার্জনে বাধ্য হবে। এভাবে চিন্তা করে যদি সকল হিসসা একত্র করো তাহলে এক তৃতীয়ংশ ও দুই তৃতীয়াংশ এর হিসাব সঠিক হয়ে যাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে প্রত্যেক দাসকে ছয় হিসসায় ভাগ করা হবে। কেননা তার মতে প্রবেশকারী (তৃতীয়) দাসের এক হিসসা আযাদ হবে। ফলে মুক্তিযোগ্য হিসসা একটি কম হবে এবং সমগ্র সম্পদ আঠারো হিসসায় বিভক্ত হবে। অবশিষ্ট ভাগ-বন্টন পূর্বে বর্ণিত অনুযায়ী।

এই সম্পূর্ণ বিষয়টি যদি তালাকের ক্ষেত্রে হয় আর স্ত্রী তিনভাগ অসহবাসকৃতা হয় এবং স্বামী তালাকের পাত্রী নির্দিষ্ট করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে নির্গমনকারিণীর মাহর থেকে চতুর্থাংশ রহিত হবে এবং অবস্থানকারিণীর মাহর থেকে তিন অষ্টমাংশ রহিত হবে। এবং প্রবেশকারিণীর মাহর থেকে এক অষ্টমাংশ রহিত হবে।

কেউ কেউ বলেন, এগুলো শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত। পক্ষান্তরে শায়খায়নের মতে প্রবেশকারীর এক চতুর্থাংশ মাহর রহিত হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, শায়খায়নের মতামতও ইমাম মুহাম্মদ -এর অনুরূপ। الزيادات এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে (মুক্তিদান ও তালাক প্রদানের) পার্থক্য এবং আনুষাংগিক মাসআলাসমূহ আমরা আলোচনা করেছি।

কেউ যদি তার দুই গোলামকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের একজন আযাদ, অতঃপর দু'জনের একজনকে বিক্রি করে কিংবা দু'জনের একজন মারা যায় কিংবা তাকে বলে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ, তাহলে অপরজন আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মৃত্যুর কারণে উক্ত গোলাম সত্তাগত দিক থেকেই মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। তদ্রূপ বিক্রির কারণে উক্ত বক্তব্য উচ্চারণকারীর দিক থেকে মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। তদ্রূপ মুদাব্বার ঘোষণার কারণে পূর্ণ মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। সুতরাং মুক্তি লাভের জন্য অপর জন নির্ধারিত হয়ে গেলো।

তাছাড়া বিক্রির মাধ্যমে মনিব মূল্য লাভের ইচ্ছা করেছে এবং মুদাব্বার ঘোষণা দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত গোলামের দ্বারা উপকৃত হওয়া অব্যাহত রাখায় ইচ্ছুক হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য দুটি অনিবার্য মুক্তির পরিপন্থী। সুতরাং (আচরণগত) প্রমাণের ভিত্তিতে অপরজন মুক্তিলাভের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেলো।

তদ্রূপ যদি দুই দাসীর একজনের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তাহলে উপরোক্ত দুই কারণে মুক্তি লাভের জন্য অপর দাসীটি নির্ধারিত হয়ে যাবে।

বিক্রয় শুদ্ধ হোক কিংবা অশুদ্ধ হোক এবং কব্জা সহ হোক কিংবা কব্জা ছাড়া হোক. তদ্রূপ শর্তহীন হোক কিংবা দুপক্ষের কারো অনুকূলে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের শর্তে হোক. তাতে সিদ্ধান্তের কোন পার্থক্য হবে না। কেননা জামে ছাগীর কিতাবে নিঃশর্ত ভাবে 'বিক্রয়' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তা-ই, যা আমরা বলেছি (অর্থাৎ বিক্রয় দ্বারা মূল্য লাভের ইচ্ছুক হয়েছে।)

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করাও বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে।

সমর্পণসহ দান করা ও সমর্পণ সহ ছদকা করা বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা (বিক্রয়ের ন্যায়) এটাও মালিকানা প্রদান।

তদ্রূপ যদি দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে যে, তোমাদের একজন তালাক, অতঃপর একজন মারা যায় (তাহলে অপর জন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।) এর কারণ আমরা বলে এসেছি। তেমনি যদি তাদের একজনের সাথে সহবাস করে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করবো।

যদি দুই দাসীকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের একজন আযাদ, অতঃপর দুজনের একজনের সাথে সহবাস করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অপরজন আযাদ হবেনা। আর ছাহেবায়ন বলেন, আযাদ হয়ে যাবে।

তাঁদের দলীল এই যে, মালিকানার অধিকার ছাড়া সহবাস বৈধ নয়, অথচ দুজনের একজন তো মুক্ত। সুতরাং সহবাসের মাধ্যমে সহবাসকৃতাকে সে মালিকানায় বহাল রেখেছে বলে গণ্য হবে। আর আযাদীর মাধ্যমে মালিকানা বিলুপ্তির জন্য অপর দাসীটি নির্ধারিত হয়ে যাবে; যেমন তালাকের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, (দুজনের) যার সাথেই সহবাস করা হবে তার মালিকানা বিদ্যমান থাকবে। কেননা মুক্তিদান তো হয়েছে অনির্ধারিত দাসীর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে সহবাস হয়েছে নির্ধারিত দাসীর সাথে। সুতরাং তার সাথে সহবাস (নীতিগতভাবে) বৈধ হবে (কেননা নির্ধারিত দাসীতে মুক্তিদান সাব্যস্ত হয়নি)। কাজেই এটাকে ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য করা যাবে না। একারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব মতে উভয়ের সাথে সহবাস করা বৈধ। তবে এই বৈধতার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করা হয় না।

অতঃপর বলা হবে যে,[১] ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে মুক্তি কার্যকর হবে না। কেননা মুক্তির বিষয়টি ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। কিংবা বলা হবে যে, মুক্তি অনির্ধারিত দাসীর মাঝে কার্যকর। সুতরাং এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে, যা অনির্ধারিত অবস্থাকে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সহবাস তো নির্ধারিত দাসীর সাথেই যুক্ত রয়েছে।

তালাকের বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ যেখানে এক স্ত্রীর সংগে সহবাস অন্য স্ত্রীর তালাকের জন্য প্রমাণ হবে।) কেননা বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই হলো সন্তান লাভ। সুতরাং সহবাস দ্বারা সন্তান লাভে চেষ্টা সহবাসকৃতা স্ত্রীর মালিকানা অব্যাহত রাখার ইচ্ছা প্রমাণ করে, যাতে সন্তান রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ নয়, বরং যৌন চাহিদা চরিতার্থ করণ। সুতরাং দাসীর সাথে সহবাস উক্ত দাসীর মালিকানা অব্যাহত রাখার ইচ্ছার প্রমাণ নয়।

যদি কেউ দাসীকে বলে, তুমি যে সন্তানটি প্রথম প্রসব করবে, তা যদি ছেলে হয় তাহলে তুমি আযাদ। অতঃপর সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করলো; কিন্তু কোন্‌টি প্রথম তা জানা গেলো না, তাহলে মাতার এবং মেয়ের অর্ধেক মুক্ত হবে। আর ছেলেটি পূর্ণ গোলাম থাকবে।

কেননা দাসী ও তার কন্যা সন্তান উভয়ে একটি অবস্থায় অর্থাৎ ছেলেটি প্রথমে জন্ম লাভ করার অবস্থায় আযাদ বিবেচিত হবে। দাসীর আযাদী হবে শর্তের অস্তিত্ব লাভের কারণে। আর কন্যা সন্তানটি আযাদী লাভ করবে মাতার অনুবর্তিনী হিসাবে। কেননা কন্যা প্রসবের সময় তো দাসীটি আযাদ।

আর অন্য অবস্থায়, অর্থাৎ প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসবের সময় শর্তের অনুপস্থিতির কারণে দাসত্ব বহাল থাকে। সুতরাং দাসী ও কন্যা উভয়ের অর্ধেক আযাদ হবে এবং বাকি অর্ধেকের জন্য উপার্জনে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে ছেলে সন্তানটি তো উভয় অবস্থাতেই দাস থাকছে, তাই সে পূর্ণ দাস থাকবে।

দাসী মাতা যদি দাবী করে যে, ছেলেটি প্রথমে জন্ম নিয়েছে আর মনিব তা অস্বীকার করে আর কন্যা সন্তানটি ছোট (অপ্রাপ্ত বয়স্কা) তাহলে কসম করার শর্তে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মনিব আযাদীর শর্ত অস্তিত্ব লাভের দাবী অস্বীকার করছে। মনিব যদি কসম করে তাহলে কেউ আযাদ হবে না। আর কসম করতে অস্বীকার করলে দাসী ও কন্যা আযাদ হবে। কেননা মাতার পক্ষ থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার আযাদীর দাবীটি যেহেতু কন্যার জন্য সম্পূর্ণত: কল্যাণজনক, সেহেতু তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে এবং (দাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে) উভয়ের আযাদী লাভের ব্যাপারে মনিবের কসম করতে অস্বীকৃতির বিষয়টি ধর্তব্য হবে। কাজেই উভয়েই আযাদ হয়ে যাবে।

১। একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন এই যে, মনিবের পক্ষ হতে উচ্চারিত মুক্তিদানের বক্তব্য কার্যকর হবে, নাকি হবে না। যদি কার্যকর না হয় তাহলে তো উচ্চারিত শব্দকে নিরর্থক করা হলো। আর যদি কার্যকর হয় তাহলে তো দাসীদ্বয়ের সাথে সহবাস বৈধ হতে পারে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জবাব এই যে, যেহেতু মুক্তিদানের বিষয়টি তার ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু তার পক্ষ হতে ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে মুক্তি কার্যকর হবে না। যেমন গৃহে প্রবেশের সংগে সম্পৃক্ত করে যদি বলে, তুমি যদি এই গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক, সে ক্ষেত্রে গৃহে প্রবেশের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

আর কন্যাটি যদি প্রাপ্ত বয়স্কা হয় আর সে নিজে কোন কিছু দাবী না করে আর মাসআলাটির স্বরূপও এই হয় (অর্থাৎ দাসী দাবী করে যে, ছেলেটি প্রথমে জন্মলাভ করেছে আর মনিব তা অস্বীকার করে) তাহলে কসমের ব্যাপারে মনিবের অস্বীকৃতির কারণে শুধু দাসী আযাদ হবে। কন্যা সন্তানটি আযাদ হবে না।

কেননা প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার ব্যাপারে মাতার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আর কসমের অস্বীকৃতির ধর্তব্যতা নির্ভর করে দাবীর উপর। সুতরাং মনিবের কসম করতে অস্বীকার করার বিষয়টি প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর যদি পুত্র সন্তানের প্রথম জন্ম লাভের দাবীটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা নিজেই করে থাকে আর মাতা নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে কসমের বিষয়ে মনিবের অস্বীকৃতির কারণে শুধু কন্যা আযাদ হয়ে যাবে, মাতা আযাদী লাভ করবে না।

যার কারণ আমরা উপরে বলেছি।

আর আমাদের আলোচ্য মাসা'আলায় মনিবকে কসম করানো হবে 'আমার জানা মতে' শব্দ দ্বারা। কেননা এটা হচ্ছে অন্যের কর্ম সম্পর্কে কসম।

মাসআলাটির অন্যান্য যে সকল সম্ভাব্য রূপ আমরা 'কেফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর হুকুম এই পরিমাণ আলোচনা দ্বারাই জানা যাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) জামে ছাগীর কিতাবে বলেন, দুজন লোক যদি এক লোকের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে যে, সে তার দুই গোলামের একটিকে আযাদ করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে এর সাক্ষী বাতিল। তবে অছিয়তের ক্ষেত্রে হলে তা বাতিল হবে না। এটি ইমাম মুহম্মদ মাবসূত কিতাবে গোলাম আযাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

আর যদি তারা দুজন সাক্ষ্যদান করে যে, সে তার স্ত্রীদের একজনকে তালাক প্রদান করেছে, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে , এবং স্বামীকে স্ত্রীদের একজনকে তালাক প্রদানে বাধ্য করা হবে।

এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, মুক্তিদানের ক্ষেত্রেও প্রদত্ত সাক্ষ্য তালাকের সাক্ষ্যের অনুরূপ।

এই মতপার্থক্যের মূল এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গোলামের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন ছাড়া গোলামের মুক্তিবিষয়ক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাহেবায়নের মতে তা গ্রহণযোগ্য।

আর দাসীর মুক্তিবিষয়ক সাক্ষ্য এবং স্ত্রীর তালাক বিষয়ক সাক্ষ্য সর্বসম্মতিক্রমেই দাবী উত্থাপন ছাড়াই গ্রহণযোগ্য। এই মাসআলাটি সুপরিচিত।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে গোলামের পক্ষ থেকে যখন দাবী উত্থাপনের শর্ত রয়েছে তখন জামে ছাগীর কিতাবে বর্ণিত মাস'আলায় তা পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং সাক্ষ্য প্রদানও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর ছাহেবায়নের মতে দাবী উত্থাপন যেহেতু শর্ত নয়, দাবীর অনুপস্থিতিতেও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে দাবীর অনুপস্থিতি সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেননা সেক্ষেত্রে তা শর্ত নয়।

যদি সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যে, সে তার দুই দাসীর একটিকে আযাদ করেছে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও দাসীর ক্ষেত্রে দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। কেননা দাসীর ক্ষেত্রে দাবী উত্থাপনের শর্ত না থাকার কারণ এই যে, তাতে যৌনাংগ হারাম হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ফলে তা তালাকের সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ রয়েছে। আর পূর্বে আমাদের উল্লেখিত বক্তব্য মতে ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট অনির্ধারিত মুক্তিদান যৌনাংগের হারাম হওয়া সাব্যস্ত করে না। সতরাং এটা দুটি গোলামের একটিকে আযাদ করা সম্পর্কিত সাক্ষ্যদানের মত হলো।

এসকল সিদ্ধান্ত হবে তখন যখন তার সুস্থতার অবস্থায় সাক্ষ্য দেয়া হবে যে, সে তার দুটি গোলামের একটিকে আযাদ করেছে। কিন্তু যদি তার মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় এই মর্মে দুই জন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তার দুটি গোলামের একটিকে আযাদ করেছে। কিংবা এই মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে, সে সুস্থ অবস্থায় বা মৃত্যুকালীন অসুস্থতার অবস্থায় দুটি গোলামের একটিকে মুদাব্বার বানিয়েছে, তবে সাক্ষ্যপ্রদান পর্বটি অসুস্থতার অবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা মুদাব্বার ঘোষণা যে অবস্থাতেই সম্পন্ন হোক তা অছিয়ত রূপেই সম্পন্ন হবে। তদ্রূপ মৃত্যুকালীন অসুস্থাতার সময় মুক্তিদানের অর্থ হলো অছিয়ত করা। আর অছিয়তের ক্ষেত্রে অছিয়তকারীই হলো (অছিয়ত বাস্তবায়নের) বাদীপক্ষ। আর সে তো নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং তার পক্ষ থেকে একজন স্থলবর্তী রয়েছে। আর সে হচ্ছে অছী বা ওয়ারিছ।

তাছাড়া (দ্বিতীয় কারণ এই যে,) মৃত্যুকালীন অসুস্থতার মুক্তিদান তার মৃত্যুর পর উভয় গোলামের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করবে, ফলে উভয়ের প্রত্যেক সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রতিপক্ষ হবে।

যদি সাক্ষী দুজন তার মৃত্যুর পর এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, লোকটি সুস্থতার অবস্থায় বলেছিলো যে, তোমাদের একজন আযাদ, তাহলে কারো কারো মতে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা এটা অছিয়ত নয়। আর কারো কারো মতে ব্যাপকতার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

باب الحلف بالعتق

অধ্যায় ঃ শর্তযুক্ত মুক্তি

অধ্যায় ঃ শর্তযুক্ত মুক্তি

কেউ যদি বলে, যখন আমি গৃহে প্রবেশ করবো তখন আমার সেদিনের মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আযাদ, অথচ শর্তারোপের সময় তার মালিকানাধীন কোন গোলাম ছিলো না, পরে সে একটি গোলাম খরিদ করলো এবং এরপর গৃহে প্রবেশ করলো, তাহলে ঐ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কেননা তার বক্তব্য 'সেদিন' এর অর্থ হলো গৃহে প্রবেশ করার দিন। সুতরাং গৃহে প্রবেশের সময় মালিকানা বিদ্যমান থাকাই হবে শর্ত : তদ্রূপ যদি শর্তারোপের দিন তার মালিকানায় কোন গোলাম থাকে আর সে সময় পর্যন্ত তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে গৃহে প্রবেশ করল তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। কারণ তা-ই যা আমরা বলেছি।

যদি শর্তারোপের সময় 'সেদিনের' শব্দটি ব্যবহার না করে তাহলে আযাদ হবে না। কেননা এ অবস্থায় আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম দ্বারা বর্তমান মালিকানা উদ্দেশ্য হবে। এবং পরিণতি হবে মালিকানাধীন গোলামের তাৎক্ষণিক মুক্তি। কিন্তু পরিণতির সাথে যখন শর্ত আরোপ করলো তখন শর্তের অস্তিত্ব লাভ পর্যন্ত তা বিলম্বিত হবে। সুতরাং গৃহে প্রবেশের সময় পর্যন্ত যদি তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকে তাহলে সে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু শর্তারোপের পর যে গোলাম খরিদ করবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যদি বলে, আমার যত পুরুষ দাস রয়েছে তা আযাদ; অথচ তার একটি গর্ভবতী দাসী ছিলো আর সে একটি পুত্র প্রসব করলো তাহলে ঐ পুত্র আযাদ হবে না।

যদি ছয়মাস বা তার পরে প্রসব করে তাহলে তো মুক্তি লাভ না করার বিষয়টি পরিষ্কার। কেননা উচ্চারিত শব্দটি বর্তমানবাচক। আর শর্তারোপের সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা শর্তারোপের পর সর্বনিম্ন গর্ভকাল বিদ্যমান রয়েছে। তদ্রূপ যদি ছয়মাসের কম সময়ে প্রসব করে। কেননা উচ্চারিত শব্দটি পূর্ণ মালিকানাধীন গোলামকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করবে। আর গর্ভস্থ সন্তান মায়ের অনুগামী হিসাবে মালিকানাধীন রয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে নয়।

তাছাড়া এক হিসাবে তা মায়ের অংশ বিশেষ; অথচ মালিকানাধীন গোলাম শব্দটি পূর্ণ সত্তাকে বোঝায়, কোন অংগকে বোঝায় না। এ কারণেই গর্ভস্থ সন্তানকে আলাদা বিক্রি করা যায় না। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করার সার্থকতা এই যে, যদি শুধু আমার মালিকানাধীন সমস্ত দাস বলে তাহলেও গর্ভবতী দাসীও অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং তার অনুগামীরূপে গর্ভস্থ সন্তান অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি বলে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত দাস আগামী-পরশু আযাদ। কিংবা যে সমস্ত ক্রীতদাসের আমি মালিক রয়েছি, সেগুলো আগামী পরশু আযাদ আর অবস্থা এই যে, বক্তব্য উচ্চারণকালে তার মালিকানাধীন একটি দাস ছিল, এরপর সে অন্য একটি দাস খরিদ করলো, এরপর পরশু-এর আগমন হলো; তাহলে বক্তব্য উচ্চারণের দিন তার মালিকানায় যে গোলাম ছিলো, তা আযাদ হবে। কেননা 'মালিক রয়েছি' কথাটা প্রকৃত বর্তমান জ্ঞাপক। সুতরাং উক্ত বক্তব্যের পরিণতি হবে আগামী পরশুর সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় বর্তমান মালিকানাধীন গোলামের মুক্তি। সুতরাং শর্তারোপের পর যা খরিদ করবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যদি বলে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আমার মৃত্যুর পর আযাদ কিংবা যত ক্রীতদাসের আমি মালিক, আমার মৃত্যুর পর তা আযাদ; তখন তার মালিকাধীন একটি গোলাম ছিল, অতঃপর সে আর একটি গোলাম ক্রয় করলো, তাহলে শর্তারোপের সময় যে গোলাম তার মালিকানায় ছিলো, সেটাই শুধু মুদাব্বার হবে। আর দ্বিতীয়টি মুদাব্বার হবে না। আর যদি লোকটি মারা যায় তাহলে উভয় গোলাম এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। নাওয়াদিরের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, শর্তারোপের দিন তার মালিকানায় যে গোলাম ছিলো, সেটাই শুধু আযাদ হবে। এরপরে যে গোলাম সে হাছিল করেছে, সেটা আযাদ হবে না। একই মত পার্থক্য হবে যদি বলে যে, আমি যখন মারা যাব তখন আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আযাদ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী উচ্চারিত শব্দটির প্রকৃত অর্থ বর্তমানের জন্য। সুতরাং (শর্তারোপের) পরবর্তীতে যে গোলামের মালিক হবে, সেটা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এজন্যই তো শর্তারোপকালে বিদ্যমান গোলামটি মুদাব্বার হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি হয় না।

ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, উচ্চারিত বক্তব্যটি যুগপৎ মুক্তিদান ও অছিয়ত করণের সমার্থক। এ কারণেই মুদাব্বারের মুক্তির বিষয়টি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের গন্ডীতে বিবেচিত হয়। আর অছিয়তের ক্ষেত্রে (অছিয়তকালীন) বর্তমান সময় এবং (মৃত্যুপর্যন্ত) প্রতীক্ষিত সময় উভয়টি বিবেচ্য হয়ে থাকে। লক্ষ্য করছ না যে, মালের অছিয়তের ক্ষেত্রে অছিয়তের পরে অর্জিত মালও অছিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং অমুকের সন্তানদের জন্য অছিয়ত করার ক্ষেত্রে অছিয়তের পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে মুক্তিদানের বিষয়টি বিশুদ্ধ হবে মালিকানার সংগে কিংবা মালিকানার কারণ (অর্থাৎ ক্রয়) এর সংগে সম্পৃক্ত অবস্থায়।

সুতরাং উচ্চারিত বক্তব্যটির অর্থ হলো মুক্তিদান। এই হিসাবে বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় (শর্তারোপকালে) মালিকানাধীন গোলামই শুধু অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং (অছিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে) উক্ত গোলামটি মুদাব্বার হবে। এবং তাকে বিক্রি জায়েয হবে না।

আর উচ্চারিত বক্তব্যটির মধ্যে অছিয়তের মর্ম রয়েছে। এ হিসাবে পরবর্তী প্রতীক্ষিত অবস্থা বিবেচনায় ঐ গোলামটিও অন্তর্ভুক্ত হবে, যাকে সে খরিদ করবে। আর প্রতীক্ষিত অবস্থাটি হলো মৃত্যুর অবস্থা। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পূর্বে মালিক হওয়ার অবস্থাটি সর্বতোভাবে ভবিষ্যত অবস্থায়। তাই তা উচ্চারিত শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর (মৃত্যুর সময় যেহেতু দ্বিতীয় গোলামটি মালিকানায় ছিল, সেহেতু) ধরা হবে যেন মৃত্যুর সময় সে বলেছে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আযাদ। কিংবা আমি যত গোলামের মালিক তা আযাদ।

আর যদি বলে 'আগামীকাল আযাদ' তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। কেননা এখানে কর্ম একটিই। আর তা হলো মুক্তিদানের কথা উচ্চারণ। অছিয়তের বক্তব্য তাতে নেই। আর (মালিকানা লাভের) অবস্থাটি হলো নিছক ভবিষ্যত কাল (যা উচ্চারিত পূর্ববর্তী বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তখন মালিকানা ছিলোনা) সুরতাং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হয়ে গেলো।

এ আপত্তি করা যাবে না যে, এখানে তো তোমরা উচ্চারিত বক্তব্যে বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় কালকে একত্র করেছ (অথচ একই শব্দে উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে না) কেননা জবাবে আমরা বলবো যে, দুটিকাল একত্র করেছি ঠিকই তবে ভিন্ন দু'টি কারণে। একটি হল মুক্তি দান এবং আর একটি অছিয়ত। আর একই কারণের ভিত্তিতে একত্র করা বৈধ নয়।

باب العتق على الجعل

অধ্যায় ঃ অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান

অধ্যায় ঃ অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান

কেউ যদি আপন গোলামকে মালের বিনিময়ে মুক্তি দান করে আর গোলাম তা কবুল করে তাহলে সে (কবুল করা মাত্র) আযাদ হয়ে যাবে।

যেমন মনিব বললো, এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তুমি আযাদ। কবুল করার দ্বারা আযাদ হয়ে যাওয়ার কারণ এই যে, এটা হচ্ছে সম্পদ এবং অসম্পদের বিনিময়। কেননা গোলাম নিজে তার মালিক নয়।[১] আর বিনিময়ের অনিবার্য দাবী হচ্ছে (প্রতিপক্ষের বিনিময়ের) দায় দেনা গ্রহণ করার সংগে সংগে চুক্তির হুকুম বা ফল সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া (আর তা হচ্ছে মুক্তি লাভ) যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়।

সুতরাং যখন সে কবুল করল তখন সে আযাদ হয়ে গেলো এবং শর্তকৃত অর্থ তার যিম্মায় ঋণ রূপে সাব্যস্ত হবে। তাই ঐ ঋণের ব্যাপারে কাউকে জামিনদার (কাফীল) নিযুক্ত করা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কিতাবাত ও চুক্তির বিনিময় এর বিপরীত। কেননা সেটা প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও গোলামের যিম্মায় সাব্যস্ত হচ্ছে। আর প্রতিবন্ধকটি হচ্ছে দাসত্ব[২] বিদ্যমান থাকা। কিতাবাত অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

(উল্লেখিত বক্তব্যের) মাল শব্দটি নিঃশর্ত ব্যবহার হওয়ার কারণে এতে সকল প্রকার মাল অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন নগদ অর্থ, দ্রব্যাদি আর পশু ,যদিও তা নির্ধারিত না করা হয়।[৩]

কেননা এটা হলো যা মাল নয়, তার সাথে মালের বিনিময়। সুতরাং এটা বিবাহের ও তালাকের এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার পর সমঝোতার সদৃশ। একই হুকুম হবে খাদ্য সামগ্রী এবং পাত্র পরিমাপিত ও বাটখারা পরিমাপিত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, যখন দ্রব্যটির প্রকার নির্ধারিত থাকে। গুণের অজ্ঞতা এক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয়। কেননা এটা মামুলি বিষয়।

ইমাম কুদূরী বলেন, আর যদি দাসের মুক্তিকে মাল পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করে তাহলে তা বৈধ হবে। এবং সে অনুমতিপ্রাপ্ত দাস রূপে গণ্য হবে।

যেমন মনিব বললো, তুমি যদি আমাকে এক হাযার দিরহাম পরিশোধ কর তাহলে তুমি আযাদ। আর বৈধ হওয়ার অর্থ এই যে, শর্তের অর্থ পরিশোধ করার পর সে আযাদ হবে। সে মুকাতাব হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা বক্তব্যটি মুক্তির বিষয়টিকে পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। যদিও তাতে পরিণতির পর্যায়ে বিনিময়ের মাঝে রয়েছে। বিষয়টি ইনশা আল্লাহ্ আমরা পরে আলোচনা করবো।

১। কেননা এর অর্থ তো হচ্ছে দাসত্ব রহিত করণ। সুতরাং এই চুক্তি দ্বারা তার হাতে সম্পদ লাভ হয়নি। বেশির চেয়ে বেশি বলা যায় যে, এর মাধ্যমে সে শরীয়ত স্বীকৃত একটি শক্তি (তথা স্বাধীনতা ও মুক্তি) লাভ করেছে, কিন্তু সেটা কোন সম্পদ নয় অবশ্যই।

২। কিয়াস বা যুক্তির দাবী এই যে, মনিব তার গোলামের উপর কোন আর্থিক দায় আরোপ করতে পারে না, কেননা দাসত্ব গুণ আর্থিক দায় গ্রহণের প্রতিবন্ধক। কিন্তু অনিবার্য প্রয়োজনে কিয়াসের বিপরীতে এটা আরোপ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলো দাসের মুক্তি অর্জন এবং মনিবের বিনিময় অর্জন। আর এই আর্থিক দায় যেহেতু কিয়াসের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং কাফালাত বা জামিনদারি পর্যন্ত গড়াবে না।

৩। অর্থাৎ ঘোড়া না গাধা এটা তো নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট তা নির্ধারণ করা হয়নি।

দাসটি অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ এই যে, মনিব অর্থ পরিশোধের দাবী করে দাসকে উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আর (উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে) তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করা; মজদূরিতে উদ্বুদ্ধ করা নয়। (কেননা এটা মনিবের জন্য লজ্জাকর) সুতরাং এটা তার পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদানের ইঙ্গিত বলে বিবেচিত হবে।

দাস যদি শর্তকৃত অর্থ উপস্থিত করে তাহলে বিচারক মনিবকে অর্থ গ্রহণে এবং দাসকে মুক্তিদানে বাধ্য করবেন।

এক্ষেত্রে এবং অন্যান্য হকের ক্ষেত্রে বাধ্যকরণের অর্থ হলো, অর্থ গ্রহণের সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়ে তাকে গ্রহণকারী রূপে ঘোষণা করবেন। (যদিও সে গ্রহণ না করে)।

ইমাম যুফার (র) বলেন, গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। এটাই কিয়াসের দাবী। কেননা এটা হলো শর্তায়নমূলক বক্তব্য।[১] কেননা এখানে শব্দগতভাবে মুক্তিদানকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত করা হয়েছে। এ কারণেই গোলামের গ্রহণ করার উপর বিষয়টি নির্ভর করেনা। আর তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আর শর্তযুক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে শর্ত সম্পাদনের ব্যাপারে বাধ্য করা যায় না। কেননা শর্তের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে অপর পক্ষের কোন হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয় না। কিতাবাত চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা হলো বিনিময়। আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনিময়রূপে সাব্যস্ত জিনিসটি আবশ্যকীয় হয়ে থাকে।

আমাদের দলীল এই যে, শব্দগত দিক বিবেচনায় এটা শর্তায়নকৃত বক্তব্য। কিন্তু উদ্দেশ্য বিবেচনায় এটা বিনিময়। কেননা মুক্তিদানকে অর্থ পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দাসকে অর্থ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করে আর মনিব তার বিপরীতে অর্থ লাভ করতে পারে। যেমন কিতাবাত চুক্তির ক্ষেত্রে। এ কারণেই এ ধরনের শব্দযোগে উচ্চারিত বক্তব্য তালাকের ক্ষেত্রে বিনিময়রূপে বিবেচ্য হয় এবং এভাবে প্রদত্ত তালাকটি বায়ন তালাক হয়ে থাকে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় শব্দগত দিক বিবেচনায় এবং মনিবের ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার লক্ষ্যে বক্তব্যটিকে আমরা শর্তায়ন বলে সাব্যস্ত করেছি। এ কারণেই গোলামটিকে বিক্রি করা মনিবের জন্য নিষিদ্ধ নয়। এবং গোলাম তার উপার্জিত মালের ব্যাপারে মনিবের চেয়ে অধিক হকদার নয়। আর (দাসীর ক্ষেত্রে) অর্থ পরিশোধের পূর্বে তার গর্ভে জন্ম লাভকারী সন্তানের উপর মুক্তিদান আরোপিত হবে না।

পক্ষান্তরে পরিণতি পর্বে অর্থ পরিশোধের সময় বক্তব্যটিকে আমরা বিনিময় বলে সাব্যস্ত করেছি, যাতে গোলামের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোধ করা যায়। এ কারণেই মনিবকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে। উভয় দিকের এই সমন্বয়ের উপরই ফিকহী মাসায়েল আহরণ আবর্তিত হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে বিনিময়ের শর্তে হেবা।[২]

আর গোলাম যদি আংশিক অর্থ পরিশোধ করে তাহলে মনিবকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে, তবে সমগ্র অর্থ পরিশোধের পূর্বে মুক্তিলাভ করবে না। কেননা শর্ত পূর্ণ হয়নি। যেমন

১। এ কারণেই এটা দাসের পক্ষ হতে গ্রহণ করার উপর নির্ভর করেনা। আর শর্তায়নমূলক বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শর্তকে অস্তিত্ব দানে বাধ্য করা যায় না। কেননা শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে গোলামের কোন হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয় না, বরং শর্তের অস্তিত্ব লাভের মাধ্যমে হক সাব্যস্ত হয়।

২। সূচনা পর্বে শব্দগত দিক বিবেচনায় এটা হেবা বা দান সাব্যস্ত করা হয়। তাই যৌথ ক্ষেত্রে তা জায়েয নয় এবং বক্তব্য প্রদানের মজলিসেই তা ফরয করা শর্ত। পক্ষান্তরে পরিণতি পর্বে এটা বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হয়। তাই হেবা করা তা প্রত্যাহার করতে পারে না এবং তাতে শোফা অধিকার সাব্যস্ত হয়।

মনিবের যদি আংশিক অর্থ রহিত আর গোলাম অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করে (তাহলে সমগ্র শর্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত গোলাম মুক্তি লাভ করবে না।)

আর যদি গোলাম শর্তযুক্ত বক্তব্য উচ্চারণের পূর্বে উপার্জিত এক হাযার দিরহাম পরিশোধ করে তাহলে মুক্তি লাভ করবে এবং পূর্ব উপার্জিত এক হাযার দিরহামের ব্যাপারে মনিব গোলামের কাছ থেকে তা পুনরায় উশুল করবে। কেননা সে তো এটার হকদার হয়ে আছে। পক্ষান্তরে যদি এটা পরবর্তীতে উপার্জন করে থাকে তাহলে মনিব গোলামের কাছে রুজু করতে পারবে না। কেননা ঐ অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সে মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

মনিব যদি বলে, 'যদি' পরিশোধ করো তাহলে পরিশোধের বিষয়টি মজলিশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। (পরিশোধ করার পরে তুমি আযাদ)। কেননা এ বক্তব্যের অর্থ হলো তাকে এখতিয়ার প্রদান করা। পক্ষান্তরে যদি বলে 'যখন তুমি পরিশোধ করবে', তাহলে মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে না। কেননা 'যখন' শব্দটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কেউ যদি তার গোলামকে বলে, আমার মৃত্যুর পর তুমি এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ, তাহলে প্রস্তাবটি গ্রহণের সময় হবে মৃত্যুর পর।

কেননা প্রস্তাবটিকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন বলা হলো, আগামীকাল তুমি এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত। পক্ষান্তরে যদি বলে, এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তুমি মুদাব্বার হবে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি বর্তমানের সাথে সীমাবদ্ধ হবে।

কেননা মুদাব্বার ঘোষণার বিষয়টি বর্তমানের সাথে যুক্ত। তবে দাসত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না।

মাশায়েখগণ বলেছেন, জামে ছাগীর কিতাবে বর্ণিত মাস'আলায় মনিবের পক্ষ থেকে গোলামটি আযাদ হবে না। যদিও মৃত্যুর পর সে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, যতক্ষণ না ওয়ারিছ তাকে মুক্তিদান করে। কেননা মৃত ব্যক্তি মুক্তিদানের অধিকারী নয়। এটাই সঠিক।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি এই শর্তে তার গোলামকে আযাদ করে যে, সে চার বছর তার খিদমত করবে। আর গোলাম তা গ্রহণ করে তবে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে সেই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করে তাহলে, ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র) এর মতে গোলামের নিজের মাল থেকে তার 'দাস সত্তার' মূল্য পরিশোধ্য। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার উপর চার বছরের খিদমতের মূল্য পরিশোধ্য হবে।

মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, মনিব নির্ধারিত সময়ের খিদমতকে মুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণের সাথে মুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হবে। আর প্রস্তাব গ্রহণ পাওয়া গেছে এবং তার উপর চার বছরের খিদমত অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) এটা বিনিময় হওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং বিষয়টি এক হাযার দিরহামের শর্তে মুক্তিদানের মত হলো।

অতঃপর গোলাম মারা গেল, তাই অন্য ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের ভিত্তিতে আলোচ্য মতপার্থক্য হয়েছে। আর তা এই যে, কেউ যদি তার গোলামের কাছে তার 'দাস সত্তাকে' নির্দিষ্ট একটি দাসীর বিনিময়ে বিক্রি করে অতঃপর (দাসীটিকে অর্পণের পূর্বে) দাসীটির কোন দাবীদার বের হয় কিংবা দাসীটি মারা যায়, তাহলে আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর

মতে মনিব তার গোলামের কাছ থেকে তার দাসসত্তার মূল্য উশুল করবে। আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে দাসীর মূল্য উশুল করবে। মাস'আলাটি সুপরিচিত। এর উপর ভিত্তির কারণ এই যে, মৃত্যুর কারণে বা দাবীদার বের হওয়ার কারণে দাসীটি অর্পণ করা যেমন অসম্ভব হয়ে গেছে, তেমনি দাসের মৃত্যুর কারণে খিদমত লাভ করা অসম্ভব হয়ে গেছে। মনিবের মৃত্যুতেও অনুরূপ হুকুম রয়েছে। সুতরাং এটা গোলামের মৃত্যুর সদৃশ হয়ে গেল।

কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমার যিম্মায় এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তোমার দাসীকে মুক্ত করো এই শর্তে যে, তাকে আমার কাছে বিবাহ দিবে। মনিব তাই করলো; কিন্তু দাসী প্রস্তাবককে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো, তাহলে মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রস্তাবকের উপর কোন কিছুই সাব্যস্ত হবে না।

কেননা কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমার পক্ষ থেকে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলামকে মুক্ত কর। আর লোকটি তাই করলো, তাহলে আদেশদাতার উপর কোন অর্থ সাব্যস্ত হবে না; বরং আদিষ্ট মনিবের পক্ষ থেকেই গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমার দায়িত্বে এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে তোমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করো আর লোকটি তাই করলো, তাহলে আদেশদাতার যিম্মায় এক হাযার দিরহাম সাব্যস্ত হবে।

কেননা তালাকের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের উপর বদল বা বিনিময়ের শর্ত আরোপ করা জায়েয রয়েছে, কিন্তু মুক্তিদানের ক্ষেত্রে জায়েয নয়। ইতিপূর্বে আমরা বিষয়টি প্রমাণিত করেছি।

কেউ যদি বলে, এক হাযার দিরহামের বিনিময়ে আমার পক্ষ থেকে তোমার দাসীকে মুক্তিদান কর আর মাস'আলাটি যথাপূর্ব হয় (অর্থাৎ বিবাহের শর্ত আরোপ করা হলো আর দাসীটি অস্বীকার করলো) **তাহলে উক্ত এক হাযার দিরহাম দাসীর মূল্য ও তার মাহরে মেছেলের মাঝে বণ্টিত হবে। আর মূল্যের বিপরীতে যে পরিমাণ দিরহাম সাব্যস্ত হবে, তা আদেশদাতা আদায় করবে। পক্ষান্তরে মাহরের বিপরীতে যা সাব্যস্ত হবে তা আদেশদাতা থেকে রহিত হয়ে যাবে।**

কেননা আদেশদাতা যখন 'আমার পক্ষ থেকে' বলেছে, তখন বক্তব্যের অনিবার্য দাবী হিসাবে তাতে ক্রয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন উসূলে ফিকাহ্ শাস্ত্রে বলা হয়েছে। বিষয়টি যখন অনুরূপ হল, তখন যেন আদেশদাতা এক হাযার দিরহামকে ক্রয়ের দিক থেকে দাসীর দাসসত্তার বিপরীতে এবং বিবাহের দিক থেকে তার সম্ভোগ অঙ্গের বিপরীতে সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এক হাযার দিরহাম উভয়ের বিপরীতে বন্টিত হবে এবং আদেশদাতার অনুকূলে সংরক্ষিত দাসসত্তার (বিপরীতে নির্ধারিত) অংশটুকু তার উপর সাব্যস্ত হবে। আর যে সম্ভোগ অংগ সমর্পিত হলো না, তার বিপরীতে নির্ধারিত অংশটুকু আদেশদাতা থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর দাসী যদি নিজে তার সাথে বিবাহ বসে যায় তাহলে কী হুকুম হবে তা ইমাম মুহম্মদ (র) উল্লেখ করেন নি। এর উত্তর এই যে, প্রথম মাস'আলায়[১] দাসীর মূল্যের বিপরীতে নির্ধারিত অংশটুকু রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাস'আলায় সেটা মনিবের প্রাপ্য হবে, আর মাহরে মেছেলের বিপরীতে যা নির্ধারিত হবে, তা উভয় ক্ষেত্রে মাহর রূপে দাসীর প্রাপ্য হবে।

১। অর্থাৎ 'আমার পক্ষ হতে' বলা হয়নি।

অধ্যায় ঃ মুদাব্বার ঘোষণা

মনিব যদি তার ক্রীতদাসকে বলে, আমি যখন মারা যাই তখন তুমি আযাদ, কিংবা যদি বলে, আমার পরে তুমি আযাদ, কিংবা যদি বলে, তুমি মুদাব্বার কিংবা তোমাকে মুদাব্বার ঘোষণা করলাম, তাহলে গোলামটি মুদাব্বার হয়ে যাবে।

কেননা এ শব্দগুলো মুদাব্বার বানানোর ব্যাপারে স্পষ্ট। কারণ, মুক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে তার পশ্চাতে। এরপর উক্ত গোলামকে বিক্রি করা কিংবা দান করা কিংবা অন্য কোনভাবে আপন মালিকানা থেকে বের করা জায়েয নয়, কিন্তু আযাদ করে দিতে পারে।

যেমন কিতাবাত চুক্তির ক্ষেত্রে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা জায়েয হবে। কেননা এটা হলো মুক্তিদানকে শর্তের সাথে সংযুক্তকরণ। সুতরাং অন্যান্য শর্তারোপের মত এবং শর্তযুক্ত মুদাব্বারের মত এখানেও বিক্রয় এবং দান নিষিদ্ধ হবে না।

তাছাড়া এই কারণে যে, মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ হলো অছিয়ত করা। আর অছিয়ত অছিয়তকারীকে বিক্রয় ও দান জাতীয় পদক্ষেপ থেকে বাধা দেয় না।

আমাদের দলিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المدبر لايباع ولايوهب ولايورث وهو حر من الثلث

মুদাব্বার গোলামকে বিক্রি করা যাবেনা এবং দান করা যাবে না এবং তার উপর উত্তরাধিকার প্রয়োগ করা যাবে না। বরং এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে সে আযাদ হবে।

তাছাড়া কারণ এই যে, মোদাব্বার ঘোষণাই হচ্ছে মুক্তিলাভের কারণ। কেননা মৃত্যুর পর মুক্তি সাব্যস্ত হচ্ছে আর এটা ছাড়া অন্য কোন কারণও নেই।

অতঃপর বক্তব্যটিকে উচ্চারণ কালেই কারণ রূপে সাব্যস্তকরণ উত্তম। কেননা উচ্চারণ কালেই বক্তব্যটি বিদ্যমান রয়েছে। মৃত্যুর পরে তা বিদ্যমান নেই।

তাছাড়া মৃত্যুর পর হচ্ছে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা বাতিল হওয়ার অবস্থা। সুতরাং বক্তব্যের কারণত্বকে যোগ্যতা বাতিল হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্ভব নয়। আর অন্য সকল শর্তায়নের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কারণ রোধকারী বিষয়টি শর্তের পূর্বেই বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু এটা হলো ইয়ামীন (বা প্রত্যক্ষ শর্তারোপ) আর ইয়ামীন হচ্ছে বধা দানকারী এবং বাধা দেওয়াই হচ্ছে ইয়ামীনের উদ্দেশ্য। তা তালাক ও মুক্তি বিরোধী। আর কারণকে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্ভব। কেননা তখন (তার প্রস্তাব উচ্চারণের) যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য হয়ে গেলো।

তাছাড়া মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ হলো অছিয়ত করা। আর অছিয়ত হলো বক্তব্য উচ্চারণের সময় স্থলবর্তীকরণ। যেমন উত্তরাধিকারের বিষয়টি।

আর মুক্তির কারণকে অকার্যকর করা জায়েয নয়। অথচ বিক্রয় ও অনুরূপ অন্যান্য পদক্ষেপগুলোতে তাই হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিবের অধিকার রয়েছে মুদাব্বার থেকে খিদমত গ্রহণ করার এবং পারিশ্রমিক নিযুক্ত করার; আর যদি দাসী হয় তাহলে তাকে সম্ভোগ করার এবং তাকে বিবাহ দেওয়ারও তার অধিকার রয়েছে।

কেননা তার মধ্যে মনিবের অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্ত রয়েছে। আর মালিকানা দ্বারাই এ সকল ক্রিয়া কর্মের অধিকার অর্জিত হয়ে থাকে।

আর মনিব যদি মারা যায় তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে উক্ত মুদাব্বার আযাদ হয়ে যাবে। প্রমাণ হলো আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিস।

তাছাড়া এই কারণে যে, মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ অছিয়ত করা। কেননা এটা হচ্ছে মৃত্যুর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি স্বেচ্ছদান। আর ঘোষণার হুকুম বর্তমানে সাব্যস্ত নয়। সুতরাং এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যেই তা কার্যকর হবে। এমন কি যদি মুদাব্বার ছাড়া তার অন্য কোন মাল না থাকে তাহলে মুদাব্বার তার দুই তৃতীয়াংশ মূল্যের ব্যাপারে উপার্জনে বাধ্য হবে।

আর যদি মনিবের যিম্মায় কোন ঋণ থাকে তাহলে মুদাব্বার তার সমগ্র মূল্যের ব্যাপারেই উপার্জনে বাধ্য হবে। কেননা ঋণ অছিয়তের উপর অগ্রাধিকার রাখে। আর মুক্তির অছিয়াত ভংগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

মুদাব্বার দাসীর সন্তানও মুদাব্বার হবে।

এ ব্যাপারে সাহাবা কেরামের ইজমা বর্ণিত হয়েছে। **যদি মুদাব্বার ঘোষণাকে তার মৃত্যুর বিশেষ কোন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে যেমন বললো, যদি আমি এই অসুস্থতার মধ্যে মারা যাই কিংবা এই সফরে মারা যাই কিংবা অমুক রোগে মারা যাই, এধরনের বক্তব্যে সে মুদাব্বার হবে না। সুতরাং তাকে বিক্রি করাও জায়েয হবে।**

কেননা ঐ গুণটির অস্তিত্বের ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কারণে বর্তমানে মুক্তির কারণ সাব্যস্ত হয়নি। সাধারণ মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে তার মুক্তির বিষয়টি নিঃশর্ত মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর তা ঘটা অনিবার্য।

আর মনিব যদি উল্লেখকৃত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে মুক্ত হয়ে যাবে, যেমন সাধারণ মুদাব্বার মুক্ত হয়। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে মুক্ত হবে। কেননা মনিবের জীবনের সর্বশেষ অংশে উল্লেখকৃত ঐ অবস্থাটি সাব্যস্ত হওয়ার কারণে মুদাব্বার হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই তা এক তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে।

শর্তযুক্ত মুদাব্বার ঘোষণার একটি ছুরত হচ্ছে এ কথা বলা, যদি এক বছর বা দশ বছরের মধ্যে আমি মারা যাই।

এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ দ্বিধা থাকায়)। পক্ষান্তরে যদি সে একশ বছরের কথা বলে, আর অবস্থা এই হয় যে, তার মত মানুষ সাধারণতঃ এতদিন বাঁচবে না। তাহলে হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা এটাও অবশ্যম্ভাবী ঘটার মত ব্যাপার।

باب الاستيلاد

অধ্যায় ঃ দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া

অধ্যায় ঃ দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া

দাসী যদি তার মনিবের ঔরসে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে মনিবের উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মাতা) হয়ে যাবে। আর তাকে বিক্রয় করা কিংবা অন্যের মালিকানায় প্রদান করা জায়েয হবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أعتقها ولدها। তার সন্তান তাকে আযাদ করে দিয়েছে।

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আযাদীর খবর দান করেছেন। সুতরাং মুক্তির কতিপয় অনিবার্য ফল সাব্যস্ত হবে, যেমন বিক্রয়ের নিষিদ্ধতা।

তাছাড়া এই কারণে যে, সন্তানের মাধ্যমে সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা বীর্য ও ডিম্ব এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে, তা পৃথকীকরণ সম্ভব নয়; যেমন বিবাহজনিত নিষিদ্ধতা প্রসংগে বলা হয়েছে। তবে সন্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অংশত্ব তত্ত্বগতভাবে বিদ্যমান থাকে। বস্তুগতভাবে বিদ্যমান থাকে না। ফলে কারণটি দুর্বল হয়ে যায় এবং মুক্তির হুকুমটি সৃষ্ট পরবর্তী সময় পর্যন্ত মুলতবী অবস্থায় সাব্যস্ত হয়।

আর তত্ত্বগতভাবে অংশত্ব বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নসব বা পরিচয়ের বিবেচনায় হয়ে থাকে। আর বংশ পরিচয় পুরুষদের দিক থেকে হয়। সুতরাং মুক্তিলাভের বিষয়টিও পুরুষদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে; স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে নয়। তাই স্বাধীন নারী যদি তার স্বামীর মালিকানা লাভ করে, আর অবস্থা এই যে, সে তার ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী মুক্তি লাভ করবে না।

আর (মৃত্যুর মেয়াদে) মুলতবীকৃত মুক্তির সাব্যস্ততা বর্তমানকালে মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং তাকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হবে এবং মুক্তিদান ছাড়া অন্য কোনভাবে তাকে বর্তমানে নিজ মালিকানা থেকে বের করা নিষিদ্ধ হবে। আর তা মৃত্যুর পর তার মুক্তি ওয়াজিব করবে। আর তেমনি দাসী তারই উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে, যদি তার অংশবিশেষ মনিবের মালিকানাধীন থাকে।

কেননা সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি বিভাজন গ্রহণ করে না। কারণ এটা বংশ পরিচয়ের অনুবর্তী। সুতরাং সেটা মূলের সাথেই বিবেচ্য হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, মানব তাকে সম্ভোগ করতে পারবে, তার খিদমত করতে পারবে, পরিশ্রমের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে এবং বিবাহদান করতে পারবে।

কেননা তার মাঝে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সে মুদারব্বার দাসীর সদৃশ হয়ে গেলো।

মনিবের স্বীকৃতি ছাড়া তার সাথে দাসীর সন্তানটির বংশ সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মনিব পিতৃত্ব দাবী না করলেও সন্তানটির বংশ তার থেকে সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা বিবাহ বন্ধন দ্বারাই যখন বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন সহবাস দ্বারা বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হওয়া আরো স্বাভাবিক। কেননা এটা তো সন্তান জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ।

আমাদের দলীল এই যে, দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন নয়, বরং যৌন চাহিদা পূরণ। কেননা সন্তান উৎপাদনের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রয়েছে। (আর তা হলো দাসীর অর্থমূল্য রহিত হওয়া কিংবা হ্রাস পাওয়া) সুতরাং মনিবের পক্ষ থেকে দাবী আবশ্যক; যেমন সহবাস ব্যতীত দাসীর মালিকানার ক্ষেত্রে।

বিবাহ বন্ধনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্যরূপে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি নির্ধারিত। সুতরাং দাবীর কোন প্রয়োজন নেই।

এরপর যদি দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করে তখন মনিবের স্বীকারোক্তি ছাড়াই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

অর্থাৎ মনিবের পক্ষ থেকে প্রথম সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেয়ার পর।

কেননা প্রথম সন্তানটির বংশ পরিচয় দাবী করার পর ঐ দাসী দ্বারা সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ তারই শয্যাশায়িনী গণ্য হবে। যেমন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা নারীর ক্ষেত্রে।

তবে মনিব যদি দ্বিতীয় সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে তার অস্বীকৃতির কারণে তার বংশ সম্পর্ক নাকচ হয়ে যাবে।

কেননা উম্মে ওয়ালাদের 'শয্যা সম্পর্ক' দুর্বল, এ কারণেই মনিব অন্যত্র বিবাহদানের মাধ্যমে তার শয্যা হস্তান্তর করতে পারে।

বিবাহিতা স্ত্রীর বিষয়টির ভিন্ন। সেখানে লি'আন বা 'কসম বিনিময়' ছাড়া শুধু অস্বীকৃতির দ্বারা সন্তানের বংশ সম্পর্ক নাকচ হয় না। কেননা স্ত্রীর শয্যা সম্পর্ক সুদৃঢ়। এ কারণেই স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ দানের মাধ্যমে নিজ শয্যা বাতিল করতে পারে না।

এই যে সিদ্ধান্ত আমরা উল্লেখ করলাম, এটা হলো আইনগত বিধান। পক্ষান্তরে দেয়ানাত বা হাক্কুল্লাহ্‌র দাবী এই যে, যদি মনিব তার সাথে সহবাস করে থাকে আর তার সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা করে থাকে এবং আযল না করে থাকে তাহলে সন্তানের সম্পর্ক দাবী করা ও স্বীকার করে নেওয়া তার জন্য আবশ্যক। কেননা দৃশ্যত: সন্তান তার ঔরসেই জন্মলাভ করেছে।

পক্ষান্তরে যদি আযল করে থাকে কিংবা তার সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা না করে থাকে তাহলে তার জন্য সন্তানের সম্পর্ক অস্বীকার করার অবকাশ রয়েছে। কেননা এই বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে আরেকটি বাহ্যিক অবস্থা রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এ রূপই বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে আলাদা আলাদা দু'টি বর্ণনা রয়েছে। কিফায়াতল মুনতাহী কিতাবে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

আর মনিব যদি তাকে বিবাহ দেয় এবং সে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে সন্তান তার মায়ের অনুবর্তী হবে।

কেননা স্বাধীনতার অধিকার সন্তানের মাঝেও সংক্রমিত হয়। যেমন, মোদাব্বার ঘোষণার ক্ষেত্রে। এ কারণেই তো স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান স্বাধীন হয় এবং দাসীর সন্তান দাস হয়।

আর বংশ সম্পর্ক স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে।

কেননা শয্যা অধিকার তার। যদিও বিবাহটি ফাসিদ হয়ে থাকে। কেননা বিধানের ক্ষেত্রে নিকাহে ফাসিদ বিশুদ্ধ বিবাহের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে।

আর যদি মনিব সন্তানটির সম্পর্ক দাবী করে তাহলে তার থেকে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। কেননা সন্তাটি অন্যজন থেকে সুসাব্যস্ত বংশ সম্পর্কের অধিকারী। আর সন্তানটি স্বাধীন হবে এবং মনিবের স্বীকৃতির কারণে তার মাতা মনিবের উম্মে ওয়ালাদ হবে।

আর মনিব যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন উম্মে ওয়ালাদ তার সমগ্র সম্পদ থেকেই আযাদ হয়ে যাবে।

এর দলীল হল সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত হাদীস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে ওয়ালাদগণের মুক্তির ফায়সালা দান করেছেন। এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের বিক্রি না করার এবং তাদের মুক্তির বিষয়টিকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গণ্য না করার আদেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, সন্তান লাভ হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। সুতরাং তা ঋণ পরিশোধের এবং ওয়ারিছদের হকের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। যেমন কাফন দাফনের বিষয়টি।

মোদাব্বার ঘোষণার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ হল অছিয়ত এমন ব্যাপারে, যা তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত।

মনিবের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে পাওনাদারদের অনুকূলে উপার্জন করা উম্মে ওয়ালাদের উপর ওয়াজিব নয়।

প্রমাণ হলো আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস।[১]

তাছাড়া এই কারণে যে, উম্মে ওয়ালাদ অর্থমূল্য সম্পন্ন মাল নয়। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে গছবের কারণে উম্মে ওয়ালাদের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না।[২] সুতরাং

১। বর্ণিত হাদীস দ্বারা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের হাদীস উদ্দেশ্য। প্রমাণের ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসে যখন বলা হয়েছে যে, ঋণের কারণে উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা যাবেনা, তখন প্রকারান্তরে তা উম্মে ওয়ালাদের অর্থমূল্য রহিত হওয়া প্রমাণ করে। আর যখন অর্থমূল্য রহিত হলো তখন তার উপর উপার্জনে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক হতে পারে না।

২। অর্থাৎ কোন লোক যদি উম্মে ওয়ালাদকে জবর দখল করে নিয়ে যায় আর জবরদখলকারীর দখলে থাকা অবস্থায় উম্মে ওয়ালাদের মৃত্যু হয়, তাহলে উম্মে ওয়ালাদের অর্থমূল্য ক্ষতিপূরণ রূপে জবরদখলকারীর উপর সাব্যস্ত হবে না।

উম্মে ওয়ালাদের সাথে পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হবে না, যেমন কেছাছের ক্ষেত্রে[1]। মোদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মোদাব্বার হচ্ছে অর্থমূল্য সম্পন্ন মাল।

খৃস্টান মনিবের উম্মে ওয়ালাদ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে নিজের অর্থমূল্য পরিশোধের জন্য তার উপর উপার্জন ওয়াজিব হবে।

আর সে কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ দাসীর সমপর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন, তৎক্ষণাৎই আযাদ হয়ে যাবে, আর উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ তার যিম্মায় ঋণরূপে সাব্যস্ত হবে।

আর এই মতপার্থক্য ঐ ক্ষেত্রেও রয়েছে, যখন মনিবের সামনে ইসলাম পেশ করা হয়। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ অস্বীকার করে।

পক্ষান্তরে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উম্মে ওয়ালাদ নিজের অবস্থায় বহাল থাকবে।

ইমাম যুফার (র)-এর দলীল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তার থেকে অপমাণতা দূর করা অপরিহার্য। আর সেটা সম্ভব বিক্রির মাধ্যমে কিংবা আযাদ করার মাধ্যমে। উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে বিক্রির অবকাশ যেহেতু নেই সেহেতু আযাদ করাই নির্ধারিত।

আমাদের দলীল এই যে, তাকে কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ দাসীর সমপর্যায়ভুক্ত করার মধ্যেই উভয় পক্ষের কল্যাণ রয়েছে। কেননা কর্মক্ষমতার দিক থেকে স্বাধীন হওয়ার কারণে তার অপমানতা দূর হয়ে গেলো। আবার স্বাধীনতার মর্যদা লাভের জন্য উপার্জনে বাধ্য হওয়ার মাধ্যমে যিম্মীর ক্ষতিগ্রস্ততা দূরীভূত হলো। সুতরাং যিম্মি তার মালিকানার বদল গ্রহণ করবে। আর যদি সে অর্থহীন অবস্থায় আযাদ হয় তাহলে (উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে যাওয়ার কারণে) উপার্জনের ব্যাপারে গড়িমসি করতে পারে।

আর খৃস্টান মনিব তো উম্মে ওয়ালাদের অর্থমূল্য সম্পন্ন হওয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং তাকে তার বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেয়া হবে।

তাছাড়া উম্মে ওয়ালাদের সম্পদগত দিকটি যদিও অর্থমূল্য সম্পন্ন নয়; কিন্তু তা সম্মান যোগ্য ও মূল্যবান অবশ্যই। আর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। যৌথ কিছাছের ক্ষেত্রে যেমন একজন হকদার যদি মাফ করে দেয় তাহলে অন্য হকদারদের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। **আর তার খৃস্টান মনিব যদি মারা যায় তাহলে উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ ছাড়াই সে 'আযাদ' হয়ে যাবে।**

কেননা সে উম্মে ওয়ালাদ। আর মনিবের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণকারিণী উম্মে ওয়ালাদ যদি উপার্জনের ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে তাকে পুর্ণ দাসীর অবস্থায় ফেরত দেয়া হবে না। কেননা তাকে পুর্ণ দাসীর অবস্থায় ফেরত দেয়া হলে সে কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ দাসীর অবস্থায় ফেরত যাবে। কেননা কিতাবাত চুক্তির অনিবার্য কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

১। অর্থাৎ যার অনুকূলে কিছাছ ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে যার উপর কিছাছ ওয়াজিব হয়েছে, সেই কিছাছের বিনিময়ে পাওনাদাররা তার কাছ থেকে তাদের পাওনা ঋণ উশুল করার অধিকার পাবে না।

কেউ যদি বিবাহের মাধ্যমে অন্যের দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে অতঃপর তার মালিকানা লাভ করে, তাহলে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না।

আর যদি মালিকানার মাধ্যমে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে অতঃপর দাসীর অসৎ দাবীদার বের হয়, পরে মনিব তার মালিকানা লাভ করে, তাহলে আমাদের মতে সে তার উম্মে ওয়লাদ হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এর দুটি মত রয়েছে। আর এ সন্তানটি হলো ধোকাগ্রস্ত[১] লোকের সন্তান।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, অন্যের দাসীটি একটি দাস সন্তানে অন্তসত্ত্বা হয়েছে। সুতরাং সে গর্ভ সঞ্চারকারীর উম্মে ওয়ালাদ হবে না। যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে যদি অন্তসত্ত্বা হয়, অতঃপর ব্যভিচারী ঐ দাসীর মালিকানা লাভ করে।

এর কারণ এই যে, উম্মে ওয়ালাদ হওয়া যায় স্বাধীন সন্তানের মাধ্যমে অন্তসত্ত্বা হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা ঐ অবস্থায় সে তার মাতার অংশ। আর অংশ সমগ্রের বিপরীত হতে পারে না।[২]

আমাদের দলীল এই যে, ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, অংশত্বই হলো কারণ। আর পিতা ও মাতা উভয়ের মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হয় একটি সন্তান উভয়ের প্রত্যেকের সাথে (সৃষ্টিগত উপাদানের মাধ্যমে) পূর্ণভাবে সম্পৃক্তি দ্বারা। আর (এখানে বিবাহের মাধ্যমে) নসব ও বংশ পরিচয় সাব্যস্ত রয়েছে। সুতরাং এই সংযোগ মাধ্যমে অংশত্বও সাব্যস্ত হবে। ব্যভিচারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে ব্যভিচারীর সাথে সন্তানের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না।

আর ব্যভিচারী যদি সন্তানটির মালিক হয় তাহলে সন্তানটি তার প্রতিকূলে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ এই যে, সন্তানটি বংশ সম্পর্কের মাধ্যম ছাড়া প্রকৃতই তার অংশ। এর উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি যিনার মাধ্যমে জন্মলাভকারী তার ভাইকে খরিদ করলো, এমতাবস্থায় তার ভাইটি তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে না। কেননা ভাইটি তো তার সাথে সম্পৃক্ত হবে পিতার সাথে নসবের সম্পৃক্তির মাধ্যমে; আর তা এখানে সাব্যস্ত নয়।

যদি আপন পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর দাসী সন্তান প্রসব করে আর সহবাসকারী সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে, তাহলে তার সাথে সন্তানটির বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর সে সহবাসকারীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর দাসীটির মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে দাসীর মাহর এবং দাসীর সন্তানের মূল্য তার উপর সাব্যস্ত হবে না।

১। যে ব্যক্তি মালিকানার বা বিবাহের ভিত্তিতে সহবাস করে এবং দাসী সন্তান প্রসব করে, পরে তার দাবীদার বের হয় ঐ ব্যক্তিকে مغرور বা ধোকাগ্রস্ত বলে। ঐ সন্তান মোকাদ্দমার দিনের মূল্যে আযাদ হয়ে যাবে।

২। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। কেননা ঐ অবস্থায় মাতা হচ্ছে তার মনিবের দাসী। সুতরাং সন্তান যদি স্বাধীন অবস্থায় সম্পৃক্ত হয় তাহলে অংশ সমগ্রের বিপরীত হয়ে যায়।

এই কিতাবের বিবাহ অধ্যায়ে মাসা'আলাটি আমরা প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করেছি।

সন্তানটির মূল্যের যামীন না হওয়ার কারণ এই যে, মূল স্বাধীন অবস্থায় সে গর্ভে সঞ্চারিত হয়েছে। কেননা সন্তান উৎপাদনের পূর্ববর্তী সময়ের সাথে মালিকানা সম্পৃক্ত হবে।

পিতার পিতা (দাদা) যদি বান্দীর সাথে পিতার বর্তমানে সহবাস করে তাহলে তার সঙ্গে বংশ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা পিতার বর্তমানে দাদার অভিভাবকত্ব নেই। **আর পিতা যদি মৃত হয় তাহলে দাদা থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে, যেমন পিতা থেকে বংশ সাব্যস্ত হয়।**

কেননা পিতার অবর্তমানে দাদার অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়। আর পিতার কাফের হওয়া এবং গোলাম হওয়া তার মৃত্যুর সমতুল্য। কেননা এগুলো অভিভাবকত্ব বিচ্ছিন্ন করে।

আর দাসী যদি দুইজনের শরীকানাধীন হয় আর সে সন্তান প্রসব করে এবং দু'জনের একজন পিতৃ সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে তাহলে তার থেকে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

কেননা পিতৃত্ব দাবীকারী মালিকানার সাথে সংযুক্তির কারণে সন্তানটির অর্ধেক অংশে যখন বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হলো তখন অবশিষ্ট অংশেও অনিবার্যভাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা বংশ পরিচয়ের কারণ তথা গর্ভসঞ্চার বিভাজ্য হয় না। কেননা একটি সন্তান মাতৃগর্ভে দুই বীর্য দ্বারা সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং বংশ পরিচয় বিভাজ্য হতে পারে না।

আর এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে।

কেননা সাহেবায়নের মতে উম্মে ওয়ালাদ হওয়া বিভাজিত হয় না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে দাবীকারীর অংশটি উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অতঃপর শরীকদারের অংশটির সে মালিক হয়ে যাবে। কেননা সেটা মালিকানার উপযুক্ত। আর দাবীকারী দাসীর অর্ধেক মাহরের জন্য দায়ী হবে। কেননা সে শরীকানাভুক্ত দাসীর সাথে সহবাস করেছে। ফলে সন্তান উৎপাদনের অনিবার্য হুকুম রূপে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এবং সহবাসের পর বর্তাবে। অপর শরীকদারের অংশের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে পিতা যদি তার পুত্রের দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, সেখানে সন্তান উৎপাদনের অনিবার্য শর্তরূপে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মালিকানা সন্তান উৎপাদন থেকে অগ্রবর্তী হবে। এভাবে পিতা নিজস্ব মালিকানায় সহবাসকারী হবে।

আর দাবীকারী দাসীর সন্তানের মূল্যের যামীন হবে না।

কেননা গর্ভসঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় সন্তানের বংশ সম্পর্ক দাবীকারী থেকে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সন্তানের গর্ভসঞ্চার কোন ভাবেই শরীকদারের মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি।

আর উভয়ে একসাথে যদি সন্তানের দাবী করে তাহলে উভয়ের সাথেই বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

অর্থাৎ দাসী যদি উভয়ের মালিকানায় গর্ভবতী হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা আমরা যেহেতু নিশ্চিত জানি যে, দুই বীর্য দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হয় না। সেহেতু দুই ব্যক্তি থেকে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবো। এ ঘটনা সত্য যে, উসামা (রা) এর পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়েছিলেন।

আমাদের দলীল হলো, এই ধরণের ঘটনায় কাযী শোরাইহের উদ্দেশ্যে লিখিত হযরত ওমর (রা) এর ফরমান। (তিনি বলেছেন) এরা দু'জন বিষয়টিকে ঘুলিয়ে ফেলেছে। তাই তুমিও উভয়ের ব্যাপারে বিষয়টিকে ঘুলিয়ে দাও। তারা যদি বিষয়টাকে পরিস্কার করতো তাহলে তাদের জন্যও তা পরিস্কার করে দেয়া হতো। সে উভয়ের পুত্র হবে এবং উভয়ের ওয়ারিছ হবে। আর উভয়ে তার ওয়ারিছ হবে। পরবর্তীতে দু'জনের যে জীবদ্দশায় থাকবে, সে তারই পুত্র হবে,

لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لها وهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما -

এ সিদ্ধান্ত ছাহাবা কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছিলো। হযরত আলী (রা) থেকেও এরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, পিতৃত্বের অধিকার লাভের কারণ তথা মালিকানার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। সুতরাং উভয়েই পিতৃত্বের অধিকারে সমান হবে। আর বংশ সম্পর্ক যদিও বিভাজ্য নয় কিন্তু তার সাথে এমন সকল বিধান সংশ্লিষ্ট রয়েছে, যা বিভাজনযোগ্য।

সুতরাং যা বিভাজনযোগ্য তা বিভাজনের ভিত্তিতে উভয়ের জন্যও সাব্যস্ত হবে। আর যা বিভাজন যোগ্য নয়, তা উভয়ের প্রত্যেকের স্বপক্ষে এমনভাবে 'পূর্ণরূপে' সাব্যস্ত হবে, যেন তার সাথে অন্য কেউ নেই। তবে যদি দুই শরীকের একজন অপরজনের পিতা হয় কিংবা দু'জনের একজন যদি মুসলমান হয় আর অপরজন যিম্মী হয় (তাহলে পিতা কিংবা মুসলমান অগ্রাধিকার লাভ করবে)। কেননা মুসলমানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কারণরূপে ইসলাম বিদ্যমান রয়েছে। আর পিতার পক্ষে অগ্রাধিকারের কারণ রূপে পুত্রের অংশের পিতার স্বীকৃত অধিকার বিদ্যমান রয়েছে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দ প্রকাশের যে কথা বর্ণিত রয়েছে, তার কারণ এই যে, কাফিররা হযরত উসমান (রা)-এর বংশ সম্পর্কে অভিযোগ করতো। পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্য ছিলো তাদের অভিযোগ খন্ডনকারী, তাই তিনি তার মন্তব্যে আনন্দিত হয়েছিলেন।

আর দাসীটি উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা সন্তানের নিজ নিজ অংশে উভয় শরীকদারের দাবী সঠিক। সুতরাং প্রত্যেকের শরীকানাভুক্ত দাসীর অংশটি তার সন্তানের অনুবর্তী হিসাবে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

আর তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মাহর সাব্যস্ত হবে এবং তা ঐ অর্ধেকের বিনিময়ে কাটা যাবে, যার অনুকূলে অপর জনের উপর সাব্যস্ত হয়েছে। আর এই পুত্র উভয়ের প্রত্যেকের কাছ থেকে পূর্ণ পুত্রের মীরাছ লাভ করবে।

কেননা প্রত্যেকে তার অনুকূলে পূর্ণ মীরাছ লাভের স্বীকৃতি দান করেছে। প্রত্যেকের স্বীকৃতি তার নিজের বিপক্ষে প্রমাণ রূপে গণ্য।

আর উভয় শরীকদার ঐ পুত্র থেকে একজন পিতার মীরাছ (ভাগাভাগি করে) **লাভ করবে**। কেননা পিতৃত্বের অধিকার লাভের কারণের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। যেমন (কোন অজ্ঞাত পরিচয় পুত্রের পিতৃত্বের দাবীর সপক্ষে) উভয়ের সাক্ষী পেশ করলে উভয়কে সমান ভাবে অধিকার প্রদান করা হয়।

আর মনিব যদি তার মুকাতাব গোলামের দাসীর সাথে সহবাস করে আর দাসী কোন সন্তান প্রসব করে এবং মনিব ঐ সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে এমতাবস্থায় মুকাতাব যদি তার সত্যতা স্বীকার করে তাহলে মনিবের সাথে সন্তানটির বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি পুত্রের দাসীর সন্তানের পিতৃত্ব দাবীকারী। পিতার উপর কিয়াস করে এখানেও মুকাতাবের সত্যায়নের বিষয়টি বিবেচনা করেন না।

যাহিরে রেওয়াতের কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান— মনিব তার মুকাতাব গোলামের উপার্জিত মালের উপর তাসাররুফের অধিকারী নয়। এ কারণেই (প্রয়োজনের সময়) সে নিজেই তার মালিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। পক্ষান্তরে পিতা (প্রয়োজনের সময়) নিজেই মালিক হওয়ার অধিকার রাখে। এ কারণে পুত্রের সত্যায়নের বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

আর দাসীর মাহর মনিবের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা মনিবের মালিকানা তার সহবাসের আগে সাব্য হয় না। কারণ গোলামের উপর তার যে অধিকার রয়েছে, সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেটাই যথেষ্ট। এর কারণ আমরা উল্লেখ করবো।

আর এ সন্তানের মূল্য মনিবের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা মনিব এখানে ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত এ হিসেবে যে সে, একটি দলীলের উপর নির্ভর করেছে। আর তা এই যে, এ সন্তান দাসীটি তার অর্জিত সম্পদের ফল। সুতরাং সে সন্তানটির দাসত্ব সম্বন্ধে বাদী নয়। তাই মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে সে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং তার সাথে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

আর দাসীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে দাসীটির উপর তার মালিকানা নেই। যেমন ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের মাতার ক্ষেত্রে (মালিকানা না থাকার কারণে উক্ত দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয় না।)

আর মুকাতাব যদি মনিবের নসবের ব্যাপারে মনিবের দাবী অস্বীকার করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, তার সত্যায়ণ অপরিহার্য।

অতঃপর যদি কোন একদিন সে উক্ত সন্তানের মালিকানা লাভ করে তখন তার সাথে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা নসব সাব্যস্তকারী স্বীকারোক্তি বিদ্যমান রয়েছে এবং মুকাতাবের অধিকার যার প্রতিবন্ধক ছিল, তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

كتاب الايـمان

কসম পর্ব

কসম পর্ব

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কসম (শপথ) তিন প্রকার يمين غموس **(ইয়ামীনে গুমূস)** يمين منعقده **(ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ)** يمين لغو **(ইয়ামীনে লাগুও) ইয়ামীন গুমূস অর্থ অতীতের কোন বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা শপথ করা। এই ধরনের শপথকারী গোনাহগার হবে।**

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। **এ ধরনের কসমের ক্ষেত্রে কোন কাফ্‌ফারা নেই। তবে তাওবা ও ইস্‌তিগফার করা আবশ্যক।**

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রেও কাফফারা রয়েছে। কেননা শরীয়তে কাফফারার বিধান এসেছে আল্লাহর নামের মর্যাদা লংঘনের পাপ মোচনের জন্য। আর মিথ্যা ভাবে আল্লাহকে সাক্ষী রূপে পেশ করার মাধ্যমে এ পাপ সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা ইয়ামীন মা'কদাহ্‌র সদৃশ হলো। আমাদের দলীল এই যে, উপরোক্ত কসম হচ্ছে সর্বোতভাবে একটি কাবীরা গোনাহ। পক্ষান্তরে কাফ্‌ফারা হচ্ছে একটি ইবাদত, যা রোযা দ্বারা আদায় করা হয় এবং তাতে নিয়তের শর্ত রয়েছে। সুতরাং কবীরা গোনাহের সাথে এটা সম্পৃক্ত হতে পারে না। ইয়ামীন মা'কুদাহ্ এর ব্যতিক্রম। কেননা তা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়। আর তাতে যদি কোন পাপ হয়ে যায়, তাহলে তা পরবর্তী পর্যায়ে (শপথ ভংগের কারণে) যার সম্পর্ক হচ্ছে নতুন একটি ইচ্ছা প্রয়োগের সাথে। আর ইয়ামীন গুমূসের ক্ষেত্রে গোনাহ হচ্ছে তার সংগে জড়িত। সুতরাং এর সাথে তার সম্পৃক্ততা সম্ভবপর নয়। **আর ইয়ামীন 'মুন'আকিদাহ' (ইচ্ছাকৃত শপথ) অর্থ ভবিষ্যতে কোন কাজ করবে বা করবে না মর্মে কসম করা। যদি এক্ষেত্রে শপথ ভংগ করে তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।**

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ
الْاَيْمَانَ

তোমাদের লাগ্‌ও (নিরর্থক) শপথের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। তবে যে শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে করেছো, সে বিষয়ে তোমাদের পাকড়াও করবেন।

এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আমরা যা বলেছি। **আর 'ইয়ামীন লাগ্‌ও' অর্থ অতীতের কোন বিষয়ে কসম করা এ ধারণায় যে, বিষয়টি তেমনই, যেমন সে বলেছে; অথচ বাস্তবে বিষয়টি তার বিপরীত। এই শপথ সম্পর্কে আমরা আশা করি যে, আল্লাহ শপথকারীকে পাকড়াও করবেন না।**

'লাগও' শপথের আরেকটি ছুরত এই যে, কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম, সে যায়েদ, আর সে তাকে যায়েদই ভেবেছে, অথচ বাস্তবে সে আমর। 'লাগও' শপথ সম্পর্কে মূল হচ্ছে لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ আয়াতটি। তবে 'লাগও' শপথের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য থাকার কারণে ইমাম মুহম্মদ (র) বিষয়টিকে আশাবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

কুদূরী প্রণেতা বলেন, কসমের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কসমকারী, জোর জবরদস্তীতে কসমকারী এবং ভুলে যাওয়া অবস্থায় কসমকারী সমান। সুতরাং সবার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثلث جد هن جد وهزلهن جد النكاح الطلاق واليمين

তিনটি বিষয় এমন যে, তাদের নিশ্চিতটিও নিশ্চিতই এবং তাদের উপহাসটিও নিশ্চিতরূপে গণ্য ঃ বিবাহ, তালাক ও শপথ।

ইমাম শাফেয়ী (র) এ বিষয়ে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনশাআল্লাহ্ 'বল প্রয়োগ' অধ্যায়ে তা আমরা বর্ণনা করব।

শপথকৃত কর্মটি যদি বল প্রয়োগের কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে করে তাহলে তাও ইচ্ছাকৃতভাবে করার সমতুল্য।

কেননা বল প্রয়োগের কারণে 'বাস্তবকর্ম' বিলুপ্ত হয় না। আর বাস্তব কর্ম সম্পাদনই হলো শর্ত। তদ্রূপ বেহুঁশ অবস্থায় কিংবা পাগল অবস্থায় যদি কর্মটি করে। কেননা তাতেও প্রকৃতপক্ষে শর্ত সাব্যস্ত হয়।

আর যদি কাফফারার হেকমত পাপ মোচন হয়ে থাকে হুকুম আবর্তিত হবে এর প্রমাণ এর উপর; আর তা হল কসম ভংগ হওয়া, প্রকৃত পাপের উপর নয়।

অধ্যায়

কোন্ বাক্য কসমরূপে বিবেচ্য আর কোন্ বাক্য কসমরূপে বিবেচ্য নয়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'আল্লাহ্' শব্দযোগে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নামের মধ্য থেকে কোন নাম যেমন, রহমান, রাহিম যোগে কিংবা আল্লাহ্র গুণসমূহের কোন গুণযোগে, যেগুলো দ্বারা শপথ করার প্রচলন রয়েছে, যেমন, আল্লাহ্র ইজ্জত (মর্যাদা) জালাল (মহিমা) এবং আল্লাহ্র বড়ত্ব ইত্যাদি যোগে কসম সম্পন্ন হয়।

কেননা এগুলো দ্বারা কসম করার প্রচলন রয়েছে এবং ইয়ামীনের মর্মার্থ হল দৃঢ়তা আর তা অর্জিত হয় (এগুলো দ্বারা)। কেননা শপথকারী আল্লাহ্ নামের এবং তাঁর গুণাবলীর মর্যাদা বিশ্বাস করে। সুতরাং কোন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকারী ও বারণকারী রূপে এগুলোর উল্লেখ উপযোগী হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিন্তু 'আল্লাহ্র ইলমের কসম' শপথকারীর এ বাক্য শপথরূপে বিবেচ্য হবে না।

কেননা কসমে এটি প্রচলিত নয়। তাছাড়া এজন্য যে, এরূপ বাক্যে 'ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জ্ঞাত বিষয়। যেমন বলা হয়, আমাদের সম্বন্ধে তোমার 'ইলম' মাফ কর অর্থাৎ তোমার জ্ঞাত অপরাধসমূহ। **তদ্রূপ যদি বলে, আল্লাহ্র গযব কিংবা অসন্তুষ্টি কিংবা আল্লাহ্র রহমতের কসম তাহলে সে শপথকারী হবে না।**

কেননা এগুলো দ্বারা কসম করার প্রচলন নেই। তাছাড়া রহমত দ্বারা কখনো কখনো রহমতের প্রকাশ ক্ষেত্র তথা বৃষ্টি বা জান্নাত উদ্দেশ্য হয় এবং গযব ও অসন্তুষ্টি দ্বারা শাস্তি উদ্দেশ্য হয়।

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্ দ্বারা কসম করবে সে কসমকারী বিবেচিত হবে না। যেমন নবীর কসম, কা'বার কসম।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كان منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليذر

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে, অন্যথায় যেন কসম পরিহার করে।

তদ্রূপ যদি কুরআনের নামে কসম করে। কেননা তা প্রচলিত নয়।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, এর অর্থ হলো নবীর কসম এবং কুরআনের কসম বলা। পক্ষান্তরে যদি বলে, (আমি এমন কাজ করলে) আমি নবী থেকে এবং কুরআন থেকে সম্পর্কহীন, তাহলে কসম হবে। কেননা নবী বা কুরআন থেকে সম্পর্কহীনতা হলো কুফ্রি। **ইমাম কুদূরী বলেন, আর কসম সংঘটিত হয় কসমের বিশেষ হরফের মাধ্যমে।** (এরপর

গ্রন্থকার আরবী বিশেষ হরফ ও পরিভাষা ব্যবহারের বিধান উল্লেখ করেছেন যা বাংলাভাষায় প্রযোজ্য নয় বলে এ অংশ অনুবাদে বাদ দেওয়া হল)।

যদি বলে 'কসম করে বলছি' কিংবা 'আল্লাহ্র নামে কসম করে বলছি' কিংবা 'হলফ করে বলছি' কিংবা 'আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলছি', আমি সাক্ষী রেখে বলছি, কিংবা আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, তাহলে সে শপথকারী হবে।

কেননা এ শব্দগুলো কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়।.....তাছাড়া আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখার অর্থ কসম করা। আর 'হলফ' শব্দটির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ শব্দটি ব্যবহার না করলেও আল্লাহ্র নামে হলফই বিবেচ্য এবং শরীয়ত সম্মত। কেননা গায়রুল্লাহ্র নামে হলফ নিষিদ্ধ। সুতরাং হলফ শব্দকে সে অর্থেই গ্রহণ করা হবে। এ কারণেই বলা হয় শুধু কসম বা শুধু হলফ শব্দের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন নেই। আর কেউ কেউ বলেন, নিয়ত অপরিহার্য। কেননা এটা নিছক প্রতিশ্রুতি অর্থে এবং গায়রুল্লাহ্র নামে কসমের অর্থে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি ফারসী ভাষায় বলে, 'সুগন্দ মীখোরাম বখোদায়ে' (আমি খোদার নামে কসম খাচ্ছি) তবে তা কসম হয়ে যাবে।

কেননা তা বর্তমান-এর জন্য। আর যদি বলে, 'সুগান্দ খোরাম', তবে কারো কারো মতে তা কসম হবে না।

যদি বলে, 'আমার স্ত্রীর তালাকের কসম খাচ্ছি' তাহলে কসম হবে না। কেননা কসমের ক্ষেত্রে এর প্রচলন নেই। **আর তেমনি যদি বলে, আল্লাহ্র নামে ওয়াদা করছি এবং অঙ্গীকার করছি (তবে কসম হয়ে যাবে)।**

কেননা, অঙ্গীকারও শপথের সামীল। **আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- واوفوا بعهد الله তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। ميثاق শব্দটি অঙ্গীকার অর্থে** ব্যবহৃত হয়। তেমনি **যদি বলে, আমার উপর মান্নত অথবা আল্লাহ্র নামে মান্নত, তাহলে কসম হবে।**) কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে,

من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين

কেউ যদি মান্নত করে আর মান্নতের বিষয় উল্লেখ না করে তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব ।

আর যদি বলে, যদি আমি এটা করি তাহলে 'সে' ইহূদী, বা খ্রীস্টান বা কাফের, তাহলে কসম হবে।

কেননা শর্তকৃত কর্মটিকে সে যখন কুফুরির নিদর্শনরূপে ঘোষণা করেছে, তখন বোঝা গেলো যে, হলফকৃত কর্মটি পরিহার করা সে আবশ্যক মনে করে।

আর শর্তায়ন ছাড়াও এটার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা ইয়ামীন ও কসম সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সম্ভব। যেমন কোন হালাল বিষয়কে নিজের জন্য হারাম করার ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি।[১]

১। অর্থাৎ নাছ বা আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে হালালকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করলে তা কসম বিবেচিত হয়।

যদি একথা এমন কোন কাজের ক্ষেত্রে বলে, যা সে বিগত সময়ে করেছে, তাহলে এটা মিথ্যা কসম বিবেচিত হবে এবং তাকে কাফের বলা যাবে না, যেমন ভবিষ্যত সম্পর্কে কসম করলে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু কাফের সাব্যস্ত হয় না।

কারো কারো মতে, সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা মর্মগত দিক থেকে এটা শর্তহীন ও তৎক্ষণাৎ বুঝায়। যেমন যদি সে বলে যে, সে ইহুদী। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে অতীত ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রেই তাকে কাফের বলা যাবে না, যদি সে জেনে থাকে যে, এটা কসম। পক্ষান্তরে যদি তার বিশ্বাস এই হয় যে, এ বক্তব্য দ্বারা কাফের সাব্যস্ত হয়, তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় অর্থেই সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা শর্তকৃত কর্মটি সম্পন্ন করে সে নিজেই কুফরীর প্রতি তার সম্মতি প্রকাশ করেছে।

আর যদি বলে, যদি আমি তা করি তাহলে আমার উপর আল্লাহ্‌র গযব বা আমার উপর অসন্তুষ্টি, তাহলে সে কসমকারী হবে না।

কেননা এটা হলো নিজের উপর বদ দু'আ। আর তা শর্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

আর এ জন্য যে, এ ধরনের কসম প্রচলিত নয়।

তদ্রূপ (কসম হবে না) যদি বলে যে, যদি আমি এটা করি তাহলে আমি যিনাকারী বা আমি চোর বা আমি মদখোর বা সূদখোর।

কেননা এই কার্যগুলোর নিষিদ্ধতা রহিত ও পরিবর্তিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং এগুলো আল্লাহ্‌র নামের মর্যাদার সমপর্যায়ের নয়। তাছাড়া এগুলো (কসমের জন্য) প্রচলিত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ কাফফারা প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী বলেন, কসমের কাফফারা হলো একটি গোলাম আযাদ করা। যিহার এর কাফারার ক্ষেত্রে যে ধরনের গোলাম গ্রহণযোগ্য হয়। এক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইচ্ছা করলে দশজন মিসকিনের প্রত্যেককে এক বা একধিক বস্ত্র দান করবে। আর বস্ত্রের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো যা দ্বারা সালাত আদায় করা জায়িয হয়। আবার ইচ্ছা করলে দশজন মিসকিনকে যিহারের কাফফারার অনুরূপ খাদ্য প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

তাহলে তার কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান, তোমাদের পরিবারকে তোমরা যে খাদ্য প্রদান করো তার মধ্যম মানের খাবার কিংবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করা কিংবা একটি গোলাম আযাদ করা। আয়াতের أو (অথবা) অব্যয়টি ইচ্ছাধিকার প্রদানের জন্য। সুতরাং এই তিনটি জিনিসের যে কোন একটি ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী বলেন, এই তিনটির কোনটি যদি আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে লাগাতার তিনদিন রোযা রাখবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাকে লাগাতার রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রদান করা হবে। কেননা আয়াতটি নিঃশর্ত।

আমাদের প্রমাণ হলো হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত কেরাত, যেখানে রয়েছে فصيام ثلثة ايام متتابعات এবং এটা মাশহুর হাদিসের পর্যায়ে বলে গণ্য।

সর্বনিম্ন পরিমাণ বস্ত্র সম্পর্কে কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসূফ ও আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত যে, সর্বনিম্ন বস্ত্রের পরিমাণ হল যা দেহের অধিকাংশ আবৃত করে। এ কারণেই শুধু পায়জামা (বা লুংগী) দেওয়া জায়েয হবে না। এটাই সঠিক মত।

কেননা লোক প্রচলনে এতটুকু পোষাক পরিধানকারীকে নগ্ন বলা হয়। তবে পোষাক হিসাবে যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্য নয়, মূল্য বিবেচনায় তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

যদি কসম ভংগের আগে কাফফারা আদায় করে ফেলে তাহলে যথেষ্ট হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সম্পদ দ্বারা আদায়কৃত কাফফারা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সে কাফফারার কারণ তথা কসম সংঘটিত হওয়ার পর কাফফারা আদায় করেছে। সুতরাং এটি আঘাত করার পর (আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে) আদায়কৃত কাফফারার সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল এই যে, কাফফারা হচ্ছে অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্য। অথচ এখানে কোন অপরাধ নেই। আর কসম কাফফারার কারণ নয়। কেননা কসম তো রোধকারী, কাফফারার প্রতি উপনীতকারী নয়। পক্ষান্তরে আঘাত হচ্ছে মৃত্যুতে উপনীতকারী। তবে

(আদায়কৃত কাফ্ফারা) দরিদ্রের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা তা সাদাকা হয়ে গেছে। **ইমাম কুদূরী বলেন, কেউ যদি কোন গোনাহ্ করার ব্যাপারে কসম করে, যেমন বললো, নামায পড়বে না কিংবা সে তার পিতার সাথে কথা বলবে না কিংবা অমুককে হত্যা করবে, তাহলে তার কর্তব্য হবে কসম ভংগ করে ফেলা এবং কাফফারা আদায় করা।** কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليات بالذى هوخير ثم ليكفر عن يمينه

যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে কিন্তু বিপরীত বিষয়টিকে কসমের চেয়ে উত্তম মনে করে, তাহলে সে যেন উত্তমটি করে অতঃপর কসমের কাফফারা আদায় করে।

তাছাড়া এই কারণে যে, আমরা যে ছূরত বলেছি, তাতে যদিও কসম পূর্ণ হওয়া হাতছাড়া হয়ে যায়, তবু কাফ্ফারার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর এর বিপরীতে গুনাহের কর্ম করে ফেললে ক্ষতিপূরণের কোন অবকাশ নেই।

কাফের যদি কসম করে, অতঃপর কাফের অবস্থায় কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কসম ভংগ করে তাহলে সে কসম ভংগের অপরাধী হবে না।

কেননা সে কসমের যোগ্য নয়। কারণ কসম তো আল্লাহর নামের মর্যাদার ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। আর কুফুরের অবস্থায় সে (আল্লাহর নামের প্রতি) সম্মান প্রদর্শনকারী গণ্য নয়। আর সে কাফফারা আদায় করারও যোগ্য নয়। কেননা কাফফারা হচ্ছে ইবাদত বিশেষ।

কেউ যদি নিজের মালিকানার কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করে তাহলে তা হারাম হবে না। এখন যদি সে সেটাকে মুবাহ রূপে ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার উপর কাফফারা সেই। কেননা হালালকে হারাম ঘোষণা করার অর্থ শরীয়তের বিধান পরিবর্তন করা। সুতরাং এ দ্বারা শরীয়তের একটি বৈধ কর্ম তথা কসম সংঘটিত হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, তার বক্তব্য হারাম হওয়ার অর্থ ব্যক্ত করে। আর তা কার্যকরী করা সম্ভব, ভিন্ন ভাব হারাম সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। অর্থাৎ কসমের হুকুম প্রবর্তন করার মাধ্যমে। সুতরাং সে হুকুমের দিকেই উপনীত হতে হবে।

অতঃপর যা সে হারাম করেছে, তার অল্প বা বেশী যদি ব্যবহার করে ফেলে তাহলে কসম ভংগকারী হয়ে যাবে এবং কাফফারা ওয়াজিব হবে আর তাই হলো উল্লেখিত মুবাহ রূপে ব্যবহারের অর্থ। কেননা হারাম হওয়া যখন সাব্যস্ত হলো তখন তা সে বিষয়ের প্রতিটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আর যদি বলে সকল হালাল আমার জন্য হারাম তাহলে তা শুধু পানাহারকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অবশ্য অন্য কিছু নিয়ত করলে তাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে কিয়াসের দাবী এই যে, কসমের উচ্চারণ থেকে ফারেগ হওয়া মাত্র সে কসম ভংগকারী হয়ে যাবে। কেননা একটি হালাল কাজ সে করে ফেলেছে। আর তা হল শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। আর তা ইমাম যুফার (র) এর মত।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, ইয়ামীন বা কসমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কসম রক্ষা করা। আর ব্যাপকতা বিবেচনা করা অবস্থায় তা অর্জিত হয় না। আর ব্যাপকতার দিকটি বিবেচনা করা যখন রহিত হয়ে গেলো তখন প্রচলিত ব্যবহার হিসেবে তা পানাহারের দিকেই অভিমুখী হবে। কেননা 'হালাল' শব্দটি সাধারণতঃ পানাহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।

আর ব্যাপকতার দিকটি রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে নিয়ত ছাড়া স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি স্ত্রীর নিয়ত করে তাহলে সেটা ঈলা (স্ত্রী সহবাস না করার শপথ) হবে। আর তা সত্ত্বেও কসমটি খাদ্য ও পানীয় থেকে রহিত হবে না। এসবই হচ্ছে যাহিরে রেওয়াতের সিদ্ধান্ত। আর আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নিয়ত ছাড়া তালাক পতিত হবে। কেননা এ অর্থেই এর ব্যবহার অধিক। এবং এর উপর ফতোয়া।

কেউ যদি শর্তহীন মান্নত করে তাহলে তাকে তা পূর্ণ করতে হবে। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من نذر و سمّى فعليه الوفاء بما سمى

যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উল্লেখ করে মান্নত করে তার কর্তব্য হবে উল্লেখিত বিষয়টি সম্পন্ন করা।

আর যদি মান্নতকে কোন শর্তের সাথে যুক্ত করে আর ঐ শর্ত অস্তিত্ব লাভ করে তাহলে স্বয়ং মান্নতটি পূর্ণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা সংশ্লিষ্ট হাদীসটি নিঃশর্ত। তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শর্তযুক্ত মান্নত শর্তযুক্ত মান্নতের সমতুল্য। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কেউ বলে, যদি আমি এ কাজ করি তাহলে আমার উপর এক হজ্জ কিংবা এক বছরের রোজা কিংবা আমার মালিকানার মাল ছাদকা করা ওয়াজিব হবে, তাহলে এর পরিবর্তে কসমের কাফফারাই যথেষ্ট হবে। এটা মুহম্মদ (র) এর মত। এবং উল্লেখকৃত আমলটি সম্পন্ন করার মাধ্যমেও সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এ সিদ্ধান্ত হবে তখন যখন শর্তটি এমন হয়, যা সম্পন্ন হওয়া তার কাম্য নয়। কেননা এতে কসমের মর্ম বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো বিরত থাকা। কিন্তু বাহ্যতঃ এটা হচ্ছে মান্নত। সুতরাং তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। আর দুটি দিকের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি এমন শর্ত হয়, যা তার কাম্য; যেমন সে বললো, আল্লাহ যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তাতে কসমের মর্ম বিদ্যমান নেই। আর তা হচ্ছে বিরত থাকা। এই বিশদ বিবরণই বিশুদ্ধ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন বিষয়ের উপর কসম করে এবং কসমের সাথে সাথে ইনশা আল্লাহ বলে, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من حلف على يمين وقال ان شاء الله فقد بر فى يمينه

কেউ যদি কোন বিষয়ে কসম করে এবং সেই সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বলে তাহলে সে তার কসমের ব্যাপারে দায়মুক্ত হয়ে গেল। তবে সাথে সাথে হওয়া অপরিহার্য। কেননা কসম উচ্চারণ থেকে ফরেগ হওয়ার পর ইনশা আল্লাহ বলার অর্থ হলো প্রত্যাহার করা। অথচ ইয়ামীনের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করার কেন অবকাশ নেই।

অধ্যায় ঃ প্রবেশ এবং বসবাস বিষয়ক কসম

কেউ যদি কসম করে যে, কোন গৃহে সে প্রবেশ করবেনা, অতঃপর বাইতুল্লায়, কিংবা কোন মসজিদে কিংবা গির্জায় কিংবা ইহুদীদের উপসানলয়ে প্রবেশ করে তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা গৃহ দ্বারা রাত্রি যাপনের জন্য নির্ধারিত গৃহকেই বোঝানো হয়। অথচ এ সকল ভবন সে জন্য তৈরি করা হয় না।

অদ্রূপ যদি কোন গৃহের বারান্দায় বা গৃহের প্রবেশ পথের ছাউনীতে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভংগকারী হবে না।

কারণ সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। ছাউনী বলতে ঐ অংশ উদ্দেশ্য, যা বাড়ীর বাইরে গলির উপর থাকে।

কোন কোন মতে বারান্দা যদি এমন হয় যে, দরজা বন্ধ করলে তা ঘরের ভেতরে এসে যায় এবং তা ছাদযুক্ত হয় তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের স্থানে সাধারণতঃ রাত্রি যাপন করা হয়।

যদি চত্বরে প্রবেশ করে তাহলে কসম ভংগ হবে। কেননা মাঝে মধ্যে রাত্রি যাপন করা হবে, এ উদ্দেশ্যেই তা বানানো হয়। সুতরাং শীতকালীন বা গ্রীষ্মকালীন রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে তৈরী স্থানের মতই হলো। কোন কোন মতে চত্বর যদি চার দেয়াল বিশিষ্ট হয়, তাহলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত হবে। আর কুফার লোকদের চত্বরগুলো তেমনই হতো।

কোন কোন মতে সিদ্ধান্তটি চার দেয়াল থাকা না থাকার শর্ত থেকে মুক্ত। এটাই বিশুদ্ধ মত[১]।

কেউ যদি শপথ করে যে, কোন বাড়ীতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সে এক বিরান বাড়ীতে প্রবেশ করলো তাহলে কসম তংগকারী হবে না। পক্ষান্তরে যদি কসম করে যে, এই বাড়ীতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সে বাড়ী ধ্বংস হয়ে খোলা মাঠ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে গেলো তাহলে কসম ভংগকারী হবে।

কেননা আরব আযম সর্বত্রই উন্মুক্ত ভিটেকেই বাড়ী বলে। ভবনাদি হলো তার অবস্থা বিশেষ। আর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গুণগত দিকটি ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য[২]।

১। মূল বিষয় হলো এটা দেখা যে, ছাদ এবং অধিকাংশ (অর্থাৎ তিন দিকের) দেয়াল রয়েছে কিনা। থাকলেই সেটা গৃহ হিসাবে বিবেচিত হবে। পার্থক্য এই যে, চত্বরের দেয়ালগুলো হয় অনুচ্চ ও খোলা। পক্ষান্তরে গৃহের দেয়ালগুলো হয় ছাদলগ্ন। যেহেতু এই ধরনের চত্বর গুলো বিভিন্ন সময় রাত্রি যাপনের জন্যও ব্যবহৃত হয়, সেহেতু এগুলো গৃহের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে।

২। অর্থাৎ উসূল শাস্ত্রের স্বীকৃত বিষয় এই যে, কসমকৃত বিষয়টি পরিচিত হতে হবে। সুতরাং উপস্থিত অবস্থায় বাড়ীটি দেখিয়ে যখন বলা হবে তখন গুনগত বা অবস্থাগত পরিচয় এর প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত অবস্থায় যেহেতু গুণগত বিষয়টি ছাড়া পরিচয়ের অন্য কোন দিক নেই, সেহেতু সেটা বিবেচ্য হবে।

যদি কসম করে যে, এই গৃহে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তা বিধ্বস্ত ও বিরান হয়ে গেলো এবং তদস্থলে অন্য ভবন তৈরি হলো আর সে তাতে প্রবেশ করলো, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে।

কেননা আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিধ্বস্ত হওয়ার পরও বাড়ীর নাম বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি সেখানে মসজিদ বা হাম্মাম বা বাগান বা অন্য কোন ভবন তৈরি করা হয় তাহলে সেখানে প্রবেশ করলে কসম ভংগ করা হবে না। কেননা উক্ত স্থানের উপর অন্য একটি নাম আরোপিত হওয়ার কারণে সেটা বাড়ী রূপে বহাল থাকেনি।

তদ্রূপ (কসম ভংগ হবে না) যদি মসজিদ, হাম্মাম ইত্যাদি ধ্বসে যাওয়ার পর সেখানে প্রবেশ করে। কেননা তাতে স্থানটির বাড়ী পরিচিতি ফিরে আসে না। **আর যদি কসম করে যে, এই গৃহে প্রবেশ করবে না। অতঃপর ঘর ভেংগে ময়দানে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তাতে প্রবেশ করলো তাহলে কসম ভংগ হবেনা।**

কেননা এতে রাত্রি যাপন হয় না বলে তার 'গৃহ' নাম তিরোহিত হয়ে গেছে। এমনকি যদি দেয়ালগুলো বহাল থাকে এবং ছাদ পড়ে যায় তাহলেও কসম ভংগ করা হবে। কেননা ছাদ পড়ে যাওয়ার পরও তাতে রাত্রিযাপন হয়। ছাদ হচ্ছে গৃহের গৌন দিক।

তদ্রূপ যদি তদস্থলে অন্য একটি ঘর তৈরি করে আর সে তাতে প্রবেশ করে, তাহলে কসম ভংগকারী হবে না। কেননা ধ্বসে যাওয়ার পর 'গৃহ' নাম অব্যাহত থাকে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, এই বাড়ীতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সে বাড়ীর ছাদে উঠল, তাহলে কসম ভংগকারী হবে।

কেননা ছাদ হচ্ছে বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই তো ই'তিকাফকারী মসজিদের ছাদে গিয়ে উঠলে তার ই'তিকাফ ভংগ হয় না। আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের প্রচলন অনুযায়ী কসম ভংগকারী হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বাড়ীর বারান্দায় প্রবেশ করে তাহলে কসম ভংগকারী হবে। তবে অবশ্যই সিদ্ধান্তটি বারান্দা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা মুতাবেক হবে।

আর যদি গৃহদ্বারের সম্মখুস্থ তাকে দাঁড়ায় আর তা এমন যে, দরজা বন্ধ করলে তা বাইরে থাকে, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা দরজা হলো বাড়ী এবং বাড়ীর ভিতরের জিনিস রক্ষা করার জন্য। সুতরাং দরজার বাইরের অংশ বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি বাড়ীতে থাকা অবস্থায় কসম করে যে, এই বাড়ীতে প্রবেশ করবে না, তাহলে বসা (বা অবস্থান) দ্বারা কসম ভংগকারী হবে না; যতক্ষণ না বের হয়ে গিয়ে পুনরায় প্রবেশ করে।

এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের সিদ্ধান্ত এই যে, কসম ভংগকারী হবে। কেননা কোন কর্ম অব্যাহত রাখা উক্ত কর্ম আরম্ভ করার হুকুমভুক্ত।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, প্রবেশ কর্মটির অব্যাহততা নেই। কেননা প্রবেশের অর্থ হলো বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভ্যন্তর মুখী হওয়া।

আর যদি বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কসম করে যে, এই কাপড় পরিধান করবে না আর সংগে সংগে তা খুলে ফেলে তাহলে কসম ভংগকারী হবে না। তদ্রূপ যদি আরোহণের অবস্থায় কসম করে যে, এই বাহনে আরোহণ করবে না আর সংগে সংগে নেমে যায় তাহলে কসম ভংগকারী হবে না। কিংবা বসবাস করা অবস্থায় যদি কসম করে যে, এই

ঘরে বাস করবে না আর সংগে সংগে গৃহ ত্যাগের আয়োজনে লেগে যায় (তাহলে কসম ভংগকারী হবে না।) ইমাম যুফার (র) বলেন, কসম ভংগকারী হবে। (কেননা সামান্য হলেও কসম ভংগের শর্ত পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দলীল এই যে, কসম করা হয় তা রক্ষা করার জন্য। সুতরাং কসম রক্ষার বিষয়টি সম্পন্ন হওয়ার সময়টুকু ব্যতিক্রম করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি ঐ অবস্থায় কিছু সময়ও থাকে তাহলে কসম ভংগকারী হবে। কেননা এসকল কর্ম সদৃশ কর্মের পুনঃ পুনঃ সংঘটন দ্বারা অব্যাহততা লাভ করে। এ কারণেই তো এ সকল কর্মের ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করে বলা হয়। একদিন (সময়) আরোহণ করেছি বা পরিধান করেছি। প্রবেশের ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা মেয়াদ বা দীর্ঘ সময় অর্থে একদিন প্রবেশ করেছি বলা হয় না। আর যদি উক্ত বক্তব্য দ্বারা সে নতুন সূচনার নিয়ত করে থাকে। (অর্থাৎ নতুন করে আরোহণ বা পরিধান করবো না) তাহলে তার কথার সত্যতা গ্রহণ করা হবে। কেননা এটা তার বক্তব্যের সম্ভাবনাভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, এই বাড়ীতে বসবাস করবে না, অতঃপর সে নিজে বেরিয়ে যায় কিন্তু তার আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজন সেখানে থেকে যায় এবং সে সে গৃহে ফিরে আসার নিয়ত না করে তাহলেও কসম ভংগকারী হবে।

কেননা লোক প্রচলনের দিক থেকে আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজনের অবস্থানের কারণে তাকে সেই বাড়ীর বাসিন্দাই ধরা হয়। তাই বাজারের দোকানদার অধিকাংশ দিন বাজারে থাকা সত্ত্বেও বলে আমি অমুক গলিতে থাকি।

ঘর এবং মহল্লা এক্ষেত্রে বাড়ীর সম পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি শহর সম্পর্কে কসম করে তাহলে কসম রক্ষার বিষয়টি আসবাবপত্র ও পরিবার পরিজন শহর থেকে সরিয়ে নেয়ার উপর নির্ভর করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এটি বর্ণিত। কেননা যে শহর থেকে সে বের হয়ে গেছে, লোক প্রচলন হিসাবে তাকে সে শহরের বাসিন্দা গণ্য করা হয় না।

কিন্তু প্রথম বিষয়টি ভিন্ন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে উক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর সমতুল্য।

স্থানান্তরের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, সমস্ত আসবাবপত্র সরাতে হবে এমন কি একটি তীলকও যদি থেকে যায় তাহলে কসম ভংগ করা হবে। কেননা সমগ্র আসবাবপত্র দ্বারাই তার বারান্দা সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং যতক্ষণ ঐ আসবাপত্রের কিছু অংশের বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ তার বসবাস অব্যাহত থাকবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, অধিকাংশ সামানপত্র সরানো যথেষ্ট। কেননা সমগ্রকে সরানো কঠিন হতে পারে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, গৃহস্থালি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলাই হলো বিবেচ্য। কেননা এর অতিরিক্তগুলো বসবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ফকীহগণ বলেন, এ মতই উত্তম এবং মানুষের জন্য সহজতর। তবে তার কর্তব্য হলো অবিলম্বে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া, যাতে কসম রক্ষিত হয়। আর যদি রাস্তায় বা মসজিদে স্থানান্তরিত হয় তাহলে ফকীহগণ বলেছেন যে, কসম রক্ষিত হবে না। الزيادات গ্রন্থে এর দলীল উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি সপরিবারে শহর থেকে বের হয়ে যায় তাহলে অন্য কোন আবাসস্থল গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সালাতের ব্যাপারে প্রথম আবাসস্থলটি বিবেচ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রেও তাই হবে।

অধ্যায় ঃ বের হওয়া অথবা আরোহণ করা ইত্যাদি সংক্রান্ত কসম

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, সমজিদ থেকে বের হবে না অতঃপর যে কোন এক ব্যক্তিকে আদেশ করল, সে তাকে তুলে বের করে নিয়ে এল তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা অদিষ্ট ব্যক্তির কর্ম আদেশদাতার সাথেই সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং ঘটনাটি এমনই হলো, যেন সে কোন বাহনে আরোহণ করলো আর বাহনটি তাকে নিয়ে বের হয়ে গেলো।

পক্ষান্তরে যদি তাকে বলপূর্বক বের করা হয় তাহলে কসম ভংগ হবে না। কেননা আদেশ না করার কারণে কর্মটি তার দিকে সম্পৃক্ত হবে না।

যদি তার আদেশে নয় কিন্তু এতে তার সম্মতি ছিল তাকে বের করে আনা হয়, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী। কেননা স্থানান্তর সাব্যস্ত হবে আদেশ দ্বারা, নিছক সম্মতি দ্বারা নয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কসম করে যে, সে জানাযায় শরীক হওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ী থেকে বের হবে না। অতঃপর সে জানাযার উদ্দেশ্যেই বের হলো কিন্তু পরে অন্য একটি প্রয়োজনও সেরে নিলো তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা ব্যতিক্রমকৃত বের হওয়াই পাওয়া গিয়াছে। আর বের হওয়ার পর কোথাও গমন করা বের হওয়া নয়।

যদি কসম করে যে, মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে না। এর পর সে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আবার ফিরে আসে তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হওয়া পাওয়া গিয়েছে। আর তা-ই হলো শর্ত। কারণ, বের হওয়া অর্থ হল অভ্যন্তর পরিত্যাগ করে বহিরাগমন করা।

পক্ষান্তরে যদি কসম করে যে, সে মক্কায় আসবে না, তাহলে মক্কায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসম ভংগকারী হবে না। কেননা আসার অর্থ হলো উপনীত হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে আস এবং তাকে বলো। فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ

আর যদি কসম করে যে মক্কায় যাবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেনঃ তাও আসবেনা বলার মতই। আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ এটি বের হওয়া বলার মত। আর এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা, এ দ্বারা স্থান ত্যাগ করা বুঝায়। **ইমাম কুদূরী বলেন, যদি কসম করে যে, অবশ্যই আমি সরায় আসবো, কিন্তু সে তথায় এলনা, এমনকি মারা গেল, তাহলে সে জীবনের সব শেষ অংশে কসম ভংগকারী হবে।** কেননা তার পূর্বে কসম পূর্ণ করার আশা রয়েছে। **যদি কসম করে যে, যদি সে সক্ষম হয় তাহলে আগামীকাল অবশ্যই তার কাছে আসবে তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, তাকদীর সম্পর্কিত সক্ষমতা নয়।**

জামে ছাগীর কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি সে অসুস্থ না হয়ে পড়ে এবং শাসক তাকে বাধা প্রদান না করে এবং তার নিকট গমনের ব্যাপারে সক্ষম হয়ে পড়ার মত কোন বিষয় না ঘটে, এর পর সে এলোনা তাহলে কসম ভংগকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি তাকদীর সম্পর্কিত সক্ষমতার নিয়ত করে থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট সত্যতা গ্রহণীয় হবে।

কেননা প্রকৃত সক্ষমতা তো তা-ই, যা কর্ম সম্পাদনের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। তবে সাধারণ ব্যবহারের দিক দিয়ে উপায় উপকরণের সুষ্ঠুতা সুস্থতার উপর শব্দটি প্রযুক্ত হয়। সুতরাং শব্দটির শর্তহীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থেই সেটি গ্রহণ করা হবে। তবে দেয়ানাত (অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্কের) হিসাবে প্রথম অর্থের নিয়তও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে উচ্চারিত বক্তব্যের প্রকৃত অর্থটি গ্রহণ করেছে। তবে কোন কোন মতে আইনগত ভাষ্যেও তা ছহী বলে গৃহীত হবে। কারণ তা-ই শব্দের প্রকৃত অর্থ। আর কোন কোন মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটি বাহ্যিক ব্যবহারের বিপরীত।

ইমাম কুদূরী বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া বের হবে না। অতঃপর সে তাকে একবার অনুমতি দিলো এবং স্ত্রী বের হলো কিন্তু পরবর্তী বার তার অনুমতি ছাড়াই বের হলো, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে। কেননা প্রত্যেক বার বের হওয়ার সময় অনুমতি আবশ্যক।

কেননা অনুমতিযুক্ত বের হওয়াকেই শুধু ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া অন্য বের হওয়া সাধারণ নিষিদ্ধতার অন্তর্গত রয়েছে। আর যদি সে একবারের অনুমতির নিয়ত করে থাকে তাহলে দিয়ানতের ক্ষেত্রে তা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। আইনগত ক্ষেত্রে নয়। কেননা এটি তার বক্তব্যের সম্ভাব্য অর্থ হলেও তা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

পক্ষান্তরে যদি বলে, তবে যদি তোমাকে আমি অনুমতি দেই অতঃপর একবার তাকে অনুমতি দিলো আর সে বের হলো এরপর তার অনুমতি ছাড়াই বের হলো, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা 'তবে যদি' অংশটি শেষ সীমানা নির্দেশক। সুতরাং তা দ্বারা কসমও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেমন যদি বলে, 'যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে অনুমতি দেই।'

এমন যদি হয় যে, স্ত্রী বের হতে চাইল তখন স্বামী বললো, যদি তুমি বের হও তাহলে তুমি তালাক, তখন সে বসে পড়লো, অতঃপর বের হলো তাহলে কসম ভংগ হবে না। অদ্রূপ কোন লোক যদি দাসকে প্রহার করতে চায় আর অন্য একজন তাকে বলে যে, তুমি যদি তোমার গোলামকে প্রহার কর তাহলে আমার গোলাম আযাদ। তখন সে তার গোলামকে (প্রহার না করে) ছেড়ে দিলো এরপর তাকে প্রহার করলো (এ অবস্থায় কসম ভংগ হবে না) এটাকে তাৎক্ষণিক কসম বলে। এই প্রকার কসম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) একক আবিষ্কারের অধিকারী। এর কারণ এই যে, লোক

প্রচলনের আলোকে বক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্থিত প্রহার এবং উপস্থিত বের হওয়া রোধ করা। আর কসমের ভিত্তিই হচ্ছে প্রচলনের উপর।

আর কেউ যদি তাকে বলে, বসো এবং আমার এখানে দুপুরে আহার গ্রহণ করো। আর সে বলে, যদি আমি দুপুরের আহার গ্রহণ করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ অতঃপর সে বের হয়ে বাড়ীতে গেলো এবং দুপুরের আহার গ্রহণ করলো, তাহলে কসম ভংগকারী হবে না। কেননা তার বক্তব্যটি অপর পক্ষের কথার প্রতিউত্তরে এসেছে। সুতরাং তা উক্ত আহবানের সাথে জড়িত হবে। সুতরাং নিমন্ত্রণকৃত মধ্যাহ্নভোজই উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, যদি আজ দুপুরের আহার গ্রহণ করি তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা প্রতিউত্তরে সে অতিরিক্ত কথা যোগ করেছে। সুতরাং এটা স্বতন্ত্র 'সূচনা বক্তব্য' ধরা হবে।

যে ব্যক্তি কসম করলো যে, অমুকের সওয়ারিতে আরোহণ করবে না। অতঃপর সে অমুকের ঋণগ্রস্ত বা ঋণমুক্ত অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের সওয়ারিতে আরোহণ করলো, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না; ইমাম আবু হানিফার মতে। পক্ষান্তরে যদি সে বেষ্টনকারী ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে নিয়ত করলেও কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা এক্ষেত্রে তাঁর মতে উক্ত গোলামের সওয়ারিতে মনিবের কোন মালিকানা নেই।

পক্ষান্তরে ঋণ যদি বেষ্টনকারী না হয় কিংবা কোন ঋণই না থাকে তাহলে যতক্ষণ গোলামের সওয়ারিটিকেও নিয়ত না করবে ততক্ষণ কসম ভংগকারী হবে না। কেননা গোলামের মালিকানাধীন বস্তুতে মূল মালিকানা হচ্ছে মনিবের। কিন্তু লোক প্রচলন ও শরীয়ত উভয় দিক থেকেই উক্ত বস্তুর মালিকানা গোলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। নবী ছালাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من باع عبدًا وله مال فهو للبائع (رواه الستة)

কেউ যদি কোন গোলাম বিক্রি করে আর তার কোন মাল থাকে তাহলে ঐ মাল বিক্রেতার হবে।

ফলে মনিবের সাথে মালিকানার সম্পৃক্তি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং নিয়ত জরুরী হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত সকল ক্ষেত্রে যদি সে নিয়ত করে তাহলে কসম ভংগকারী হবে।

কেননা মনিবের সাথে মালিকানার সম্পৃক্তি ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) মনিবের প্রকৃত মালিকানাকে বিবেচনায় এনে বলেছেন, নিয়ত না করা সত্তেও (সকল ক্ষেত্রে) কসম ভংগকারী হবে। কেননা উভয়ের মতে ঋণগ্রস্ততা মনিবের মালিকানা হওয়া রোধ করে না।

باب اليمين فى الاكل والشوب

অধ্যায় ঃ পানাহার সংক্রান্ত কসম

অধ্যায় ঃ পানাহার সংক্রান্ত কসম

কেউ যদি কসম করে যে, আমি এ খেজুর বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করবো না। তাহলে এটা তার ফলের উপর প্রযোজ্য হবে।

কেননা কসমটিকে সে যা খাওয়া যায় না, তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তা থেকে উৎপন্ন ফলের দিকেই কসমটি প্রত্যাবর্তিত হবে। কারণ বৃক্ষ হচ্ছে ফলের উপকরণ। সুতরাং বৃক্ষ দ্বারা রূপক অর্থে ফল উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, নতুন কোন প্রক্রিয়া দ্বারা তাতে যেন কোন পরিবর্তন না হয়। এ কারণেই নাবিয, সিরকা ও জ্বাল দেয়া 'শিরা' পান করা দ্বারা কসম ভংগকারী হবে না।

যদি কসম করে যে, এই কাঁচা খেজুর থেকে খাবো না। অতঃপর তা পেকে যাওয়ার পর খায় তাহলে কসম ভংগকারী হবে না। তদ্রূপ যদি কসম করে যে, সে এই তাজা খেজুর থেকে খাবে না বা এই দুধ খাবে না। অতঃপর পাকা খেজুর খোরমা হয়ে গেল এবং ঐ দুধ ছানা হয়ে গেলে খেলো তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না।[১]

কেননা খেজুরের কাঁচা-পাকা গুণ কসম করার কারণ হতে পারে। তদ্রূপ দুধের অবস্থাও কসমের কারণ হতে পারে। সুতরাং কসম উল্লেখিত শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। তা ছাড়া দুধ যেহেতু আহারযোগ্য, সেহেতু দুধ থেকে যা তৈরী করা হয়, কসমটি সেদিকে অভিমুখী হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি কসম করে যে, এই বালকের সাথে কথা বলবে না কিংবা এই যুবকের সংগে কথা বলবে না, অতঃপর সে বৃদ্ধ হওয়ার পর তার সাথে কথা বললো, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা কথা বন্ধের মাধ্যমে মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং কসমের কারণ রূপে বিবেচ্য অবস্থাগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে কারণ রূপে গণ্য হবে না।

যদি কসম করে যে, এই মেষ শাবকের গোশত খাবো না অতঃপর মেষ হওয়ার পর তার গোশত খেল, তাহলে কসম ভংগকারী হবে।

কেননা এখানে 'শাবকত্ব' এমন গুণ নয়, যা কসম করার কারণ হতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি শাবকের গোশত পরিহার করে, সে মেষের গোশত থেকে আরো অধিক পরিহারকারী হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ কেউ যদি কসম করে যে কাঁচা খেজুর খাবেনা। অতঃপর পাকা খেজুর খায় তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা ভক্ষিত ফলটি কাঁচা খেজুর নয়।

১। এখানে একটি মূলনীতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তা এই যে, কোন বিষয়ে বিশেষ কোন গুণের অবস্থায় যদি কসম করা হয় আর গুণটি যদি কসমের কারণ হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হয় তাহলে ঐ গুণ বিদ্যমান থাকার সাথে কসমের সম্পর্ক হবে।

কেউ যদি কসম করে যে, কাঁচা খেজুর বা পাকা খেজুর খাবে না কিংবা পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর খাবে না অতঃপর গোড়ার দিকে পাক ধরা খেজুর খেলো তাহলে সে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কসম ভংগকারী হবে। সাহেবায়নের মতে পাকা খেজুর খেলে কসম ভংগকারী হবে না।

অর্থাৎ কাঁচা খেতে যেটি গোড়ার দিকে কাঁচা খেজুর খাওয়া এবং পাকা খেজুরের ক্ষেত্রে শুধু গোড়ায় পাক ধরা খেজুর খাওয়া দ্বারা কসম ভংগ হবে না।

কেননা গোড়ায় পাক ধরা খেজুরকে কাঁচা খেজুরই বলা হয় এবং শুধু গোড়ার দিকে কাঁচা অবস্থার খেজুরকে কাঁচা খেজুরই বলা হয়। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে কৃত কসমটি ক্রয়ের ব্যাপারে কৃত কসমের মতই হলো। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, কাঁচা-পাকার পরিমাণ যাই হোক, মিশ্র খেজুর ভক্ষণকারী প্রকৃত পক্ষে কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থার খেজুর ভক্ষণকারী হবে। আর ভক্ষণের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে ক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্রয় 'সমগ্র'-এর সাথে যুক্ত হয়। সুতরং অল্প সেখানে অধিকের অনুগামী হয়।

যদি কসম করে যে, পাকা খেজুর ক্রয় করবে না অতঃপর সে কাঁচা খেজুরের গুচ্ছ ক্রয় করে, যাতে কিছু পাকা খেজুরও রয়েছে, তাহলে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা ক্রয় 'সমগ্র' এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এবং স্বল্প অংশটি অনুগামী হবে। পক্ষান্তরে যদি খাওয়ার ব্যাপারে কসম হয় তাহলে কসম ভংগ করা হবে। কেননা ভক্ষণ কর্মটি ধীরে ধীরে বস্তুটির সাথে যুক্ত হয়। ফলে কাঁচা ও পাকা উভয় অংশটি উদ্দেশ্যভুক্ত হবে। সুতরাং এমন হলো যে, যব ক্রয় করবে না বা খাবে না বলে কসম করলো। অতঃপর গম ক্রয় করলো, যাতে কিছু যবের দানা ছিলো এবং সে তা খেলো। এ অবস্থায় ভক্ষণের ক্ষেত্রে কসম ভংগ হবে কিন্তু ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভংগ হবে না। কারণ এটিই, যা আমরা বলেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কসম করে যে, গোশত খাবে না অতঃপর সে মাছের 'মাংস' খেলো, তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কিয়াসের দাবী হচ্ছে কসম ভংগ হওয়া। কেননা কুরআনে মাছের ক্ষেত্রে 'মাংস' ব্যবহার করা হয়েছে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, মাছের ক্ষেত্রে 'মাংস' শব্দের ব্যবহার হচ্ছে রূপক। কেননা মাংসের উৎপত্তি হচ্ছে রক্ত থেকে। অথচ পানিতে বাসকারী মাছের রক্ত নেই।

আর যদি শূকরের কিংবা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে তাহলে কসম ভংগকারী হবে।

কেননা এটি প্রকৃত মাংস তবে তা হারাম আর কসম সংঘটিত হয় হারাম থেকে রোধ করার জন্য।

একই হুকুম হবে যদি কলজে বা পাকস্থলী ভক্ষণ করে।

কেননা প্রকৃত পক্ষে এই মাংস। কেননা এর উৎপত্তি ও বর্ধন রক্ত থেকে। আর মাংসের মতই এগুলো ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন মতে আমাদের প্রচলন অনুযায়ী কসম ভংগ হবেনা। কেননা এটাকে মাংস হিসাবে ধরা হয় না। **ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কসম করে যে, চর্বি খাবে না বা ক্রয়**

করবেনা, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে শুধু উদরের চর্বির ক্ষেত্রেই কসম ভংগ হবে। সাহেবায়ন বলেন, পিঠের চর্বির ক্ষেত্রে কসম ভংগ হবে।

মূলতঃ এটা চর্বি মিশ্রিত মাংস। কেননা তাতে চর্বির বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর সেটা হলো আগুনে গলে যাওয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, যেহেতু এটা রক্ত থেকে উৎপন্ন সেহেতু এটা প্রকৃত মাংস এবং মাংসের মতই ব্যবহৃত হয়। আর তা দ্বারা মাংসের শক্তি অর্জিত হয়। এ কারণেই গোশত না খাওয়ার কসম করার ক্ষেত্রে তা ভক্ষণ করলে কসম ভংগ হয়। অথচ চর্বি বিক্রয় না করার কসমের ক্ষেত্রে তা বিক্রি করলে কসম ভংগ হবে না।

কোন কোন মতে এই মতপার্থক্য হচ্ছে আরবীতে شحم শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে ফার্সিতে پيه (বাংলায় চর্বি) ব্যবহার করলে পৃষ্ঠের চর্বি কোন অবস্থাতেই কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যদি কসম করে যে, গোশত বা চর্বি ভক্ষণ করবে না বা ক্রয় করবে না অতঃপর সে দুম্বার ঝুলন্ত নিতম্ব ক্রয় করলো বা ভক্ষণ করলো তাহলে কসম ভংগ হবে না। কেননা এটা তৃতীয় প্রকার বস্তু এবং তা গোশত বা চর্বির মতো ব্যবহৃত হয় না।

যদি কসম করে যে, 'এই গম' থেকে ভক্ষণ করবে না, তাহলে দাঁতে চিবানো ছাড়া কসম ভংগ হবে না এবং যদি উক্ত গমের তৈরী রুটি ভক্ষণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে কসম ভংগ হবে না। ছাহেবায়ন বলেন, উক্ত গমের রুটি ভক্ষণেও কসম ভংগ হবে।

কেননা প্রচলনে এ ধরনের কথা দ্বারা بر রুটি বোঝান হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, গম ভক্ষণের একটি প্রকৃত অর্থ রয়েছে, যা ব্যবহৃত হয়। কেননা এটা সিদ্ধ করে এবং ভেজে দাঁতে চিবিয়ে খাওয়া হয়। আর ব্যবহৃত প্রকৃত অর্থ প্রচলিত রূপক অর্থের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফার (র) মূলনীতি। আর যদি তা চিবিয়ে খায় তাহলে ছাহেবায়নের মতেও রূপক অর্থের ব্যাপকতার ভিত্তিতে কসম ভংগ হবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। যেমন যদি কসম করে যে, অমুকের বাড়ীতে পা রাখবে না এই 'রূপক অর্থ ব্যাপকতায়' দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। রুটির ক্ষেত্রেও কসম ভংগ হবে বলে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি কসম করে যে, এই আটা থেকে খাবে না অতঃপর ঐ আটার তৈরি রুটি খেলো তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা খোদ আটা 'ভক্ষণীয়' নয়। সুতরাং আটা দ্বারা তৈরি রুটির দিকেই কসমটি অভিমুখী হবে।

যদি আটা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলে তাহলে কসম ভংগ হবে না। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা রূপক অর্থটি (প্রকৃত অর্থ রূপে) নির্ধারিত হয়ে গেছে।

যদি কসম করে যে, রুটি খাবে না, তাহলে তার কসমটি শহরবাসী যে ধরনের রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত তার উপর প্রযোজ্য হবে। আর তা হলো গমের বা যবের রুটি। কেননা অধিকাংশ শহরে এটিই হচ্ছে অভ্যস্ত রুটি। **আর যদি বাদামের তৈরী রুটি খায় তাহলে কসম ভংগ হবে না।** কেননা নিঃশর্ত ভাবে এটাকে রুটি বলা হয় না। তবে এটার নিয়ত করলে কসম ভংগ হবে। কারণ এটা তার বক্তব্যের সম্ভাবনাভুক্ত।

অদ্রূপ ইরাক অঞ্চলে চালের রুটি খেলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা এটা তাদের নিকট অভ্যস্ত রুটি নয়। পক্ষান্তরে তাবরিস্তানে কিংবা যে শহরের সাধারণ খাদ্য হলো চালের রুটি তাদের ক্ষেত্রে কসম ভংগ হবে।

যদি কসম করে যে, 'ভুনা' খাবে না তাহলে তা ভুনা গোশতের উপর প্রয়োজ্য হবে। বেগুন গাজর ভুনার উপর প্রযোজ্য হবে না।

কেননা নিঃশর্ত 'ভুনা' শব্দ দ্বারা ভুনা গোশত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে যদি ডিম ভাজা বা এ জাতীয় অন্য কিছু নিয়ত করে তাহলে প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে তাতেও কসম ভংগ হবে। যদি কসম করে যে, রান্না করা কিছু খাবে না, তাহলে প্রচলনের ভিত্তিতে[১] রান্না করা গোশত উদ্দেশ্য হবে।

এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা বক্তব্যটির ব্যাপকায়ন কঠিন। সুতরাং প্রচলিত বিশিষ্ট ক্ষেত্রের দিকেই কসমকে অভিমুখী করা হবে। আর তা হলো পানি দিয়ে রান্না করা গোশত। তবে যদি অন্য কিছুও নিয়ত করে (তাহলে গ্রহণ করা হবে।) কেননা এতে নিজের উপর কঠোরতা রয়েছে।

আর যদি গোশতের শুরুয়া খায় তাহলেও কসম ভংগ হবে। কেননা এতে গোশতের অংশ রয়েছে। আর এজন্য যে, একে রান্নাকৃত বলা হয়। **যদি কসম করে যে, মাথা খাবে না; তাহলে কসম দ্বারা ঐ সকল মাথা উদ্দেশ্য হবে, যা তন্দুরে ঢুকিয়ে স্যাঁকা হয় এবং বাজারে বিক্রি হয়। পক্ষান্তরে জামে ছাগীর কিতাবের বর্ণনা মতে যদি কসম করে যে, মাথা খাবে না তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গরু ও খাসীর মাথা উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) বলেছেন, শুধু খাসীর মাথা উদ্দেশ্য হবে।**

এটা মূলতঃ (প্রমাণ ভিত্তিক মতপার্থক্য নয়, বরং) দেশ-কাল ভিত্তিক মতপার্থক্য। অর্থাৎ আবু হানীফা (র) এর সময় উভয় মাথার ক্ষেত্রে প্রচলন ছিলো। পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের সময় শুধু খাসীর মাথার ক্ষেত্রে প্রচলন ছিলো। আর আমাদের সময় অভ্যাস ও প্রচলন হিসাবেই ফতোয়া দেয়া হবে। যেমন মুখতাছারুল কুদূরীতে উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কসম করে যে, ফল খাবে না অতঃপর আংগুর বা আনার বা তাজা খেজুর বা কাকরি বা শশা খেলো তাহলে কসম ভংগ হবে না। আর যদি আপেল বা তরমুজ বা কিসমিস খায় তাহলে কসম ভংগ হবে। এ হল ইমাম আবু

১। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোক প্রচলনই হলো মাপকাঠি।

হানীফা (র) এর মত। আর আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) বলেন, আংগুর, তাজা খেজুর ও আনারসের ক্ষেত্রেও কসম ভংগ হবে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, ফল অর্থ যা মূল খাবারের আগে ও পরে বিনোদন মূলক ভাবে খাওয়া হয়। অর্থাৎ অভ্যস্ত পরিমাণের অতিরিক্ত আনন্দ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর বিনোদনমূলক হওয়ার ব্যাপারে কাঁচা ও শুকনো দুটোই সমান, যদি এগুলি বিনোদন হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন থাকে। একারণেই শুকনো তরমুজ খাওয়া দ্বারা কসম ভংগ হবে না। আর এই বিনোদনগত দিকটি আপেল ও অন্যান্য ফলেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে কসম ভংগ হবে। কিন্তু কাকরি ও শশায় তা বিদ্যমান নেই। কেননা এগুলো সবজী রূপেই বিক্রি হয় এবং খাওয়া হয়। সুতরাং এ দুটো খাওয়া দ্বারা কসম ভংগ হবে না।

আর আংগুর, আনার ও তাজা খেজুর সম্পর্কে ছাহেবায়নের বক্তব্য এই যে, বিনোদনগত দিকটি এগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। বরং এগুলো উচ্চমানের ফল। এবং এগুলো দ্বারা বিনোদন অন্যান্য ফলের দ্বারা বিনোদনের চেয়ে অধিক বিদ্যমান।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এগুলো (আংগুর ইত্যাদি) খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয় এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং জীবন ধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বিনোদনের দিকটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। একারণেই উপরোক্ত ফলের শুকনো গুলো মশলা বা খাদ্য রূপে বিবেচিত। **ইমাম মুহম্মদ বলেন, যদি কসম করে যে, সালন খাবে না, তাহলে যা কিছু মিশিয়ে খাওয়া হয় তাই সালন। ভুনা গোশত সালন নয়। লবণ সালন রূপে বিবেচ্য। এ হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, সাধারণতঃ যা কিছু রুটির সাথে খাওয়া হয় তাই সালন।**

ইমাম আবু ইউসূফ (র) থেকে এটি বর্ণিত। কেননা সালন হলো এমন সব কিছু, যা রুটির সংগে (বা ভাতের সংগে) সহযোগী রূপে খাওয়া হয়। যেমন, গোশত, ডিম ইত্যাদি।

শায়খায়নের দলীল এই যে, সালন হলো যা সাধারণভাবে অনুগামী রূপে খাওয়া হয়। আর অনুগামিত্ব হলো প্রকৃতপক্ষে মিশ্রণের মধ্যে যা মূল খাদ্যের সাথে লেগে থাকে। আর যা গুণগত দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে খাওয়া হয় না। আর পূর্ণ সহযোগিত্ব সাব্যস্ত হবে সংমিশ্রণের দ্বারা। আর সিরকা ও অন্যান্য তরল পদার্থ কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে খাওয়া হয় না বরং পান করা হয়। আর লবণ সাধারণতঃ আলাদা খাওয়া হয় না। তাছাড়া এটা দ্রবীভূত হয়ে যায়। সুতরাং তা অনুগামী হিসাবে সালন হবে। গোশত ও এ জাতীয় বস্তু এর বিপরীত। কেননা সেগুলো আলাদা ভাবে খাওয়া যায়। তবে সেগুলোর নিয়ত করলে তাও বিবেচ্য হবে। কেননা এতে কঠোরতা রয়েছে।

আর আংগুর ও তরমুজ ব্যঞ্জন নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত।

যদি কসম করে যে, সকালের আহার করবে না, তাহলে ভোর থেকে সকালের আহার হল দুপুর পর্যন্ত সময়ের খাওয়া। আর বৈকালিক আহার হলো যোহরের সালাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত।

কেননা প্রচলিত অর্থে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে বিকাল বলা হয়। আর এ কারণেই হাদীছ শরীফে যোহরের সালাতকে বৈকালিক দুই সালাতের এক সালাত বলা হয়েছে।

আর সাহরী খাওয়ার দ্বারা মধ্যরাত থেকে সোবহে ছাদেক পর্যন্ত উদ্দেশ্য হবে।

কেননা আরবী, سحور শব্দটি سحر থেকে নির্গত আর তা উক্ত সময় ও তার নিকটতম সময়ের উপর প্রযোজ্য হয়।

অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজ ও নৈশ ভোজ দ্বারা ঐ খাবার উদ্দেশ্য হবে, যা দ্বারা তৃপ্তি পরিমাণ উদর পূর্তি উদেশ্য এবং প্রত্যেক এলাকার জন্য তাদের অভ্যাস বিবেচ্য হবে। এবং অর্ধেকের অধিক তৃপ্তি লাভ শর্ত হবে।

কেউ যদি বলে, যদি আমি পরিধান করি বা আহার করি বা পান করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ অতঃপর সে বললো, আমি কিছু জিনিস বাদ দিয়ে কিছু জিনিস উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে আইন ও দিয়ানাত কোন ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয় উল্লেখকৃত বস্তর ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে পরিধেয় ও অন্যান্য বস্তু প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আর ক্রিয়ার অনিবার্য দাবী রূপে যে কর্মবাচ্য এখানে বিদ্যমান রয়েছে, তাতে ব্যাপকতা নেই। সুতরাং বিশিষ্ট করণের নিয়ত এখানে বাতিল হবে।

আর যদি বলে যে, যদি আমি কোন কাপড় পরিধান করি কিংবা কোন খাবার গ্রহণ করি কিংবা কোন পানীয় পান করি তাহলে (তার উক্ত নিয়ত) শুধু আইনগত ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা গ্রহণ করা হবে না।

কেননা এখানে শর্তবাচক বাক্যে অনির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তাতে ব্যাপকতা হবে এবং বিশিষ্টকরণের নিয়ত কার্যকর হবে। তবে যেহেতু এটা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত সেহেতু আইনগত ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম কুদূরী বলেন, কেউ যদি বলে যে, সে দজলা থেকে পান করবে না। অতঃপর সে পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পানি তুলে পান করলো তাহলে কসম ভংগকারী হবে না। যতক্ষণ না সে মুখ লাগিয়ে দজলা থেকে পান করে। এহল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়নের মতে পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পান করলেও কসম ভংগ হবে।

কেননা প্রচলন অনুযায়ী পাত্র দ্বারা পান করাই বোধগম্য।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, থেকে (من) অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপক। আর মুখ লাগিয়ে পান করাই হলো তার প্রকৃত অর্থ এবং তা-ই ব্যবহৃতও রয়েছে। এ কারণেই মুখ লাগিয়ে পান করা দ্বারা সর্বসম্মতি ক্রমে কসম ভংগ হয়ে যায়। সুতরাং তা রূপক অর্থ গ্রহণকে রোধ করবে। যদিও তা প্রচলিত থাকে।

আর যদি কসম করে যে, দজলার পানি থেকে পান করবে না অতঃপর পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পানি নিয়ে পান করলো, তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা পাত্রে পানি নেওয়ার পরও তার পরিচিতি দজলার সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। আর তা-ই ছিলো কসম ভংগের শর্ত। সুতরাং এমনই হলো যেন ঐ নদী থেকে পানি পান করলো যে নদী দজলা থেকে পানির প্রবাহ লাভ করে।

কেউ যদি বলে এই পাত্রে যে পানি আছে তা যদি আমি আজ পান না করি তাহলে 'তার' স্ত্রী তালাক। অথচ উক্ত পাত্রে পানি নেই, তাহলে কসম ভংগ হবে না। আর যদি পাত্রে পানি থাকে আর ঐ পানি রাত হওয়ার আগেই ফেলে দেওয়া হয় তাহলে কসম ভংগ হবে না। এহল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, সবক'টি ক্ষেত্রেই কসম ভংগ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

একই মতপার্থক্য রয়েছে যদি আল্লাহর নামে কসম করে থাকে।

মতপার্থক্যের মূল এই যে, তারফায়নের মতে কসম সংঘটন হওয়ার এবং তা অব্যাহত থাকার জন্য শর্ত হলো কসম রক্ষা করার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

কেননা কসম সংঘটিত হয় তা রক্ষা করার জন্য। সুতরাং কসম রক্ষার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা জরুরী, যাতে তাকে সে কাজে বাধ্য করা সম্ভব হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, কসম সংঘটিত হওয়ায় কথা এভাবে বলা সম্ভব যে, তা পূর্ণ করা এমনভাবে ওয়াজিব যে, তার প্রকাশ ঘটবে স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে। আর তা হলো কাফফারা। আমাদের বক্তব্য এই যে, মূলের সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাতে কসমটি স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে। একারণেই মিথ্যা কসমে কাফফারা ওয়াজিবকারী হিসাবেও সংঘটিত হয় না। আর কসমটি যদি সময়ে সীমাবদ্ধ না হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে তারফায়নের মতে কসম ভংগ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে তৎক্ষণাৎ কসম ভংগ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সকলেরই মতে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) সময় মুক্ত ও সময়াবদ্ধ ইয়ামীনের মাঝে পার্থক্য করেছেন। পার্থক্যের কারণ এই যে, সময়াবদ্ধ করা হয় প্রশস্ততার জন্য। সুতরাং সময়ের শেষ অংশেই কর্মটি সম্পন্ন করা আবশ্যক। তাই শেষ সময়ের পূর্বে কসম ভংগ হবে না। পক্ষান্তরে সময় মুক্ত কসমের ক্ষেত্রে ইয়ামীনের বক্তব্য থেকে অবসর হওয়া মাত্র কসম পূর্ণ করা আবশ্যক। অথচ সে পূর্ণ করতে অক্ষম। সুতরাং তৎক্ষণাৎ কসম ভংগ হয়ে যাবে।

তারফায়নও উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেছেন। পার্থক্যের কারণ এই যে, সময় মুক্ত কসমের ক্ষেত্রে ইয়ামীনের বক্তব্য থেকে অবসর হওয়া মাত্র কসম পূর্ণ করা আবশ্যক। সুতরাং যে বিষয়ের উপর কসম সম্পন্ন করেছে তা না থাকার কারণে কসম পূর্ণ করার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাব। ফলে তার কসম ভংগ হয়ে যাবে। যেমন যদি পাত্রে পানি থাকা অবস্থায় কসমকারী মারা যায়। পক্ষান্তরে সময়াবদ্ধ কসমের ক্ষেত্রে সময়ের শেষ অংশে কসম পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে সময় সম্ভাব্যতা বিদ্যমান না থাকার কারণে কসম পূর্ণ করার পাত্র বিদ্যমান নেই। সুতরাং ঐ অবস্থায় কসম পূর্ণ করার আবশ্যক হবে না। এবং ইয়ামীন বাতিল হয়ে যাবে। যেমন এই অবস্থায় যদি কসমের সূচনা করতো তাহলে কসম বাতিল গণ্য হতো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, অবশ্যই সে আসমানে আরোহণ করবে কিংবা এই পাথরকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবে তাহলে তার কসম সংঘটিত হবে এবং সংঘটিত হওয়ার পরপরই তা ভংগ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, এই কসম সংঘটিত হবে না। কেননা স্বভাবতঃ তা অসম্ভব। সুতরাং তা প্রকৃত অসম্ভবের সদৃশ হবে। ফলে ইয়ামীন সংঘটিত হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, কসম পূর্ণ করার প্রকৃত সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে। আসমানে আরোহণ করা সম্ভব। তুমি কি জাননা যে, ফিরিস্তাগণ আসমানে আরোহণ করে থাকেন। তদ্রূপ আল্লাহর রূপান্তরিত করা দ্বারা পাথর স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। আর সম্ভাব্যতা যখন বিদ্যমান হলো তখন ইয়ামীনটি তার স্থলবর্তী কাফফারাকে ওয়াজিবকারী অবস্থায় সংঘটিত হয়ে যাবে। অতঃপর বিদ্যমান স্বভাবতঃ অক্ষমতার কারণে কসম ভংগ হয়ে যাবে। যেমন কসমকারী মারা গেলে পুনঃ জীবন লাভ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কসম ভংগ হয়ে যায়।

পাত্রের মাসাআলাটি ভিন্ন। কেননা কসম করার সময় পানিহীন পাত্রের পানি পান করা সম্ভব নয়। সুতরাং সংঘটিত হবে না।

অধ্যায় ঃ কথা বলা সম্পর্কিত ইয়ামীন

ইমাম কুদূরী বলেনঃ কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের সংগে কথা বলবে না অতঃপর তার সংগে এমন ভাবে কথা বললো যে, সে তা শুনতে পারে, কিন্তু সে ঘুমন্ত; তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা সে কথা বলেছে এবং কথা তার কান পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু ঘুমন্ত থাকার কারণে সে বুঝতে পারে নি। ফলে তা এমন হলো যে, তাকে শোনা যায়, এমন দূরত্ব থেকে ডাক দিলো কিন্তু অন্যমনস্কতার কারণে সে তা বুঝতে পারল না।

মাবসূতের কোন কোন বর্ণনা মতে শর্ত এই যে, তার কথার আওয়াজে সে জেগে যায়। আমাদের মাশায়েখগণ এমত পোষণ করেন। কেননা যদি সে জাগ্রত না হয় তাহলে এমনই হলো যে, তাকে দূর থেকে ডাক দিলো আর সে এমন দূরত্বে রয়েছে যে, সে তার আওয়াজ শুনতে পাবে না।

যদি কসম করে যে, তার অনুমতি ছাড়া তার সাথে কথা বলবে না, অতঃপর সে তাকে অনুমতি দিলো কিন্তু সে অনুমতির কথা অবগত না হয়েই তার সাথে কথা বললো, তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা অনুমতি বলা হয় অবহিত হওয়াকে অথবা তার অনুমতি শ্রুতিগোচর হওয়াকে। আর এর মধ্যে কোন ত্রুটিই শ্রবণ ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে কসম ভংগ হবে না। কেননা অনুমতির অর্থ হলো বাধামুক্তি। আর তা এককভাবে অনুমতি দাতার দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমন সন্তুষ্টি এককভাবে সন্তুষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়। আমাদের দলীল এই যে, সন্তুষ্টি হলো অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু অনুমতি তা নয়। যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে। **ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কসম করে যে, তার সঙ্গে এক মাস কথা বলবে না, তাহলে তা কসম করার সময় থেকে গণ্য হবে।**

কেননা যদি সে মাস উল্লেখ না করতো তাহলে উক্ত ইয়ামীন চিরস্থায়ী হতো। সুতরাং মাসের উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাস পরবর্তী সময়কে বাদ দেওয়া। সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষিত অনুযায়ী ইয়ামীন সংলগ্ন সময়কে তার অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে।

আর যদি বলে যে, আল্লাহর কসম আমি এক মাস রোযা রাখবো তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা যদি সে মাস উল্লেখ না করতো তাহলে ইয়ামীন চিরস্থায়ী হতো না। সুতরাং এখানে মাস উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা দ্বারা রোযার মেয়াদ উল্লেখ করা। আর যেহেতু সময়টি অনির্দিষ্ট, সেহেতু তা নির্ধারণের ভার তার উপরই অর্পিত হবে।

আর যদি কসম করে যে, সে কথা বলবে না। অতঃপর সে সালাতের মাঝে তেলাওয়াত করলো তাহলে কসম ভংগ হবে না। আর সালাতের বাইরে তেলাওয়াত করলে ভংগ হবে।

তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর সম্পর্কেও একই সিদ্ধান্ত। অবশ্য কিয়াসের দাবী হলো সালাতের ভিতরে ও বাইরে উভয় অবস্থায় ভংগ হয়ে যাওয়া। এটি ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ-ও কথা।

আমাদের দলীল এই যে, প্রচলনে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সালাতের মধ্যে তিলাওয়াত কথা নয়।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس

আমাদের এই সালাতে মানুষের কোন কথা সমীচীন নয়।

কোন কোন মতে আমাদের প্রচলন অনুযায়ী সালাতের বাইরেও কসম ভংগ হবে না। কেননা এটাকে কথা বলেছে বলে বলা হয় না, বরং কারী ও তসবীহ পাঠকারী বলা হয়।

আর যদি বলে যে, যেদিন অমুকের সাথে কথা বলবো, তার (অর্থাৎ নিজের) স্ত্রী তালাক, তাহলে দিবারাত্রি পূর্ণ সময়ের সাথে কসমের সম্পর্ক হবে।

কেননা দিন শব্দটি যখন অপ্রলম্বিত কোন কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ

আর কথা প্রলম্বিত কর্ম নয়।

আর যদি শুধু দিবস উদ্দেশ্য করে থাকে তাহলে আইনগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা দিন শব্দটি দিবস অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আইনগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা প্রচলনের বিপরীত। **আর যদি বলে যে, রাত্রে অমুকের সাথে কথা বলবো, তাহলে কসমটি শুধু রাত্রের সাথে সম্পৃক্ত হবে।**

কেননা এর প্রকৃত অর্থ হলো সময়ের অন্ধকার অংশ। যেমন দিবসের প্রকৃত অর্থ হলো সময়ের আলোকিত অংশ। আর সাধারণ সময় অর্থে এর ব্যবহার নেই।

আর যদি বলে যে, যদি অমুক আসার পূর্বে কিংবা অমুকের অনুমতি দানের পূর্বে অমুকের সাথে কথা বলি কিংবা যদি বলে যে, যতক্ষণনা অমুক আগমন করে কিংবা অনুমতি দান করে তাহলে 'তার' স্ত্রী তালক। অতঃপর অমুকের আগমনের কিংবা অনুমতি দানের পূর্বে অমুকের সাথে কথা বললো, তাহলে সে কসম ভংগকারী হবে। আর যদি আগমনের এবং অনুমতি দানের পরে কথা বলে তাহলে কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা আগমন ও অনুমতি প্রদান হচ্ছে ইয়ামীন রক্ষা করার সীমা। আর সীমার পূর্বে ইয়ামীন অব্যাহত থাকে এবং সীমার পরে সমাপ্তি লাভ করে। সুতরাং ইয়ামীনের সমাপ্তির পর কথা বলা দ্বারা কসম ভংগ হবে না।

আর যদি (অনুমতিদাতা বা আগমনকারী) অমুক মারা যায় তাহলে ইয়ামীন রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

কেননা কসমকারীর জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে ঐ কথা, যার নিষিদ্ধতা অনুমতি দান বা আগমন দ্বারা সমাপ্তি লাভ করবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকেনি। সুতরাং ইয়ামীন রহিত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে সম্ভাব্যতা শর্ত নয়। সুতরাং সীমা বিলুপ্ত হওয়ার পর ইয়ামীন চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের গোলামের সাথে কথা বলবে না, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন গোলামের নিয়ত করলো না। কিংবা অমুকের স্ত্রীর সাথে কিংবা অমুকের বন্ধুর সাথে

কথা বলবে না। অতঃপর অমুক তার গোলাম বিক্রি করে ফেললো কিংবা স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো কিংবা বন্ধুর সাথে শত্রুতা হয়ে গেলো অতঃপর সে তাদের সাথে কথা বললো, তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা সে তার কসমকে এমন ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা অমুকের সাথে সম্বন্ধিত পাত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। হয় তার সাথে মালিকানার সম্বন্ধ কিংবা তার প্রতি সম্পর্কের সম্বন্ধ। আর কথা বলার সময় এই সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিলো না। সুতরাং কসম ভংগ হবে না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, মালিকানার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। পক্ষান্তরে সম্পর্কের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে কসম ভংগ হবে। যেমন স্ত্রী ও বন্ধু। زيادات-এ ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন, এর কারণ এই যে, উক্ত সম্বন্ধ হচ্ছে পরিচয় প্রদানের জন্য। কেননা স্ত্রী বা বন্ধুর সত্তাই হচ্ছে কথা বর্জনের পাত্র। সুতরাং পরিহাসের স্থায়িত্ব শর্ত নয়। বরং তাদের সত্তার সাথে হুকুম সম্পৃক্ত হবে। যেমন তাদের প্রতি ইশারা মাধ্যমে কসম করার ক্ষেত্রে হয়।

জামে ছাগীরের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে যে সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ এই যে, এখানে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার উদ্দেশ্য হলো যার সাথে সম্বন্ধ রয়েছে তার কারণেই তাদের সাথে কথা বর্জন করা। এ কারণেই বর্জনকৃত সত্তাকে নির্দিষ্ট করেনি। সুতরাং এই সন্দেহের কারণে সম্বন্ধ শেষ হওয়ার পর কসম ভংগ হবে না।

আর যদি নির্দিষ্ট কোন গোলামের ক্ষেত্রে কসম করে; যেমন বললো, অমুকের এই গোলামের সাথে কিংবা অমুকের নির্দিষ্ট স্ত্রীর সাথে কিংবা নির্দিষ্ট বন্ধুর সাথে (কথা বলবোনা) তাহলে গোলামের ক্ষেত্রে কসম ভংগ হবে না। কিন্তু স্ত্রী ও বন্ধুর ক্ষেত্রে কসম ভংগ হবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, গোলামের ক্ষেত্রেও কসম ভংগ হবে।

এটা ইমাম যুফার (র) এরও মত।

আর যদি কসম করে যে, অমুকের এই বাড়ীতে প্রবেশ করবো না। অতঃপর সে তা বিক্রি করে ফেললো আর সে তাতে প্রবেশ করলো তাহলে তাতেও এই মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মুহম্মদ ও যুফার (র) এর দলীল এই যে, সম্বন্ধ হচ্ছে পরিচয়ের জন্য। আর পরিচয়ের ব্যাপারে ইশারা হচ্ছে অধিকতর পরিচয়জ্ঞাপক। কারণ এতে অন্যের অন্তর্ভুক্তি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সম্বন্ধের বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং ইশারাই বিবেচ্য হবে এবং সম্বন্ধের বিবেচনা অকার্যকর হয়ে যাবে। আর ইংগিত কৃত গোলামের বিষয়টি বন্ধু ও স্ত্রীর অনুরূপ হয়ে যাবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, ইয়ামীনের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কারণটি তার মাঝেই নিহিত যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা এসকল জিনিস বর্জন করা হয় না আর সত্তাগত কারণে এগুলোর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা হয় না। তদ্রূপ গোলামকে নিম্ন শ্রেণীর হওয়ার কারণে বর্জন করা হয় না। বরং মনিবের মাঝে নিহিত কোন কারণেই বর্জন করা হয়। সুতরাং মালিকানা বিদ্যমান থাকার অবস্থার সাথেই কসমটি বন্ধনযুক্ত হবে।

আর সম্বন্ধ যদি নিছক পরিচয়ের জন্য হয়, যেমন স্ত্রী ও বন্ধু, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সত্তাগত কারণেও এদের সাথে শত্রুতা করা হয়। সুতরাং সম্বন্ধের উল্লেখ শুধু পরিচয়ের

জন্য হবে। আর যার সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তার মাঝে উদ্বুদ্ধকারী কারণটি বিদ্যমান থাকার বিষয়টি অস্পষ্ট। কেননা, বর্জনের উদ্দেশ্য হিসাবে সে সুনির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লেখকৃত মালিকানাগত সম্বন্ধের বিষয়টি ভিন্ন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি কসম করে যে, এই জুব্বা পরিধানকারীর সাথে কথা বলবে না, অতঃপর সে তা বিক্রি করে ফেললো আর সে তার সাথে কথা বললো, তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা এই সম্বন্ধের উল্লেখ পরিচয় ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা মানুষ জুব্বার সাথে সম্পৃক্ত কোন কারণে কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না। সুতরাং এটা জুব্বাওয়ালার দিকে ইশারা করে পান করার মত হল।

কেউ যদি কসম করে যে, এই যুবকের সাথে কথা বলবে না, অতঃপর বৃদ্ধ অবস্থায় সে তার সাথে কথা বললো, তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুণের উল্লেখ যেহেতু অর্থহীন হবে এবং যেহেতু এই গুণটি ইয়ামীনের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী নয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু হুকুমের সম্পর্ক হবে ইংগিতকৃত ব্যক্তির সাথে।

অনুচ্ছেদ ঃ

ইমাম কুদূরী বলেন, কেউ যদি (আরবী ভাষায়) বলে,

لااكلمه حينا او زمانا اوالحين أو الزمان

আমি তার সংগে কথা বলবো না বিশেষ কালে বা বিশেষ সময়ের মধ্যে, তাহলে এ কসমের মেয়াদ ছয়মাস পর্যন্ত হবে। কেননা বিশেষ সময় দ্বারা কখনো সামান্য সময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কখনো চল্লিশ বছর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ আবার কখনো ছয়মাস উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন تؤتى أكلها كل حين আর এটা হলো মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং উচ্চারিত শব্দকে উক্ত সময়ের দিকে অভিমুখী করা হবে। এর কারণ এই যে, সময়ের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য বারণ করা উদ্দেশ্য হয় না। কেননা স্বল্প সময়ের জন্য বিরত থাকা সচরাচর হয়েই থাকে, আর বিশেষ সময় শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ চিরস্থায়ীকাল উদ্দেশ্য হয় না। কেননা এটা 'সর্বদা'র স্থলবর্তী। আর যদি 'বিশেষ সময়' বলা থেকে বিরত থাকতো তাহলে নিজে নিজেই কসমটি চিরকালের জন্য হয়ে যেতো। তাই আমরা যে সময় উল্লেখ করেছি তা-ই নির্ধারিত হল। তদ্রূপ 'কাল' শব্দটি 'সময়' এর স্থলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়ে থাকে, তোমাকে বিশেষ সময় থেকে দেখিনি বা বিশেষ কাল থেকে দেখিনি-এ উভয়টির মর্ম একই।

আর ছয় মাসের সিদ্ধান্ত তখনই হবে, যখন তার কোন নিয়ত না থাকে। যদি কোন সময়ের নিয়ত করে থাকে তা হলে যা নিয়ত করেছে,তাই ধর্তব্য হবে।

কেননা সে তার কথার প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে.

ছাহেবায়নের মতে الدهر (কাল) শব্দ দ্বারাও ছয় মাসই উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমি জানিনা الدهر এর কী অর্থ।

এই মতপার্থক্য نكرة (অনির্দিষ্টতা) জ্ঞাপক শব্দের ক্ষেত্রে, এটাই বিশুদ্ধ মত। ال যুক্ত নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে এটা দ্বারা স্থায়ীকাল বোঝানো হয়। ছাহেবায়নের দলীল এই যে, دهر শব্দটি حين বা زمان এর সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, আমি তোমাকে এককাল ও এক সময় থেকে দেখিনি–একথা দুটি সমার্থক।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) শব্দটির অর্থ নির্ধারণে মত প্রকাশে বিরত রয়েছেন। কেননা কিয়াস দ্বারা শব্দের অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। আর ব্যবহারগত পার্থক্যের কারণে প্রচলনের অব্যাহততা জানা যায়নি।

কেউ যদি কসম করে বলে لايكلمه اياما (সে তার সাথে কয়েক দিন কথা বলবো না) তাহলে তিন দিন উদ্দেশ্য হবে।

কেননা এখানে বহুবচনের শব্দকে অনির্দিষ্ট রূপে (نكرة রূপে) ব্যবহার করা হয়েছে; সুতরাং তা বহু বচনের সর্বনিম্ন পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তা হল তিন দিন।

যদি কসম করে বলে لايكلمه الشهور সে তার সাথে কয়েক মাস কথা বলবে না। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে দশদিন উদ্দেশ্য হবে। আর ছাহেবায়নের মতে এক সপ্তাহ উদ্দেশ্য হবে। আর যদি কসম করে বলে, لايكلمه الشهور (সে তার সাথে বহুমাস কথা বলবে না) তাহলে ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মতে দশমাস উদ্দেশ্য হবে। আর ছাহেবায়নের মতে বারমাস উদ্দেশ্য হবে। কেননা দিন যেহেতু সপ্তাহে আর মাস বছরে আবর্তিত হয় সেহেতু নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক ال দ্বারা যা উদ্দেশ্য হবে আমরা তাই উল্লেখ করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এটা হল নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক বহুবচন। সুতরাং বহুবচন দ্বারা যে সংখ্যা বোঝানো হয়, তার সর্বোচ্চ পরিমাণ উদ্দেশ্য হবে। আর তা হলো দশ দিন।

الجمع (বহু সপ্তাহ) ও السنون (বহু বছর) উল্লেখের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর নিকট একই হুকুম হবে। আর ছাহেবায়নের মতে সারা জীবন বুঝান হবে।

কেননা এর নীচে শব্দদ্বয়ের কোন নির্ধারিত সীমা নেই।

কেউ যদি তার গোলামকে বলে "তুমি যদি অনেক দিন আমার খিদমত কর" তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে অনেক দ্বারা দশদিন উদ্দেশ্য হবে।

কেননা এটা হচ্ছে ايام (অনেকদিন) এর সর্বোচ্চ সংখ্যা। আর ছাহেবায়ন বলেন, সাতদিন উদ্দেশ্য হবে। কেননা এর অতিরিক্ত দিনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি বক্তব্যটি ফারসি ভাষায় হয়, তাহলে সাতদিনই উদ্দেশ্য হবে। কেননা সেখানে 'দিন' শব্দটি বহুবচনের পরিবর্তে একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায় ঃ মুক্তিদান ও তালাক সংক্রান্ত ইয়ামীন

কেউ যদি আপন স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি সন্তান প্রসব কর তাহলে তুমি তালাক। অতঃপর সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করলো, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি আপন দাসীকে বলে যে, যদি তুমি সন্তান প্রসব কর, তবে তুমি আযাদ।

কেননা যে শিশুর জন্ম হয়েছে তা প্রকৃত অর্থেই সন্তান এবং প্রচলনে তাকে সন্তান বলা হয়। আর শরীয়তও এটাকে সন্তান বিবেচনা করে। একারণেই এর দ্বারা ইদ্দত সম্পন্ন হয়। এবং পরবর্তীতে নির্গত রক্ত নেফাস রূপে গণ্য হয়। আর ঐ সন্তানের মাতাকে মনিবের উম্মে ওয়ালাদ গণ্য করা হয়। সুতরাং সন্তান জন্ম দানের শর্ত বিদ্যমান হবে।

যদি বলে যে, যখন তুমি কোন সন্তান প্রসব করবে তখন ঐ সন্তান আযাদ। অতঃপর (প্রথমে) একটি মৃত সন্তান প্রসব করলো এবং পরবর্তীতে একটি জীবিত সন্তান প্রসব করলো, এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে শুধু জীবিত সন্তানটি আযাদ হবে। আর ছাহেবায়নের মতে উভয়টির একটিও আযাদ হবে না।

কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণনা মতে মৃত সন্তান প্রসবের মাধ্যমে শর্ত পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং ফলাফল ছাড়াই ইয়ামীন শেষ হয়ে যাবে। কেননা মৃত সন্তান আযাদ হওয়ার পাত্র নয়। আর তাই ছিলো ইয়ামীনের ফলাফল।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'সন্তান' শব্দটি প্রাণ গুণের সাথে বিশিষ্ট। কেননা এখানে ইয়ামীনের ফলাফল রূপে 'মুক্তি' সাব্যস্ত করার ইচ্ছে করেছে। আর এটা হচ্ছে একটা বিধানগত শক্তি, যা অন্যের হস্তক্ষেপ রোধ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। আর এ গুণ মৃতের মাঝে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং তা প্রাণগুণের সাথে বিশিষ্ট হবে। তাই বিষয়টি এমনই হলো, যেন সে বললো যদি তুমি 'জীবিত' সন্তান প্রসব করো। পক্ষান্তরে তালাক ও মাতার মুক্তির ফলাফলের বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা (যেহেতু এই পরিণতিটি সন্তানের জীবিত হওয়া না হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয় সেহেতু) তা জীবিত থাকার গুণের শর্ত আরোপকারী হওয়ার যোগ্য নয়।

আর যদি বলে, প্রথম যে গোলামটি আমি খরিদ করবো সে আযাদ; অতঃপর সে একটি গোলাম ক্রয় করলো, তখন উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা 'প্রথম' শব্দের একটি পূর্ববর্তী বস্তু যাতে অন্য (বস্তু) অংশীদার নয়।

যদি এক সাথে দুটি গোলাম খরিদ করে অতঃপর অন্য একটি গোলাম খরিদ করে তাহলে তাদের একটিও আযাদ হবে না।

কেননা প্রথম দু'টিতে একত্ব নেই, আর তৃতীয়টিতে পূর্ববর্তীতা নেই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে 'প্রথমত' (শর্ত) বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আর যদি বলে, প্রথম যে গোলামটি এককভাবে খরিদ করবো তা আযাদ, তাহলে তৃতীয় গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা এর অর্থ হলো ক্রয়ের অবস্থার এককত্ব। আর তৃতীয় গোলামটি এই গুণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী।

আর যদি বলে, শেষ যে গোলামটি খরিদ করবো, তা আযাদ। অতঃপর সে একটি গোলাম খরিদ করলো এবং মনিব মারা গেলো; তাহলে গোলামটি আযাদ হবে না।

কেননা 'শেষ' বলা হয় ঐ বস্তুকে, যা কোন বিষয়ে পরবর্তী হয়েছে। অথচ এখানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে গোলামটির কোন পূর্ববর্তী নেই। সুতরাং সে পরবর্তী হবে না।

আর যদি একটি গোলাম খরিদ করার পর আরেকটি খরিদ করে অতঃপর মৃত্যু বরণ করে তাহলে শেষেরটি আযাদ হবে।

কেননা এটি হচ্ছে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী। সুতরাং সে 'শেষত্ব' গুণ সম্পন্ন হয়েছে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ক্রয়ের দিন আযাদ হবে (মৃত্যুর পর নয়)। ফলে সমগ্র মাল থেকে তার মুক্তি বিবেচিত হবে। ছাহেবায়ন বলেন, যে দিন তার মৃত্যু হয়েছে, সে দিন আযাদ হবে। ফলে এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে মুক্তি বিবেচিত হবে।

কেননা গোলামটির মাঝে 'শেষত্ব' সাব্যস্ত হবে না; তার পরে অন্য গোলাম ক্রয় না করা পর্যন্ত। আর সেটা মৃত্যুর পরেই সাব্যস্ত হবে। সুতরাং শর্তটি মৃত্যুর সময় সম্পন্ন হবে। সুতরাং মৃত্যুকালের সাথে মুক্তির বিষয়টি সীমাবদ্ধ হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, মৃত্যু হচ্ছে 'সর্বশেষত্ব'-এর পরিচায়ক। আর গোলামের 'সর্বশেষত্ব' গুণ বিশিষ্ট হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে ক্রয়ের সময়কাল থেকে সাব্যস্ত হবে।

একই মতপার্থক্য রয়েছে' সর্বশেষত্ব' গুণের সাথে তিন তালাক সম্পৃক্ত করার বিষয়টি।

এই মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে মীরাছ পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রে।

কেউ যদি বলে, যে কোন গোলাম আমাকে অমুকের সন্তান জন্ম দানের সুসংবাদ দান করবে সে আযাদ হবে। অতঃপর পৃথক পৃথক ভাবে তিনজন গোলাম তাকে সুসংবাদ দান করলো, তাহলে প্রথম গোলামটি শুধু আযাদ হবে।

কেননা সুসংবাদ হচ্ছে এমন সংবাদ, যা চেহারার ভাব পরিবর্তন ঘটায় এবং প্রচলনে তা আনন্দদায়ক হওয়া শর্ত। এবং তা শুধু প্রথম গোলামের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়।

আর যদি তারা এক সাথে তাকে সংবাদ দান করে তাহলে সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। কেননা সুসংবাদ দানের মর্ম সকলের থেকেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

যদি সে বলে যে, যদি আমি অমুক গোলামটি খরিদ করি তাহলে সে আযাদ। অতঃপর সে তাকে কসমের কাফফারা আদায়ের নিয়তে খরিদ করলো তাহলে কাফফারা আদায় হবে না।

কেননা কাফফারা আদায় হওয়ার শর্ত হলো কাফফারা আদায়ের নিয়ত মুক্তির কারণের সাথে সংলগ্ন হওয়া, আর তাহলো কসম। আর এখানে হলো মুক্তিদানের শর্ত। (মুক্তির নিয়ত ক্রয়ের সাথে সংলগ্ন হয়েছে, কসমের সাথে নয়)।

যদি কসমের কাফফারা প্রদানের নিয়তে আপন পিতাকে খরিদ করে তাহলে আমাদের মতে তা কাফফারা হিসাবে জায়েয হবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের দলীল এই যে, ক্রয় হলো মুক্তির শর্ত। আর মুক্তির কারণ হল আত্মীয়তা।

এটা এই কারণে যে, ক্রয় অর্থ মালিকানা সাব্যস্তকরণ এবং মুক্তিদান অর্থ মালিকানা রহিতকরণ। আর উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, আত্মীয়কে ক্রয় করার অর্থই হলো মুক্তিদান করা। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لن يجزى ولد والده الا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه

কোন সন্তান তার পিতার প্রতিদান দিতে পারে না, তবে যদি তাকে গোলাম অবস্থায় পায় আর খরিদ করে ও আযাদ করে।

এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ক্রয়কেই মুক্তিদান সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তিনি মুক্তির জন্য ক্রয় ছাড়া অন্য কিছুকে শর্ত সাব্যস্ত করেননি। সুতরাং এমনই হলো যেন বলা হলো سقاه فأرواه সে তাকে পান করিয়েছে এবং পরিতৃপ্ত করেছে।

যদি সে তার উম্মে ওয়ালাদকে খরিদ করে তাহলে তা যথেষ্ট হবে না।

(জামে ছাগীর উপস্থাপিত) এই মাসআলারি অর্থ এই যে, বিবাহের মাধ্যমে যে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে, তাকে বললো, যদি তোমাকে খরিদ করি তাহলে আমার পূর্ববর্তী একটি ইয়ামীনের কাফফারা হিসাবে তুমি আযাদ। অতঃপর সে তাকে ক্রয় করলো। তাহলে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কাফফারা হিসাবে বিবেচিত হবে না।

কেননা সন্তান উৎপাদনের ভিত্তিতেই সে মুক্তির অধিকারিণী হয়ে গেছে। সুতরাং মুক্তির বিষয়টি সর্বোতভাবে ইয়ামীনের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সে কোন দাসীকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে ক্রয় করি তাহলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে, ইয়ামীনের কাফফারা দিয়েছ যথেষ্ট হবেনা যদি সে তাকে ক্রয় করে।

কেননা এখানে অন্য কোন দিক থেকে তার মুক্তি অনিবার্য হয়নি। সুতরাং ইয়ামীনের দিকে মুক্তির সম্বন্ধে ত্রুটি হয়নি। আর কাফফারার নিয়ত ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

কেউ যদি বলে, আমি কোন দাসীকে যদি উপপত্নী রূপে গ্রহণ করি তাহলে সে আযাদ। অতঃপর সে নিজের মালিকানার কোন দাসীকে উপপত্নী রূপে গ্রহণ করলো, তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা এই দাসীর ক্ষেত্রে ইয়ামীন বা শর্তায়ন সংঘটিত হয়েছে। কারণ ইয়ামীন বা শর্তায়ন মালিকানার সাথে যুক্ত হয়েছে। এটা এ কারণে যে, এই শর্তায়নের ক্ষেত্রে দাসী শব্দটি অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক। সুতরাং আলাদাভাবে প্রতিটি দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আর যদি কোন দাসীকে ক্রয় করার পর উপপত্নী বানায় তাহলে এই ইয়ামীনের আওতাধীনে আযাদ হবে না।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মালিকানা ছাড়া উপপত্নী গ্রহণ বৈধ নয়। সুতরাং উপপত্নী গ্রহণের কথা উল্লেখ করা অর্থই হলো মালিকানার কথা উল্লেখ

করা। সুতরাং এমনই হলো, যেন কোন পর নারীকে বললো, যদি তোমাকে তালাক প্রদান করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এখানে বিবাহ করার বিষয়টি অনিবার্যভাবে উল্লেখিত ধরা হয়।

আমাদের দলীল এই যে, উপপত্নীত্বের বৈধতার অনিবার্য কারণে মালিকানা উল্লেখিত রয়েছে বলে ধরা হয়। আর এটা বৈধতার শর্ত। সুতরাং অনিবার্যতার সীমা পর্যন্ত তা সীমিত থাকবে। ফলে ইয়ামীনের পরিণতি অর্থাৎ মুক্তির ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে না।

পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে বিবাহগত মালিকানা প্রকাশ পায় শর্তের ক্ষেত্রে جزاء বা পরিণতির ক্ষেত্রে নয়। এমনকি যদি সে ঐ স্ত্রীলোকটিকে বলে, যদি তোমাকে তালাক দেই তাহলে তুমি তিন তালাক। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করলো এবং তালাক প্রদান করলো তাহলে তিন তালাক হবে না। সুতরাং এটা হলো আমাদের পূর্ববর্তী মাসআলার সমতুল্য।

কেউ যদি বলে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আযাদ, তাহলে তার উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার এবং গোলাম সকলেই আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা এদের সকলের ক্ষেত্রে পূর্ণ মালিকানার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কারণ তাদের উপর সত্তাগত ও কর্তৃত্বগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

আর তার মোকাতাব গোলামগণ নিয়ত ছাড়া আযাদ হবে না।

কেননা তার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বগত মালিকানা বিদ্যমান নেই। একারণেই মনিব তার উপার্জনাদির মালিক হয় না। এবং মোকাতাব দাসীর সাথে সহবাস বৈধ নয়। উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং মুকাতাবের ক্ষেত্রে মালিকানা সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। ফলে নিয়ত জরুরী।

কেউ যদি তার স্ত্রীদের সম্পর্কে বলে যে, এইটি অথবা এইটি আর এইটি তালাক। তাহলে সর্বশেষটি তালাক হয়ে যাবে। আর প্রথম দুটির ব্যাপারে তার নির্ধারণের এখতেয়ার রয়েছে। কেননা 'অথবা' শব্দটির দাবী হচ্ছে দুটির যে কোন একটিকে সাব্যস্ত করা। এবং অথবা অব্যয়টি প্রথম দুজনের মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়টিকে তালাক প্রাপ্তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা 'আর' অব্যয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিন্নতা। অতএব সিদ্ধান্তের পাত্রের সাথে যুক্ততা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন সে বললো, তোমাদের দুজনের একজন এবং এইটি তালাক।

তদ্রূপ যদি সে তার গোলামদের সম্পর্কে বলে, এটি কিংবা এটি এবং এটি আযাদ। তাহলে আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে তৃতীয় গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে এবং প্রথম দুজনের ব্যাপারে তার এখতেয়ার থাকবে।

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ে কসম

কেউ যদি কসম করে যে, ক্রয় করবে না কিংবা বিক্রয় করবে না কিংবা ভাড়া নেবে না। অতঃপর ঐ কাজে অন্য কাউকে ওকীল নিযুক্ত করলো, যে এ কাজ সম্পাদন করে নেয়, তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা চুক্তি সংঘটিত হয়েছে চুক্তিকারী (উকিলের) দ্বারা। এ জন্য যাবতীয় দায় দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হয়। আর এ কারণেই কসমকারী যদি স্বয়ং চুক্তিকারী হয়, তবে তার কসম ভংগ হয়ে যাবে। সুতরাং আদেশদাতার তরফ থেকে চুক্তি করণের শর্ত পাওয়া যায়নি। অবশ্য তার অনুকূলে চুক্তির হুকুম সাব্যস্ত হবে।

তবে যদি সে তা নিয়ত করে (তাহলে সেটাও ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হবে।)

কেননা এতে কঠোরতা রয়েছে।

অথবা যদি কসমকারী কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়, যে নিজে চুক্তিটুক্তি করে না। কেননা কসমের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অভ্যস্ত জিনিস থেকে বিরত রাখে।

কেউ যদি কসম করে যে, বিবাহ করবে না কিংবা তালাক দেবেনা কিংবা আযাদ করবে না। অতঃপর এ ব্যাপারে কাউকে ওকীল নিযুক্ত করলো তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা এ ক্ষেত্রে ওকীল হচ্ছে নিছক দূত এবং অন্যের বক্তব্য উচ্চারণকারী। এ কারণেই ওকীল এসব কর্মকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে না, বরং আদেশদাতার দিকে সম্পৃক্ত করে এবং চুক্তির দায় দায়িত্ব সমূহ আদেশদাতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়; উকিলের দিকে নয়।

যদি বলে যে, এ কসমের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, ঐ শব্দগুলো আমি নিজে উচ্চারণ করবো না। তাহলে বিশেষভাবে বিচারের ক্ষেত্রে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

ইনশাআল্লাহ পার্থক্য বর্ণনাকালে এর অন্তর্নিহিত কারণের দিকে আমরা ইংগিত করবো।

আর যদি কসম করে যে, সে আর গোলামকে প্রহার করবে না। কিংবা সে তার বকরী যবেহ করবে না। অতঃপর অন্যকে আদেশ করলো। আর সে তা করলো, তাহলে তার কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা নিজের গোলামকে প্রহার করার এবং নিজের বকরী যবেহ করার অধিকার মনিবের রয়েছে। সুতরাং অন্যকেও এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানের অধিকার তার আছে। অতঃপর এই কাজের সুফল আদেশদাতার দিকে ফিরে আসে। সুতরাং তাকেই কর্মসম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে। কেননা এখানে এমন কোন দায় দায়িত্ব নেই, যা আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আর যদি (কসমকারী) বলে যে, আমার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, আমি নিজে তা করবো না, তাহলে বিচারের ক্ষেত্রেও তার কথা বিশ্বাস করা হবে।

কিন্তু পূর্বে বর্ণিত তালাক ও অন্যান্য বিষয়গুলোর হুকুম ভিন্ন। পার্থক্যের কারণ এই যে, তালাক অর্থই হচ্ছে এমন কথা উচ্চারণ করা, যা স্ত্রীর উপর তালাক সাব্যস্ত হওয়ার পরিণতি লাভ করবে। আর তালাক প্রদানের আদেশ করা তালাকের শব্দ উচ্চারণ করার সমতুল্য এবং ইয়ামীনের উচ্চারিত বক্তব্য নিজে উচ্চারণ এবং আদেশ দান উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যখন সে নিজে উচ্চারণের দিকটি নিয়ত করলো তখন সে ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন শব্দ দ্বারা বিশেষ অর্থের নিয়ত করলো। সুতরাং দিয়ানাতের দিক থেকে তা বিশ্বাস করা হবে, আইনের ক্ষেত্রে নয়।

পক্ষান্তরে প্রহার ও যবেহ হচ্ছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার, যা পরিণতির দ্বারা জানা যায়। এক্ষেত্রে আদেশ দাতার দিকে কর্মটির সম্পৃক্তি হচ্ছে কারণ হিসেবে রূপক অর্থে। সুতরাং সে যখন নিজে কর্মটি না করার নিয়তের কথা বললো তখন সে উচ্চারিত বক্তব্যের প্রকৃত অর্থেরই নিয়ত করলো। সুতরাং দিয়ানাত আইন উভয় দিক থেকে বিশ্বাস করা হবে।

কেউ যদি কসম করে যে, সে নিজে তার সন্তানকে প্রহার করবে না, অতঃপর সে অন্য একজনকে আদেশ করলো, আর সে তাকে প্রহার করলো তাহলে তার কসম ভংগ হবে না। কেননা সন্তানকে প্রহারের সুফল আর তাহল আদব ও শিষ্টাচার সন্তানের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মটি আদেশদাতার দিকে সম্পৃক্ত হবে না।

পক্ষান্তরে গোলামকে প্রহারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে প্রহারের সুফল হচ্ছে আদেশদাতার প্রতি গোলামের অনুগত হওয়া। সুতরাং আদেশদাতার দিকেই কর্মটির সম্বন্ধ হবে।

কেউ যদি অন্যকে বলে যে, যদি এই কাড়পটি তোমার পক্ষে বিক্রি করি তাহলে 'তার' স্ত্রী তালাক, অতঃপর যার সাথে কসম করা হয়েছে, সে তার কাপড়কে কসমকারীর কাপড়ের সাথে মিলিয়ে ফেললো আর কসমকারী তা না জেনে বিক্রি করলো, তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা এখানে 'পক্ষে' শব্দটি বিক্রির সাথে সংশ্লিষ্ট, যার দাবী হচ্ছে বিক্রয় কর্মকে ঐ ব্যক্তির সাথে বিশিষ্ট করা। আর তা হবে তার আদেশে বিক্রয়কর্মটি করা দ্বারা। কেননা বিক্রয় কর্মে প্রতিনিধিত্বের অবকাশ রয়েছে। আর এখানে তা পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে যদি বলে, যদি আমি তোমার কোন কাপড় বিক্রি করি তাহলে তার মালিকানার কোন কাপড় বিক্রি দ্বারা কসম ভংগ হয়ে যাবে। তার আদেশে করুক কিংবা আদেশ ছাড়া করুক এবং বিষয়টি তার জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে হোক। কেননা এখানে উক্ত ব্যক্তির কাপড় বিক্রয় বোঝান হয়েছে। আর এর দাবী হল ব্যক্তিটির সাথে কাপড়ের বিশিষ্টতা থাকা। আর তা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মালিকানা ভুক্ত থাকা দ্বারা।

বিক্রয় এর নযীর হল রং করা, সেলাই করা সহ এমন সকল মু'আমেলা, যাতে অন্যের প্রতিনিধিত্বের অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে আহার করা, পান করা এবং আপন সন্তানকে প্রহার করার বিষয়টি ভিন্ন।

কেননা এগুলোতে প্রতিনিধিত্বের অবকাশ নেই। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে উভয় অবস্থায় সিদ্ধান্ত ভিন্ন হবে না।

কেউ যদি কসম করে যে, যদি এই গোলামটিকে বিক্রি করি তাহলে সে আযাদ, অতঃপর সে তাকে ইচ্ছাধিকারের শর্তে বিক্রি করলো তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মুক্তির শর্ত অর্থাৎ বিক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে এবং গোলামটিতে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তার পরিণতি সাব্যস্ত হবে।

তদ্রূপ যদি ক্রেতা বলে যে, যদি আমি তাকে খরিদ করি তাহলে সে আযাদ। অতঃপর সে তাকে ইচ্ছাধিকারের শর্তে খরিদ করলো, তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মুক্তির শর্ত অর্থাৎ ক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে।

আর গোলামের মাঝে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে।

ছাহেবায়নের মূলনীতি অনুযায়ী মালিকানা বিদ্যমান থাকা তো পরিষ্কার। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মূলনীতি অনুসারেও তাই।

কেননা এই মুক্তিটি তার শর্তায়নের কারণে সাব্যস্ত হচ্ছে। আর অস্তিত্বের ব্যাপারে শত্যায়ীত বিষয় অশত্যায়ীত বিষয়েরই মত।

এমতাবস্থায় যদি তাৎক্ষণিক আযাদ করে তাহলে মুক্তি দানের সংলগ্নপূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

যদি কেউ বলে যে, যদি এই গোলামটি কিংবা এই দাসীটি আমি বিক্রি না করি তাহলে 'তার' স্ত্রী তালাক; অতঃপর সে (উক্ত দাস বা দাসীকে) আযাদ করে দিলো, কিংবা মুদাব্বার ঘোষণা করলো; তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

কেননা বিক্রির 'পাত্রত্ব' বিলুপ্ত হওয়ার কারণে বিক্রি না করার শর্ত সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে, তুমি আমার বর্তমানে অন্য বিবাহ করেছ তখন স্বামী বললো, আমার প্রতিটি স্ত্রী তিন তালাক; তাহলে বিচারগত দিক থেকে এই স্ত্রীটিও যে তাকে হলফ করিয়েছে, তালাক হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, সে তালাক হবে না। কেননা সে তার বক্তব্যকে কথার প্রতিউত্তর রূপে উচ্চারণ করেছে। সুতরাং সেটা উক্ত কথার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হবে। তাছাড়া স্বামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা। সুতরাং তার বক্তব্য অন্যের তালাকের সাথে বিশিষ্ট হবে।

আর যাহিরে রেওয়াতের কারণ হলো বক্তব্যের ব্যাপকতা। তদুপরি সে মূল বক্তব্যের সাথে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করেছে। সুতরাং সেটিকে স্বতন্ত্র বক্তব্য গণ্য করা হবে।

তাছাড়া তার উদ্দেশ্য হতে পারে উক্ত স্ত্রীকে বিপদে ফেলা। কেননা আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন তাতে সে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে আর অর্থগত দ্বিধার কারণে তা বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ হতে পারে না।

যদি সে অন্য স্ত্রীর নিয়ত করে থাকে, তাহলে দিয়ানাতের ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস করা হবে কিন্তু বিচারের দিক থেকে বিশ্বাস করা হবে না। কেননা এতে ব্যাপক শব্দকে বিশিষ্ট করা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ হজ্জ, সালাত ও সিয়াম সংক্রান্ত ইয়ামীন

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কাবা শরীফে বা অন্যত্র অবস্থান করা অবস্থায় কেউ যদি বলে আমি মান্নত করলাম যে, বাইতুল্লায় কিংবা কাবায় গমন করব; তাহলে তার উপর পদব্রজে একটি হজ্জ অথবা ওমরা ওয়াজিব হবে। তবে ইচ্ছা করলে সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে পারে। কিন্তু একটি দম দিতে হবে।

কিয়াস অনুযায়ী এই মান্নত দ্বারা কিছুই ওয়াজিব হবে না।

কেননা সে নিজের উপর এমন বিষয়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, যা ওয়াজিব ইবাদত নয় এবং মূলতঃ উদ্দেশ্যগত নয়।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত হযরত আলী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা হজ্জ ও ওমরা (নিজের উপর) ওয়াজিব করা লোকের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন বললো, আমার উপর পদব্রজে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত ওয়াজিব। সুতরাং পদব্রজে গমন করা তার উপর আবশ্যক হবে। তবে ইচ্ছা করলে আরোহণ করতে পারে কিন্তু একটি দম দিতে হবে। এই মাসআলাটি হজ্জ পর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি বলে, আমার উপর বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হওয়া কিংবা গমন করা আবশ্যক। তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

কেননা এই বক্তব্য দ্বারা হজ্জ ও ওমরার মান্নত করার প্রচলন নেই।

আর যদি বলে, আমি হারামে কিংবা সাফা মারওয়ায় পদব্রজে গমন করার মান্নত করলাম, তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, হারামের দিকে পদব্রজে যাওয়ার উল্লেখের ক্ষেত্রে একটি হজ্জ বা ওমরা ওয়াজিব হবে।

আর যদি 'মসজিদুল হারামের দিকে যাওয়ার কথা বলে, তাহলে এতেও এ মতপার্থক্য রয়েছে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, 'হারাম' শব্দটি বাইতুল্লাহকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অন্তর্ভুক্ত করে। তেমনি মসজিদুল হারাম বায়তুল্লাহ্কে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং হারামের উল্লেখ বাইতুল্লাহর উল্লেখের সমতুল্য। কিন্তু ছাফা মারওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ দুটি বাউতুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এই ধরনের বক্তব্য দ্বারা ইহরামের বাধ্যবাধ্যকতা গ্রহণ প্রচলিত নেই। আর শব্দের প্রকৃত অর্থের বিচারে তা আবশ্যকীয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বদিক দিয়েই তা অগ্রহণীয়।

কেউ যদি বলে যে, যদি আমি এ বছর হজ্জ না করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর সে বলে যে, আমি হজ্জ করেছি অথচ দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দান করে যে, এ

বছর সে কুফায় কোরবানী করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে তার গোলাম আযাদ হবে না। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা এটি হচ্ছে একটি প্রকাশ্য বিষয়ের উপর প্রদত্ত সাক্ষ্য। অর্থাৎ কুফায় এ বছর কোরবানী করা। আর এর অনিবার্য পরিণতি হজ্জ না করা। সুতরাং শর্ত বিদ্যমান হয়ে যাবে।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, একটি নেতিবাচক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে। কেননা এর উদ্দেশ্য কুফায় কোরবানী সাব্যস্ত করা নয়,বরং হজ্জের দাবী প্রত্যাখান করা। কেননা কুরবানীর বিষয়ে কেউ দাবীদার নেই। সুতরাং এমনই হলো যেন তারা সাক্ষ্য দিলো যে, সে হজ্জ করেনি।

বেশীর চেয়ে বেশী এই বলা যায় যে, এই না বাচক বিষয়টি এমন, যা সাক্ষ্যদাতার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিন্তু সহজীকরণের প্রেক্ষিতে দুই নাবাচক বিষযের মাঝে পার্থক্য করা হবে না।

কেউ যদি কসম করে যে, সে সওম রাখবে না। অতঃপর সওমের নিয়ত করে আর কিছু সময় পানাহার থেকে বিরত থাকে; এরপর সেদিনই সওম ভংগ করে তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা যেহেতু সওম অর্থ ছাওয়াবের নিয়তে সওম ভংগকারী বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা সেহেতু ইয়ামীনের শর্ত বিদ্যমান হয়েছে।

আর যদি কসম করে যে, একদিন সওম রাখবে না বা একটি সওম রাখবে না। অতঃপর কিছু সময় সওম রেখে রোযা ভংগ করে ফেলে তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা এ বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি পূর্ণ সওম যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। আর তা হবে দিনের শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করা দ্বারা। তাছাড়া মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিন শব্দটি প্রত্যক্ষ।

যদি কসম করে যে, সালাত আদায় করবে না। অতঃপর কেয়াম, কেরাত ও রুকু আদায় করলো, তাহলে কসম ভংগ হবে না। কিন্তু যদি সেই সাথে সিজদা করে। এরপর সালাত ভংগ করে তাহলে কসম ভংগ হবে।

সওম শুরু করার সাথে তুলনা করে কিয়াসের দাবী হলো সালাত শুরু করা মাত্র কসম ভংগ হয়ে যাওয়া।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, সালাত অর্থ বিভিন্ন রোকনের সমষ্টি। সুতরাং সবকটি রোকন আদায় না করা পর্যন্ত সালাত বলা হবে না। সওমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সওম হচ্ছে একটি মাত্র রোকন, অর্থাৎ বিরত থাকা যা সওম শুরু করার পর দ্বিতীয় মুহূর্তে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে।

আর যদি কসম করে যে, একটি সালাত পড়বে না। তাহলে দুই রাকাত সালাত আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত কসম ভংগ হবে না।

কেননা এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য সালাত আর তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দুই রাকাত। কারণ হাদীসে এক রাকাত সালাত সম্পর্কে নিষেধ রয়েছে।

অধ্যায় ঃ বস্ত্র বা অলংকার পরিধান ও অন্যান্য বিষয়ে কসম

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তোমার নিজের কাটন সূতার বস্ত্র পরিধান করি তাহলে তা মক্কার ফকীরদের প্রতি সাদকা হবে। অতঃপর স্বামী তুলা ক্রয় করলো আর স্ত্রী তা থেকে সূতা কেটে বস্ত্র বয়ন করলো আর স্বামী তা পরিধান করলো, তাহলে আবু হানীফা (র) এর মতে তা মক্কার ফকীরদের প্রতি সাদাকা করতে হবে।

সাহেবায়ন বলেন, কসম করার দিন স্বামীর মালিকানাধীন ছিলো, এমন তুলা থেকে সূতা না কাটা হলে স্বামীকে ঐ বস্ত্র (মক্কার ফকীরদের প্রতি) সাদাকা করতে হবে না।

হাদী অর্থ মক্কায় সাদকা করা। কেননা হাদী নাম হল ঐ বস্তু, যা মক্কার দিকে সাদকা স্বরূপ পাঠান হয়। সাহেবায়নের দলীল এই যে, মান্নত শুধু মালিকানাধীন বিষয়ে কিংবা মালিকানার কারণের দিকে সম্পর্কিত বিষয়ে দুরস্ত হয়। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। কেননা পরিধান করা এবং স্ত্রীর সুতা কাটা (ও বয়ন করা) তার মালিকানার কারণ নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, স্ত্রীর সূতা কর্তন (ও বয়ন) সাধারণতঃ স্বামীর মালিকানাধীন তুলা দ্বারাই হয়ে থাকে। আর যে বিষয় প্রচলিত আছে কসমে তাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এটা স্বামীর মালিকানার কারণ। এ জন্যই তো কসমের সময়ের মালিকানাধীন তুলা থেকে সূতা কর্তন হলে কসম ভংগ হয়ে যায়। অথচ কসমের বক্তব্যে তুলার উল্লেখ নেই।

কেউ যদি কসম করে যে, অলংকার পরিধান করবে না, অতঃপর রূপার আংটি পরলো তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা লোক প্রচলনে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অলংকার নয়। একারণেই পুরুষদের জন্য তা পরা এবং মাহরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বৈধ।

কিন্তু স্বর্ণের আংটি হলে কসম ভংগ হবে। কেননা এটা অলংকার। একারণেই পুরুষদের জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

যদি খচিত ও বিন্যস্ত না করে মুক্তার মালা পরে তা হলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কসম ভংগ হবে না। ছাহেবায়ন বলেন, ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা প্রকৃত অর্থে এটা অলংকার। কারণ কোরআনে মুক্তার মালাকে অলংকার বলা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, লোক প্রচলনে খচিত না করে শুধু মুক্তাকে অলংকার রূপে ব্যবহার করা হয় না। আর কসমের ভিত্তি হলো লোক প্রচলেনের উপর। কোন কোন মতে এই মতপার্থক্য হচ্ছে যুগ ও কালের পার্থক্য।

ছাহেবায়নের মতামত অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া হয়। কেননা মুক্তাকে আলাদা ভাবেও অলংকার রূপে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

কেউ যদি কসম করে যে, একটি বিশেষ বিছানায় ঘুমোবে না। অতঃপর সে বিছানার উপর চাদর বিছিয়ে ঘুমালো তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা চাদর বিছানার অনুবর্তী বস্তু। সুতরাং তাকে বিছানার উপর শয়নকারীই গণ্য করা হবে।

আর যদি ঐ বিছানার উপর অন্য একটি বিছানা পেতে নেয় এবং তাতে ঘুমায় তাহলো কসম ভংগ হবে না।

কেননা সমতুল্য জিনিস তার অনুবর্তী হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং প্রথম বিছানার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হয়ে যাবে।

যদি কসম করে যে, জমিনে (বা মাটিতে) বসবে না। অতঃপর বিছানা বা চাটাইয়ের উপর বসলো, তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা (এ ভাবে বসলে) তাকে মাটির উপর উপবেশনকারী বলা হয় না। পক্ষান্তরে যদি তার ও জমিনের মাঝে শুধু তার পোশাক আড়াল হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা পোশাক হলো তার অনুবর্তী। সুতরাং এটাকে আড়াল গণ্য করা হবে না।

যদি কসম করে যে, এই খাটের উপর বসবে না। অতঃপর তার উপর বিছানা বা চাটাই থাকা অবস্থায় বসলো, তাহলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

কেননা (এভাবে বসলে) তাকে খাটে উপবেশনকারী গণ্য করা হয়। আর খাটের উপর সাধারণতঃ এভাবেই বসা হয়।

পক্ষান্তরে যদি খাটের উপর আরেকটি খাট পেতে তার উপর বসে তাহলে কসম ভংগ হবে না। কেননা এটা প্রথমটার সমতুল্য। সুতরাং প্রথম খাটের থেকে সম্পর্ক কর্তিত হয়ে গেলো।

অধ্যায় ঃ হত্যা, প্রহার ও অন্যান্য বিষয়ে কসম

কেউ যদি বলে যে, যদি আমি তোমাকে প্রহার করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ, তাহলে এটা সম্বোধিত ব্যক্তির জীবদ্দশার সাথে সীমাবদ্ধ হবে।

কেননা প্রহার বলা হয় ব্যথা দানকারী কর্মকে, যা শরীরের সংগে যুক্ত হয়। আর মৃতের ক্ষেত্রে ব্যথা দান পাওয়া যায় না। আর কবরে যাদেরকে আযাব দেয়া হয়, তাদের দেহ প্রাণ ও রূহ স্থাপন করা হয় অধিকাংশ আলিমের মতে।

অদ্রূপ পোশাক পরিধান করানোর কসম সম্পর্কেও একই কথা। কেননা সাধারণভাবে বলা হলে তা দ্বারা মালিকানাসহ পরিধান করানো উদ্দেশ্য হয়। কাফফারায় পোশাক পরিধান করানো কথাটা এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর মৃতের ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। তবে যদি শরীর ঢেকে দেওয়া নিয়ত করে থাকে (তাহলে মৃতের ক্ষেত্রেও কসম ভংগ হবে।)

আর কেউ কেউ বলেছেন ফারসী ভাষায় কসমটি শুধু পরিধান করানোর সাথে সম্পৃক্ত হবে। (মালিকানা পূর্ণ থাকা শর্ত নয়)। **অদ্রূপ কথা বলা ও প্রবেশ করা সম্পর্কেও একই হুকুম।** কেননা কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বোঝানো আর মৃত্যু এর পরিপন্থী। আর প্রবেশের অর্থ হলো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর মৃত্যুর পর তার কবরের যিয়ারত করা হয়, তার সাথে সাক্ষাৎ করা হয় না। **যদি বলে যে, যদি তোমাকে গোসল করাই তাহলে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর সে তার মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিলো তাহলে কসম ভংগ হবে।**

কেননা গোসল অর্থ শরীরে পানি প্রবাহিত করা। এবং তার উদ্দেশ্য হলো পবিত্র করা আর এটা মৃতের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়[১]।

কেউ যদি কসম করে যে, নিজের স্ত্রীকে প্রহার করবে না। অতঃপর সে তার চুল ধরে টানলো কিংবা গলা চিপে ধরলো কিংবা কামড় দিলো তাহলে কসম ভংগ হবে। কেননা প্রহার বলা হয় কষ্টদায়ক কর্মকে। আর এ সকল ব্যবহারে কষ্ট প্রদান পাওয়া গিয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেছেন সোহাগের অবস্থায় (এ সকল কর্মে) কসম ভংগ হবে না। কেননা কৌতুক বলা হয়, প্রহার বলা হয় না।

কেউ যদি বলে যে, যদি আমি অমুককে হত্যা না করি তাহলে 'তার' স্ত্রী তালাক। অথচ অমুক মৃত আর সে তার মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত, তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা সে তার কসমকে এমন প্রাণের উপর সংঘটিত করেছে, যা আল্লাহ তা'আলা উক্ত মৃত ব্যক্তির মাঝে (আপন কুদরত দ্বারা) সৃষ্টি করবেন। আর তা কল্পনা করা সম্ভব। সুতরাং কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। অতঃপর তার কসম ভংগ হয়ে যাবে সাধারণতঃ অক্ষমতার কারণে। **আর যদি সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কথা না জেনে থাকে তাহলে কসম ভংগ হবে না।**

কেননা সে তার কসমকে এমন প্রাণের প্রতি সংঘটিত করেছিলো, যা উক্ত ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান ছিলো। এ অবস্থায় কসম পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই মাস'আলার হুকুম পাত্রের পানি পান করার (অথচ তাতে পানি নেই) মাসআলার উপর কিয়াস করে মতপার্থক্যপূর্ণ হবে। আর বিশুদ্ধ মতে পাত্রের মাসআলায় অবগত থাকা না থাকার তফসীল নেই।

১। বাংলায় গোসল করানো জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর গোসল দেয়া মৃত ব্যক্তি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায় ঃ ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত কসম

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, অচিরেই তার ঋণ পরিশোধ করবে তাহলে তা এক মাসের কম সময় হবে। আর যদি বলে যে, দেরীতে পরিশোধ করবে, তাহলে এক মাসের বেশী সময় বোঝান হবে।

কেননা এক মাসের কমসময়কে নিকটবর্তী মনে করা হয়। এবং একমাস বা তার বেশী সময়কে দেরী গণ্য করা হয়। একরাণেই দেরী ও বিলম্বের ক্ষেত্রে বলা হয়, মাস হয়ে গেলো তোমার সাক্ষাৎ নেই।

কেউ যদি কসম করে যে, আজই অমুকের ঋণ শোধ করে দেবে। অতঃপর সে পরিশোধ করলো। কিন্তু সে ব্যক্তি তাতে কিছু খুঁত ওয়ালা কিংবা অচল পেলো কিংবা অন্য দাবীদার পেলো তাহলে কসমকারী কসম ভংগকারী হবে না।

কেননা অচলতা হলো একটি দোষ। আর দোষ মূল সত্তাকে বিলুপ্ত করে না। একারণেই তো পাওনাদার যদি তা মেনে নেয় তাহলে দেনাদার হক আদায়কারী সাব্যস্ত হবে; সুতরাং কসম রক্ষার শর্ত পূর্ণ হয়েছে। আর দাবীদার সাব্যস্ত মুদ্রার ক্ষেত্রে কব্জা ও দখল গ্রহণযোগ্য। এবং পরবর্তীতে দাবীদারকে তা ফিরিয়ে দেয়ার কারণে কসম রক্ষার সাব্যস্ত বিষয়টি বাতিল হবে না।

যদি পাওনাদার ওগুলোকে শীশা বা পিতল মিশ্রিত পায় তাহলে কসম ভংগ হবে।

কেননা এগুলো দিরহামের বা মুদ্রার শ্রেণীভুক্ত নয়। একারণেই মুদ্রা 'বায় সরফ' ও 'বায় সলম' এর ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

আর যদি কসমকারী দেনাদার ঐ মুদ্রার বিনিময়ে পাওনাদারের কাছে কোন গোলাম বিক্রি করে এবং সে গোলাম কব্জা করে তাহলে তার কসম রক্ষা হবে।

কেননা ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিই হলো পরস্পর অদল বদল। আর এখানে শুধু বিক্রয় দ্বারাই তা সাব্যস্ত হয়েছে।

আর গোলাম কব্জা করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে সম্ভবতঃ একারণে যে, যেন বিক্রয় পূর্ণভাবে স্থির হয়ে যায়। **পাওনাদার যদি ঋণের মুদ্রা তাকে দান করে দেয় তাহলে কসম পূর্ণ হবে না।**

কেননা পরস্পর অদল বদল সাব্যস্ত হয়নি। কারণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে কসমকারী দেনাদারের কাজ; পক্ষান্তরে দান হচ্ছে পাওনাদারের পক্ষ হতে রহিত করন।

কেউ যদি কসম করে যে, সে তার ঋণ দিরহাম দিরহাম করে ভেংগে ভেংগে উশুল করবে না। অতঃপর কিছু পরিমাণ উশুল করলো, তাহলে কসম ভংগ হবে না; যতক্ষণ না সমগ্র ঋণ ভেংগে উশুল করে।

কেননা কসম ভংগ হওয়ার শর্ত হলো সমগ্র ঋণ বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা। দেখুননা, কসমকারী উশুলের বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছে তার দিকে সম্বন্ধকৃত একটি নির্দিষ্ট ঋণের সাথে।

সুতরাং তা সম্বন্ধকৃত ঋণের সমগ্রের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র ঋণ উশুল করা ছাড়া কসম ভংগ হবে না।

কিন্তু যদি কসমকারী তার ঋণের মুদ্রাগুলো দুইবারের মাপে বা দুইবারের গণনায় উশুল করে আর দুই মাপ (বা গণনার) মাঝে সংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না হয় তাহলে কসম ভংগ হবে না। এবং এটা (উশুলের ক্ষেত্রে) বিচ্ছিন্নতা নয়।

কেননা সমগ্র পরিমাণ একবারে ফরয করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। সুতরাং এই পরিমাণ বিচ্ছিন্নতা ব্যতিক্রম ধরা হবে।

কেউ যদি কসম করে বলে যে, আমার কাছে যদি একশ দিরহাম ছাড়া অন্য কিছু থাকে তাহলে 'তার' স্ত্রী তালাক। আর দেখা গেলো যে, পঞ্চাশ দেরহামের বেশী তার মালিকানায় নেই। তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা লোক প্রচলনে এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে একশর অতিরিক্ত পরিমাণ অস্বীকার করা।

তাছাড়া একশকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করার অর্থ হলো তার সমস্ত অংশকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা।

'একশ' ছাড়া অথবা 'বাদে'-এর সমার্থক যে কোন শব্দ ব্যবহার করলে একই হুকুম হবে।

কেননা এসকল শব্দই হলো ব্যতিক্রমের অব্যয়।

বিবিধ মাস'আলা

কেউ যদি কসম করে যে, অমুক কাজটি করবে না তাহলে তা সর্বদা বর্জন করতে হবে।

কেননা সে কর্মটিকে নিঃশর্তভাবে বর্জনের কথা বলেছে। সুতরাং বিরত থাকার বিষয়টি ব্যাপক হবে বর্জনের ব্যাপকতার অনিবার্য দাবী হিসাবে।

যদি কসম করে যে, অমুক কাজটি অবশ্যই করবে। অতঃপর সে তা একবার করলো তাহলে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে।

কেননা এই কসমের কারণে পালনীয় বিষয় হচ্ছে অনির্ধারিত একটি কর্ম। আর বক্তব্যের ক্ষেত্র যেহেতু ইতিবাচক ক্রিয়ার ক্ষেত্র, সেহেতু যে কাজটিই করবে তা দ্বারা কসম পূর্ণ হয়ে যাবে।

অবশ্য যখন কসমকারীর মৃত্যুর কারণে কিংবা কর্মটার ক্ষেত্র বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ঐ কর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে নৈরাশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন কসম ভংগ হবে।

শাসক যদি কোন ব্যক্তিকে এই মর্মে শপথ করায় যে, শহরে প্রবেশকারী যে-কোন দুষ্কৃতিকারী সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে, তাহলে এ শপথের মেয়াদ হবে শুধু তার শাসনকাল পর্যন্ত।

কেননা শপথ করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ দুস্কৃতিকারীকে শাসন করার মাধ্যমে তার বা অন্যের দুষ্কৃতি দমন করা। আর তার ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর শাসন তার তেমন উপকারী হবে না।

যাহিরে রেওয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী ক্ষমতা লোপ মৃত্যুর মাধ্যমে, তেমনি অপসারণের মাধ্যমে হতে পারে।

কেউ যদি কসম করে যে, নিজের গোলামটি অমুককে দান করবে। অতঃপর সে তাকে দান করলো, কিন্তু সে তার দান গ্রহণ করলো না; তাহলে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা দানকে তিনি বিক্রয়ের সাথে তুলনা করেন। কারণ, সে দানও বিক্রয়ের ন্যায় মালিকানা প্রদানের সমার্থক।

আমাদের দলীল এই যে, এটা হচ্ছে স্বেচ্ছাদান কর্ম। সুতরাং এককভাবে দাতার দ্বারাই তা স্পন্নতা লাভ করবে। একারণেই বলা হয় যে, সে দান করেছে কিন্তু অমুক তা গ্রহণ করেনি। তাছাড়া দানের উদ্দেশ্য হলো বদান্যতা প্রকাশ। আর তা একক ভাবে তার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় হচ্ছে বিনিময়। সুতরাং তা উভয় পক্ষের ক্রিয়া দাবী করে।

কেউ যদি কসম করে যে, সে ريحان এর ঘ্রাণ নেবে না অতঃপর সে গোলাব বা ইয়াসমীন ফুলের ঘ্রাণ নিলো, তাহলে কসম ভংগ হবে না।

কেননা ريحان কান্ডহীন উদ্ভিদের ফুল। অথচ গোলাব ও ইয়াসমীনের কান্ড রয়েছে।

কেউ যদি কসম করে যে, বনস্পতি ক্রয় করবে না, আর তার কোন নিয়ত না থাকে, তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে বনস্পতির তেল।

এ সিদ্ধান্ত প্রচলিত রেওয়াজের ভিত্তিতে। এ কারণেই উক্ত তেল বিক্রেতাকে বনস্পতিওয়ালা বলা হয়। আর ক্রয়ের ভিত্তি হলো বিক্রয়।

কেউ কেউ বলেন, আমাদের প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী বনস্পতির পাতাই উদ্দেশ্য হবে।

যদি গোলাব ক্রয় না করার কসম করে তাহলে এ কসম গোলাব ফুলের উপর প্রযোজ্য হবে। কেননা এটাই গোলাবের প্রকৃত অর্থ। আর প্রচলিত রেওয়াজ একে স্বীকৃতি দেয়। পক্ষান্তরে বনস্পতির ক্ষেত্রে রেওয়াজ প্রকৃত অর্থকে বিলুপ্ত করেছে।

كتاب الحدود
অধ্যায় ঃ হদ্দ (শাস্তি)

অধ্যায় ঃ হদ্দ (শাস্তি)

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, অভিধানে হদ্দ অর্থ রোধ করা। একারণেই দ্বাররক্ষীকে حداد বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় হদ্দ অর্থ আল্লাহর হকরূপে নির্ধারিত শাস্তি। এজন্যই কিছাছকে হদ্দ বলা হয় না। কেননা তা বান্দার হক। তদ্রূপ সাধারণ শাস্তিকেও হদ্দ বলা হয় না। কেননা তাতে নির্ধারিত পরিমাণ নেই।

শরীয়তে হদ্দ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা থেকে নিবৃত্তি। গোনাহ থেকে পবিত্রতা লাভ হদ্দের মূলগত বিষয় নয়; প্রমাণ এই যে, কাফিরের ক্ষেত্রেও তা প্রবর্তিত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, 'যিনা' সাক্ষ্য প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ শাসকের নিকট সাব্যস্ত হয়। কেননা সাক্ষ্য হচ্ছে প্রকাশ্য প্রমাণ; তদ্রূপ স্বীকারোক্তিও। কেননা সত্যবাদিতার দিকটিই তাতে প্রবল।

বিশেষতঃ যা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে ক্ষতি ও কলংকের সম্পর্ক রয়েছে। আর নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন যেহেতু দুঃসাধ্য সেহেতু বাহ্যিক প্রমাণকেই যথেষ্ট ধরা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর এখানে সাক্ষ্য অর্থ হল, চারজন সাক্ষী কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فاستشهدوا عليهن اربعة منكم

তোমাদের মধ্য হতে চারজনকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী রূপে তলব করো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, ثم لم ياتوا باربعة شهداء অতঃপর (যদি) তারা চারজন সাক্ষ্য পেশ করতে সক্ষম না হয়। এবং আপন স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ائت باربعة يشهدون على صدق مقالتك

এমন চারজন লোক পেশ করো, যারা তোমার বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবে।

তাছাড়া চারজন সাক্ষ্য নির্ধারণের মাঝে গোপনীয়তার অর্থ পাওয়া যায়। আর এ বিষয়ে গোপনীয়তাই মুসতাহাব। আর ঘটনা প্রকাশ করা হলো তার বিপরীত।

যখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন শাসক তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, যিনা কাকে বলে, কোথায় যিনা করেছে, কবে যিনা করেছে এবং কার সাথে যিনা করেছে? কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইয (র) কে যিনার অবস্থা এবং যিনার পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আর এ ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন অবশ্যক। কেননা হতে পারে যে, গুপ্তাংগে যিনা ছাড়া অন্য কিছু সে উদ্দেশ্য করেছে। কিংবা হয়ত দারুল হরবে যিনা করেছে

কিংবা হয়ত অনেক আগে যিনা করেছে। কিংবা যিনার পাত্রীর ব্যাপারে তার (হালাল হওয়ার) সন্দেহ ছিলো। অর্থাৎ সে কিংবা সাক্ষীরা পাত্রীটিকে চিনতে পারেনি। যেমন পুত্রের দাসীর সাথে সংগম করা। সুতরাং হদ্দ রহিত করার চেষ্টা হিসাবে এ বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসা করা হবে।

যখন তারা এসব বর্ণনা করবে এবং বলবে যে, আমরা তাকে তার গুপ্তাংগে এমন ভাবে সংগম করতে দেখেছি, যেমন সুরমাদানিতে শলাকা। আর কাযী সাক্ষীদের সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সততার পক্ষে মতামত আসবে, তখন কাযী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন।

হদ্দের ক্ষেত্রে কাযী সাক্ষীদের বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করবেন না, যাতে হদ্দ রহিত করার বাহানা মিলে যায়।

নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ادرء والحدود ما استطتم (الترمذى)

তোমরা যতদূর পার হদ্দকে রহিত করো।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অন্য সকল 'হক' এর বিষয়টি ভিন্ন। (সেখানে বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়।)

গোপনে ও প্রকাশ্যে ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি ইনশাআল্লাহ সাক্ষ্য অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো। মবসূত গ্রন্থে ইমাম মোহম্মদ (র) বলেছেন, সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া পর্যন্ত অপরাধের অভিযোগের ভিত্তিতে কাযী বিবাদীকে আটক রাখবেন। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগের ভিত্তিতে একজন লোককে আটক রেখেছিলেন। (আবু দাউদ)।

পক্ষান্তরে যাবতীয় ঋণ খেলাপি অভিযোগে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হওয়ার আগে (বিবাদীকে) আটক করা হবে না। পার্থক্যের কারণ ইনশাআল্লাহ পরে বলা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, স্বীকারোক্তির অর্থ এই যে, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি পৃথক পৃথক চারটি মজলিসে চারবার নিজের বিরুদ্ধে যিনার অপরাধ স্বীকার করবে। যখনই সে স্বীকার করবে, কাযী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করবেন।

প্রাপ্ত বয়স্কতা ও সুস্থমস্তিষ্কতার শর্ত এজন্য যে, বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা এ কারণে যে, তাদের স্বীকারোক্তি হদ্দ ওয়াজিবকারী নয়।

আর চারবার স্বীকারোক্তির শর্ত হচ্ছে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট হবে। এটি তিনি বলেছেন অন্য সকল হকের উপর কিয়াস করে। এই কিয়াসের কারণ এই যে, স্বীকারোক্তি হচ্ছে ঘটনা প্রকাশকারী। আর স্বীকারোক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটনার 'প্রকাশ' বৃদ্ধি করে না। আর সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি এর বিপরীত। (এতে ঘটনার প্রকাশকে দৃঢ় করা হয়।)

আমাদের দলীল (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) মাইয (র) সম্পর্কিত হাদীস। সেখানে তার পক্ষ হতে চার মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদ্দ কায়েম করা বিলম্বিত করেছেন। কেননা চারের কমে যদি ঘটনার প্রকাশ

সাব্যস্ত হতো তা হলে হদ্দ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হওয়ার পর কিছুতেই তিনি হদ্দ বিলম্বিত করতেন না।

তাছাড়া সাক্ষীর সংখ্যা চারে উন্নীত করার বিষয়টি যিনার সাথে বিশিষ্ট হয়েছে। সুতরাং যিনার গুরুতরতা প্রকাশের জন্য এবং গোপনীয়তার দিকটি সাব্যস্ত করার জন্য স্বীকারোক্তির সংখ্যাও চারে উন্নীত করা হবে।

আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে স্বীকারোক্তিকারীর মজলিসের ভিন্নতা জরুরী।

তাছাড়া বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করার ক্ষেত্রে মজলিসের অভিন্নতার ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মজলিসের অভিন্নতার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির অভিন্নতার বাহ্যিক সন্দেহ সাব্যস্ত হয়।

আর স্বীকারোক্তি যেহেতু স্বীকারোক্তিকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু তার মজলিসের বিভিন্নতার দিকটিই বিবেচ্য হবে, কাযীর মজলিস নয়। মজলিসের বিভিন্নতার রূপ এই যে, যখন সে স্বীকারোক্তি করবে তখন কাযী তা প্রত্যাখান করবেন। অতঃপর সে কাযীর চোখের আড়ালে গিয়ে ফিরে আসবে এবং স্বীকারোক্তি করবে। ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইয (র) কে প্রত্যেকবার সরিয়ে দিয়েছেন। এমন কি তিনি মদীনায় দেওয়ালগুলোর পিছনে আড়াল হয়ে যান (আবার ফিরে আসেন)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন তার স্বীকারোক্তি চার দফা সম্পন্ন হবে তখন কাযী তাকে যিনার হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, যিনা কি ও কাকে বলে? এবং কোথায় সে যিনা করেছে এবং কার সাথে যিনা করেছে। যখন সে তা বয়ান করবে তখন তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এ সকল বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদের কারণ আমরা যিনার সাক্ষ্য প্রসংগে বর্ণনা করেছি।

যিনার স্বীকারোক্তি প্রসংগে ইমাম কুদূরী (র) যিনার সময় সম্পর্কিত প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু যিনার সাক্ষ্য প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। কেননা অনেক আগের অতীত সাক্ষ্য গ্রহণকে বাধা দেয়, স্বীকারোক্তিকে নয়।

কেউ কেউ বলেন, কাযী তাকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কেননা হতে পারে যে, সে শৈশবে যিনা করেছিলো।

যদি হদ্দ জারী করার পূর্বে কিংবা মাঝে সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার প্রত্যাহার গ্রহণ করা হবে এবং তার পথ ছেড়ে দেয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এবং ইবনে আবী লায়লারও এই মত–এ অবস্থায়ও তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা তার স্বীকারোক্তির কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং তার প্রত্যাহার বা অস্বীকারের কারণে তা বাতিল হবে না। যেমন সাক্ষ্য দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। এটা কিছাছ ও অপবাদ আরোপ জনিত হদ্দের মত।

আমাদের দলীল এই যে, প্রত্যাহার করাও একটি সংবাদ, যা সত্যতার সম্ভাবনা রাখে, যেমন স্বীকারোক্তি (একটি খবর ছিল)। আর প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী কোন পক্ষ নেই। সুতরাং স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সন্দেহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট কিছাছ ও অপবাদজনিত হদ্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী প্রতিপক্ষ রয়েছে। কিন্তু হদ্দে যিনার মত নিরেট শরীয়তের হকের ক্ষেত্রে এমন কোন পক্ষ নেই।

শাসকের জন্য উত্তম হবে স্বীকারোক্তিকারীকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে এরূপ বলা যে, হয়ত তুমি শুধু স্পর্শ করেছো কিংবা চুম্বন করেছো।

কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইয (র) কে বলেছিলেন, হয়ত তুমি স্পর্শ করেছো অথবা তাকে চুম্বন করেছো।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মহম্মদ (র) বলেছেন, শাসকের এরূপ বলা উচিত যে, সম্ভবতঃ তুমি তাকে বিবাহ করেছো কিংবা সন্দেহ বশতঃ সহবাস করেছো। অবশ্য অর্থগত দিক থেকে এটা প্রথমটায় নিকটবর্তী।

অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ ও তা জারী করার বিবরণ

হদ্দ যখন ওয়াজিব হয় আর যিনাকারী 'মুহছান' হয় তবে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইয (রা) কে রজম করেছিলেন। আর তিনি 'মোহছান' ছিলেন।

তাছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীসে তিনি বলেছেন وزنا بعد الاحصان যদি মোহছান অবস্থায় যিনা করে (তবে তার খুন হালাল হবে)। এর উপর ছাহাবা কেরামের ইজমা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তাকে খোলা মাঠে নিয়ে যাবে। আর সাক্ষীগণ প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করবে। এর পর শাসক এবং তারপর সাধারণ লোক। হযরত আলী (রা) থেকে তেমনি বর্ণিত রয়েছে।

কেননা সাক্ষী তখনো সাক্ষ্য প্রদানের দুঃসাহস করে ফেলে পরে স্বয়ং রজম করার বিষয়টি গুরুতর মনে করে এবং সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। সুতরাং তাকে দিয়ে রজম শুরু করার মাঝে হদ্দ রহিত করার সুকৌশল রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) বেত্রাঘাতের উপর কিয়াস করে বলেন, সাক্ষীর রজম শুরু করা শর্ত নয়।

আমাদের দলীল এই যে, সকলেই নিয়ম সম্মত বেত্রাঘাত করতে সক্ষম নয়। তাই তা প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ প্রাণ নাশ তার প্রাপ্য নয়। আর রজমের বিষয়টি এমন নয়। কেননা এর উদ্দেশ্যই হলো প্রাণনাশ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষীগণ যদি শুরু করা থেকে বিরত থাকে তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

কেননা এটা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের প্রমাণ। তদ্রূপ যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী (হদ্দ রহিত হবে) যদি তারা মারা যায় কিংবা গায়েব হয়ে যায়, শর্তের অবিদ্যমানতার কারণে।

আর যদি যিনাকারী স্বীকারোক্তিকারী হয়, তাহলে প্রথমে শাসক শুরু করবেন, অতঃপর সাধারণ লোকেরা।

হযরত আলী (রা) হতে এরূপ বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গামেদিয়া মহিলাকে চানাবুট আকারের একটি পাথর কণা নিক্ষেপ করে রজম আরম্ভ করেছিলেন। আর সে যিনার স্বীকারোক্তি করেছিলো।

রজমকৃত ব্যক্তিকে জানাযা ও কাফন দেয়া হবে।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইয (র) সম্পর্কে বলেছেন,

اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم

তোমরা নিজেদের মৃতদের সাথে যে আচরণ করো তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করবে।

আর এই কাম্য যে, একটি 'হক' এর বিপরীতে সে নিহত হয়েছে। সুতরাং গোসল (দাফন-কাফন) রহিত হবে না, যেমন কিছাছ রূপে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

আর নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের পর গামেদি মহিলার উপর জানাযা পড়েছিলেন।

আর যদি যিনাকারী ব্যক্তিটি মোহছান না হয় এবং স্বাধীন হয় তাহলে তার হদ্দ হবে একশ দোররা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারকারিণী ও ব্যভিচারকারী তাদের প্রত্যেককে একশটি দোররা মার। তবে মোহছানের ক্ষেত্রে আয়াতটি রহিত হয়েছে। সুতরাং অন্যের ক্ষেত্রে তা কার্যকর থাকবে।

শাসক তাকে এমন একটি চাবুক দ্বারা, যাতে গিট নেই, মধ্যম ধরনের আঘাত করার আদেশ দেবেন।

কেননা হযরত আলী (র) যখন হদ্দ কায়েমের ইচ্ছা করেছিলেন তখন চাবুকের গিট ভেংগে নিয়েছিলেন। মধ্যম অর্থ যখমকারীও হবে না, এবং এমনও হবে না যাতে ব্যথা পাওয়া যায় না। কেননা প্রথমটি প্রাণনাশে পরিণতকারী আর দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য সিদ্ধিকারী নয়। আর তা হল এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখা।

আর তার দেহ থেকে কাপড় চোপড় খুলে ফেলা হবে।

অর্থাৎ ইযার (তহবন্দ) ছাড়া অন্য কাপড়। কেননা হযরত আলী (র) হদ্দ কায়েমের ক্ষেত্রে পোশাক খুলে ফেলার আদেশ করতেন।

আর এই কারণে যে, বস্ত্রমুক্ত করাটা আসামীর দেহে ব্যথা পৌছানোর জন্য অধিক কার্যকর। আর এই হদ্দ এর ভিত্তি হলো প্রহারে কঠোরতার উপর। পক্ষান্তরে ইযার খুলে ফেলার অর্থ গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা। সুতরাং সেটা পরিহার করতে হবে।

প্রহারকে শরীরের বিভিন্ন অংগে বিক্ষিপ্ত করতে হবে। কেননা সকল আঘাত এক অংগে বর্ষণ মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ হদ্দ হচ্ছে শাসনকারী, বিনষ্টকারী নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে তার মাথায় চেহারায় ও লজ্জাস্থানে প্রহার করবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে হদ্দ মারার আদেশ করেছিলেন, তাকে বলেছিলেন, اتق الوجه والمذاكير

তার চেহারা এবং লজ্জাস্থান পরিহার করো। তাছাড়া এই কারণে যে, লজ্জাস্থানে আঘাতও প্রাণঘাতী। আর মাথা সকল অনুভূতির কেন্দ্র। মুখমন্ডলও তাই। তদুপরি তা সৌন্দর্যের কেন্দ্র। আর প্রহারের কারণে অনুভূতি ও সৌন্দর্য নিরাপদ থাকে না। আর গুণগতভাবে এটা প্রাণনাশের সমতুল্য। সুতরাং তা হদ্দ রূপে শরীয়ত অনুমোদিত হতে পারে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) পরবর্তীতে মত পরিবর্তন করে বলেছেন, মাথায়ও প্রহার করা যাবে। মাথায় অন্তত একটি চাবুক মারার কারণ এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) বলেছেন, মাথায় প্রহার করো; কেননা তাতে শয়তান রয়েছে।

এর ব্যাখ্যা রূপে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি এটা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, যাকে কবূল করা বৈধ ছিল। কোন কোন মতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কুফুরি প্রচারকারী এক হারবী সম্পর্কে। আর প্রানণাশ তো তার প্রাপ্য।

সকল হদ্দের ক্ষেত্রেই দাঁড়ানো অবস্থায় প্রহার করা হবে, তাকে টেনে রাখা হবে না।

কেননা হযরত আলী (রা) বলেছেন, হদ্দ সমূহের ক্ষেত্রে পুরুষদের দাঁড়ানো অবস্থায় এবং স্ত্রীলোকদের বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, হদ্দ কায়েম করার ভিত্তি হলো প্রচারের উপর। আর দাঁড়ানো অবস্থা প্রচারের জন্য অধিক সহায়ক।

মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য 'টেনে রাখা হবে না' এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, টানা অর্থ মাটিতে লম্বা করে শোয়ানো, যেমন আমাদের যুগে ধরা হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল চাবুক টেনে ধরে মাথার উপর তুলে প্রহারকারীর আঘাত করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আঘাত করার পর (শরীরের চাবুক টান দেওয়া। আর এসব আচরণ করা যাবে না। কেননা তা প্রাপ্য শাস্তির অতিরিক্ত।

আর যদি (অপরাধকারী) গোলাম হয় তাহলে তাকে পঞ্চাশ ঘা চাবুক লাগানো হবে।

কেননা দাসীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابِ

তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক হবে, যা স্বাধীন নারীদের উপর হয়ে থাকে। তাছাড়া এই কারণে যে, 'দাসত্ব' নেয়ামতকে হ্রাস করে; সুতরাং শাস্তিকেও হ্রাস করবে। কেননা নেয়ামতের পূর্ণতার সময় অপরাধ অধিক গুরুতর হয়। সুতরাং সেই অপরাধ কঠোরতর শাস্তির কারণ হবে।

হদ্দের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান হবে।

কেননা শরীয়তের নির্দেশ সমূহ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে স্ত্রীলোকের জন্য চামড়ার পোষাক ও তুলা ভর্তি কাপড় ব্যতীত পোষাক খোলা যাবে না।

কেননা তার পোষাক খোলা দ্বারা তার গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা হয়। আর চামড়া ও তুলা ভর্তি পোষাক প্রহৃতার শরীরে ব্যথা পৌছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এবং এ পোষাক ছাড়াও সতর রক্ষা হয়। সুতরাং সেগুলো খুলে ফেলা হবে।

স্ত্রীলোককে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রহার করা হবে।

প্রমাণ আমাদের বর্ণিত হযরত আলী (রা)-এর হাদীস। তাছাড়া এটি হলো সতরের জন্য অধিক সহায়ক। ইমাম কুদূরী (র) বলেন, রজমের ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকের জন্য যদি গর্ত খনন করা হয় তবে তা জায়িয।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম গামেদী মহিলা (র) এর জন্য বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করে ছিলেন। তদ্রূপ আলী (রা) শারাহা হামদানী মহিলার জন্য গর্ত খনন করেছিলেন। তবে না করলেও দোষের কিছু নেই। নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করার আদেশ দেননি। তাছাড়া সে তো তার পোশাক দ্বারাই আবৃত রয়েছে। তবে গর্ত করাই উত্তম। কেননা এতে তার সতর অধিক ঢাকা হয়।

আর আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত (গামেদী মহিলা সম্পর্কিত) হাদীসের আলোকে বুক পর্যন্ত গর্ত করা সংগত।

আর পুরুষের জন্য গর্ত করা হবে না।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইয (র) এর জন্য গর্ত খনন করেননি। তাছাড়া পুরুষের ক্ষেত্রে হদ্দ কায়েমের ভিত্তি হলো প্রচারের উপর। আর বেঁধে রাখা বা ধরে রাখা শরীয়ত সম্মত নয়।

শাসকের অনুমতি ছাড়া মনিব তার গোলামের উপর হদ্দ কায়েম করতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সে তা করতে পারে, কেননা শাসকের ন্যায় তারও গোলামের উপর পূর্ণ অভিভাবকত্ব রয়েছে, বরং শাসকের চেয়ে অধিক রয়েছে। কারণ মনিব গোলামের বিষয়ে এমন সকল ব্যবহার করতে পারে,যা শাসক পারে না। সুতরাং এটি সাধারণ শাস্তির মত হলো।

আমাদের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী চারটি বিষয় কায়েম করার অধিকার শাসকের উপর ন্যস্ত। তন্মধ্যে হদ্দের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, হদ্দ হলো আল্লাহর হক। কেননা এর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে ফাসাদ থেকে মুক্ত করা। এ কারণেই তা বান্দার মাফ করার কারণে মাফ হয় না। সুতরাং শরীয়তের যিনি প্রতিনিধি তিনিই তা উশুল করবেন। আর তিনি হলেন শাসক কিংবা তার স্থলবর্তী।

সাধারণ শাস্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বান্দার হক। এ কারণেই বালককেও শাস্তি প্রদান করা যায় অথচ শরীয়তের হক তার উপর অপ্রযোজ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, রজমের ক্ষেত্রে মোহছান হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীন হওয়া, সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং মুসলমান হওয়া, যে বিশুদ্ধ বিবাহ সম্পন্ন করেছে এবং যে মোহছান অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে।

সুস্থ মস্তিষ্কতা ও প্রাপ্তবয়স্কতা শাস্তিযোগ্য হওয়ার শর্ত, কেননা এ দুটি ছাড়া শরীয়তের সম্বোধন আরোপিত হয় না। এছাড়া অন্যান্য শর্ত হলো নেয়ামতের পূর্ণতার মাধ্যমে অপরাধ পূর্ণতার জন্য। কেননা নেয়ামতের আধিক্যের সময় নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা গুরুতর হয়। আর উপরোক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে বড় বড় নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

আর শরীয়ত এ সকল শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার সময় যিনার কারণে রজম অনুমোদন করেছে। সুতরাং শুধু এগুলোর সাথেই তা সম্পৃক্ত হবে। মর্যাদা ও ইলমের নেয়ামতের বিষয়টির ভিন্ন। কেননা এ দুটোকে বিবেচনা করার ব্যাপারে শরীয়তের বাণী আসেনি। আর নিজস্ব মতামতে শরীয়ত নির্ধারণ সম্ভব নয়।

তাছাড়া স্বাধীন অবস্থা বিশুদ্ধ বিবাহ করার সামর্থ্য সৃষ্টি করে। আর বিশুদ্ধ বিবাহ হালাল সহবাসের সামর্থ্য সৃষ্টি করে। আর সহবাস হালাল পথে তৃপ্তি দান করে। আর ইসলাম তাকে মুসলিম নারী বিবাহ করার সক্ষমতা দান করে। আর যিনা হারাম হওয়ার বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করে। সুতরাং এ সমস্ত শর্তগুলোর বিদ্যমানতা যিনা থেকে দূরে থাকার কারণ। আর প্রতিবন্ধকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকার কারণে অপরাধ গুরুতর হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) ইসলামের শর্ত আরোপের ব্যাপারে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। এক বর্ণনা মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও (তার সাথে রয়েছেন)

তাঁদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীস যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনাককারী দুই ইহুদী (নর-নারী) কে রজম করেছেন।

আমাদের জবাব এই যে, সেটা তাওরাতের বিধান মোতাবেক ছিলো, অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী তা সমর্থন করে,

من اشرك بالله فليس بمحصن

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মোহছান নয়। আর সহবাসের গ্রহণযোগ্য অবস্থা হলো 'সম্মুখস্থ' গুপ্তাংগে পুরুষাঙ্গ এতদূর প্রবেশ করানো, যাতে গোসল ওয়াজিব হয়।

ইমাম কুদুরী (র) সহবাসের সময় উভয়ের মধ্যে ইহছান গুণ বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং যদি কাফির স্ত্রীর সাথে কিংবা দাসীর সাথে কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রীর সাথে কিংবা নাবালিকা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে স্বামী মোহছান হবে না। তদ্রূপ স্বামীর মাঝে যদি এসকল অবস্থার কোন একটি বিদ্যমান থাকে আর স্ত্রী স্বাধীন, মুসলিম[১] সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্কা হয় তাহলেও মোহছান হবে না।

১। "স্বামী কাফের অথচ স্ত্রী মুসলমান" অবস্থাটা সম্ভব এভাবে যে উভয়ে কাফির ছিলো, অতঃপর স্ত্রী—ইসলাম গ্রহণ করলো আর কাযী স্বামীর নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করার পূর্বে স্বামী ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো। কেননা কাযী যতক্ষণ তার সামনে ইসলাম পেশ না করছেন আর সে প্রত্যাখ্যান না করছে ততক্ষণ তারা স্বামী -স্ত্রী রূপে বহাল থাকে।

কেননা এসকল শর্ত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় (সহবাসের) নেয়ামত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কারণ বিকৃত স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে রুচি সায় দেয় না। তদ্রূপ বালিকার যৌন চাহিদা না থাকার কারণে তার প্রতি আকর্ষণ কমই হয়ে থাকে। তদ্রূপ সন্তানের দাসত্বের আশঙ্কায় দাসী স্ত্রীর প্রতিও আগ্রহ কম হয়ে থাকে, আর ধর্মের ভিন্নতার ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গতার অভাব হয়ে থাকে।

কাফির স্ত্রীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ(র) আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের এই মাত্র উল্লেখিত বক্তব্য হলো তার বিপক্ষের দলীল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী,

لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحرة العبد

ইহুদী স্ত্রী এবং নাসরানী স্ত্রী মুসলিম স্বামীকে, তদ্রূপ দাসী স্ত্রী স্বাধীন স্বামীকে এবং দাস স্বামী স্বাধীন স্ত্রীকে মোহছান বানাতে পারে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোহছানকে একত্রে বেত্রাঘাত ও রজম করা যাবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটিকে একত্র করেননি। তাছাড়া এই কারণে যে, রজমের সাথে বেত্রাঘাত উদ্দেশ্যেহীন হয়ে পড়ে। কেননা অন্যকে সতর্ক করার উদ্দেশ্য তো সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে রজম দ্বারাই অর্জিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে রজম দ্বারা মৃত্যু হওয়ার পর তার নিজের সতর্ক হওয়ার প্রশ্ন নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অবিবাহিতের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন একত্র করা যাবে না।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) হদ্দরূপে উভয় শাস্তি একত্র করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

কুমারের সাথে কুমারীর ব্যভিচারে একশ দোররা ও এক বছরের নির্বাসন।

তাছাড়া এই কারণে যে, এতে পরিচয় স্বল্পতার কারণে ব্যভিচারের সুযোগ বন্ধ করা হয়।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী فاجلدوا। এখানে ف অব্যয়টির ব্যাকরণগত দাবীর ভিত্তিতে বলা যায় যে, বেত্রাঘাতকেই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র ওয়াজিব শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কিংবা এই জন্য যে. এটাই হচ্ছে (শাস্তির ক্ষেত্রে) সমগ্র উল্লেখকৃত বিষয়।

তাছাড়া এই কারণে যে. আত্মীয় স্বজনের লজ্জা-ভয় না থাকার কারণে নির্বাসন দ্বারা যিনার দরজা খুলে দেয়া হয়। তদুপরি এতে জীবিকার পথ রুদ্ধ করা হয়। ফলে হয়ত যিনাকেই সে উপার্জনের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করবে। আর সেটা যিনার নিকৃষ্ট স্তর। আর হযরত আলী (র) এর নিম্নোক্ত বাণী সম্ভাবনার এই দিকটিকে প্রবলতা দান করে,

كفى بالنفي فتنة

ফিতনা হিসাবে নির্বাসনই যথেষ্ট।

আর আলোচ্য হাদীসটি তার অপরাংশের ন্যায় রহিত হয়ে গেছে। সে অংশটি হলো,

الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة

বিবাহিতের সাথে বিবাহিতার ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশ বেত্রাঘাত এবং প্রস্তর দ্বারা রজম।

আর আলোচ্য হাদীস রহিত হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে (নাসিখ মানসুখ বিষয়ক শাস্ত্রে) আলোচিত হয়েছে। **তবে শাসক যদি নির্বাসনে উপকার মনে করেন, তবে যে মেয়াদ উপযুক্ত বিবেচিত হয় সে মেয়াদের জন্য ব্যভিচারীকে নির্বাসন দিতে পারেন।**

এটা (হদ্দ নয় বরং) সাধারণ শাস্তি ও শাসন। কেননা ক্ষেত্র বিশেষে এটি উপকারী হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত শাসকের মতের উপর নির্ভর করবে। কোন কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত নির্বাসন বিষয়ক হাদীস এই ব্যাখ্যার উপর প্রযোজ্য হবে। **অসুস্থ ব্যক্তি যদি যিনা করে আর তার হদ্দ যদি রজম হয় তাহলে রজম করা হবে।**

কেননা প্রাণনাশই হলো তার প্রাপ্য, সুতরাং অসুস্থতার কারণে শাস্তি স্থগিত হবে না। **আর যদি তার হদ্দ বেত্রাঘাত হয় তাহলে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত বেত্রাঘাত করা হবে না।**

যাতে তা প্রাণনাশ না ঘটায়। একারণেই চুরির ক্ষেত্রে প্রচন্ড গরমে বা প্রচন্ড শীতে হস্ত কর্তন করা হয় না।

গর্ভবতী যদি যিনা করে তাহলে প্রসবের পূর্বে হদ্দ কায়েম করা হবে না।

যাতে তা সন্তানের মৃত্যুর কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সেটাতো সম্মানযোগ্য প্রাণ।

আর যদি তার হদ্দ হয় বেত্রাঘাত তাহলে নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত করা হবে না।

কেননা নেফাস একধরনের অসুস্থতা । সুতরাং আরোগ্য লাভের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে। রজমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে বিলম্বের কারণ সন্তান । আর সেটাতো দেহচ্যুত হয়ে গেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সন্তান তার উপর নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে, যদি তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের মত কেউ না থাকে। কেননা এই বিলম্বে জীবন নাশ থেকে সন্তানকে রক্ষার বিষয় রয়েছে।

আর বর্ণিত আছে যে, প্রসবের পর গামেদি মহিলা (র) কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ফিরে যাও এবং তোমার সন্তান তোমার উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

আর হদ্দ যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে গর্ভবতীকে প্রসব পর্যন্ত আটক রাখা হবে যাতে পালিয়ে না যায়। স্বীকারোক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বীকারোক্তিতে প্রত্যাহারের বিষয়টি কার্যকর। সুতরাং আটক করা অর্থহীন। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ সংগম হদ্দ ওয়াজিব করে আর কোন্টি করে না ?

হেদায়া গ্রন্থাকার বলেন, যিনা বা ব্যাভিচার হচ্ছে হদ্দ ওয়াজিবকারী সংগম। **আর অভিধানে ও শরীয়তের পরিভাষায় যিনা অর্থ মালিকানামুক্ত বা মালিকানার সন্দেহমুক্ত**

ক্ষেত্রে সম্মুখস্থ গুপ্তাংগে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীলোকের সাথে যৌন সংগম। কেননা এটা নিষিদ্ধ কর্ম। (সুতরাং হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার জন্য তাতে পূর্ণতা আবশ্যক) আর হারামত্বের পূর্ণতা হবে মালিকানা এবং মালিকানার সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী এটাকে সমর্থন করে,

ادرءوا الحدود بالشبهات

সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত করে দাও। আর সন্দেহের ক্ষেত্র দুটি। প্রথমত: ব্যভিচার কর্মে সন্দেহ। এটাকে شبهة اشتباه (হারামত্বের দ্বিধাজনিত সন্দেহ) বলা হয়। দ্বিতীয়ত: ব্যভিচারের পাত্রীতে (বা পাত্রে) সন্দেহ। এটাকে شبهة حكمية (বা অধিকার জনিত সন্দেহ) বলা হয়।

প্রথমটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে, যে প্রমাণগত দ্বিধায় পড়েছে। অর্থাৎ অপ্রমাণকে প্রমাণ ভেবে নিয়েছে। অবশ্য এই দ্বিধা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রবল ধারণা বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত হবে স্বকীয়ভাবে হারামত্ব নাকচকারী প্রমাণ বিদ্যমান থাকা দ্বারা। সেটা অপরাধকারীর ধারণার ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হবে না। উভয় ক্ষেত্রেই হদ্দ রহিত হয়ে যায়। কেননা এ বিষয়ক হাদীসটি ব্যাপক।

আর সংগমকারী যদি সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নসব সাব্যস্ত হবে কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে দাবী করলেও হবে না। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি খালেছ যিনা, তবে হদ্দ রহিত হচ্ছে লোকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কারণে। আর সেটা হলো তার দৃষ্টিতে কথাটার হারামত্বের অস্পষ্টতা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা খালেছ যিনা নয়।

ব্যভিচার কর্মে সন্দেহ হওয়ার ক্ষেত্র আটটি। যথা, পিতার (দাদার যত উর্ধ্বতন হোক) দাসী, মাতার দাসী, স্ত্রীর দাসী, ইদ্দত অবস্থায় তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী, অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত তালাকের মাধ্যমে বায়ন তালাকপ্রাপ্ত ইদ্দতরত স্ত্রী, মালিকের আযাদকৃত ইদ্দত অবস্থার উম্মে ওয়ালাদ, গোলামের জন্য মনিবের দাসী, এবং কিতাবুল হুদূদের বর্ণনা মতে বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী দাসী।

এসকল ক্ষেত্রে লোকটি যদি বলে যে, আমার প্রবল ধারণা ছিলো যে, পাত্রীটি আমার জন্য হালাল, তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। আর যদি বলে যে, আমি জানতাম যে, পাত্রীটি আমার জন্য হারাম, তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে।

পাত্রীতে সন্দেহ সাব্যস্ত হবে ছয়টি ক্ষেত্রে। যথা পুত্রের দাসী, অস্পষ্ট শব্দে প্রদত্ত বায়ন তালাক দ্বারা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী, বিক্রেতার জন্য দখল হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রিতা দাসী, স্বামীর জন্য বিবাহের মাহর রূপে সাব্যস্ত দাসী, স্ত্রী কর্তৃক দখল বুঝে নেয়ার পূর্বে দুজনের শরীকানার দাসী এবং কিতাবুর রিহন -এর বর্ণনা মতে বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী দাসী।

এসকল ক্ষেত্রে লোকটি যদি বলে যে, আমি জানতাম যে, পাত্রীটি আমার জন্য হারাম তবু তার উপর ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে আরেক প্রকার সন্দেহ রয়েছে, যা বৈবাহিক আকদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। এমনকি যদিও আকদটির হারামত্ব

সর্বসম্মত হয় এবং হারামত্ব সম্পর্কে লোকটি অবগত হয়। অন্যদের মতে, লোকটি যদি আকদের হারামত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে সন্দেহ সাব্যস্ত হবে না। এই মতপার্থক্যের ফলাফল মাহরামকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে যার বিবরণ ইনশআল্লাহ আসছে।

সন্দেহের উভয় প্রকার যখন আমরা জানলাম ।

কেউ যদি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে অতঃপর ইদ্দতের মধ্যে তার সাথে সহবাস করে আর বলে যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম, তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। কেননা হালালকারী মালিকানা সর্বতো ভাবে রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং সন্দেহের সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যাবে। আর কিতাবুল্লাহ এক্ষেত্রে হালালত্ব নাকচ হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে। এবং এর উপর ইজমা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিরোধীর মত বিবেচ্য হবে না। কেননা এটা মতভিন্নতা নয়, বরং বিরোধিতা।

আর যদি বলে যে, আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে আমার জন্য হালাল, তাহলে হদ্দ জারী হবে না। কেননা ধারণাটি যথাস্থানে হয়েছে। এজন্য যে, নগরের ক্ষেত্রে গৃহত্যাগের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে এবং নফ্কা (ভরণপোষণ) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহগত মালিকানার জের অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং হদ্দ রহিত করার পর্যায়ে তার ধারণা বিবেচ্য হবে।

মনিবের আযাদকৃত উম্মে ওয়ালাদ এবং খোলাকৃত স্ত্রী এবং অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা এসকল ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে হারামত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। আবার ইদ্দতের অবস্থায় বিবাহগত মালিকানার কিছু চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে (এভাবে প্রচ্ছন্ন তালাকের শব্দ) বলে, তুমি মুক্ত কিংবা তোমার বিষয় তোমার হাতে, আর স্ত্রীও আত্ম-স্বাধীনতা গ্রহণ করলো, অতঃপর ইদ্দতের অবস্থায় তার সাথে সহবাস করলো আর বললো যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম। তবুও হদ্দ জারী করা হবে না। কেননা প্রচ্ছন্ন তালাকের বিষয়ে ছাহাবা কেরামের মত ভিন্নতা রয়েছে।

হযরত ওমর (রা) এর মতে সেটি তালাকে রিজয়ী।

অন্য সকল অস্পষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ একই সিদ্ধান্ত হবে যদি (এই সকল প্রচ্ছন্ন শব্দ দ্বারা) তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। কেননা এ বিষয়েও মতভিন্নতা রয়েছে।

কেউ যদি সন্তানের বা সন্তানের সন্তানের দাসীর সংগে সহবাস করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না, যদিও সে বলে যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম।

শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী এই সন্দেহটি যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে দলীলের দ্বারা, দলীলে তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস أنت ومالك لابيك তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। আর দাদার ক্ষেত্রেও পিতৃত্বের গুণগত দিক বিদ্যমান রয়েছে।

আর তার সাথে নসব সাব্যস্ত হবে। এবং তার যিম্মায় দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে।

বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি পিতার কিংবা মাতার কিংবা স্ত্রীর দাসীর সাথে সংগম করে আর বলে যে, আমার ধারণা ছিলো যে, সে আমার জন্য হালাল, তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না এবং তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীর উপরও হদ্দুল কাযাফ (অপবাদজনিত হদ্দ) জারী হবে না। আর যদি বলে যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম, তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে। অদ্রূপ একই সিদ্ধান্ত হবে যদি গোলাম মনিবের দাসীর সাথে সংগম করে।

কেননা এদের মাঝে উপকার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। সুতরাং উপভোগের বৈধতাও সম্ভাবনা যুক্ত। সুতরাং এটা অস্পষ্টতা জনিত সন্দেহ।

তবে যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এটি যিনা সেহেতু তার নামে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দুল কাযাফ জারী হবে না।

অদ্রূপ দাসী যদি বলে যে, আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে আমার জন্য হালাল।

আর পুরুষটি হালালত্বের দাবী না করলেও যাহিরে রেওয়ায়াতের মতে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। কেননা ব্যভিচার কাজটি অভিন্ন। (সুতরাং একজনের ক্ষেত্রে রহিত হলে অপরজনের ক্ষেত্রেও রহিত হবে।)

যদি নিজের ভাইয়ের বা চাচার দাসীর সাথে হালালত্বের ধারণার ভিত্তিতে সংগম দান করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে।

কেননা তাদের মাঝে সম্পদ ব্যবহারে প্রশস্ততা নেই। 'জন্ম সূত্র' ছাড়া অন্য সকল মাহরামের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত হবে।

কারণ সেটাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি (অর্থাৎ পরস্পর সম্পদ ব্যবহারে অপ্রশস্ততা)

যদি কারো বাসর ঘরে স্ত্রী ছাড়া অন্য রমণীকে তুলে দিয়ে স্ত্রীলোকেরা বলে যে, এ তোমার বধূ ফলে সে তার সংগে সহবাস করলো। এমতাবস্থায় হদ্দ জারী হবে না। তার উপর মাহর ধার্য হবে।

এক্ষেত্রে হযরত আলী (র) মাহর ধার্যের এবং সেই সাথে ইদ্দত পালনের ফায়সালা করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, সে একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করেছে। আর সেটা হলো অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সংবাদ। কেননা মানুষ প্রথম মুহূর্তেই নববধূ ও অন্য রমণীর মাঝে পার্থক্য করে উঠতে পারে না।

সুতরাং সে অর্থাৎ বিবাহগত বা দেহসত্তাগত মালিকানার ভরসায় সহবাসকারী[১] ধোকাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত হলো।

আর তার নামে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দুল কাযাফ জারী হবেনা। কেননা প্রকৃত পক্ষে মালিকানা রহিত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত এক বর্ণনা মতে জারী হবে।

১। কিন্তু পরে দেখা গেলো যে, তার বৈধ স্বামী রয়েছে, কিংবা বৈধ মালিক রয়েছে।

কেউ যদি নিজের শয্যায় কোন স্ত্রীলোককে পেয়ে সংগম করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে।

কেননা দীর্ঘ সংস্পর্শের পর অস্পষ্টতার অবকাশ নেই, সুতরাং তার ভুল ধারণাটি প্রমাণ নির্ভর নয়।

এটা এ কারণে যে, স্ত্রীর শয্যায় বাড়ীর অন্যান্য মাহরামের মধ্যেও কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে।একই সিদ্ধান্ত হবে যদি সহবাসকারী অন্ধ হয়, কেননা জিজ্ঞাসাবাদ বা অন্য কোন উপায়ে পার্থক্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

তবে যদি আপন স্ত্রীকে সে আহ্বান করে আর অন্য স্ত্রী লোক ধরা দিয়ে বলে আমি তোমার স্ত্রী, ফলে সে তাকে সঙ্গ দান করলো তাহলে হদ্দ জারী হবে না। কেননা প্রদত্ত সংবাদ প্রমাণ রূপে বিবেচ্য।

কেউ যদি এমন নারীকে বিবাহ্ করে যাকে বিবাহ্ করা তার জন্য হালাল নয় অতঃপর তার সঙ্গে সহবাস করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। তবে যদি সে হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ, মুহম্মদ ও শাফেয়ী (র) বলেন, তার উপর হদ্দ জারী হবে, যদি সে এ বিষয়ে অবগত থাকে।

কেননা এটা এমন এক বিবাহ চুক্তি, যা যথাস্থানে যুক্ত হয়নি, সুতরাং অকার্যকর হবে। যেমন কোন পুরুষের দিকে আকদ সম্বন্ধিত হলে (অকার্যকর হয়)।

যথাস্থানে না হওয়ার কারণ এই যে, সেটাই হবে কার্যক্ষেত্রের 'যথাপাত্র' যা কার্যের ফল বা বিধান গ্রহণের পাত্র হতে পারে। এখানে কার্যক্ষেত্রের ফল হচ্ছে সংগম বৈধতা, অথচ স্ত্রী লোকটি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বিবাহ চুক্তি যথাস্থানে যুক্ত হয়েছে। কেননা সেটাই কার্যক্ষেত্রের যথাপাত্র যা কার্যের উদ্দেশ্যেকে গ্রহণ করে। আর আদম কন্যা 'প্রজননে' সক্ষম, যা বিবাহের উদ্দেশ্য। সুতরাং সকল বিধানের ক্ষেত্রেই বিবাহ্ চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শরীয়তের হারাম করার কারণে প্রকৃত হালালত্ব সংশোধনে তা ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং চুক্তিটি সন্দেহ জন্ম দিয়েছে। কেননা সন্দেহযুক্ত অর্থই হলো যা স্বয়ং সাব্যস্ত নয়, কিন্তু সাব্যস্তের সদৃশ।

কিন্তু সে একটি অপরাধ করেছে যার জন্য নির্ধারিত কোন হদ্দ নেই। সুতরাং তার উপর ভিন্নভাবে শাস্তি বিধান করা হবে।

কেউ যদি অন্য রমণীর সঙ্গে জরায়ুর বাইরে সঙ্গম করে তাহলে শাস্তি বিধান করা হবে। কেননা এটি এমন অপরাধ, যার জন্য নির্ধারিত কোন হদ্দ নেই।

কেউ যদি অন্য রমণীর গুহ্যদ্বারে সংগম করে কিংবা কোন পুরুষের সাথে সমকামিতা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোন হদ্দ নেই; তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর (শাস্তির স্বরূপ সম্পর্কে) ইমাম মুহম্মদ (র) জামে ছাগীর কিতাবে বলেছেন, তাকে কারাদন্ড প্রদান করা হবে।

পক্ষান্তরে ছাহেবায়নের মতে এটা যিনার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তার উপর হদ্দ জারী করা হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে প্রাপ্ত দুটি মতের একটি। তাঁর অন্য মত এই যে,উভয়কে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اقتلوا الفاعل و المفعول

ভোগী ও ভোগা উভয়কে হত্যা করো।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে فارجموا الاعلى والاسفل উপরের ও নীচের দুটোকেই রজম করো।

ছাহেবায়নের দলীল এই যে, এটা যিনার মর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে সম্পূর্ণ হারাম রূপে শুধু বীর্যস্খলনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ যৌনানন্দ লাভের স্থানে যৌনানন্দ পূর্ণ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, এটা যিনা নয়। কেননা এর নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে সাহাবা কেরামের মতভিন্নতা রয়েছে। যেমন আগুনে পুড়িয়ে মারা, দেয়াল ধ্বসিয়ে হত্যা করা, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দেয়া এবং সেইসাথে পিছনে পাথর গড়িয়ে দেয়া, ইত্যাদি।

আবার যিনার মর্মের অন্তর্ভুক্তও নয়। কেননা এতে সন্তানকে নষ্টের মুখে ফেলে দেয়ার এবং বংশ পরিচয় সন্দেহমুক্ত করার বিষয়টি নেই। তদ্রূপ এর ঘটনাও বিরল। কেননা এখানে দুই তরফের এক তরফে চাহিদা নেই। পক্ষান্তরে যিনার চাহিদা উভয় তরফে বিদ্যমান।

ইমাম শাফেয়ী (র) বর্ণিত হাদীসটি রাষ্ট্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে কিংবা এটাকে হালাল বিশ্বাসকারীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে আমাদের উপরে বর্ণিত কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

কেউ যদি পশুর সাথে সংগম করে তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

কেননা অপরাধের ক্ষেত্রে এবং আগ্রহের বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে এতে যিনার মর্মার্থ নেই। কেননা সুস্থ রুচি তা ঘৃণা করে। আর চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা এবং প্রবল কামেচ্ছা একাজে প্ররোচিত করে। এ কারণেই পশুর লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। তবে আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

আর পশুকে যবাই করে জ্বালিয়ে ফেলার যে সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ প্রসঙ্গের আলোচনার গোড়া কেটে দেওয়া, কিন্তু তা ওয়াজিব নয়।

কেউ যদি দারুল হরবে কিংবা বিদ্রোহীদের অধিকৃত অঞ্চলে যিনার অপরাধ করে অতঃপর আমাদের দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা তার অবস্থান যেখানেই হোক, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সে ইসলামের বিধান সমূহ পালনে দায়বদ্ধ হয়েছে।

আমাদের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

لا يقام الحدود فى دار الحرب

(দারুল হরবে হদ্দ কায়েম করা হবে না।)

তাছাড়া হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য যেহেতু বিরত রাখা আর উক্ত দুই স্থানে শাসকের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব নেই, সেহেতু সে ক্ষেত্রে হদ্দ ওয়াজিব করা বেকায়দা হবে। দারুল ইসলামে চলে আসার পরও হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা যিনার অপরাধটি হদ্দ ওয়াজিব কারী হয়নি। সুতরাং পরবর্তীতে হদ্দ ওয়াজিবকারী রূপে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

নিজে হদ্দ কায়েমের ক্ষমতাধিকারী কেউ যদি বাহিনী সহ অভিযানে বের হয়, যেমন স্বয়ং খলিফা কিংবা শহরের শাসক; তাহলে তাঁর বাহিনীর কেউ যিনা করলে তিনি তার উপর হদ্দ কায়েম করবেন। কেননা সে তার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। পক্ষান্তরে বাহিনী প্রধান কিংবা সৈন্যদল প্রধান তা পারবে না। কেননা তাদের হাতে হদ্দ কায়েম করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি।

কোন হারবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে আসে এবং কোন যিম্মী নারীর সাথে যিনা করে কিংবা কোন যিম্মি যদি নিরাপত্তা গ্রহণ কারিণী কোন হারবিয়ার সাথে যিনা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে যিম্মি ও যিম্মিয়াকে হদ্দ কায়িম হবে; কিন্তু হারবী ও হারবিয়ার হদ্দ কায়িম করা হবে না। যিনার ব্যাপারে ইমাম মুহম্মদ (র)-এরও এই মত অর্থাৎ যিম্মী যদি হারবীয়ার সাথে যিনা করে।

পক্ষান্তরে হারবী যদি যিম্মী নারীর সাথে যিনা করে তাহলে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে তাদের উপর হদ্দ কায়িম হবে না। প্রথম দিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এরও এই মত ছিলো।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, সকলের উপরই (সর্বাবস্থায়) হদ্দ কায়িম করা হবে। এ হল তাঁর শেষ মতামত। ইমাম আবূ ইউসুফের দলীল এই যে, নিরাপত্তা গ্রহণকারী হারবী আমাদের দারুল ইসলামে অবস্থান কাল পর্যন্ত কার্যকরী বিষয়ে আমাদের যাবতীয় আহকাম ও বিধান সমূহ পালনের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। যেমন যিম্মী সারা জীবনের জন্য ঐ বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। একারণেই তার উপর হদ্দুল কাযাফ (অপবাদের হদ্দ) প্রয়োগ করা হয় এবং কিসাসের ভিত্তিতে কতল করা হয়। মদপানের হদ্দের বিষয়টির অবশ্য ভিন্ন। কেননা সে এর বৈধতায় বিশ্বাসী।

তারফায়নের দলীল এই যে, সে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রবেশ করেনি, বরং ব্যবসা ইত্যাদি সাময়িক প্রয়োজনে প্রবেশ করেছে। সুতরাং সে দারুল ইসলামভুক্ত হয়নি। এ কারণেই সে দারুল হরবে ফিরে যেতে সক্ষম। এবং তাকে হত্যার কারণে মুসলমান বা যিম্মীকে কিছাছ রূপে হত্যা করা হয় না। কেননা সে ঐ সমস্ত বিধানের দায় গ্রহণ করেছে, যা তার উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেগুলো হচ্ছে বান্দার হক সমূহ। কেননা সে যখন অনুকূল ইনসাফের আশা করছে তখন প্রতিকূল ইনসাফেরও দায় গ্রহণ করবে। আর কিছাছ ও হদ্দুল কাযাফ হচ্ছে বান্দার হক। পক্ষান্তরে যিনার হদ্দ হচ্ছে শরীয়তের হক।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল হলো (যিম্মী ও যিম্মীয়ার মাঝে) পার্থক্য থাকা। কেননা যিনার ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে পুরুষের ক্রিয়ার কান্ড, স্ত্রী লোকটি তার অনুগামিনী মাত্র। যা সামনে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। সুতরাং মূলের ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়া অনুগামীর ক্ষেত্রে রহিত হওয়া দাবী করে। পক্ষান্তরে অনুগামীর ক্ষেত্রে রহিত হওয়া মূলের ক্ষেত্রে রহিত হওয়া দাবী করে না।

এর উদাহরণ হল প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি বালিকা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক নারীর সাথে যিনা করে (তবে পুরুষের উপর হদ্দ কায়িম করা হয়) এবং প্রাপ্ত বয়স্কা যদি বালককে কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে সুযোগ দান করে (তবে কারো উপর হদ্দ কায়িম করা হয় না)।

হারবী সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, নিরাপত্তা প্রাপ্ত হারবীর কর্মটি যিনা (রূপেই বিবেচ্য)। কেননা বিশুদ্ধ মতে সে যাবতীয় আদেশ নিষেধ গ্রহণের সম্বোধন পাত্র, যদিও আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী বিধান সমূহ পালনের সম্বোধন পাত্র সে নয়। আর নিজের সাথে যিনা করার সুযোগ দান স্ত্রীলোকটির উপর হদ্দ ওয়াজিবকারী বিষয়। বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তারা শরীয়তের সম্বোধন পাত্র নয়।

এই মতপার্থক্যের উদাহরণ এই যে, বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি যখন ইচ্ছুক নারীর সাথে যিনা করে তখন ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ইচ্ছুক নারীর উপর হদ্দ জারি হয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে তার উপর হদ্দ জারী হয় না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, নিজেই উৎসাহ দান করেছে এমন কোন নারীর সাথে যদি বালব বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি যিনা করে তাহলে তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

আর যদি সুস্থ মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি বিকৃত মস্তিষ্ক কোন নারীর সাথে কিংবা অনুরূপ বালিকা যাকে সংগম করা যেতে পারে, তার সাথে যিনা করে, তাহলে শুধু পুরুষটির উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, নারীর পক্ষ থেকে বিদ্যমান ওযর পুরুষের উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়া সাব্যস্ত করে না। তদ্রূপ পুরুষের পক্ষ হতে বিদ্যমান ওযর নারীর উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়া সাব্যস্ত করবে না।

এটা এজন্য যে উভয়ের প্রত্যেকে স্ব-স্ব কর্মের জন্য দায়ী।

আমাদের দলীল এই যে, যিনার কর্মটি পরুষ থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর নারী নিছক ব্যভিচার কর্মের স্থল। একারণেই পুরুষকে واطى (সহবাসকারী), زانية (যিনাকারী) পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকটিকে موطوءة (যার সাথে সহবাস করা হয়েছে) বলা হয় এবং مزنى بها (যার সাথে যিনা করা হয়েছে) বলা হয়। অবশ্য কর্মকারকের জন্য কর্তৃকারকের শব্দ প্রয়োগের ভিত্তিতে রূপক অর্থে নারীকেও زانية (যিনাকারিণী) বলা হয়। যেমন مرضية অর্থে راضية, শব্দের প্রয়োগ কিংবা এই ভিত্তিতে যে সুযোগ দানের মাধ্যমে সে যিনার কারণ হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে হদ্দ সম্পৃক্ত হবে যিনার ঘৃণ্য কাজের সুযোগ দানের কারণে। আর যিনা হচ্ছে এমন ব্যক্তির কর্ম, যে তা থেকে বিরত থাকার সম্বোধন পাত্র এবং তা সম্পন্ন করার কারণে গোনাহগার হয়। অথচ বালকের (তদ্রূপ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির) কর্ম অনুরূপ গুণযুক্ত নয়। সুতরাং উক্ত কর্মের সাথে হদ্দ সম্পৃক্ত হবে না। **ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি সুলতানের (শাসকের) বল প্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে যিনা করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না।**

প্রথম দিকে ইমাম আবু হানীফা (র) হদ্দ কায়েমের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ইমাম যুফার (র) এরও এ মত। কেননা লিংগোত্থান ছাড়া পুরুষের পক্ষ থেকে যিনা সম্পন্ন হতে পারে না আর তা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হওয়ার প্রমাণ। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে হদ্দ কায়েম না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা বাধ্যকারী কারণ প্রকাশ্যরূপে বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে লিংগোত্থান হচ্ছে দ্বিধাপূর্ণ প্রমাণ। কেননা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতিগত কারণেও তা হতে পারে। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সুতরাং বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে।

সুলতান ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি বল প্রয়োগ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর হদ্দ জারী হবে। সাহেবায়ন বলেন, হদ্দ জারী হবে না।

কেননা তাদের মতে সুলতান ছাড়া অন্যদের থেকেও বল প্রয়োগ হতে পারে। কারণ, মূল ভূমিকা হলো প্রাণ নাশের আশঙ্কা আর তা সুলতান ছাড়া অন্যদের দ্বারাও সাব্যস্ত হতে পারে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, অন্য কারো থেকে বল প্রয়োগ স্থায়ী হওয়া অতি বিরল। কেননা সুলতানের সাহায্য গ্রহণ কিংবা মুসলমানদের জামাত থেকে সাহায্য গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব। তদ্রূপ নিজের পক্ষে ও অস্ত্রের সাহায্যে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর বিরল অবস্থার উপর কোন হুকুম হয় না। সুতরাং তা দ্বারা হদ্দ রহিত হবে না। আর সুলতানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ কিংবা নিজে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টি দুটি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

কেউ যদি বিভিন্ন মজলিশে চার বার স্বীকারোক্তি করে যে, সে অমুক নারীর সাথে যিনা করেছে, অথচ স্ত্রী লোকটি বলে যে, সে আমাকে বিবাহ করেছে। কিংবা স্ত্রীলোকটা যিনার কথা স্বীকার করে আর লোকটি বলে যে, আমি তাকে বিবাহ করেছি, তাহলে তার উপর (এবং উক্ত নারীর উপর) হদ্দ সাব্যস্তত হবে না। বরং উভয় অবস্থায় তার উপর মাহর ওয়াজিব হবে।

কেননা বিবাহের দাবীটার সত্যতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা উভয় পক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং দাবীটি সন্দেহের উদ্রেক করেছে। আর হদ্দ যখন রহিত হলো তখন উপভোগ অংগের মর্যাদা প্রকাশের জন্য মাহর ওযাজিব হবে।

কেউ যদি কোন দাসীকে ধর্ষণ করে ফলে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে এবং তার উপর দাসীটির মূল্য ওয়াজিব হবে।

এ কথতার অর্থ এই যে, ধর্ষণ কর্ম দ্বারা হত্যা করেছে। হদ্দ ও মূল্যের ক্ষতিপূরণ দুটো সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, সে দুটি অপরাধ করেছে, সুতরাং প্রত্যেকটির বিধান পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা ধর্ষকের উপর মূল্যের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়াটা দাসীর মালিকানা লাভের কারণ। সুতরাং যিনা করার পর দাসীকে খরিদ করে নেয়ার মত হলো। অবশ্য এক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য রয়েছে।

আর হদ্দ কায়েমের পূর্বে মালিকানার কারণ বিদ্যমান হওয়া হদ্দ রহিত করে। যেমন যদি হাত কর্তনের পূর্বে চোর চুরিকৃত মালের মালিক হয়ে যায়।

তারফায়নের দলীল এই যে, এটা হচ্ছে হত্যার ক্ষতিপূরণ। সুতরাং তা মালিকানা সাব্যস্ত করবে না। কেননা এটা রক্তের ক্ষতিপূরণ।

আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, তা মালিকানা সাব্যস্ত করে, তাহলে বক্তব্য এই যে, এটা দেহ সত্তার মালিকানা সাব্যস্ত করে। যেমন চুরিকৃত বস্তু হেবা করার ক্ষেত্রে উপভোগ অঙ্গের ভোগ মালিকানা সাব্যস্ত করে না। কেননা ভোগ তো উশুল হয়ে গেছে (এবং অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে) অথচ মালিকানা সাব্যস্ত হবে দাসীর সত্তার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং অস্তিত্বহীন হওয়ার কারণে উশুলকৃত ভোগের ক্ষেত্রে মালিকানা প্রকাশ পাবে না।

পক্ষান্তরে ধর্ষণের কারণে যদি চক্ষু (বা অন্য কোন অঙ্গ) নষ্ট হয় তাহলে তার মূল্য সাব্যস্ত হবে এবং হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা সেখানে মালিকানা সাব্যস্ত হয় অন্ধ হয়ে যাওয়া চক্ষু পিন্ডের মাঝে, যা একটি সত্তাবিশেষ। সুতরাং তা মালিকানার সন্দেহ সৃষ্টি করে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যে শাসকের উপর আর কোন শাসক নেই, সেই শাসক যা কিছু করবেন, সেজন্য তার উপর কোন হদ্দ জারী হবে না। অবশ্য কিছাছ জারী হবে।

অর্থাৎ কিছাছ গ্রহণ করা হবে এবং মালের হকও আদায় করতে হবে। কেননা হদ্দ হলো আল্লাহর হক। আর হদ্দ কায়েম করার কর্তৃত্ব তাঁর, অন্য কারো নয়। আর নিজের উপর হদ্দ কায়েম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হদ্দ ওয়াজিব করার কোন কায়দা নেই।

বান্দার হকসমূহের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা হক উশুল করার ওয়ালী বা অভিভাবক তা উশুল করবে, হয় খলীফার নিজের উপর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে কিংবা মুসলমানদের শক্তির সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে। আর কিছাছ ও মালের দেয় হল বান্দার হকভুক্ত।

আর হদ্দুল কাযাফ সম্পর্কে ফকীহগণ বলেছেন যে, তাতে শরীয়তের হক প্রধান। সুতরাং তার হুকুমও অন্য সকল হদ্দের ন্যায় হবে, যেগুলো আল্লাহর হক।

পরিচ্ছেদ ঃ যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তা প্রত্যাহার

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সাক্ষীরা যদি বেশ পূর্বের হদ্দ সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে অথচ শাসক থেকে দূরে অবস্থান তাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিলো না, তাহলে শুধু হাদ্দুল কাযাফ ছাড়া অন্য কোন হদ্দে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

জামে ছাগীর কিতাবে রয়েছে, যদি সাক্ষীগণ দীর্ঘ সময় পরে তার বিরুদ্ধে চুরি কিংবা মদপান কিংবা যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। তবে চোরকে চুরির মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এ সম্পর্কিত মূলনীতি এই যে, খালেছ আল্লাহর হক রূপে সাব্যস্ত হদ্দসমূহ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এগুলোকে বান্দার হকসমূহের উপর কিয়াস করেন এবং হদ্দ জারীর দুই প্রমাণের এক প্রমাণ তথা স্বীকারোক্তির উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, সাক্ষী, সাক্ষ্য প্রদান কিংবা মুসলমানের দোষ গোপন করা এ দুই নেক কর্মের মাঝে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ছিলো। এখন বিলম্ব যদি গোপন করার দিকটি গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে তাহলে এরপর সাক্ষী প্রদানে অগ্রসর হওয়ার কারণ হবে শুধু বিদ্বেষ ও শত্রুতা, যা তাকে ক্ষিপ্ত করেছে। সুতরাং সাক্ষ্যের ব্যাপারে সে সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে।

আর যদি বিলম্ব দোষ গোপন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয় তা হলে সে ফাসেক ও গোনাহগার হবে। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণের প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম। স্বীকারোক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মানুষ নিজের সাথে শত্রুতা করতে পারে না।

আর যিনা, মদপান ও চুরির হদ্দ হচ্ছে খালেছ আল্লাহর হক। এ কারণেই স্বীকারোক্তির পরও তা প্রত্যাহার করা যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া প্রতিবন্ধক হবে।

পক্ষান্তরে হদ্দুল কাযাফের মাঝে বান্দার হক রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে বান্দার কলংক মোচন হয়। এ কারণেই স্বীকারোক্তির পর এ ক্ষেত্রে তা প্রত্যাহার করা যায় না। আর বান্দার হক সন্দেহের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া প্রতিবন্ধক নয়। কেননা দাবী উত্থাপন শর্ত, সুতরাং সাক্ষীদের বিলম্ব দাবীর অনুপস্থিতির কারণে হতে পারে। তাই বিলম্ব তাদেরকে ফাসেক সাব্যস্ত করেনা। চুরির হদ্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পিছনের বর্ণনা মতে যেহেতু এটা খালেছ আল্লাহর হক, সেহেতু এক্ষেত্রে দাবী উত্থাপন শর্ত নয়, বরং দাবী উত্থাপনে শর্ত এসেছে অর্থ সম্পর্কের কারণে। হদ্দটি আল্লাহর হুকুম হওয়ার উপরই হুকুম আবর্তিত হবে। সুতরাং প্রত্যেক সাক্ষীর ক্ষেত্রে উক্ত অভিযোগ বিদ্যমান থাকার বিষয় বিবেচনা করা হবেনা,।

তাছাড়া চুরি যেহেতু মালিকের বেখবরিতে গোপনে সংঘটিত হয়, সেহেতু সাক্ষীদের কর্তব্য হলো সেটা জানিয়ে দেয়া, গোপন করা দ্বারা সে বরং ফাসিক ও গোনাহগার হবে।

আর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া প্রাথমিক অবস্থায় সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্যতা নষ্ট করে। আমাদের মতে তেমনি তা বিচারের ফায়সালার পর হদ্দ প্রয়োগের পথও রুদ্ধ করে। ইমাম যুফার (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। এমন কি যদি কিছু হদ্দ প্রয়োগের পর সে পালিয়ে যায়, অতঃপর দীর্ঘসময় পার হওয়ার পর সে ধরা পড়ে তখন তার উপর হদ্দ কায়েম হবেনা। কেননা হদ্দের ক্ষেত্রে প্রয়োগও বিচারের অংশ।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। জামে ছাগীর কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) بعد حين বলে ছয়মাসের প্রতি ইংগিত করেছেন। ইমাম তাহাবী (র)-ও অনুরূপ ইংগিত করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ না করে প্রত্যেক যুগের কাযীর বিবেচনার উপর বিষয়টি অর্পণ করেছেন।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একমাস নির্ধারণ করেছেন, কেননা এর চেয়ে কম সময়কে নিকটবর্তী গণ্য করা হয়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং এ-ই বিশুদ্ধতম।

এ সিদ্ধান্ত হবে তখন, যখন কাযী ও সাক্ষীদের মাঝে একমাসের দুরত্ব না হয়। আর যদি ঐ পরিমাণ দূরত্ব হয় তাহলে এক মাসের পরেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা এখানে প্রতিবন্ধক হচ্ছে শাসক থেকে তাদের দুরত্ব। সুতরাং শত্রুতার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আসবেনা।

মদপানের হদ্দ কায়েম করার ব্যাপারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া পরিমাণ ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে অনুরূপ ।

আর শায়খায়নের মতে গন্ধ দূর হওয়া দ্বারা তা নির্ধারণ করা হবে। মদপানের হদ্দ অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ বিষয়টি আসছে।

আর যদি সাক্ষীগণ কোন লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে অমুক নারীর সাথে যিনা করেছে; অথচ সে নারী অনুপস্থিত রয়েছে, তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে অমুকের মাল চুরি করেছে; অথচ অমুক অনুপস্থিত রয়েছে - তাহলে হস্তকর্তন করা হবেনা।

পার্থক্যের কারণ এই যে, অনুপস্থিতির কারণে দাবী উত্থাপনের অনুপস্থিতি হয়, আর দাবী উত্থাপন চুরির সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে, যিনার ক্ষেত্রে শর্ত নয়।

অবশ্য কথিত স্ত্রীলোকটির উপস্থিতিতে সন্দেহের দাবী করার ধারণা[১] রয়েছে। কিন্তু নিছক ধারণা বিবেচ্য নয়।

যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে এমন এক স্ত্রীলোকের সংগে যিনা করেছে, যাকে তারা চিনেনা, তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবেনা।

কেননা সে নারী তার স্ত্রী বা দাসী হওয়ার সম্ভাবনা রায়েছে। বরং তা-ই তো স্বাভাবিক।

তবে সে যদি (অপরিচিতা নারীর সাথে) যিনার কথা স্বীকার করে তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা তার নিজের কাছে তো তার দাসী বা তার স্ত্রীর পরিচয় গোপন থাকতে পারেনা।

দু'জন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক স্ত্রীলোকের সাথে বলপূর্বক যিনা করেছে আর অপর দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রীলোকটি তাকে স্বেচ্ছায় সুযোগ দিয়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উভয়ের থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

এ-ই যুফার (র)-এরও মত।

ছাহেবায়ন বলেন, শুধু পুরুষটির উপর হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা উভয় হদ্দ ওয়াজিবকারী মূল বিষয়ে একমত রয়েছে। শুধু একজন অতিরিক্ত অপরাধের ব্যাপারে আলাদা মত প্রকাশ করেছে। আর তা হচ্ছে বল প্রয়োগ।

স্ত্রীলোকটির বিষয় ভিন্ন, কেননা তার ক্ষেত্রে হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো তার সম্মতি, আর সেটা উভয় সাক্ষীদলের ভিন্নমতের কারণে সাব্যস্ত হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র)- এর দলীল এই যে, এখানে সাক্ষ্যের বিষয় ভিন্ন হয়েছে। কেননা যিনা এমন কর্ম যা উভয় দ্বারা সম্পন্ন হয় (সুতরাং – তা দুই বিপরীত গুণযুক্ত হতে পারেনা, সুতরাং কোন পক্ষেই সাক্ষির নেছাব পূর্ণ হয়নি)।

তাছাড়া স্ত্রীলোকটির সম্মতির সাক্ষ্যদানকারীরা তাকে অপবাদ দানকারী হয়ে গেলো। ফলে তারা সাক্ষীর পরিবর্তে স্ত্রীলোকটির প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ালো। তবে তাদের উপর থেকে হদ্দুল কাযাফ রহিত হওয়ার কারণ হচ্ছে বল প্রয়োগের সাক্ষ্যদানকারীদ্বয়ের সাক্ষ্য। কেননা বল প্রয়োগের যিনা তার 'মোহছান' হওয়া রহিত করে দেয়।

১। অর্থাৎ সে বলতে পারে যে, বিবাহ হয়েছিলো, তখন সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং তার অনুপস্থিতির কারণে সন্দেহ বিদ্যমান হওয়ার একটা ধারণা সৃষ্টি হয়। এটা হচ্ছে সন্দেহের সন্দেহ, যা বিবেচ্য নয়।

আর যদি দু'জন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে একজন স্ত্রীলোকের সাথে কুফায় যিনা করেছে আর অপর দুজন সাক্ষী দেয় যে, সে তার সাথে বছরায় যিনা করেছে, তাহলে নারী পুরুষ উভয় থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

কেননা সাক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে ব্যভিচার কর্ম। আর স্থান ভিন্নতার কারণে ব্যভিচার কর্ম ভিন্ন হয়ে গেলো। সুতরাং দুটির কোন ক্ষেত্রেই সাক্ষীর নেছাব পূর্ণ হয়নি।

অবশ্য সাক্ষীদের উপর হদ্দুল কাযাফ প্রয়োগ করা হবে না, কেননা স্ত্রীলোকটির অভিন্নতা এবং দৃশ্যগত অভিন্নতার কারণে ব্যভিচার কর্মের অভিন্নতার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আর যদি একই ঘরের বিভিন্ন স্থানের ক্ষেত্রে সাক্ষীরা ভিন্নমত করে তাহলে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে।

এর অর্থ এই যে,প্রত্যেক দুজন ঘরের ভিন্ন ভিন্ন কোণে যিনা সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কিয়াসের দাবী হচ্ছে হদ্দ কায়েম না করা, কেননা প্রকৃত পক্ষে স্থান ভিন্ন হয়েছে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, উভয় সাক্ষ্যের মাঝে এভাবে সমন্বয় সম্ভব যে , যিনা শুরু হয়েছিল এক কোণে কিন্তু জড়াজড়ি ও গড়াগড়ির কারণে অপর কোণে গিয়ে তা শেষ হয়েছে।

কিংবা ঘটনা ঘরের মধ্যস্থানে হয়েছে, কিন্তু যারা সামনের দিকে ছিলো তারা সামনের দিকে ধারণা করেছে। আর যারা পিছনের দিকে ছিলো তারা পিছনের দিকে ধারণা করেছে। এভাবে নিজ নিজ দৃষ্টি অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করেছে ।

আর যদি চারজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে সূর্যোদয়ের সময় নুখায়লা নামক স্থানে একজন স্ত্রীলোকের সাথে যিনা করেছে। আর চারজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে সূর্যোদয়ের সময় তার সাথে দিরহিন্দ নামক স্থানে যিনা করেছে, তাহলে সবার উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

স্ত্রী- পুরুষ উভয় থেকে রহিত হওয়ার কারণ এই যে, অনির্ধারিতভাবে দুইদল সাক্ষীর একটি দলের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত।

আর সাক্ষীদের থেকে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ, প্রত্যেক দলের সত্যবাদিতার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি চারজন সাক্ষী কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয় অথচ প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীলোকটি কুমারী , তাহলে উভয় থেকে এবং সাক্ষীদের থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

কেননা কুমারিত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যিনা সম্পন্ন হতে পারে না। মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, স্ত্রীলোকেরা তার গুপ্তাংগ দেখে তাকে কুমারী বলে রায় দিলো, আর হদ্দ রহিত করার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য প্রমাণ রূপে গণ্য হবে। অবশ্য হদ্দ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ রূপে গণ্য নয়। একারণেই স্ত্রী- পুরুষ উভয় থেকে হদ্দ রহিত হবে, কিন্তু সাক্ষীদের উপর হদ্দ কায়েম হবে না।

যদি চারজন সাক্ষী কোন লোকের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে, আর তারা অন্ধ কিংবা হদ্দুল কাযাফ প্রাপ্ত হয় কিংবা তাদের একজন গোলাম বা হদ্দুল কাযাফ প্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের উপর হদ্দ কায়েম হবে। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না।

কেননা এদের সাক্ষ্য দ্বারা তো অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ই সাব্যস্ত হয় না, হদ্দ কিভাবে সাব্যস্ত হবে?

আর যেহেতু এরা (সাক্ষ্য ধারণে সক্ষম হলেও শাসকের সামনে)সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয়, আর গোলাম যেহেতু সাক্ষ্য ধারণ ও প্রদান কোনটারই উপযুক্ত নয়, সেহেতু যিনার সন্দেহ (পর্যন্ত) সাব্যস্ত হয় নি। কেননা যিনা সাব্যস্ত হয় সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে, (সুতরাং তাদের উপর অপবাদ আরোপের হদ্দ কায়েম করা হবে।)

আর যদি তারা ফাসিক প্রমাণিত অবস্থায় যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে কিংবা (সাক্ষ্য প্রদানের পর) প্রকাশ পায় যে, তারা ফাসিক, তাহলে তাদের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না।

কেননা ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষ্য ধারণ ও সাক্ষ্য প্রদান দুটোরই উপযুক্ত. যদিও ফাসেক হওয়ার অভিযোগের কারণে তাদের সাক্ষ্য প্রদানে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। একারণেই কাযী যদি ফাসিকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন ফায়সালা করেন তাহলে আমাদের মতে তা কার্যকর হয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য দ্বারা যিনার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। আবার ফাসিক হওয়ার অভিযোগের কারণে সাক্ষ্য প্রদানের ত্রুটি বিবেচনায় যিনা না হওয়ার সন্দেহও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যিনার হদ্দ এবং অপবাদ আরোপের হদ্দ উভয়টি প্রতিহত হবে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ভিন্নমত সামনে আসছে, যার ভিত্তি হলো তাঁর এই মূলনীতি অনুযায়ী যে. ফাসিক সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে ফাসিক এ বিষয়ে গোলামের সমতুল্য।

সাক্ষীদের সংখ্যা যদি চারের কম হয় তাহলে তাদের উপর হদ্দুল কাযাফ কার্যকর হবে। কারণ (আইনত:) তারা অপবাদ আরোপকারী । কেননা সংখ্যার অপূর্ণতার সময় সাক্ষ্যদান ছাওয়াবের কাজ নয়। আর ছাওয়াবের দিক বিবেচনার কারণেই সাক্ষ্য দান অপবাদ আরোপ থেকে পৃথক।

চারজন যদি কোন লোকের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে, অতঃপর তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হয়, অতঃপর দেখা গেলো যে, তাদের একজন গোলাম কিংবা হদ্দুল কাযাফ প্রাপ্ত, তাহলে তাদের উপর হদ্দুল কাযাফ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা তারা অপবাদ আরোপকারী, কারণ প্রকৃতপক্ষে সাক্ষী তিনজনই রয়েছে। **তবে তাদের উপর কিংবা বাইতুল মালের উপর প্রহারের ক্ষতিপূরণ অবশ্য সাব্যস্ত হবে না। আর যদি রজম হয়ে থাকে তাহলে তার দিয়ত বাইতুল মালের উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।**

এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ছাহেবায়ন বলেন, প্রহারের ক্ষতিপূরণও বাইতুল মালের উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে। অধম বান্দা (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) বলে, এর অর্থ এই যে, প্রহারের কারণে যদি জখম হয়।একই মতভিন্নতা রয়েছে যদি বেত্রাঘাতের কারণে মৃত্যু ঘটে যায়। এই মতভিন্নতার ভিত্তিতেই যদি (বেত্রাঘাতের দ্বারা জখম বা মৃত্যু হওয়ার পর) সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে ইমাম আবূ হানিফা (র)এর মতে, তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে না। আর ছাহেবায়নের মতে তাদের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে।

ছাহেরায়নের দলীল এই যে, তাদের সাক্ষ্য দ্বারা নিঃশর্ত বেত্রাঘাত অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা জখম পরিহার করে প্রহার করা সাধ্যাতীত। সুতরাং জখমকারী ও জখমহীন উভয় প্রহারই অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে(জখম বা মৃত্যু) তাদের সাক্ষ্যের সাথেই সম্বন্বিত হবে, এর প্রত্যাহারের কারণে তারা দায়বহনকারী হবে। আর প্রত্যাহার না করার কারণে বইতুল মালের উপর দায় সাব্যস্ত হবে। কেননা, জল্লাদের কর্ম কাযীর সাথে সম্পর্কিত, যিনি মুসলমানদের জন্য কর্মরত। সুতরাং তাদের অর্থের মধ্যেই ক্ষতিরপূরণ সাব্যস্ত হবে, যেমন রজম ও কিছাছের বেলায়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দীলল এই যে, (তাদের সাক্ষ্য দ্বারা) শুধু বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো ব্যথা সৃষ্টিকারী প্রহার, জখম সৃষ্টিকারী বা প্রাণঘাতী নয়। সুতরাং বাহ্যতঃ ঐ বেত্রাঘাত জখম সৃষ্টিকারী হবে না। প্রহারকারীর মাঝে নিহিত কোন কারণ ছাড়া। আর তা হলো তার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা, সুতরাং তা তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। (সাক্ষীদের মাঝে সম্প্রসারিত হবে না।) তবে বিশুদ্ধ মতে প্রহারকারীর উপরও ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না, যাতে ক্ষতিপূরণের ভয়ে মানুষ হদ্দ কায়েম থেকে বিরত না হয়ে পড়ে।

চারজন লোক যদি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অন্য চারজন লোক কারো বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে ঐ লোকটির উপর হদ্দ কায়েম করা হবেনা।

কেননা সাক্ষীর উপর এই দ্বিতীয় সাক্ষীতে অতিরিক্ত সন্দেহ রয়েছে। আর অতিরিক্ত সন্দেহ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই।

এরপর যদি প্রথম দল এসে উক্ত স্থানে ব্যভিচার কর্ম অবলোকনের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলেও হদ্দ কায়েম করা হবে না।

'উক্ত স্থানে'-এর অর্থ হুবহু পূর্ববর্ণিত যিনার সাক্ষ্য প্রদান করা।

কেননা একই ঘটনার ব্যাপারে অনুবর্তীদের সাক্ষ্য রদ করার মাধ্যমে এক হিসাবে তাদের সাক্ষ্যও রদ করা হয়ে গেছে। কারণ সাক্ষ্য ও সাক্ষ্য ধারণের ক্ষেত্রে তারা মুল সাক্ষীদের স্থলবর্তী।

তবে মূল সাক্ষী এবং অনুবর্তী সাক্ষীদের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা তাদের সংখ্যা পূর্ণ রয়েছে। আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে, তার থেকে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ এক ধরনের সন্দেহের উপস্থিতি (অর্থাৎ অনুবর্তীদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ধারণের ব্যাপারে সন্দেহ এবং মূল সাক্ষীদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য রদ করে দেয়ার সন্দেহ)।

আর এই সন্দেহ যিনার হদ্দ প্রতিহত করার জন্য তো যথেষ্ট। (সাক্ষীদের উপর) হদ্দুল কাযাফ সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

চারজন যখন কারো বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং রজম করা হয় তখন পরবর্তীতে যখনই একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করবে তখনই তার উপর হদ্দুল কাযাফ প্রয়োগ করা হবে এবং সে দিয়তের এক চতুর্থাংশের দণ্ডবহন করবে।

অর্থদণ্ডের কারণ এই যে, যারা নিজেদের সাক্ষ্যে অটল রয়েছে তাদের সাক্ষ্যের কারণে 'হক'-এর তিন চতুর্থাংশ বহাল রয়েছে, সুতরাং প্রত্যাহারকারীর সাক্ষ্যের কারণে 'হক'-এর চতুর্থাংশ নষ্ট হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, অর্থদণ্ড নয় রবং প্রত্যাহারকারীর মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হবে। এর ভিত্তি হচ্ছে কিছাছের সাক্ষীদের ব্যাপারে তাঁর গৃহীত নীতির উপর। ইনশাআল্লাহ দিয়াত অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করবো।

আর প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দুল কাযাফ প্রয়োগ হচ্ছে আমাদের তিন ইমামের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র) বলেন, হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

কেননা প্রত্যাহারকারী যদি জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী হয়, তাহলে তার হদ্দ মৃত্যুর কারণেই বাতিল হয়ে গেছে (হদ্দুল কাযাফের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার প্রযোজ্য নয়।)

আর যদি মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী হয় তাহলে যেহেতু সে কাযীর রায় অনুসারে রজমকৃত হয়েছে, সেহেতু তা (মোহছান হওয়া রহিত না করলেও) সন্দেহ উদ্রেককারী হবে। (আর সন্দেহ দ্বারা হদ্দ বাতিল হয়ে যায়।)

আমাদের দলীল এই যে, প্রত্যাহারের কারণে সাক্ষ্যটি অপবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেননা এতে সাক্ষ্যগুণ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের নামে অপবাদ আরোপ সাব্যস্ত করা হবে। আর যেহেতু সাক্ষ্য বা দলীল রহিত হয়ে গেছে সেহেতু প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ও দলীলের উপর ভিত্তিকৃত আদালতের রায় রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং এই রায় (অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির 'ইহছান' বিলুপ্তির) সন্দেহ উদ্রেক করবেনা।

পক্ষান্তরে অন্য কারো পক্ষ থেকে তার নামে অপবাদ আরোপের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অন্যের ব্যাপারে যেহেতু আদালতের রায় বহাল রয়েছে সেহেতু অন্যের ক্ষেত্রে রজমকৃত লোকটি 'মোহছান' নয়।

আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তার উপর হদ্দ প্রয়োগের পূর্বেই যদি কোন একজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সবার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এবং যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, শুধু প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা আদালতের ফায়সালার কারণে সাক্ষ্যটি দৃঢ়তা লাভ করেছে। সুতরাং শুধু প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য রহিত হবে। (অন্যান্যের সাক্ষ্যের উপর তা প্রভাব ফেলবেনা।) যেমন আদালতের রায় কার্যকর হওয়ার পর যদি কোন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে।

শায়খায়নের দলীল এই যে, হদ্দ কার্যকর করাও আদালতের ফায়সালার অংশভুক্ত। সুতরাং এটা আদালতে রায় ঘোষণার পূর্বে প্রত্যাহার করার মতই হলো। একারণেই তো যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে ব্যক্তি থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যায়।

যদি রায় ঘোষণার পূর্বে কোন একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে (তিন ইমামের মতে) সকল সাক্ষীর উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন, শুধু প্রত্যাহার করার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা অন্যদের ব্যাপারে তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায় না।

আমাদের দলীল এই যে, তাদের বক্তব্য মূলতঃ অপবাদ। আদালতের রায় সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তা সাক্ষ্যের মর্যাদা লাভ করে থাকে। সুতরাং আদালতের রায় যখন যুক্ত হলো না তখন অপবাদ রূপেই বিবেচনা থাকবে। ফলে তাদের সবার উপর হদ্দ কার্যকর হবে।

সাক্ষী যদি পাঁচজন হয় আর তাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর কোন কিছুই হবে না।

কেননা যাদের সাক্ষ্যের দ্বারা পূর্ণ হক বহাল থাকে অর্থাৎ চারজন সাক্ষী তারা বিদ্যমান রয়েছে।

এরপর যদি আরেকজন প্রত্যাহার করে তাহলে প্রত্যাহারকারী উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে এবং উভয়ের উপর দিয়তের একচতুর্থাংশের দায় আরোপ করা হবে।

হদ্দ প্রয়োগের কারণতো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

অর্থ দণ্ডের কারণ এই যে, যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা 'হক'-এর তিন চতুর্থাংশ বহাল রয়েছে। আর যারা বহাল রয়েছে, তাদের বহাল থাকাই বিবেচ্য, যারা প্রত্যাহার করেছে তাদের প্রত্যাহার বিবেচ্য নয়। যেমন পূর্বে (كتاب الشهادات সাক্ষ্য পর্বে) আলোচিত হয়েছে।

আর যদি চারজন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তাদের সম্পর্কে সাফাই সাক্ষ্য দেওয়া হয়, এরপর রজম কার্যকর হয়। কিন্তু পরে জানা গেলো যে, সাক্ষীরা অগ্নিপূজক বা গোলাম, তাহলে সাফাই সাক্ষ্য দাতাদের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে—ইমাম আবূ হানিফার মতে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি তাদের সাফাই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, এই ক্ষতি পূরণ বাইতুল মালের উপর আসবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা হবে তখন যখন তারা বলবে যে, আমরা তাদের অবস্থা জানা সত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে সাফাই সাক্ষ্য দিয়েছি।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, তারা সাক্ষীদের উত্তম প্রসংশা করেছে। সুতরাং এটা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে ব্যক্তির প্রশংসা করার অর্থাৎ তার 'মোহছান' হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানের মত হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সাফাই এর কারণেই সাক্ষ্যটি কার্যকর প্রমাণ হয়ে থাকে, সুতরাং সাফাই হলো 'কারণের কারণ'–এর মর্মার্থক। সুতরাং হুকুমটিকে এর দিকে সম্পর্কিত করা হবে।

'মোহসান' হওয়ার সাক্ষ্যদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মোহসান হওয়া রজমের বিধানের জন্য শর্তমাত্র।

'সাক্ষ্য' শব্দ ব্যবহার করা এবং সাধারণভাবে খবর দেয়ার মাঝে পার্থক্য নেই।

আর এ (সাফাইকারীদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার) বিষয়টি তখন হবে যখন তারা সাক্ষীদের স্বাধীন হওয়ার কিংবা মুসলমান হওয়ার খবর প্রদান করবে। পক্ষান্তরে যদি তারা বলে যে, সাক্ষীরা ন্যায়পরায়ণ আর দেখা গেলো যে, তারা গোলাম, তাহলে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা গোলাম ন্যায়পরায়ণ হতে পারে।

সাক্ষীদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না, কেননা তাদের বক্তব্য সাক্ষ্য রূপে গণ্য হয়নি।

তদ্রূপ তাদের উপর হদ্দুল কাযাফ জারী করা হবে না। কেননা তারা তার নামে অপবাদ আরোপ করেছে জীবিত অবস্থায়, এরপর সে মৃত্যুবরণ করেছে; সুতরাং তার পক্ষ থেকে কেউ হদ্দুল কাযাফ দাবী করার উত্তরাধিকারী হবে না।

চারজন যদি কারো বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্যদান করে আর কাযী তাকে রজম করার আদেশ জারী করেন আর কোন লোক তাকে কতল করে ফেলে অতঃপর দেখা গেলো যে, সাক্ষীরা গোলাম , তাহলে হত্যাকারীর উপর দিয়ত আসবে।

কিয়াসের দাবী হলো কিসাস ওয়াজিব হওয়া। কেননা সে একটি 'নিরপরাধ' প্রাণকে বিনা অধিকারে হত্যা করেছে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, প্রকাশিত প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের ফায়সালা সঠিক ছিলো। সুতরাং (হত্যার বৈধতার) সন্দেহ উদ্রেক করেছে।

পক্ষান্তরে যদি ফায়সালার পূর্বে হত্যা করে থাকে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে ।

(কেননা সাক্ষ্য) তখনো প্রমাণ রূপে সাব্যস্ত হয়নি।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, বৈধতা দানকারী দলীলের উপর নির্ভর করে হত্যাকারী তাকে 'খুন করা বৈধ' ধারণা করেছিলো। সুতরাং কারো গায়ে হারবীদের আলামত বিদ্যমান দেখে তাকে হারবী ধারণা করে হত্যা করার মত হলো।

হত্যাকারীর মাল থেকেই দিয়াত আদায় ওয়াজিব হবে। কেননা তা ইচ্ছাকৃত হত্যা । আর عاقلة রা (নিকটাত্মীয়রা) ইচ্ছাকৃত হত্যার দায় বহন করে না। আর এই দিয়াত তিন বছর সময় কালের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব । কেননা এই দিয়াত মূল হত্যার বিনিময়ে ওয়াজিব হয়েছে।

আর যদি ঐ লোকটিকে রজম করা হয়, অতঃপর দেখা গেলো যে, সাক্ষীরা গোলাম; তাহলে দিয়াত বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে শাসকের আদেশ পালন করেছে।

সুতরাং তার কর্মটি শাসকের দিকে সম্পর্কিত হবে। আর শাসক নিজে যদি রজম সম্পন্ন করতেন তাহলে আমাদের পূর্বোল্লেখিত কারণে বাইতুল মাল থেকে দিয়াত ওয়াজিব হতো। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

পক্ষান্তরে (অন্য উপায়ে) হত্যা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে শাসকের আদেশ পালন করেনি।

যদি (চারজন লোক) কারো বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে আর বলে যে, আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবলোকন করেছি, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা সাক্ষ্য ধারণ করার প্রয়োজনে তাদের জন্য দৃষ্টিপাত বৈধ হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে তারা চিকিৎসক ও ধাত্রীর সদৃশ হলো।

চারজন লোক যদি কারো বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে আর সে নিজের মোহসান হওয়া অস্বীকার করে, অথচ তার স্ত্রী রয়েছে এবং ঐ স্ত্রী তার ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে তাহলে তাকে রজম করা হবে।

মাসআলাটির অর্থ এই যে, ইহছানের অন্য সকল শর্ত বিদ্যমান অবস্থায় সে স্ত্রী সহবাসের কথা অস্বীকার করছে।

কেননা তার থেকে নসব সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হলো তার প্রতি সহবাসের হুকুম সাব্যস্ত হওয়া। একারণেই তো যদি সে তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে রাজয়ী তালাক সাব্যস্ত হবে, আর এরূপ দলীল দ্বারা মোহছান হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আর যদি সে ঐ লোকের ঔরসে কোন সন্তান প্রসব না করে থাকে কিন্তু একজন পুরুষ দুজন স্ত্রী লোক তার বিপক্ষে মোহছান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাকে রজম করা হবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) নিজস্ব এই মূলনীতি অনুসরণ করেছেন যে, অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আর ইমাম যুফার (র) বলেন যে, ইহছান হচ্ছে কারণ বা হেতুর সমার্থক একটি শর্ত। কেননা ইহছান অবস্থায় অপরাধটি গুরুতর হয়। সুতরাং রজমের হুকুমটি তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর তা প্রকৃত কারণ বা হেতুর সদৃশ হবে। সুতরাং (যিনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি) এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। তাই বিষয়টি এমন হলো যে, দু'জন যিম্মী এমন একজন যিম্মীর বিরুদ্ধে, যার মুসলিম গোলাম যিনা করেছিল, এই সাক্ষ্য দিলো যে, যিনা করার আগেই সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিলো, এ অবস্থায় আমাদের পূর্ববর্তী কারণে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, ইহসান হচ্ছে কতিপয় উত্তম গুণের সমষ্টি, যা ব্যভিচার কর্ম থেকে বাধা দান করে, যেমন পূর্বে আলোচনা করেছি। তাই এটির কারণ বা হেতুর সমার্থক হতে পারে না।

সুতরাং এমনই হলো যেন তারা এই পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় তার বিবাহের ও সহবাসের সাক্ষ্য প্রদান করলো।

ইমাম যুফার (র)-এর উল্লেখিত সাদৃশ্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বাধীনতার বিষয়টি তাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এখানে সাব্যস্ত হচ্ছে না পিছনের তারিখ হওয়ার কারণে। কেননা মুসলমান এই পিছন তারিখ অস্বীকার করছে কিংবা এটা দ্বারা মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (আর সে ক্ষেত্রে মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়)।

যদি মোহছান হওয়ার সাক্ষ্যদানকারীরা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে আমাদের মতে তারা ক্ষতি পূরণের দায় বহন করবে না।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। মূলত: এটা পূর্ববর্তী মাসআলার অনুবর্তী।

পরিচ্ছেদ ঃ মদ্যপানের হদ্দ

কেউ যদি মদ পান করে এবং (মুখে) মদের গন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় পাকড়াও হয়, কিংবা মাতাল অবস্থায় তাকে হাজির করা হয় এরপর সাক্ষীগণ তার বিরুদ্ধে 'মদপান করেছে' মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। একই বিধান কার্যকর হবে যদি গন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় মদপানের কথা সে নিজে স্বীকার করে।

কেননা মদপানের অপরাধ প্রকাশিত হয়েছে আর বিষয়টি পুরোনো হয়ে যায়নি।

মদ পানের শাস্তি বিধানের দলীল হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী, ومن شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه

কেউ যদি মদপান করে তাহলে তাকে (নির্ধারিত সংখ্যা) বেত্রাঘাত করো। যদি সে পুনঃপান করে তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত করো।

যদি মুখের দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর স্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, হদ্দ কায়েম করা হবে। দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর যদি তার বিরুদ্ধে মদপানের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত অনুরূপ (অর্থাৎ হদ্দ কায়েম করা হবে না)। আর ইমাম মুহম্মদ বলেন, হদ্দ কায়েম করা হবে।

মোট কথা সর্বসম্মতক্রমেই সাক্ষ্যের গ্রহণ যোগ্যতা প্রতিরোধ করে। তবে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে এই বিলম্বতা সময় দ্বারা আবদ্ধ (এ ক্ষেত্রে এক মাস)। যিনার হদ্দের উপর কিয়াস করে। আর তা এই জন্য যে,কালাতিক্রান্তি ও গন্ধ বিলুপ্তি দুটো দ্বারাই বিলম্বতা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু (গন্ধের বিষয়টি অকাট্য নয়। কেননা) অন্য কারণেও মুখে মদসদৃশ গন্ধ হতে পারে। কবিতায় যেমন আছে−

يقولون لى انكه شربت سرامة + فقلت لابل أكلت السفرجلا

লোকেরা বলে, মনে হয় তুমি মদ গিলেছো, মুখ হা করে শ্বাস ছাড়ো দেখি। আমি বলি. না হজুর আসলে 'নাশপাতি'খেয়েছি তাই এ গন্ধ।

পক্ষান্তরে শায়খায়নের মতে বিলম্বতা নির্ধারিত হবে গন্ধ বিলুপ্তির ভিত্তিতে।

কেননা এ প্রসংগে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন,

فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه

যদি তোমরা মদের গন্ধ পাও তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো।

তাছাড়া এই জন্য যে, মদের আলামত বিদ্যমান থাকা মদপানের অধিকতর মজবুত প্রমাণ। সুতরাং আলামত ও গন্ধ বিবেচনা করা দুষ্কর হলেই শুধু সময় দ্বারা বিলম্বতা নির্ধারণের দিকে যাওয়া যাবে। আর বিভিন্ন গন্ধের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে (সহজেই) সম্ভব। অনভিজ্ঞদের ক্ষেত্রেই শুধু তা অস্পষ্ট হতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বিলম্বতার কারণে স্বীকারোক্তি বাতিল হয় না. যেমন যিনার হদ্দের ব্যাপারে। যেমন পূর্বে তার কারণ বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে শায়খায়নের মতে গন্ধের বিদ্যমানতা ছাড়া 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে না।

কেননা মদপানের হদ্দ সাব্যস্ত হয়েছে সাহাবা কেরামের ইজমা এর ভিত্তিতে[১] আর ইবনে মাসউদের মতামত ছাড়া তো ইজমা সম্পন্ন হতে পারে না। অথচ আমাদের পূর্বে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইবনে মাসউদ (রা) 'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য গন্ধ বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন।

এমন যদি হয় যে, সাক্ষীগণ তাকে গন্ধসহ বা মাতাল অবস্থায় পাকড়াও করলো এবং এক শহর থেকে অন্য শহরে যেখানে হদ্দ প্রয়োগকারী শাসক রয়েছেন, সেখানে

১। কেননা সংশ্লিষ্ট হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ অকাট্য প্রমাণরূপে গণ্য। সুতরাং তা দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইজমা হচ্ছে শরীয়তের স্বীকৃত অকাট্য প্রমাণ। সুতরাং তা দ্বারাই হদ্দ সাব্যস্ত হবে।

নিয়ে গেলো; কিন্তু সেখানে পৌছার পূর্বেই গন্ধ দূর হয়ে গেলো, তাহলে তাদের সকলের মতেই হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা এটা ওযর রূপে বিবেচিত হবে। 'যিনার হদ্দ' এ ক্ষেত্রে স্থানগত দূরত্বের বিষয়টি যেমন। আর এ ধরনের অবস্থায় সাক্ষীকে অভিযুক্ত করা যায় না।

নাবীয[1] পান করে যদি কেউ নেশাগ্রস্ত হয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা (ইমাম দারে কুতনী সংকলিত সুনানে) বর্ণিত হয়েছে যে, নাবীয পানে নেশাগ্রস্ত জনৈক বেদুঈনের উপর হযরত ওমর (রা)'হদ্দ' প্রয়োগ করেছিলেন।

নেশার হদ্দ এবং প্রযোজ্য হদ্ এর পরিমাণ প্রসংগে বিষয়টি বিশদ আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। যার মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যায় কিংবা যে মদ বমন করেছ (কিন্তু মদ পান করতে দেখা যায়নি) তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা (বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে) সনাক্তির পূর্বে স্বকীয়ভাবে গন্ধ একটি সম্ভাবনা দুষ্ট বিষয়। তদ্রূপ মদপান জোরপূর্বক ও অনন্যোপায় অবস্থায়ও হতে পারে। সুতরাং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির উপর ততক্ষণ হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না, যতক্ষণ না জানা যায় যে, সে নাবীয (ও মদ) দ্বারা নেশাগ্রস্ত হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় পান করেছে।

কেননা অনুমোদনযোগ্য দ্রব্য দ্বারা নেশা হলে তা হদ্দ সাব্যস্ত করে না, যেমন ভাং ও ঘোটকী দুগ্ধ।

তদ্রূপ বলপূর্বক মদপান দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। (কেননা এখানে স্বেচ্ছাগ্রহণের দিক অনুপস্থিত)।

নেশা কেটে যাওয়ার পূর্বে হদ্দ কার্যকর করা হবে না। যাতে শাস্তি ও শাসনের উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়।

স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ ও অন্যান্য নেশার হদ্দ হলো আশি দোররা।

কেননা এ বিষয়ে ছাহাবা কেরামের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (বুখারী)

যিনার হদ্দ এর মত এক্ষেত্রেও শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেত্রাঘাত করা হবে।

যিনার হদ্দ প্রসংগে এটা আলোচিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে (সতর রক্ষা করে) তাকে বস্ত্রমুক্ত করে নেয়া হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে শাস্তির লঘুতা প্রকাশার্থে তাকে বস্ত্রমুক্ত করা হবেনা।

কেননা মদ পানের হদ্দ সম্পর্কে শরীয়তের প্রত্যক্ষ নাছ (বাণী-প্রমাণ) নেই।

প্রসিদ্ধ বর্ণনার দলীল এই যে, (বেত্রাঘাতের সংখ্যা একশ থেকে আশিতে হ্রাস করে) একবার আমরা লঘুতা সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং দ্বিতীয়বার লঘুতা সাব্যস্ত করা বিবেচ্য নয়।

দাসের ক্ষেত্রে হদ্দ এর পরিমাণ হলো চল্লিশ দোররা।

কেননা এ বিদিত রয়েছে যে, দাসত্ব (শাস্তি) 'অর্ধায়ণ' করে থাকে।

কেউ যদি মদ পান বা অন্য নেশার কথা স্বীকার করে পরবর্তীতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

কেননা এটা নিরেট আল্লাহর হক।

১। ফলসিক্ত পানিকে নাবীয বলে।

দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা মদ পান সাব্যস্ত হবে। আর একবার স্বীকারের মাধ্যমেও সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে তিনি দু'বার স্বীকারোক্তি করার শর্ত আরোপ করেছেন।

এটা চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার সদৃশ। বিষয়টি আমরা সম্মুখে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

মদ পানের ক্ষেত্রে পুরুষ লোকের সাথে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে (পুরুষের) বিকল্পতার সন্দেহ রয়েছে। তদুপরি বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতির তোহমত রয়েছে। **যে নেশাগ্রস্তের উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অল্প বিস্তর কোন কথাই বুঝতে সক্ষম নয়। কিংবা যে স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য করতে সক্ষম নয়।**

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবায়ন বলেন, যে প্রলাপ বকে এবং যার কথা গুলিয়ে যায়।

কেননা পরিভাষায় তাকেই মাতাল বলে।

অধিকাংশ মাশায়েখ সাহেবায়নের মতই সমর্থন করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, হদ্দ শাস্তি যথা সম্ভব রোধ করার মূলনীতির আলোকে হদ্দ এর অনুষঙ্গ গুলোর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ই বিবেচ্য হবে। আর নেশাগ্রস্ততার চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে বুদ্ধির উপর তরলতার এমন প্রবলতা, যা দুটি জিনিসের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা রহিত করে। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়টি হুশ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনামুক্ত নয়।

তবে হারামের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নেশাগ্রস্ততার ঐ পর্যায়ই সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচ্য যা সাহেবায়ন বলেছেন। এর কারণ হলো সর্তকতার দিকটি গ্রহণ করা।

ইমাম শাফেয়ী (র) হাঁটাচলা ও অংগ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে নেশার প্রভাব প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন।

কিন্তু এটা মানুষ ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং মানদন্ডরূপে এটাকে বিবেচনা করার অর্থ নেই।

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মবিপক্ষ স্বীকারোক্তি দ্বারা তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয় না।

কেননা এ অবস্থায় তার স্বীকারোক্তিতে মিথ্যার সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং হদ্দ রহিত করার জন্য সেটাকে অজুহাত রূপে গ্রহণ করা হবে। কেননা এটা নিরেট আল্লাহর হক।

পক্ষান্তরে কাযফ বা অপবাদ আরোপের হদ্দ প্রসংগটি ভিন্ন। কেননা এতে বান্দার হক রয়েছে। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে শাস্তিরূপে মাতালকে সুস্থ ব্যক্তির সমপর্যায়ে গণ্য করা হয়। যেমন তার যাবতীয় কার্যে হয়ে থাকে।

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হলে তার ক্ষেত্রে স্ত্রী বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা কুফরি হচ্ছে আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়। সুতরাং নেশাগ্রস্ততা অবস্থায় তা সাব্যস্ত হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত।

পক্ষান্তরে যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটা 'ধর্মত্যাগ' বলে সাব্যস্ত হবে। (সুতরাং স্ত্রীবিচ্ছেদও সাব্যস্ত হবে)।

পরিচ্ছেদ ঃ অপবাদের হদ্দ

কোন মানুষ যদি 'ইহছান' সম্পন্ন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে সরাসরি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি হদ্দ প্রযোগ করার দাবী জানায় আর অপবাদ আরোপকারী স্বাধীন ব্যক্তি হয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর শাসক হদ্দ হিসেবে আশিটি দোররা লাগাবেন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً

যারা ইহছান সম্পন্না স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, (অতঃপর চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে) তাদেরকে আশিটি দোররা লাগাও।

আর 'অপবাদ আরোপ' দ্বারা যে ব্যভিচারের অপবাদ উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে ইজমা রয়েছে। তাছাড়া চারজন সাক্ষীর শর্তারোপের মাধ্যমে আয়াতের মধ্যে সেদিকে ইংগিতও করা হয়েছে। কেননা চার সাক্ষীর বিষয়টি যিনার সাথেই বিশিষ্ট।

অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপনের শর্ত রয়েছে।

কেননা অপবাদ অপনোদনের দিক থেকে হদ্দ প্রয়োগ হচ্ছে তার নিজের হক।

আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির 'মুহসীন' হওয়ার দলীল হল তেলাওয়াতকৃত আয়াত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তার বিভিন্ন অংগে পৃথক পৃথকভাবে বেত্রাঘাত করা হবে।

এর কারণ যিনার হদ্দ প্রসংগে বলা হয়েছে।

তবে তাকে বস্ত্রমুক্ত করা হবে না।

কেননা আলোচ্য হদ্দ-এর কারণ সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং পূর্ণ কঠোরতার সাথে তা প্রয়োগ করা হবে না।

যিনার হদ্দ প্রয়োগের বিষয়টি ভিন্ন। (কেননা তা সাক্ষ্যযোগে বা স্বীকারোক্তির কারণে সুনিশ্চিত।)

তবে চামড়া ও তুলা ভর্তি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলা হবে।

কেননা তাতে বেত্রাঘাতের ব্যথা পৌঁছানো ব্যাহত হয়।

অপবাদ আরোপকারী যদি দাস হয় তাহলে তাকে চল্লিশটি দোররা লাগানো হবে।

কারণ হলো দাসত্বের বিদ্যমানতা।

ইহছান অর্থ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির স্বাধীন, সুস্থমস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম ও ব্যভিচার দোষ থেকে পবিত্র হওয়া।

স্বাধীন হওয়ার শর্ত এ জন্য যে, (কোরআনে) স্বাধীন ব্যক্তির উপর 'ইহছান' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে: যেমন, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ

দাসীদের উপর ইহছান সম্পন্না নারীদের অর্থাৎ স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি সাব্যস্ত হবে

সুস্থ মস্তিষ্কতা ও প্রাপ্তবয়স্কতার শর্ত এজন্য যে, অপবাদজনিত কলংক বাচ্চা ও পাগলকে স্পর্শ করে না। কেননা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) তাদের দ্বারা ব্যভিচার কর্ম সম্পন্ন হয় না।

মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من اشرك بالله فليس بمحصن

আল্লাহ্‌র সাথে যে শরীক করে সে মুহসিন নয়।

চারিত্রিক শুচিতার শর্ত এজন্য যে, চরিত্রহীন ব্যক্তির কলংক স্পর্শ হয় না। তাছাড়া অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি তার বক্তব্যে সত্যবাদী।

কেউ যদি অন্য কারো বংশ-পরিচয় অস্বীকার করে বলে যে, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

এটা তখনই অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আম্মা যদি স্বাধীন ও মুসলিম হয়।

কেননা প্রকৃত পক্ষে এটা তার আম্মার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের নামান্তর। কেননা ব্যভিচারী থেকেই বংশপরিচয় রহিত করা হয়। অন্য কারো থেকে নয়।

কেউ যদি ক্রোধের অবস্থায় কাউকে তার স্বীকৃত পিতার নাম নিয়ে বলে, তুমি অমুকের পুত্র নও, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে ক্রোধমুক্ত অবস্থায় বললে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

কেননা ক্রোধের সময় এ ধরনের কথা দ্বারা প্রকৃতই তাকে গালি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে অ-ক্রোধের অবস্থায় উদ্দেশ্য হয় সদগুণাবলীর ক্ষেত্রে পিতার সাথে তার সাদৃশ্য নাকচ করে তাকে তিরস্কার করা।

যদি দাদার নাম নিয়ে বলে যে, তুমি অমুকের পুত্র নও তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না।

কেননা সে তার বক্তব্যে সত্যবাদী। তদ্রূপ কারো বংশ পরিচয় তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করলেও হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা রূপকভাবে দাদার বংশ পরিচয় সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

যদি তাকে লক্ষ্য করে বলে, হে ব্যভিচারীণীর পুত্র, আর তার মা মৃতা ও মুহসিনা হয় এবং পুত্র অপরাধ আরোপকারীর বিরুদ্ধে হদ্দ দাবী করে, তাহলে অপবাদকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা সে একজন মুহসিনা নারীকে তার মৃত্যুর পর অপবাদ দিয়েছে।

মৃতের স্বপক্ষে অপবাদ জনিত হদ্দ এমন ব্যক্তিই শুধু দাবী করতে পারে, অপবাদের কারণে যার বংশ পরিচয়ে কলংক যুক্ত হয়। অর্থাৎ মৃতের পিতা ও সন্তান।

কেননা মৃতের সংগে অংশত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান হওয়ার কারণে উভয়ের সাথে কলংক যুক্ত হয়। সুতরাং অন্তর্নিহিতভাবে এ অপবাদ তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে হদ্দ দাবী করার অধিকার প্রত্যেক ওয়ারিছের জন্য সাব্যস্ত হয়। কেননা এমর্মে সামনে আমাদের বর্ণনা আসছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে অপবাদজনিত হদ্দ এর ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী কার্যকর হয়।

আমাদের মতে হদ্দ দাবী করার অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। বরং কলংকজনিত যে কারণ বর্ণনা করেছি সেই সূত্রে। একারণেই আমাদের মতে হত্যার অপবাদে মীরাছ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষেও আলোচ্য হদ্দ দাবী করার অধিকার সাব্যস্ত হয়।

এ অধিকার মৃতের পুত্রের সন্তানের পক্ষে যেমন সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হয়, তেমনি কন্যার সন্তানদের পক্ষেও সাব্যস্ত হয়। ইমাম মুহম্মদ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

মৃতের সন্তান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও সন্তানের সন্তানের পক্ষে আলোচ্য অধিকার সাব্যস্ত হয়। ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি মুহসিন হয় তাহলে তার কাফির পুত্র ও দাস পুত্রের জন্য হদ্দ দাবী করার বৈধতা রয়েছে।

ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, উক্ত অপবাদ অন্তর্নিহিতভাবে পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা কলংক তাকে স্পর্শ করে। আর আমাদের মতে এ অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। সুতরাং এরূপ হল যে, যখন দৃশ্যতঃ ও অন্তর্নিহিত উভয় রূপেই অপবাদ তাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদের দলীল এই যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি মুহরিম ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করার মাধ্যমে তার পুত্রকে লজ্জা দিয়েছে। সুতরাং হদ্দ-এর মাধ্যমে সে তার থেকে শোধ নিতে পারবে।

এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, যার প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা হয়, তার ক্ষেত্রে মুহসিন হওয়ার শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে লজ্জা দান পূর্ণ মাত্রায় হওয়া। অতঃপর এই পূর্ণ লজ্জা দান তার সন্তানকেও স্পর্শ করবে। (সুতরাং সে হদ্দ-এর দাবীদার হতে পারবে।)

কুফর অধিকার লাভের যোগ্যতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। পক্ষান্তরে স্বয়ং কাফির বা দাসের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপিত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে ব্যভিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে 'ইহছান' না থাকার কারণে পূর্ণমাত্রায় লজ্জাদান সাব্যস্ত হয়নি।

দাস তার মনিবের বিরুদ্ধে তার স্বাধীন মাকে অপবাদ আরোপ করার কারণে হদ্দ দাবী করতে পারে না। তদ্রূপ পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে তার স্বাধীন মুসলিম মাকে অপবাদ আরোপ করার কারণে হদ্দ দাবী করতে পারে না।

কেননা দাসের অনুকূলে মনিবকে এবং পুত্রের অনুকূলে পিতাকে শাস্তি প্রদানের অবকাশ নেই। একারণেই সন্তানকে বা দাসকে হত্যা করার কারণে পিতা বা মনিবের উপর কিসাস কার্যকর হয় না।

আর যদি অন্য স্বামীর ঔরসজাত কোন পুত্র স্ত্রীলোকটির থাকে তাহলে সে হদ্দ দাবী করতে পারে।

কেননা হদ্দ-এর কারণ সাব্যস্ত হয়েছে, আর হদ্দ প্রয়োগের প্রতিবন্ধক অনুপস্থিত রয়েছে।

কেউ যদি কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মারা যায় তাহলে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বাতিল হবে না।

আংশিক হদ্দ কার্যকর করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমাদের মতে অবশিষ্ট হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

মতভিন্নতার ভিত্তি এই যে, আলোচ্য হদ্দ-এর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়। আর আমাদের মতে তাতে উত্তরাধিকার কার্যকর নয়।

অবশ্য এতে দ্বিমত নেই যে, আলোচ্য হদ্দ-এর ক্ষেত্রে শরীয়তের হক ও বান্দার হক দু'টোই রয়েছে। কেননা অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি থেকে কলংক লজ্জা অপনোদনের জন্যই শরীয়ত 'হদ্দুল কাযফ' অনুমোদন করেছে এবং তা থেকে সেই এককভাবে লাভবান হচ্ছে। সুতরাং এদিক থেকে এটা বান্দার হক। পক্ষান্তরে এটাকে অপবাদ আরোপের প্রবণতা রোধকারী রূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। একারণেই এর নামকরণ হয়েছে হদ্দ বা রোধকারী। আর শরীয়তে হদ্দ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীকে ফাসাদ থেকে মুক্ত করা। আর এটা শরীয়তের বা আল্লাহ্‌র হক হওয়ার আলামত। হদ্দুল কাযাফ সংশ্লিষ্ট আহকাম উভয় দিককেই প্রমাণ করে।

এমতাবস্থায় হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদ-এ দু'টি দিক যখন পরস্পর বিপরীতমুখী হলো তখন শাফেয়ী (র) বান্দার হককে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্যে হক্কুল ইবাদের দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা বান্দা প্রয়োজনমুখী আর শরীয়ত প্রয়োজন মুক্ত।

পক্ষান্তরে আমরা শরীয়তের হককে প্রাধান্য দান করেছি। কেননা বান্দার যে হক রয়েছে তার দায়িত্ব তার মাওলা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন। সুতরাং বান্দার হক বিবেচিতই থাকবে।

বিপরীত ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হক রক্ষিত হবে না। কেননা প্রতিনিধিত্ব ছাড়া অন্য কোন সূত্রে শরীয়তের হক উশুল করার অধিকার বান্দার নেই।

এটা সু-প্রসিদ্ধ সেই মূলনীতি, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাঝে মতপার্থক্যপূর্ণ বহু মাসা'আলা আহরিত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো উত্তরাধিকার। কেননা বান্দার হকসমূহের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয় শরীয়তের হকসমূহের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয় না।

অপরটি এই যে, যার নামে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, আমাদের মতে সে তা নিজের হক হিসাবে মাফ করে দিতে পারেনা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে প্যারে।

আরেকটি এই যে, হদ্দুল কাযাফের বিনিময় গ্রহণ করা যায় না। এবং তাতে একীভূতকরণের অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর মতে সে অবকাশ নেই।

হদ্দুল কাযাফ ক্ষমা করা প্রসংগে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অনুরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। আমাদের কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, তাতে বান্দার হক প্রবল এবং সেই ভিত্তিতে বিভিন্ন আহকাম আরহণ করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মত অধিক প্রকাশিত।

যে ব্যক্তি অপবাদ আরোপের কথা স্বীকার করে অতঃপর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তার প্রত্যাহার গ্রহণ করা হবে না।

কেননা তাতে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এই হকওয়ালা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

পক্ষান্তরে খালেছ আল্লাহ্‌র হকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কোন পক্ষ নেই।

কেউ যদি কোন আরবকে বলে, হে নিবতী! তাহলে তার উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে না।

কেননা এর দ্বারা চরিত্রগত বা ভাষাদুর্বলতা গত সাদৃশ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তদ্রূপ যদি বলে, তুমি আরব নও। (তাহলে) আমাদের বর্ণিত কারণে (হদ্দ আসবে না)

কেউ যদি কাউকে বলে, يا ابن ماء السماء (হে মেঘের পুত্র) তাহলে অপবাদ আরোপকারী হবে না।

কেননা এর উদ্দেশ্য হলো বদান্যতা, দানশীলতা ও পরিচ্ছন্নতা (ইত্যাদির) ক্ষেত্রে তুলনা করা।

কেননা কোন কোন মানুষকে ماء السماء উপাধি দান করা হয়েছে তার পরিচ্ছন্নতা বা বদান্যতার কারণে।

কেউ যদি কাউকে তার চাচা, কিংবা মামা কিংবা সৎ পিতার দিকে সম্পর্কিত করে তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী নয়।

কেননা এদের সবাইকে পিতৃতুল্য ও পিতা বলা হয়। প্রথমটির প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ

অথচ ইসমাঈল (আ) ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর চাচা। দ্বিতীয়টির প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী الخال اب। (মামা পিতার তুল্য) আর তৃতীয় জনকে প্রতিপালনগত কারণে পিতা বলা হয়।

কেউ যদি কাউকে বলে زنات فى الجبل আর বলে, আমি পর্বতারোহণ বুঝিয়েছি তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, হদ্দ কায়েম করা হবে না।

কেননা হামযা যুক্ত زنات শব্দটি প্রকৃত অর্থে আরোহণের জন্য ব্যবহৃত। জনৈকা আরব নারী বলেন,

وارق إلى الخيرات زناء فى الجبل

কল্যাণের পানে আরোহণ করো পর্বতারোহণের ন্যায়। তদুপরি جبل বা পর্বত শব্দটি উক্ত অর্থকে উদ্দেশ্যরূপে দৃঢ় করে দেয়।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, হামযাযুক্ত অবস্থায়ও এটাকে ব্যভিচার অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেননা আরবরা হামযাকে লীন এবং লীনকে হামযায় রূপান্তরিতরূপে উচ্চারণ করে থাকে।

আর ক্রোধ ও গালমন্দের অবস্থায় খারাপ অর্থটাই উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হয়। যেমন শুধু زنات বা يا زاني বলার ক্ষেত্রে।

আর جبل এর উল্লেখ আরোহণের অর্থকে নির্ধারিত করবে যদি على অব্যয়যুক্ত হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে এ অব্যয়টিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যদি زنات على الجبل বলে তাহলে কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের বর্ণিত কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। আর কেউ কেউ বলেন, আমাদের বর্ণিত অর্থের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেউ যদি অন্যজনকে বলে, হে ব্যভিচারী! আর অন্যজন উত্তরে বলে, না বরং তুমি, তাহলে উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে।

কেননা বরং শব্দটি প্রমাণ করে যে, প্রথম বাক্যের মূল বিষয়টি বাক্যে উচ্চারিত রূপে বিবেচ্য।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে ব্যভিচারিণী! আর উত্তরে সে স্বামীকে বলে, না বরং তুমি, তাহলে স্ত্রীর উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে। লি'আন সাব্যস্ত হবে না।

কেননা এখানে উভয়ে অপবাদ আরোপকারী আর স্বামীর অপবাদ আরোপ দ্বারা লি'আন সাব্যস্ত হয় এবং স্ত্রীর অপবাদ আরোপ দ্বারা হদ্দুল কাযাফ সাব্যস্ত হয়। আর প্রথমে স্ত্রীর উপর হদ্দুল কাযাফ সাব্যস্তের দ্বারা লি'আন বাতিল হয়। কেননা হদ্দুল কাযাফপ্রাপ্ত ব্যক্তি লি'আনের উপযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে বিপরীত দিকে কোনটি বাতিল হবে না। সুতরাং রোধ করার কৌশল অবলম্বন করা হবে। কেননা লি'আন যিনার হদ্দের সমার্থক।

আর যদি (স্বামীর কথার উত্তরে) বলে, তোমার সাথে ব্যভিচার করেছি, তাহলে হদ্দ আসবে না এবং লি'আনও সাব্যস্ত হবে না।

কেননা উভয়ের প্রত্যেকের কথাই সন্দেহ উদ্রেককারী। কারণ হতে পারে যে, স্ত্রী বিবাহের পূর্ববর্তী যিনার কথা বুঝিয়েছে, তখন তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। লি'আন সাব্যস্ত হবে না। কেননা সে স্বামীর বক্তব্যকে সত্যয়িত করেছে। কিন্তু স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর সত্যায়ন পাওয়া যায় নি।

পক্ষান্তরে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, স্ত্রীর কথার উদ্দেশ্য হলো, আমার যিনা হচ্ছে সেটাই, যা বিবাহের পরে তোমার সাথে হয়েছে। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কাউকে আমি সুযোগ দান করিনি। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে এটাই উদ্দেশ্য হওয়ার কথা।

এই দিক বিবেচনায় লি'আন সাব্যস্ত হয়। স্ত্রীর উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপ হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়নি।

সুতরাং তা-ই হুকুম হবে যা আমরা বলেছি। (অর্থাৎ হদ্দ ও লি'আন কিছুই ওয়াজিব হবে)।

কেউ যদি কোন সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে অতঃপর তা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন সাব্যস্ত হবে।

কেননা তার স্বীকারোক্তি দ্বারা বংশ পরিচয় অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর অস্বীকার করা দ্বারা সে স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপকারী হবে। সুতরাং তাকে লি'আন করতে হবে।

আর যদি প্রথমে অস্বীকার করার পর স্বীকার করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কেননা সে যখন নিজেকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো তখন লি'আন বাতিল হয়ে গেলো। কারণ লি'আন হচ্ছে জরুরী পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত হদ্দ। পরস্পরের প্রতি মিথ্যাচারের দাবীর অনিবার্য কারণে তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু (স্বামী নিজের মিথ্যাচার স্বীকার করার মাধ্যমে) যখন পারস্পরিক মিথ্যাচারের দাবী বাতিল হয়ে গেলো তখন মূল হদ্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

আর উভয় অবস্থাতে সন্তান তারই হবে।

কেননা আগে বা পরে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে।

আর বংশ পরিচয়ের কর্তন ছাড়াও লি'আন হতে পারে, যেমন হতে পারে সন্তানের উপস্থিতি ছাড়াও।

কেউ যদি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে যে, এটা আমারও পুত্র নয় এবং তোমারও পুত্র নয়, তাহলে হদ্দুল কাযাফ ও লি'আন কিছুই সাব্যস্ত হবে না।

কেননা সে সন্তানের প্রসব অস্বীকার করেছে আর তা দ্বারা অপবাদ আরোপকারী হয় না।

কেউ যদি কোন স্ত্রী লোকের নামে অপবাদ আরোপ করে এমন অবস্থায় যে, সে মহিলার সাথে সন্তানাদি রয়েছে, যাদের পিতার পরিচয় নেই; কিংবা সন্তানের ব্যাপারে লি'আনকারিণীকে অপবাদ দিলো এমন অবস্থায় যে, সন্তানটি জীবিত রয়েছে, কিংবা সন্তানের মৃত্যুর পর তাকে অপবাদ দিলো; তাহলে ঐ লোকের উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে না।

কেননা তার পক্ষ থেকে যিনার আলামত বিদ্যমান রয়েছে, অর্থাৎ পিতৃপরিচয়হীন সন্তান প্রসব করা।

সুতরাং যিনার আলামতের উপস্থিতি বিবেচনায় সে সতীত্বহীন হয়ে গেছে। আর মোহসান হওয়ার জন্য সেটা শর্ত।

কেউ যদি এমন কোন স্ত্রীলোককে অপবাদ দেয়, যে লি'আন করেছে, কিন্তু তার সন্তান হয়নি, তাহলে তার উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে।

কেননা যিনার আলামত বিদ্যমান নেই। **গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি আপন মালিকানার বাইরে হারামভাবে যৌন সংগম করে তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে না।**

কেননা সতীত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, আর সেটা হচ্ছে মোহসান হওয়ার শর্ত। তাছাড়া অভিযোগকারীর বক্তব্য সত্য।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে ব্যক্তি এমন যৌন সংগম করে, যা সত্তাগত ভাবে হারাম তার প্রতি অপবাদ আরোপ দ্বারা হদ্দুল কাযাফ আসেনা। কেননা সত্তাগতভাবে হারাম সংগমকেই যিনা বলে। আর যদি সংগমটি পরোক্ষভাবে হারাম হয় তাহলে হদ্দুল কাযাফ আসবে। কেননা এটা যিনা নয়।

(এ মূলনীতির আলোকে বক্তব্য এই যে,) পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাহীন ক্ষেত্রে সংগম সত্তাগতভাবেই হারাম। তদ্রূপ হুকুম স্থায়ী হারামত্বসম্পন্ন মালিকানায় সংগমের।

কিন্তু হারামত্ব যদি সাময়িক হয় (যেমন হায়যের অবস্থা) তাহলে এই সংগম হবে পরোক্ষ কারণে হারাম।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) শর্ত আরোপ করেন যে, স্থায়ী হারমত্ব ইজমা দ্বারা কিংবা মশহুর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে, যাতে বিষয়টি নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হয়।

এ আলোকে বিশদ বিবরণ এই যে, নিজের ও অন্যের শরীকানাধীন দাসীর সাথে সংগমকারী কোন ব্যক্তিকে যদি কেউ অপবাদ দেয় তাহলে তার উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে না।

কেননা একদিক দিয়ে মালিকানা অবিদ্যমান। **তদ্রূপ হুকুম যদি এমন লোককে অপবাদ দেয়, যে খৃষ্টান অবস্থায় যিনা করেছে।**

কেননা ব্যভিচারকারীর মালিকানা না থাকার কারণে শরীয়ত অনুযায়ী তার দ্বারা যিনা সংঘটিত হয়েছে। একারণেই উক্ত যিনার কারণে তার উপর যিনার হদ্দ ওয়াজিব হয়।

কেউ যদি এমন লোকের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, যে নিজের অগ্নিপূজক দাসীর সাথে কিংবা হায়েযগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে কিংবা মুকাতাব দাসীর সাথে সহবাস করেছে; তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আসবে।

কেননা এখানে মালিকানা বিদ্যমান অবস্থায় সাময়িক হারামত্ব রয়েছে। সুতরাং এটা হবে পরোক্ষ কারণে হারাম, যা যিনারূপে গণ্য নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মুকাতাব দাসীর সাথে সংগম মোহসান হওয়াকে বিলুপ্ত করে। এটা ইমাম যুফার (র) এরও মত। কেননা সহবাসের ক্ষেত্রে মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে। একারণেই সহবাসের কারণে 'অর্থবিনিময়' অবশ্য সাব্যস্ত হয়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্তাগত মালিকানা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর সাময়িক হওয়ার কারণে হারামত্বটি পরোক্ষ।

যদি একদিকে দাসী এবং অন্যদিকে দুধবোন এমন নারীর সংগে সংগমকারী কোন লোককে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবেনা।

কেননা এটাই স্থায়ী হুরমত এবং এটাই বিশুদ্ধ মত।

যদি মুকাতাব গোলামকে অপবাদ দেয় আর সে চুক্তি পরিমাণ সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে না।

কেননা ছাহাবা কেরামের মতপার্থক্যের কারণে তার স্বাধীনতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

আপন মাতাকে বিবাহকারী অগ্নিপূজককে যদি কেউ অপবাদ দেয় অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে অপবাদদাতার উপর হদ্দ আসবে। সাহেবায়ন বলেন, হদ্দ আসবে না।

এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে মাহরামের সাথে অগ্নিপূজকের বিবাহের বৈধতা রয়েছে তাদের নিজেদের মাঝে। কিন্তু সাহেবায়ন তিন্নমত পোষণ করেন। বিষয়টি (মুশরিকদের) বিবাহ প্রসংগে আলোচিত হয়েছে।

হারবী যদি আমাদের দারুল ইসলামে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে আর কোন মুসলমানের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে।

কেননা এতে বান্দার হক রয়েছে। আর সে বান্দার হকসমূহ আদায় করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া নিরাপত্তা গ্রহণের মাধ্যমে সে আশা করেছে যে, কারো পক্ষ থেকে তাকে কষ্ট দেয়া হবে না। সুতরাং সেও অন্য কাউকে কষ্ট না দেয়ার এবং কষ্টদানের অনিবার্য পরিণতি ভোগের বাধ্যবাধকতা গ্রহণকারী হবে।

মুসলমান যখন অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্ত হয় তখন তাওবা করা সত্ত্বেও তার সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। সাক্ষীদান পর্বে বিষয়টি আলোচিত হবে।

কাফের যদি অপবাদের হদ্দপ্রাপ্ত হয় তাহলে কোন যিম্মীর বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা আপন সম্প্রদায়ে কারো বিপক্ষে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা তার ছিলো। সুতরাং হদ্দুল কাযাফের পূর্ণতা বিধানের জন্য তা রদ করা হবে।

এরপর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মুসলিম অমুসলিম সবার বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা এ সাক্ষ্যদান যোগ্যতা সে ইসলাম গ্রহণের পর অর্জন করেছে। সুতরাং তা পূর্ববর্তী রদের আওতায় আসবে না। পক্ষান্তরে হদ্দুল কাযাফ ভোগের পর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা দাসত্বের অবস্থায় মোটেই তার সাক্ষ্যদান যোগ্যতা ছিলো না। সুতরাং মুক্তি পরবর্তী সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রদ করাই হবে তার হদ্দ ভোগের পুর্ণতা।

হদ্দুল কাযাফের একটি দোররা লাগানোর পরই যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং পরবর্তীতে অবশিষ্ট দোররা লাগানো হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রদ হচ্ছে হদ্দের পূর্ণতা দানকারী। সুতরাং সেটা হদ্দসম্পৃক্ত বিষয় হবে। আর ইসলাম গ্রহণের পর হদ্দের অংশবিশেষ কার্যকর হয়েছে। সুতরাং সাক্ষ্য রদ ঐ হদ্দের সম্পৃক্ত গুণ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রদ করা হবে। কেননা অল্প অংশ প্রধান অংশের অনুবর্তী হয়। প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি একাধিক বার অপবাদ আরোপ করে কিংবা যিনা করে কিংবা মদপান করে অতঃপর হদ্দভোগ করে তাহলে একই হদ্দ সবকটির জন্য যথেষ্ট হবে।

অপর দু'টির (অর্থাৎ ব্যভিচার ও মদপানের) ক্ষেত্রে কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র হক হিসাবে হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন ও সতর্কীকরণ। আর প্রথম হদ্দ দ্বারা তা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীন হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান।

আর একই ব্যক্তি যদি যিনা করে, অপবাদ আনে, চুরি করে এবং মদপান করে, তবে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা প্রত্যেক শ্রেণীর হদ্দের উদ্দেশ্য অপর শ্রেণীর হদ্দ থেকে ভিন্ন। সুতরাং সেগুলো পরস্পর একীভূত হবে না।

আর অপবাদ আরোপের বিষয়টিতে যেহেতু আমাদের মতে আল্লাহ্‌র হকই প্রধান। সুতরাং সেটা অন্য দু'টির সাথে যুক্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি কিংবা অপবাদের বিষয় যদি ভিন্ন হয় তাহলে একীভূত হবে না। কেননা তার মতে এতে বান্দার হক প্রধান।

অনুচ্ছেদ ঃ সাধারণ শাস্তি বিধান

কেউ যদি কোন দাস বা দাসীকে কিংবা উম্মে ওয়ালাদকে কিংবা কোন কাফেরকে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে তাকে শাস্তি দান করা হবে।

কেননা এটা হলো অপবাদ আরোপের অপরাধ। শুধু ইহছানের গুণ অবিদ্যমান থাকার কারণে হদ্দ সাব্যস্তকরণ রহিত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ শাস্তি অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

তদ্রূপ যদি কোন মুসলমানকে যিনা ছাড়া অন্য কোন অপবাদ আরোপ করে, যেমন বললো, হে ফাসেক, কিংবা হে কাফের কিংবা হে খবীছ, কিংবা হে চোর।

কেননা একথা বলে সে তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বে কলঙ্ক আরোপ করেছে। আর হদ্দ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিয়াসের কোন দখল নেই। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণ শাস্তি দান সাব্যস্ত হবে।

তবে প্রথম অপবাদটির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ গয়ের মোহসিনকে যিনার অপবাদ দানের ক্ষেত্রে) চরম পর্যায়ে শাস্তি প্রদান করবে। কেননা তা ঐ শ্রেণীর অপরাধ দ্বারা হদ্দ সাব্যস্ত হয়।

আর দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি শাসকের বিবেচনাধীন।

আর যদি বলে, হে গর্দভ! কিংবা হে শূকর, তাহলে শাস্তি প্রদান করা হবে না।

কেননা যেহেতু বিষয়টির অবাস্তবতা নিশ্চিত, সেহেতু একথায় তার ব্যক্তিত্বে কোন কলংকযুক্ত হবে না।

কেউ কেউ বলেন, আমাদের লোক প্রচলনে যেহেতু এটাকে গালি গণ্য করা হয়, সেহেতু শাস্তি প্রদান করা হবে।

আর কেউ কেউ বলেন, যাকে গালি দেয়া হয়েছে, তিনি যদি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন হন, যেমন ফকীহ (আলিম) ও সৈয়দ, তাহলে শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা এ ধরনের কথায় তাঁদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলা হয়।

আর যদি সাধারণ স্তরের লোক হয় তাহলে শাস্তি প্রদান করা হবে না। এই ব্যাখ্যাই উত্তম। এ শাস্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ উনচল্লিশটি বেত্রাঘাত আর সর্বনিম্ন পরিমাণ তিনটি বেত্রাঘাত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ শাস্তির পরিমাণ পঁচাত্তরটি বেত্রাঘাত। এক্ষেত্রে মুল ভিত্তি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

من بلغ حداً فى غير حد فهو من المعتدين

হদ্দের ক্ষেত্র ছাড়া যে ব্যক্তি হদ্দ এর পরিমাণে উপনীত হয়, সে সীমা লংঘনকারী।

আর যখন হদ্দ এর পরিমাণে উপনীত হওয়া অসম্ভব হলো না, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) সর্বনিম্ন হদ্দ কোন্‌টি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন। আর তা হলো গোলামের উপর আরোপিত অপবাদজনিত হদ্দ। সুতরাং হাদীসকে তারা সেদিকে প্রত্যাবর্তিত করেছেন। আর তার পরিমাণ হলো চল্লিশ দোররা। সুতরাং তা থেকে একটি দোররা হ্রাস করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) স্বাধীন লোকদের সর্বনিম্ন হদ্দ বিবেচনা করেছেন। কেননা স্বাধীনতার অবস্থাই হলো মূল। অতঃপর তাঁর থেকে একটি বর্ণনা মতে তিনি একটি দোররা হ্রাস করেছেন। এবং এটা ইমাম যুফার (র) এরও মত; কিয়াসের দাবীও তাই।

পক্ষান্তরে আলোচ্য বর্ণনায় পাঁচটি দোররা হ্রাস করা হয়েছে। এটা আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাই তিনি তা অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর গ্রন্থে বলা হয়েছে, শাস্তির সর্বনিম্ন পরিমাণ তিনটি বেত্রাঘাত।

কেননা এর চেয়ে কম পরিমাণে সতর্তীকরণ হয় না।

আমাদের মাশায়েখেগণ উল্লেখ করেছেন যে, শাস্তির সর্ব নিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত হবে শাসকের বিবেচনা অনুযায়ী। তিনি যে পরিমাণ দ্বারা সর্তকীকরণ সম্পন্ন হবে বলে মনে করবেন, সে পরিমাণই নির্ধারণ করবেন। কেননা মানুষের ভিন্নতার কারণে তা ভিন্ন হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, গুরু অপরাধী ও লঘু অপরাধির পরিমাণের ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারণ হবে।

তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, প্রতিটি অপরাধের শাস্তি সেই শ্রেণীর হদ্দের নিকটবর্তী হবে। সুতরাং স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদির শাস্তি যিনার হদ্দের নিকটবর্তী হবে এবং যিনা ছাড়া অন্য কোন অপবাদ আরোপের শাস্তি হদ্দুল কাযাফের নিকটবর্তী হবে।

ইমাম কুদূরী(র) বলেন,শাস্তির ক্ষেত্রে শাসক যদি প্রহারের সাথে সাথে জেল দেওয়া সংগত বিবেচনা করেন, তাহলে তাও করতে পারেন।

কেননা এককভাবেও এটা শাস্তি হওয়ার যোগ্য এবং সামগ্রিক ভাবে এর পক্ষে শরীয়তের অনুমোদন রয়েছে। এমনকি জেল দেওয়ার মধ্যে সীমিত করাও জায়েয রয়েছে। সুতরাং প্রহারের সাথে সেটাকে যুক্ত করাও জায়েয হবে।

আর যেহেতু আটকাবস্থা এককভাবে শাস্তি হওয়ার যোগ্য, সেহেতু যে অপরাধে সাধারণ শাস্তি সাব্যস্ত হয়, সেটা প্রমাণিত হওয়ার আগে আটক রাখা যায় না, হদ্দের ক্ষেত্রে যেমন প্রমাণিত হওয়ার আগে আটক রাখা যায়।কেননা এটা তাযীর[১] বা সাধারণ শাস্তি হওয়ার যোগ্য ।

গ্রন্থকার বলেন, সাধারণ শাস্তির প্রহার হবে শক্ততম।

কেননা এখানে একদিক থেকে সংখ্যাগত ব্যাপারে শিথিল করা হয়েছে। সুতরাং গুণগত দিক থেকে শিথিল করা হবে না, যাতে উদ্দেশ্যের বিফলতায় পরিণত না হয়। একারণেই (এ শাস্তিতে) বিভিন্ন অংগে প্রহার বিক্ষিপ্ত করণের মাধ্যমেও লঘুতা আনা হয়নি।

১। উদাহরণতঃ কেউ যদি দাবী করে যে, অমুক আমাকে খারাপ গালি দিয়েছে এবং এর স্বপক্ষে সাক্ষীও পেশ করলো; তো এটা হলো তাযীর বা সাধারণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের ন্যায়পরতা তদন্তপূর্বক বিষয়টির সত্যতা সাব্যস্ত হওয়ার আগে অভিযুক্তকে আটক করা যাবে না। পক্ষান্তরে হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার মত বিষয়ে সাক্ষ্যদানের পর সাক্ষীদের অবস্থা অনুসন্ধানের আগেই তাকে আটক করা যাবে।

গ্রন্থাগার বলেন, অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রহার হলো যিনার হদ্দ।

কেননা যিনার হদ্দ সাব্যস্ত হয়েছে কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা। পক্ষান্তরে মদপানের হদ্দ সাব্যস্ত হয়েছে ছাহাবা বাণী দ্বারা।

তাছাড়া এটা হলো গুরুতর অপরাধ। একারণেই শরীয়ত কর্তৃক এতে রজমও প্রবর্তিত হয়েছে।

অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রহার হলো মদপানের হদ্দ।

কেননা এর কারণ নিশ্চিত। অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রহার হলো হদ্দুল কাযফ কেননা অপবাদ দাতার সত্যবাদী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় হদ্দের কারণটি সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে গেলো। তাছাড়া এক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রদ করার মাধ্যমে কঠোরতা করা হয়েছে। সুতরাং প্রহারের গুণগত দিক থেকে কঠোরতা করা হবে না।

শাসক যার উপর হদ্দ কায়েম করেন কিংবা যাকে তা'যীর করেন এবং এর ফলে সে মারা যায় তার খুন মাফ (দন্ডহীন)

কেননা তিনি যা করেছেন তা শরীয়তের আদেশে করেছেন। আর আদিষ্ট ব্যক্তির কর্মটি নিরাপত্তার শর্তে শর্তায়ীত নয়। যেমন রক্ত মোক্ষণকারী এবং অশ্ব চিকৎসাকারী।

পক্ষান্তরে স্বামীর স্ত্রীকে তা'যীর করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে আদিষ্ট নয় বরং ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত। আর ইচ্ছাধিকার পূর্ণ কর্ম নিরাপত্তার শর্তে শর্তযুক্ত। যেমন রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে (চলার সময় যদি কিছু নষ্ট করে ফেলে তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।)

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বাইতুল মাল থেকে দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা এক্ষেত্রে প্রাণনাশ করা হলো ভুল। কারণ তা'যীর হচ্ছে শাসনের জন্য। তবে দিয়াতের দায় বাইতুল মালের উপরে হওয়ার কারণ এই যে,তাঁর কর্মের সুফল সাধারণ মুসলমানদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণ তাদের মাল থেকেই হবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি আল্লাহর আদেশে আল্লাহর হক উশুল করেছেন। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন আল্লাহ মাধ্যম ছাড়া স্বয়ং তাকে মেরেছেন। সুতরাং ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

كتاب السرقة
চুরি অধ্যায়

চুরি অধ্যায়

অভিধানে سرقة চুরি অর্থ গোপনে ও সন্তর্পণে অন্যের থেকে কোন জিনিস নেওয়া। তা থেকেই استراق السمع শব্দের ব্যবহার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ। (তবে যারা গোপনে শ্রবণ করে)

এই আভিধানিক অর্থের সাথে শরীয়ত কয়েকটি গুণ অতিরিক্ত যোগ করেছে, যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে। আর আভিধানিক অর্থটি শুরুতে ও শেষে কিংবা শুধু শুরুতে বিবেচ্য হওয়া রূপ এই যে, গোপনে সিঁদ কেটে ভিতরে প্রবেশ করলো। অতঃপর প্রকাশ্যে জোর খাটিয়ে মালিকের কাছ থেকে মাল নিলো। বড় চুরি রাহাজানিতে শাসকের দৃষ্টি এড়ানো হয়। কেননা শাসকই হচ্ছেন তার সহকারীদের মাধ্যমে পথের নিরাপত্তা বিধানের যিম্মাদার। পক্ষান্তরে ছোট চুরিতে মালিকের কিংবা নিযুক্ত স্থলবর্তীর দৃষ্টি এড়ানো হয়।

গ্রন্থকার বলেন, সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যখন টাকশালের নির্মিত দশ দেরহাম বা ঐ মূল্যের সমপরিমাণ কোন দ্রব্য এমন সুরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে, যার সুরক্ষায় কোন সন্দেহ নেই, তখন তার বিরুদ্ধে হস্তকর্তন ওয়াজিব হবে।

এ বিষয়ে মূল দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

পুরুষ চোর ও স্ত্রী চোরের হস্ত কর্তন করো।

তবে সুস্থ মস্তিষ্কতা ও প্রাপ্ত বয়স্কতার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। কেননা এ দুটির বিদ্যমানতা ছাড়া অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। আর হস্ত কর্তন হলো অপরাধের প্রতিফল।

অদ্রূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাল নির্ধারণ করা জরুরী। কেননা তুচ্ছ মালের ব্যাপারে আগ্রহ নিস্তেজ থাকে। অদ্রূপ তা হরণ করার বিষয়টি গোপন করা হয় না। ফলে চুরিকর্মটির মূলতত্ত্ব অস্তিত্ব লাভ করে না এবং সতর্কীকরণের হেকমতও সাব্যস্ত হয় না। কেননা যে অপরাধ সচারাচর ঘটে, সে ক্ষেত্রেই সর্তকীকরণের হেকমত রয়েছে।

দশ দিরহাম নির্ধারণ করা হলো আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে এক চতুর্থাংশ দীনার নির্ধারণ করা হবে। আর ইমাম মালেক (র)-এর মতে তিন দীনার নির্ধারণ করা হবে।

উভয়ের দলীল এই যে,নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঢালের মূল্য পরিমাণ ক্ষেত্র ব্যতীত কর্তন সাব্যস্ত হয়নি। আর তার মূল্য নির্ধারণ প্রসংগে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে, তা হলো তিন দিরহাম। আর সুনিশ্চিত হিসাবে সর্বনিম্ন পরিমাণটি গ্রহণ করাই উত্তম।

তবে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক দীনার ছিলো বার দেরহামের সমান। সুতরাং তিন দিরহাম হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দীনারের সমান।

আমাদের দলীল এই যে, হদ্দ রোধ করার প্রয়াস হিসাবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্রহণ করাই উত্তম। এর কারণ এই যে,নিম্নতম পরিমাণের ক্ষেত্রে অপরাধ না হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান। আর সন্দেহ হদ্দ রোধ করে। আর এটা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী দ্বারাও সমর্থিত,

لا قطع الا فى دينار أو عشرة دراهم

এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের কমে হস্ত কর্তন নেই।

আর লোক প্রচলনের টাকশালে নির্মিত মুদ্রার উপরই দেরহাম নামটি প্রযুক্ত হয়।

এ থেকেই কুদূরী কিতাবের বক্তব্যে টাকশাল নির্মিত হওয়ার শর্তারোপের কারণ তোমার সামনেই স্পষ্ট হবে। এটাই হলো যাহিরে রেওয়ায়েত। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা এতে অপরাধের পূর্ণতার দিকটি বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি দশটি রৌপ্য খন্ড চুরি করে, যার মূল্য টাকশালে নির্মিত দশ দেরহামের কম, তাহলে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না।

আর দেরহামের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাত মিছকালের ওজনই বিবেচ্য। কেননা অধিকাংশ দেশে এই প্রচলিত।

আর গ্রন্থকারের বক্তব্য "কিংবা দশ দিরহামের মূল্যের সমপরিমাণ" দ্বারা এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, দিরহাম ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে দিরহামই বিবেচ্য হবে, যদিও তা স্বর্ণ হয়। স্থানটি এমন সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক, যার সুরক্ষায় কোন সন্দেহ নেই। কেননা সন্দেহ হচ্ছে হদ্দ প্রতিহতকারী। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ এটা আমরা আলোচনা করবো।

গ্রন্থকার বলেন, হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন সমান।

কেননা আয়াতে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেনি।

তাছাড়া এই কারণ যে, হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে অর্ধেকীকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের মালের হেফাজতের স্বার্থে পূর্ণ হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে একবারের স্বীকারোক্তি দ্বারাই হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দুই বার স্বীকারোক্তি করা ছাড়া হস্ত কর্তন করা হবে না।

তাঁর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, দুই স্বীরারোক্তি ভিন্ন দুই মজলিসে হতে হবে।

কেননা স্বীকারোক্তি হচ্ছে দুই প্রমাণের একটি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাক্ষ্য ভিত্তিক প্রমাণ। সুতরাং প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপর কিয়াস করা হবে। যিনার হদ্দের ক্ষেত্রেও আমরা এটা বিবেচনা করেছি।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, এক বারের স্বীকারোক্তি দ্বারাই চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তাই যথেষ্ট হবে। যেমন কেছাছ বা হদ্দুল কাযফের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের উপর এটাকে কিয়াস করার অবকাশ নেই। কেননা তবে কারণ সাক্ষীর সংখ্যাধিক্য মিথ্যা হওয়ার তোহমত হ্রাস করে। কিন্তু স্বীকারোক্তি ক্ষেত্রে এর কোন সুফল নেই। কেননা তাতে মিথ্যার তোহমত নেই। আর পুনরোক্তি দ্বারা হদ্দের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের সুযোগ বন্ধ হয়

না। পক্ষান্তরে মালের ক্ষেত্রে (এমনকি একবারের স্বীকারোক্তিও) প্রত্যাহার করা মোটেও সহীহ নয়। কেননা মালের মালিক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

আর কিয়াসের বিপরীত যিনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বীকারোক্তির শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা শরীয়তের নির্ধারিত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আর ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাই হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

কেননা এতেই বিষয়টির প্রকাশ সাব্যস্ত হয়ে যায়, অন্যান্য 'হক' এর ক্ষেত্রে যেমন।

শাসকের কর্তব্য হলো তাদেরকে চুরির ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকতর সতর্কতার উদ্দেশ্যে এবং চুরির সময় ও স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, হদ্দ সংক্রান্ত আলোচনায় যেমন বলা হয়েছে।

আর তার উপর তোহমত থাকার কারণে সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত তাকে আটক রাখবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, চুরির কাজে যদি একজন লোক শরীক হয় এবং প্রত্যেকে দশ দিহরাম ভাগ পায় তাহলে তাদের হাত কর্তন করা হবে। আর যদি তার চেয়ে কম ভাগ পায় তাহলে কর্তন করা হবে না।

কেননা নেছাব পরিমাণ চুরি হচ্ছে হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারী। আর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তার কৃত অপরাধের কারণে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। সুতরাং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নেছাবের পূর্ণতা বিবেচ্য হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে কর্তন হবে না

যে কোন জিনিস দারুল ইসলামে যে সকল নগণ্য বস্তু মোবাহ (বা সবার জন্য বৈধ) রূপে পাওয়া যায়, যেমন লাকড়ি, ঘাস, বাঁশ, মাছ, পাখী, বিভিন্ন শিকার, হরিতাল, লালমাটি, চুন ইত্যাদি, তাতে হস্ত কর্তন হবে না।

এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে সাধারণ তুচ্ছ জিনিসের ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন করা হতো না।

আর যে জিনিস স্বরূপে মূলতঃ বিনামূল্যে বৈধরূপে পাওয়া যায় এবং যা আগ্রহের বিষয় নয়, সেগুলো তুচ্ছ রূপে গণ্য। কেননা এ সবে সাধারণতঃ মানুষের তেমন চাহিদা থাকে না এবং দিতে কার্পণ্যও করে না।

ফলে এসকল জিনিস মালিকের নিকট থেকে জোরপূর্বক নেয়া খুব কমই হয়। সুতরাং শাসনমূলক বিধান প্রবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। একারণেই তো নেছাবের কম পরিমাণ চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হয়নি।

তাছাড়া আলোচ্য জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ থাকে। তুমি কি দেখনা যে, লাকড়ি দরজার বাইরে ফেলে রাখা হয়। বাড়ীর ভিতরে তো আনা হয় নির্মাণ কাজে, সংরক্ষণের জন্য নয়।

আর পাখী তো উড়ে যায় এবং শিকার পালিয়ে যায়। তদ্রূপ এর মাঝে যে গণমালিকানা রয়েছে তা এই গুণগত অবস্থায় সন্দেহ উদ্রেক করে। আর সন্দেহ হদ্দ প্রতিহতকারী।

মাছের ক্ষেত্রে নোনা, শুষ্ক ও তাজা সবই অন্তর্ভুক্ত। আর পাখীর মধ্যে মোরগ হাঁস ও কবুতর। আমাদের পূর্বোল্লিখিত কারণে।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাদীসও নিঃশর্ত রূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, لا قطع فى الطير পাখির ব্যাপারে কর্তন নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কাদা, মাটি ও গোবর ব্যতীত সব কিছুতেই হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এরও অভিমত। কিন্তু তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী বলেন, দুধ, গোশ্‌ত, কাঁচা ফল ইত্যাদি শীঘ্র পঁচনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاقطع فى ثمر و لاكثر كثر অর্থ গাছের মাথি; কোন কোন মতে খেজুর বৃক্ষের চারা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاقطع فى الطعام খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে হস্ত কর্তন নেই।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহই অধিক জানেন, যা দ্রুত পঁচনশীল, যেমন আহারের জন্য প্রদত্ত খাবার এবং যা ঐ পর্যায়ভুক্ত যেমন গোশ্‌ত ও ফল। এই ব্যাখ্যার কারণ এই যে, গম ও চিনির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই কর্তন কার্যকরী।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ সকল বস্তুতেও কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاقطع فى ثمر ولا كثر فاذا اواه الجرين ان الجران قطع

ফল ও মাথির মধ্যে কর্তন নেই, তবে গোলায় উঠিয়ে রাখার পর কর্তন করা হবে।

আমাদের জবাব এই যে, দ্বিতীয় অংশটি তিনি তখনকার প্রচলন হিসাবে বলেছেন। কেননা শুকনো ফলই গোলায় জমা করার প্রচলন ছিলো। আর তাতে হস্তকর্তন করা বিধেয়। **ইমাম কুদূরী বলেন, গাছে বিদ্যমান ফল এবং ক্ষেত্রে অকর্তিত ফসল চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। কেননা এক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিদ্যমানতা নেই। আর নেশামূলক পানীয় চুরিতে হস্ত কর্তন নেই।**

কেননা, চোর সেগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য নিয়েছে বলে ব্যাখ্যা দিতে পারে।

তাছাড়া এর কোন কোনটি তো মাল রূপে গণ্য নয়। আর কোন কোনটির বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং মাল না হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান। **আর তাম্বুরা চুরিতে হস্ত কর্তন নেই।**

কেননা এটা বাদ্য যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। **কুরআন মজীদ চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। যদিও তা স্বর্ণ খচিত হয়।**

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

কেননা এটা অর্থমূল্য সম্পন্ন সম্পদ। এজন্যই তো তা বিক্রয় করা জায়েয।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

তাঁর নিকট থেকে এরূপও বর্ণিত রয়েছে যে, মন্ডিত নকশা যদি নেছাব পরিমাণ হয় **তাহলে কর্তন** সাব্যস্ত হবে। কেননা তা কুরআন শরীফভুক্ত নয়। সুতরাং সেটাকে আলাদাভাবে **বিবেচনা করা হবে।**

যাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, হরণকারী তা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখার ও পড়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারে।

তাছাড়া 'লেখা' হিসাবে এর কোন অর্থমূল্য নেই। লেখা বিষয়ের জন্যই এটা সংরক্ষণ করা হয়। বাঁধাই কাগজ কিংবা অলংকারের জন্য সংরক্ষণ করা হয় না। কেননা এগুলো হচ্ছে অনুবর্তী জিনিস। আর অনুবর্তী জিনিস বিবেচ্য নয়। যেমন কেউ মদপূর্ণ পাত্র চুরি করলেও যার মূল্য নেছাব ছাড়িয়ে যায়। (কিন্তু পাত্র মদের অনুবর্তী বলে কর্তন হয় না।)

আর মসজিদে হারামের দরজাগুলোর ক্ষেত্রে কর্তন হবে না।

কেননা এখানে সংরক্ষণ নেই। সুতরাং বাড়ীর দরজার মত হলো, বরং তার চেয়ে বেশী হলো। কেননা বাড়ীর দরজা দিয়ে তো ভিতরের জিনিস হেফাজত করা উদ্দেশ্য হয়; কিন্তু মসজিদের দরজা দ্বারা ভিতরের জিনিস হেফাজত উদ্দেশ্য হয় না। একারণেই তো মসজিদের সামান্য চুরিতে হস্ত কর্তন হয় না।

ইমাম কুদূরী বলেন, স্বর্ণের ক্রুশ এবং দাবা ও বিলিয়ার্ড খেলার সামগ্রী চুরিতে হস্ত **কর্তন নেই।** কেননা সে অন্যায় কর্মে বাধা দেয়ার জন্য এগুলো ভেংগে ফেলার উদ্দেশ্যে নিয়েছে বলে বিকল্প ব্যাখ্যা দিতে পারে।

মূর্তির অংকন সম্বলিত দিরহামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা পূজার জন্য তৈরি হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে ভেংগে ফেলার বৈধতায় সন্দেহ সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ক্রুশ যদি প্রার্থনার স্থানে থাকে তাহলে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্য কোন ঘরে থাকে তাহলে পূর্ণ সম্পদগত ও সংরক্ষণগত দিকের বিবেচনায় কর্তন সাব্যস্ত হবে।

স্বাধীন ছেলেমেয়ে চুরি করাতে হস্ত কর্তন হবে না, যদিও তাদের গায়ে অলংকার **থাকে।**

কেননা স্বাধীন মানুষ মাল নয়। আর তার গায়ে বিদ্যমান অলংকার তার অনুবর্তী।

তাছাড়া সে তাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে কান্না থামানো কিংবা স্তন্যদানকারিণীর নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি তার গায়ে নেছাব পরিমাণ অলংকার থাকে তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা তা আলাদা চুরি করলে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হতো। সুতরাং অন্যকিছুর সাথে চুরি করলেও একই হুকুম হবে। এই একই মতপার্থক্য রয়েছে যদি এমন রূপার পাত্র চুরি করে, যাতে নাবীয বা ছারীদ থাকে। মতপার্থক্য হচ্ছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে, যে হাঁটতে পারে না এবং কথা বলতে পারে না, যাতে সে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে না হয়।

বড় গোলাম চুরি করায় হস্ত কর্তন নেই। কেননা এটা হচ্ছে বলপূর্বক কিংবা প্রতারণাপূর্বক অপহরণ। তবে অল্পবয়স্ক গোলাম চুরি করলে হস্তকর্তন হবে। কেননা এক্ষেত্রে চুরির পূর্ণ সংজ্ঞা সাব্যস্ত হয়।

তবে যদি সে নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে পারে তাহলে কর্তন হবে না। কেননা আত্মনিয়ন্ত্রণ বিবেচ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সে ও প্রাপ্ত বয়স্ক গোলাম সমপর্যায়ের।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, গোলাম যদি এত ছোটও হয় যার বুঝ নেই এবং কথা বলতে না পারে তবুও সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে হস্তকর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা এক হিসাবে সে মানব সত্তা এবং অন্য হিসাবে সে সম্পদ।

তার ফায়নের দলীল এই যে, গোলাম হচ্ছে নিরংকুশ মাল। কেননা সে এখনই উপকার যোগ্য কিংবা উপকারযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ। তবে তার সাথে মানব সত্তার যোগ রয়েছে। **আর বইপত্র বা খাতাপত্র জাতীয় জিনিস চুরিতে হস্ত কর্তন নেই।**

কেননা এগুলো চুরির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিতরের (লেখা) বিষয় আর সেগুলো মাল নয়।

তবে হিসাবের খাতাপত্রে কর্তন হবে।

কেননা তাতে অংকিত লেখাসমূহ নেয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কাগজই হবে উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার বলেন, কুকুর বা চিতা চুরি করাতে কর্তন নেই।

কেননা তাদের শ্রেণীর প্রাণী মূলতঃ মোবাহ রূপে পাওয়া যায় এবং তা মানুষের আগ্রহের বিষয় নয়।

তাছাড়া কুকুরের অর্থমূল্য ও সম্পদ গুণ সম্পর্কে আলিমগণের সুস্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে তা সন্দেহের উদ্রেক করবে।

ঢোল, তবলা, সারিন্দা, বিউগল (ইত্যাদি যাবতীয় সংগীত যন্ত্র) **চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই।**

কেননা সাহেবায়েনের মতে (আইনতঃ) এগুলোর কোন মুল্য নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে এগুলো যে নিবে সে ব্যাখ্যা হিসাবে ভেংগে ফেলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারে।

শালকাঠ, বর্শাদন্ড তৈরির কাঠ, আরলুস কাঠ, চন্দন কাঠ চুরির ক্ষেত্রে হস্তকর্তন করা হবে। কেননা মানুষের নিকট মুল্যবান হওয়ার কারণে এগুলো সংরক্ষিত সম্পদ রূপে গণ্য এবং দারুল ইসলামে এগুলো স্বরূপে মোবাহ রূপে (অর্থাৎ বিনামূল্যে) পাওয়া যায় না।

ইমাম মুহম্মদ (র) সবুজ পাথর, ইয়াকুত ও পান্না চুরিতে হস্ত কর্তন করা হবে।

কেননা এগুলো অতি মুল্যবান সম্পদরূপে বিবেচ্য, এবং দারুল ইসলামে এগুলো স্বরূপে মুলতঃ মোবাহ রূপে এবং অনাগ্রহের জিনিস হিসাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমতুল্য। কাঠ দ্বারা যদি পাত্র ও দরজা বানানো হয় তাহলে সেগুলো চুরি করার অপরাধে কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা কারিগরির কারণে এগুলো মূল্যবান দ্রব্যের সাথে যুক্ত। তুমি কি দেখনা যে, এগুলোর হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়। আর চাটাইর হুকুম ভিন্ন। কেননা কারিগরির কাজ তার শ্রেণী সত্তার উপর প্রবল হয়নি। একারণেই অরক্ষিত স্থানে তা বিছিয়ে রাখা হয়। বাগদাদী পাটি সম্পর্কে আলিমগণ বলেছেন যে, তা চুরি করলে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা তার মূল সত্তার উপর কারিগরির দিক প্রবল হয়েছে।

দরজা যদি ঘরে যুক্ত না হয় (বরং ঘরের ভিতরে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে তদুপরি যদি তা একজনে উঠিয়ে নেয়ার মত হালকা হয় তাহলেই শুধু হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা ভারী হলে তা চুরি করার আগ্রহ থাকে না।

আমানতের মাল আত্মসাৎকারী নারী ও পুরুষের হস্তকর্তন করা হবে না।

কেননা এতে সংরক্ষণ ক্রটিপূর্ণ।

তদ্রূপ ছিনতাইকারী ও চকিতে হরণকারীর হস্ত কর্তন হবে না।

কেননা সে তো তার কাজ প্রকাশ্যে সম্পন্ন করছে। যেমন এটি কিরূপে হত? অথচ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاقطع في مختلس ولا منتهب ولاخائن

চকিতে হরণকারী, ছিনতাইকারী এবং আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নেই।

কাফন চোরেরও হস্ত কর্তন নেই।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহম্মদ (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من نبش قطعناه যে কাফন চুরি করবে আমরা তার হাত কেটে দেবো। কেননা এটা অর্থমূল্য সম্পন্ন মাল যা তার উপযোগী রক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং এক্ষেত্রে তার হস্ত কর্তন করা হবে।

তারফায়নের দলীল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا قطع على المختفى কাফন চোরের হস্ত কর্তন নেই।

তাছাড়া এ কারণে যে, মালিকানার বিষয়ে সন্দেহ সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা প্রকৃত পক্ষে মৃত ব্যক্তির মালিকানা নেই। আবার ওয়ারিছদেরও মালিকানা নেই। কারণ মৃত ব্যক্তির প্রয়োজন অগ্রবর্তী। তাছাড়া হদ্দের মূল উদ্দেশ্য শাসনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। কেননা নিজস্ব প্রকৃতিতে অপরাধটির অস্তিত্ব বিরল। আর তারা যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা মারফূ' নয়। কিংবা তা শাসনের মাসলেহাতের উপর প্রযোজ্য।

আর কবর যদি কোন তালাবদ্ধ ঘরে হয় তাহলেও বিশুদ্ধ মতে আমাদের উল্লেখকৃত একই কারণে একই মতপার্থক্য হবে। তদ্রূপ যদি কাফেলায় বিদ্যমান কফিন থেকে কাফন চুরি করে আর তাতে মৃতদেহ বিদ্যমান থাকে তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে একই মতপার্থক্য হবে।

বাইতুল মাল থেকে কেউ চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। কেননা এটা জনসাধারণের মাল আর সেও তাদের একজন। **তদ্রূপ এমন মাল চুরি করলে যাতে চোরের অংশ রয়েছে, হস্ত কর্তন করা হবে না।** কারণ তাই যা আমরা বর্ণনা করেছি।

যে ব্যক্তির অন্য কারো কাছে কিছু দিরহাম পাওনা রয়েছে, সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে ঐ পরিমাণ চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা এটা হলো নিজের মাল উশুল করা। আর সূক্ষ্ম কিয়াস মতে এক্ষেত্রে নগদ পাওনা ও মেয়াদি পাওনা সমান। কেননা মেয়াদ নির্ধারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাগাদা বিলম্বিত হওয়া।

তদ্রূপ নিজের পাওনা হকের বেশী নিলেও কর্তন করা হবে না। কেননা নিজের হক পরিমাণ মাল দ্বারা সে তাতে অংশীদার সাব্যস্ত হয়। **কিন্তু যদি সে তার কাছ থেকে (দিরহামের পরিবর্তে) কোন দ্রব্য চুরি করে তাহলে কর্তন করা হবে।** কেননা পাস্পরিক সম্মতিতে বিক্রয় ছাড়া তার তা গ্রহণ করার অধিকার নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তন করা হবে না।

কেননা কোন কোন আলিমের মতে তার নিজের হক উশুল করার জন্য কিংবা হকের পরিবর্তে বন্ধক রাখার জন্য দ্রব্য গ্রহণ করার অধিকার তার রয়েছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা এমন সিদ্ধান্ত যা সুস্পষ্ট কোন দলীল নির্ভর নয়। সুতরাং ঐ দলীলের সাথে তার দাবী যুক্ত হওয়া ছাড়া তা বিবেচ্য হবে না। অবশ্য সে যদি তা দাবী করে তাহলে হদ্দ রহিত হবে। কেননা সে মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারণা পোষণ করেছে।

আর যদি এমন হয় যে, তার পাওনা হক ছিলো দিরহাম। কিন্তু সে তার থেকে চুরি করলো দীনার, তাহলে কোন কোন মতে কর্তন করা হবে। কেননা তা নেয়ার অধিকার তার নেই।

আবার কোন কোন মতে কর্তন করা হবে না। কেননা সকল মুদ্রা একই শ্রেণীভুক্ত।

কোন বস্তু চুরি করার কারণে যদি কারো হাত কাটা যায় এরপর সে চুরির মাল দিয়ে দেয়। অতঃপর একই মাল দ্বিতীয়বার চুরি করে, অথচ ঐ মাল পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে পুনরায় হস্ত কর্তন করা হবে না।

কিন্তু কিয়াসের দাবী হলো হস্ত কর্তন করা হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এবং ইমাম শাফেয়ী (র) এরও এই মত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فان عاد فاقطعوه যদি সে পুনরায় চুরি করে তাহলে পুনরায় তার হস্ত কর্তন কর। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া এই জন্য যে, প্রথমটির মত দ্বিতীয় অপরাধটিও পূর্ণতা সম্পন্ন বরং তা অধিকতর মন্দ। কেননা এর পূর্বে সতর্ক করা হয়েছে।

আর বিষয়টি এমন হলো, যেন মালিক জিনিসটি চোরের নিকট বিক্রি করার পর তার কাছ থেকে আবার খরীদ করলো এরপর চুরির ঘটনা ঘটলো।

আমাদের দলীল এই যে, হস্ত কর্তন সম্পদসত্তার সুরক্ষা গুণের বিলুপ্তি অনিবার্য করে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে জানা যাবে। অবশ্য মালিকের কাছে বস্তুটি ফেরত দেয়ার ফলে তার সুরক্ষা যদিও পুনঃলাভ হয়ে থাকে কিন্তু মালিকানায় অভিন্নতা এবং সম্পদ পাত্রের অভিন্নতা এবং সুরক্ষার বিলুপ্তির সাব্যস্তকারী তথা কর্তন বিদ্যমান থাকার দিকে লক্ষ্য করে বলা যায় যে, সুরক্ষা বিলুপ্তির সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বিক্রয়ের যে মাস'আলা উল্লেখ করেছেন, সেটা ভিন্ন। কেননা মালিকানার কারণ পরিবর্তিত হওয়ায় বস্তুও পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া 'কর্তিত হস্ত' ব্যক্তি থেকে পুন: অপরাধ সংঘটন বিরল। কেননা সে শাসনের কষ্ট বরদাশত করেছে। সুতরাং হদ্দ প্রয়োগ অপরাধের পরিমাণ হ্রাস করার মুল উদ্দেশ্য থেকে খালি হয়ে যাবে। তাই বিষয়টির এমন হলো, যেন হদ্দুল কাযাফপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাকে প্রথমে অপবাদ দিয়েছিলো তাকেই পুনরায় অপবাদ দিলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বস্তুটি তার পূর্ব অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায় যেমন সুতা ছিলো, সেটা চুরি করলো ফলে তার হস্ত কর্তন করা হলো আর চুরির মাল ফেরত দিলো অতঃপর মালিক তা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করলো এবং সে তা আবার চুরি করলো, তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে।

কেননা বস্তুটির সত্তারূপ পরিবর্তিত হয়েছে। একারণেই তো গসবকারী (ছিনতাইকারী) ঐ সুতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে ফেললে সে তার মালিক হয়ে যায়, যেন কোন ক্ষেত্রে এটাই হলো বস্তুসত্তা পরিবর্তিত হওয়ার আলামত। আর যখন বস্তুসত্তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো তখন সম্পদপাত্রের অভিন্নতা এবং ঐ পাত্রের বিপরীতে কর্তন সাব্যস্ত হওয়া থেকে উদ্ভূত সন্দেহ নাকচ হয়ে গেলো। সুতরাং দ্বিতীয়বার কর্তন সাব্যস্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসংগে

কেউ যদি তার মাতা-পিতা থেকে কিংবা সন্তান থেকে কিংবা মাহরাম আত্মীয় থেকে কিছু চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ জন্ম সূত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কারণ, সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরস্পর শিথিলতা এবং সুরক্ষিত স্থানে অবাধ প্রবেশাধিকার।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণে। আর এ জন্যই শরীয়ত মাহরাম আত্মীয়দের প্রকাশ্য সৌন্দর্যের স্থানগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত বৈধ করেছে।

দুই বন্ধুর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা চুরি করার মাধ্যমে তো সে তার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (মাহারেমের মাল চুরির ক্ষেত্রে) ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কেননা তিনি মাহরাম আত্মীয়তাকে দূর আত্মীয়তার সাথে যুক্ত করেছেন।

এই মত পার্থক্য আমরা দাসমুক্তি প্রসংগে আলোচনা করেছি।

মাহরামের ঘর থেকে যদি অন্য কারো মাল চুরি করে তাহলে কর্তন সাব্যস্ত না হওয়ারই কথা। পক্ষান্তরে অন্যের ঘর থেকে মাহরামের মাল চুরি করলে কর্তন সাব্যস্ত হবে।

এটা হলো সংরক্ষিত থাকা না থাকার বিচেনায়।

যদি দুধ মায়ের মাল চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তন করা হবে না। কেননা সে বিনানুমতিতে নিঃসংকোচে তার কাছে যাওয়া আসা করে।

দুধ বোনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে সচরাচর এ অবস্থা হয় না।

যাহিরে রেওয়াতের কারণ এই যে,এখানে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা বিদ্যমান নেই। আর এটা ছাড়া মাহরাম সম্পর্কের মর্যাদা সাধারণত ততটা রক্ষিত হয় না। যেমন যিনার মাধ্যমে সম্পর্ক। আর এর চাইতে নিকটতম মাহরাম হচ্ছে দুধবোন।

আর দুধ সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় না আনার কারণ এই যে, এটা বিশেষ প্রচার লাভ করে না। ফলে তোহমতের অবস্থান থেকে সরে থাকার জন্য সেখানে খোলা-মেলা মেলামেশা হয় না। কিন্তু নসব ও রক্ত সম্পর্কের বিষয়টি ভিন্ন।

স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের মাল চুরি করে, কিংবা গোলাম যদি তার মনিবের কিংবা মনিবের স্ত্রীর কিংবা মালিকার স্বামীর মাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না।

কেননা এসকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আসা-যাওয়ার অবাধ অনুমতি থাকে। স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি অপর জনের বিশেষ সুরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে, যেখানে তারা এক সাথে বসবাস করেনা; তাহলেও আমাদের মতে একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ী ভিন্ন মত পোষণ করেন।

কেননা অভ্যাসগত এবং বিবাহ সম্পর্কের প্রমাণগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে খোলামেলা মেলামেশা রয়েছে। এটা স্বামী স্ত্রীর একের পক্ষে অন্যের সাক্ষ্য দান প্রসংগে মতপার্থক্যের সদৃশ। **আর মনিব যদি তার মুকাতাব গোলামের মাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না।**

কেননা তার উপার্জনে মনিবের হক রয়েছে।

গনীমতের মাল থেকে চুরি করারও একই হুকুম।

কেননা উক্ত মালে তার হিস্‌সা রয়েছে। হদ্দ রহিত করণ এবং তার কারণ দুটোই হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সংরক্ষণ দুই প্রকারঃ একটা হলো নিজস্ব গুণগত সংরক্ষণ। যেমন বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: হেফাজতকারী নির্ধারণের মাধ্যমে সংরক্ষণ।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সংরক্ষণ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কেননা এছাড়া গোপনে নিয়ে যাওয়া সম্পন্ন হবে না।

আবার এই সংরক্ষণ স্থান দ্বারা হতে পারে। অর্থাৎ এমন স্থান যা সামানপত্র সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেমন ঘরবাড়ী, বাক্স ও দোকান ইত্যাদি।

আর কখনো হেফাজতকারী দ্বারা হতে পারে। যেমন কেউ সামান পাশে রেখে রাস্তায় কিংবা মসজিদে বসে রয়েছে। তখন ঐ সামান তার দ্বারা সংরক্ষিত হবে।

আর মসজিদে ঘুমন্ত অবস্থায় হযরত ছাফওয়ানের মাথার নীচে থেকে চাদর চুরি করেছিলো যে ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হস্ত কর্তন করেছেন।

স্থান দ্বারা সংরক্ষিত জিনিসের ক্ষেত্রে হেফাজতকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা হেফাজতকারী ছাড়াই তা গৃহের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। যদিও সে গৃহের দরজা না থাকে। কিংবা দরজা থাকে, খোলা থাকে। সুতরাং ঐ ঘর থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কেননা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংরক্ষণ করা। তবে ঐ ঘর থেকে মাল বের করা ছাড়া হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা বের করার পূর্ব পর্যন্ত মালের মধ্যে মালিকের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে হেফাজতকারীর মাধ্যমে সংরক্ষিত জিনিসটির বিষয় ভিন্ন। সেখানে মাল হস্তগত করা মাত্র কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা শুধু হস্তগত করা দ্বারাই মালিকের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং চুরি সম্পন্ন হয়ে যায়। হেফাজতকারী জাগ্রত হওয়া এবং ঘুমন্ত হওয়া তদ্রূপ সামান তার নীচে হওয়া কিংবা কাছে হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সামানের নিকটে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিকে লোক প্রচলন অনুযায়ী সামানের হেফাজতকারী গণ্য করা হয়।

একারণেই এধরনের অবস্থায় আমানতগ্রহীতা ও ধার গ্রহীতার উপর ক্ষতিপূরণ আসেনা।

কেননা এটা (ইচ্ছাকৃত) মাল নষ্ট করা নয়। অবশ্য ফাতাওয়ায় গৃহীত মত এর বিপরীত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে অথবা অরক্ষিত স্থান থেকে এমন অবস্থায় চুরি করে যে মালিক সামানের কাছে থেকে তা হেফাজত করছে, তাহলে কর্তন করা হবে। কেননা সে দুই সংরক্ষণের একটি দ্বারা সংরক্ষিত মাল চুর করেছে।

যে ব্যক্তি হাম্মানখানা থেকে কিংবা মানুষের প্রবেশানুমতি রয়েছে এমন ঘর থেকে মাল চুরি করে, তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা প্রবেশের ব্যাপারে রীতিগত কিংবা প্রকৃত অনুমতি রয়েছে। ফলে সংরক্ষণে ত্রুটি রয়েছে।

ব্যবসায়ের দোকান ঘর সমূহ এবং সরাইখানাসমূহ প্রবেশানুমতিপূর্ণ ঘরের অন্তর্ভুক্ত। তবে রাত্রে সেখান থেকে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। কেননা এগুলো আসবাব পত্র রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। অনুমতি তো শুধু দিনের বেলার সাথে বিশিষ্ট।

কেউ যদি মসজিদ থেকে এমন মাল চুরি করে, যার কাছে তার মালিক রয়েছে; তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, যদিও মসজিদ মালামাল হেফাজতের জন্য তৈরি করা হয়নি, এদিক থেকে স্থানের দ্বারা মাল সংরক্ষিত নয়, কিন্তু হেফাজতকারীর উপস্থিতি দ্বারা তা সংরক্ষিত।

হাম্মাম এবং প্রবেশানুমতিপূর্ণ অন্যান্য ঘরের বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে কর্তন করা হবে না। কেননা এগুলো যেহেতু আসবাব হেফাজতের জন্য তৈরি, সেহেতু এগুলো হচ্ছে সংরক্ষিত স্থান। সে কারণে হেফাজতকারীর উপস্থিতি দ্বারা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচ্য হবে না। (তবে প্রবেশানুমতির কারণে কর্তন করা হবে না।)

মেহমান যদি মেযবানের কোন মাল চুর করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা তার যেহেতু প্রবশানুমতি রয়েছে, সেহেতু তার ক্ষেত্রে ঘরটি সংরক্ষিত থাকেনি। তাছাড়া যেহেতু সে সাময়িকভাবে ঘরের একজনের মত হয়ে পড়েছে, সেহেতু তার কর্মটি খেয়ানত হবে চুরি হবে না। **কেউ যদি কোন কিছু চুরি করে এবং তা বাড়ী থেকে বের না করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে, না।** কেননা পুরো বাড়ী হচ্ছে অভিন্ন সংরক্ষিত স্থান। সুতরাং (চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) বাড়ী থেকে বের করে আনা অপরিহার্য। তাছাড়া বাড়ী এবং বাড়ীতে বিদ্যমান সবকিছু গুণগতভাবে বাড়ীর মালিকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সুতরাং না নেয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে।

আর যদি একটি বাড়ীতে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকে আর চোর একটি প্রকোষ্ঠ থেকে মালামাল বাড়ীর আঙ্গিনায় নিয়ে আসে, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা প্রতিটি প্রকোষ্ঠ তার অধিবাসীদের বিচারে স্বতন্ত্র সংরক্ষিত স্থান রূপে গণ্য।

আর যদি বাড়ীর প্রকোষ্ঠগুলোর কোন একজন বাসিন্দা অন্য প্রকোষ্ঠে হানা দিয়ে তা থেকে মালামাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। এর কারণ, আমরা বর্ণনা করেছি। **চোর যদি বাড়ীতে সিঁধ কেটে ভিতরে প্রবেশ পূর্বক মালামাল হস্তগত করে অতঃপর ঘরের বাইরে অপেক্ষমান অন্য একজনকে তা ধরিয়ে দেয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না।**

কেননা প্রথম জনের পক্ষ হতে মাল বের করা পাওয়া যায় নি। কারণ ঘর থেকে তার বের হওয়ার পূর্বে মালামালের উপর আরেকটি হাতের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জনের পক্ষ হতে সংরক্ষণ ভংগ করার অপরাধ পাওয়া যায়নি। সুতরাং দু'জনের কারো ক্ষেত্রেই চৌর্য্যকর্ম পূর্ণতা লাভ করেনি।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, গৃহে প্রবেশকারী যদি তার হাত বের করে বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিকে মালামাল হস্তান্তর করে তাহলে প্রবেশকারীর হস্ত কর্তন হবে। আর যদি বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিটি হাত ঢুকিয়ে প্রবেশকারীর হাত থেকে মালামাল গ্রহণ করে তাহলে উভয়ের হস্ত কর্তন হবে।

এর ভিত্তি হচ্ছে সেই মা'আলাটি, যা পরবর্তীতে আসছে ইনশাআল্লাহ্। আর যদি সে ভিতর থেকে মালামাল রাস্তায় ফেলে দেয় অতঃপর বের হয়ে তা নিয়ে নেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। ইমাম যুফার (র) বলেন, কর্তন করা হবে না।

কেননা বাইরে নিক্ষেপ হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারী অপরাধ নয়। যেমন (নিক্ষেপের পর) বাইরে এসে মালামাল ধরল না।

তদ্রূপ রাস্তা থেকে মালামাল তুলে নেওয়া কর্তন সাব্যস্তকারী অপরাধ নয়। যেমন অন্য কেউ তা তুলে নিলো।

আমাদের দলীল এই যে, বাইরে নিক্ষেপ করা চোরদের একটি অভ্যস্ত কৌশল। কেননা মালামালসহ বের হয়ে আসা কঠিন। কিংবা তাতে বাড়ীর মালিকের সাথে মোকাবেলা করা বা পলায়ন করা সহজ হয়। আর মাঝখানে অন্য হাতের গ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং সমগ্র কর্মকে অভিন্ন কর্ম সাব্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বের হয়ে মালামাল না নেয় তাহলে সে চোর হলো না; বরং মাল নষ্টকারী হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ যদি গাধার পিঠে মাল বোঝাই করে তা হাঁকিয়ে বাড়ী থেকে বের করে (তাহলে কর্তন হবে।) কেননা তার চালানোর কারণে গাধার চলা তার দিকে সম্বন্ধিত হবে।

যদি এক দল সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ মাল নেওয়ার ভার গ্রহণ করে, তাহলে সবার হাত কাটা হবে। গ্রন্থকার বলেন, এটা সুক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবী হলো একা বহনকারীর হাত কাটা যাবে। এ হল ইমাম যুফার (র) এর মত। কেননা তার থেকেই মাল বের করার অপরাধ পাওয়া গেছে। সুতরাং, তার দ্বারাই সেটা কর্মপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমাদের দলীল এই যে, পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে গুণগতভাবে বের করার অপরাধ সবার থেকেই পাওয়া গেছে; যেমন বড় চুরির (রাহাজানির) ক্ষেত্রে। এর কারণ এই যে, চোর দলের অনুসৃত রীতি এই যে, কেউ মালামাল উঠিয়ে নেয় আর অবশিষ্ট তার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকে। এখন যদি হস্তকর্তন রহিত হয়, তাহলে এর ফলে হদ্দের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

কেউ যদি ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং কোন জিনিস হস্তগত করে তাহলে তার হাত কাটা হবে না।

ইমলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার হস্ত কর্তন করা হবে।

কেননা সে সংরক্ষিত স্থান থেকে মাল বের করে এনেছে। আর এই তো উদ্দেশ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রবেশের শর্ত আরোপ করা হবে না। যেমন পোদ্দাবের সিন্দুকে হাত দিয়ে দিরহাম বের করে নিলো। আমাদের দলীল এই যে, অবিদ্যমানতার সন্দেহ পরিহার করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ ভংগের পুর্ণতার শর্ত আরোপ করা হয়, এবং প্রবেশের মধ্যেই পুর্ণতা সম্পন্ন হয় আর তা বিবেচনা করা সম্ভব। এবং প্রবেশই চুরি করার সাধারণ অবস্থা।

সিন্দুকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে হাত ঢোকানোই হলো সম্ভব, প্রবেশ করা সম্ভব নয়। অদ্রূপ পূর্বে বর্ণিত 'দলের একজনে মালামাল তুলে নেয়ার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটাই সাধারণ রীতি। (সুতরাং তাতে পূর্ণতার অর্থ রয়েছে।)

যদি আস্তিনের (বা কোমরের) বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেটে নেয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি আস্তিনের (বা কোমরের বা পকেটের) ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নেয় তাহলে কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে মুখ বাঁধার রশি বাইরের দিকে থাকে। সুতরাং থলে কাটার দ্বারা বাহির থেকে নেওয়া সাব্যস্ত হয়। কাজেই সংরক্ষণ ভংগ করা সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুখবাঁধার রশি থাকে আস্তিনের ভিতরে। সুতরাং থলে কাটা দ্বারা সংরক্ষিত স্থান অর্থাৎ আস্তিন থেকে নেওয়া সাব্যস্ত হয়। আর যদি কাটার পরিবর্তে মুখের বাঁধন খুলে নেয়া হয়, তাহলে কারণ বিপরীত হওয়ার দরুণ উভয় ক্ষেত্রে হুকুম বিপরীত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সর্বাবস্থায় হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা মাল হয় আস্তিন দ্বারা কিংবা আস্তিনের অধিকারী দ্বারা সংরক্ষিত ছিলো।

আমাদের দলীল এই যে, আস্তিনই হচ্ছে সংরক্ষিত স্থান। কেননা আস্তিন ওয়ালা মালের হেফাজতের জন্য আস্তিনের উপরই নির্ভর করে থাকে। তার লক্ষ্য তো থাকে দূরত্ব অতিক্রম কিংবা বিশ্রাম করা। সুতরাং তা গোলার ভিতরে মালামাল রক্ষার সদৃশ হলো।

যদি সারিবদ্ধ উট থেকে একটি উট চুরি করে কিংবা (তাদের উটের উপর থেকে) একটি গাঠরি চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কেননা তা উদ্দেশ্যরূপে সংরক্ষিত নয়। সুতরাং সংরক্ষণ বিদ্যমান না থাকার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে।

এর কারণ এই যে, সামনের থেকে যে টেনে নেয় কিংবা পিছন থেকে হাঁকিয়ে নেয় কিংবা সওয়ার হয়ে চলে, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পথ অতিক্রম এবং মালামালের স্থানান্তর। হেফাজত উদ্দেশ্য নয়। তবে যদি মালামালের হেফাজতের জন্য যদি কেউ পিছনে পিছনে চলে তাহলে ফকীগণের মতে হস্ত কর্তন করা হবে।

আর যদি গাঠরি কেটে তা থেকে কিছু বের করে নেয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা এধরনের অবস্থায় বস্তুটাই সংরক্ষণকারীরূপে গণ্য। কারণ সামনের হেফাজতই হচ্ছে তাতে সামান রাখার উদ্দেশ্য, যেমন আস্তিনের বিষয়টি। সুতরাং সংক্ষিত স্থান থেকে চুরি বিদ্যমান হলো। ফলে হস্ত কর্তন করা হবে।

যদি সামান ভরা বস্তা চুরি করে এমন অবস্থায় যে, সামানের মালিক তা হেফাজত করছে কিংবা তার উপর ঘুমিয়ে রয়েছে, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। অর্থাৎ বস্তা যদি রাস্তায় বা এধরনের অরক্ষিত স্থানে থাকে, তখন তা মালিকের হেফাজত দ্বারা সংরক্ষিত হবে। কেননা এ অসবস্থায় মালিক হেফাজতের জন্য পাহারা দিচ্ছে।

এর কারণ এই যে, রীতি সম্মত (ও অভ্যস্ত) হেফাজতই হলো বিবেচ্য। আর সামানের কাছে বসে থাকা এবং তার উপর ঘুমিয়ে থাকাকে রীতি অনুযায়ী হেফাজত করা বলে ধরা হয়। অদ্রূপ ইতিপূর্বে আমরা যে মতামত গ্রহণ করেছি, সে হিসাবে কাছে ঘুমিয়ে থাকাও হেফাজতরূপে গণ্য।

জামে ছাগীরের কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে যে, মালিক তার উপর কিংবা এমন স্থানে ঘুমিয়ে আছে, যেখান থেকে তার হেফাজত করা যায়। এটা ঐ মতামতকেই জোরদার করে যেটাকে আমরা উত্তম মত বলে ইতি পূর্বে পেশ করে এসেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ হস্ত কর্তন এবং তা সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে

গ্রন্থকার বলেন, চোরের ডানহাত কব্জি পর্যন্ত কাটা হবে অতঃপর (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য) দাগিয়ে দেওয়া হবে।

কর্তনের দলীল ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখকৃত আয়াত আর ডান হাত কাটার দলীল হযরত অবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (র) এর কিরাতে প্রমাণিত[১]।

কব্জি থেকে কর্তনের কারণ এই যে, يد শব্দটি যদিও হাতের বগল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু কব্জি পর্যন্ত স্থানটি (সর্বনিম্ন পর্যায় হওয়ার কারণে) সুনিশ্চিত। তদুপরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোরের হাত কব্জি পর্যন্ত কাটার আদেশ করেছেন।

দাগিয়ে দেওয়ার কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী- فاقطعوه واحسموه তার হাত কর্তন করো এবং দাগিয়ে দাও।

তাছাড়া দাগিয়ে দেওয়া না হলে প্রাণনাশ পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ হদ্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন, প্রাণনাশ নয়।

দ্বিতীয়বার যদি চুরি করে তাহলে তার বাম পা কর্তন করা হবে। কিন্তু তৃতীয়বার চুরি করলে আর কর্তন করা হবে না। বরং তাওবা করা পর্যন্ত জেলাখানায় আটক রাখা হবে। অধিক কর্তন না করা সুক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। মাশায়েখগণ বলেছেন, সেই সাথে সাধারণ শাস্তিও দেওয়া হবে।

তৃতীয় দফা চুরির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, তার বাম হাত কাটা হবে এবং চতুর্থ দফায় ডান পা কাটা হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من سرق فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فا عاد فاقطعوه

যে চুরি করে তার কর্তন করো, যদি পুনরায় করে তাহলে আবার কর্তন কারো, যদি পুনরায় করে তাহলে আবার কর্তন কারো। এবং ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাব অনুযায়ী হাদীসে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া অপরাধের ক্ষেত্রে তৃতীয়টি প্রথমটিরই সমতুল্য, বরং তার চেয়েও অধিক।

সুতরাং হদ্দ প্রবর্তনের জন্য তা অধিকতর যোগ্য।

আমাদের দলীল হলো এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) এর বাণী ঃ

انى لاستحى من الله أن لاأدع له يداً يأكل بها ويستنجى بها ورجلا يمشى بها -

এ বিষয়ে আমি আল্লাহ্‌কে লজ্জা করি যে, তার জন্য একটি হাতও রেখে দেবো না, যা দ্বারা সে আহার করবে এবং ইস্তিঞ্জা করবে, তদ্রূপ একটি পাও রেখে দেবোনা, যার দ্বারা সে-হাঁটা চলা করবে।

১। فاقطعوا ايمانهما। (তাদের ডান হাত কর্তন করো।)

এই যুক্তি নিয়ে তিনি অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, আর তাঁরা এ যুক্তি গ্রহণ করেন। সুতরাং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর গুণগতভাবে এরূপ করা ধ্বংস করার নামান্তর। কেননা এতে অংগের সমগ্র উপকারযোগ্যতা বিনষ্ট করা হয়। অথচ হদ্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন, ধ্বংস সাধন নয়।

তাছাড়া এর অস্তিত্ব হলো বিরল। অথচ শাসন প্রবর্তন করা প্রয়োজন ঐ সকল ক্ষেত্রে, যা সচরাচর ঘটে।

কিছাছের বিষয়টি ভিন্ন। (সেখানে অংগের বদলে অংগ কর্তন হতে থাকবে।) কেননা এটা হলো বান্দার হক। সুতরাং বান্দার হক রক্ষা করার জন্য যতটা সম্ভব পূর্ণভাবে আদায় করে নেওয়া হবে।

আর বর্ণিত হাদীসটির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে ইমাম তাহাবী (র) অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অথবা এটাকে আমরা শাসন উ-শৃঙ্খলার মাসলিহাতের উপর গণ্য করব।

চোরের বাম হাত যদি অবশ হয় কিংবা কর্তিত হয় কিংবা ডান পা যদি কর্তিত হয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা এতে ধরা বা চলার ক্ষেত্রে সমগ্র উপকারযোগিতা বিনষ্ট করা হয়। তদ্রূপ হুকুম আমাদের বর্ণিত কারণে যদি তার ডান পা অবশ হয়।

তেমনি হস্ত কর্তন করা হবে না যদি বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলি কর্তিত হয়। কিংবা অবশ হয় কিংবা বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া অন্য দু'টি আংগুলি (কর্তিত বা অবশ হয়।) কেননা 'ধারণশক্তি' বৃদ্ধাংগুলির উপর নির্ভরশীল।

আর বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া যদি একটি মাত্র আংগুল কর্তিত বা অবশ হয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে।

কেননা এক আংগুল নষ্ট হওয়া ধারণশক্তির ক্ষেত্রে 'ব্যাহতঃ বিঘ্ন' ঘটায়না। দুই আংগুল নষ্ট হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ধারণশক্তির ক্ষুণ্নতার ক্ষেত্রে দুই আংগুল বৃদ্ধাংগুলির সমপর্যায়ে গণ্য হবে।

গ্রন্থকার বলেন, শাসক যদি হদ্দ প্রয়োগকারীকে বলেন যে, একটি কৃত চুরির অপরাধে তুমি এর ডান হাত কেটে ফেলো। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে তার বাম হাত কেটে ফেললো, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোন কিছু নেই। আর সাহেবায়ন বলেন, ভুলক্রমে কর্তনের ক্ষেত্রে তার ওপর কোন দণ্ড আসবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত কর্তনের ক্ষেত্রে সে ক্ষতিপূরণ দিবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, ভুলের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ দিবে। আর এটাই কিয়াসের দাবী। এখানে 'ভুলের' অর্থ[১]

ইজতিহাদগত ভুল পক্ষান্তরে ডান ও বাম চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভুল করা মার্জনাযোগ্য নয়। অবশ্য কোন কোন মতে এটাও ওজর রূপে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম যুফার (র) এর দলীল এই যে, একটি নিরপরাধ হাত সে কর্তন করেছে। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে ভুল মার্জনীয় নয়। সুতরাং তাকে কর্তিত হাতের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১। অর্থাৎ সে এই ভুল ইজতিহাদ করেছে যে, কোরআনের আয়াত فاقطعوا ايديهما ডান কিংবা বামের শর্তমুক্ত সুতরাং যে কোন এক হাত কর্তন করার অবকাশ রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, যেহেতু কুর'আনের বাণীতে ডান হাত নির্ধারিত নয়, সেহেতু এটা তার ইজতিহাদগত ভুল। আর (শরীয়তের দৃষ্টিতে) ইজতিহাতগত ভুল মার্জনীয়।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, সে নাহকভাবে একটি নিরাপরাধ অংগ কর্তন করেছে। আর (যেহেতু এটি ভুলক্রমে নয়, সেহেতু) বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কেননা সে ইচ্ছাকৃতভাবে জুলুম করেছে। সুতরাং তা মাফ করা হবে না, যদি এটিও ইজতিহাদযোগ্য ক্ষেত্র হয়।

অবশ্য তাতে কেছাছ সাব্যস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ বশত: কেছাছ রহিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, সে একটি অংগ নষ্ট করেছে; কিন্তু তার সমগোত্রীয় এবং তার চেয়ে উত্তম একটি অংগ (ডান হাত) রেখে দিয়েছে। সুতরাং এটাকে 'নষ্ট করা' গণ্য করা হবে না। যেমন কেউ অন্য একজনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তার কোন মাল 'সম মূল্যে' বিক্রি করেছে, এরপর সে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলো।

এই ভিত্তিতে বলা যায় যে, হদ্দ প্রয়োগকারী ছাড়া অন্য কেউ কর্তন করলেও ক্ষতিপূরণ আসবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত।

আর চোর যদি বাম হাত বের করে বলে যে, এটা আমার ডান হাত, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই ক্ষতিপূরণ আসবেনা। কেননা সে তো তার নির্দেশক্রমেই কর্তন করেছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে ইচ্ছাকৃত কর্তনের ক্ষেত্রে চোরের উপর চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। কেননা বাম হাতের কর্তন হদ্দরূপে সম্পন্ন হয়নি।

আর ভুলক্রমে কর্তনের ক্ষেত্রে (হদ্দরূপে কর্তিত হয়নি) এই দৃষ্টিকোণ থেকে (চোরের উপর) ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইজতিহাদগত ভুলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না।[১]

যার মাল চুরি হয়েছে তার উপস্থিতি এবং তার পক্ষ হতে চুরির অভিযোগ দায়ের ছাড়া চোরের হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা চৌর্যাপরাধ প্রকাশিত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন শর্ত আর আমাদের নিকট (উপস্থিতির শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে) সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত চুরির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা অন্যের মালের ক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠন ঐ মালের মালিকের অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া প্রকাশিত হয় না।

তদ্রূপ আমাদের মতে কর্তনের সময় সে অনুপস্থিত থাকলে কর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা হদ্দ বিষয়ে হদ্দকার্যকরী ও বিচারের অন্তর্ভুক্ত।

আমানতের মাল হেফাজতকারী, অন্যের মাল হরণকারী এবং সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তির অধিকার রয়েছে তাদের কাছ থেকে যে চুরি করেছে তার হস্ত কর্তনের দাবী করার। আমানতের মাল যে গচ্ছিত রেখেছে এবং যার কাছ থেকে মাল হরণ করা হয়েছে, তাদেরও অধিকার রয়েছে হস্ত কর্তনের দাবী করার।

১। কেননা অপরাধ দমনকারী হদ্দ রূপে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতেই চোরের উপর থেকে চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ রহিত হয়। সুতরাং ভুলক্রমে কর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে ইজতিহাদের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন হদ্দরূপেই গণ্য হবে। সুতরাং হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে মালের ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হরণকারী ও আমানত হেফাজতকারী ব্যক্তির দাবী উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন করা হবে না।

একই মতপার্থক্য রয়েছে ধারে মাল গ্রহণকারী, ভাড়ায় মাল গ্রহণকারী, মোদারাবার ভিত্তিতে মালগ্রহণকারী, লগ্নীতে মাল গ্রহণকারী, ক্রয়মূল্য নিরূপণের শর্তে পণ্য গ্রহণকারী, বন্ধক গ্রহণকারী এবং এমন সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে, মালিক না হওয়া সত্ত্বেও যাদের জন্য হেফাজত ক্ষমতা সংরক্ষিত রয়েছে।

উপরোল্লিখিত লোকদের থেকে চুরি করার ক্ষেত্রে মালিকের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন করা হবে। তবে বন্ধক প্রদানকারীর অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন করা হবে ঋণ পরিশোধের পরও বন্ধকি মাল বিদ্যমান থাকা অবস্থায়। কেননা ঋণ পরিশোধ ছাড়া মূল বন্ধকী মাল তার দাবী করার কোন হক নাই।

ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর নিজস্ব মুলনীতির উপর তাঁর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন। কেননা তাঁর মতে উপরোক্ত লোকদের মাল ফেরত পাওয়ার জন্য দাবী উত্থাপনের হক নেই। (এটা মুল মালিকের হক)।

ইমাম যুফার (র) বলেন, মাল ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দাবী উত্থাপনের অধিকার হচ্ছে মাল হেফাজতের দায়িত্ব পালনের অনিবার্য কারণে। সুতরাং হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রকাশ পাবে না।

কেননা এতে মালের হেফাজত গুণ নষ্ট করা হয়[১]।

আমাদের দলীল এই যে, চৌর্যাপরাধ নিজস্বতাবেই হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারী। আর তা একটি শরীয়ত সম্মত প্রমাণের মাধ্যমে কাযীর নিকট প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই প্রমাণটি হচ্ছে নিঃশর্তরূপে সঠিক দাবী উত্থাপনের পর দু'জন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান। কেননা দাবী উত্থাপনের অধিকার বিবেচ্য হয়েছে (হেফাজতের দায়িত্বের অনিবার্যতার কারণে নয়, বরং) তাদের মাল ফেরত পাওয়ার প্রয়োজনের কারণে। সুতরাং (তাদের দাবী উত্থাপনের ভিত্তিতে) হস্ত কর্তন সম্পন্ন করা হবে।

আর তাদের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা।

আর মালের হেফাজত গুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে হস্ত কর্তন সম্পন্ন করার অনিবার্য ফল।[২]

সুতরাং এটাকে বিবেচনায় আনা হবে না।

আর দেখা দিতে পারে বলে কল্পিত সন্দেহের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। যেমন মালিক উপস্থিত হলো কিন্তু বন্ধক গ্রহণকারী অনুপস্থিত থাকল। তখন যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিকের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হাত কর্তন করা হবে। অথচ সেখানে (বন্ধক গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে) সু-রক্ষিত স্থানে প্রবেশের অনুমতির সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

১। কেননা চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ চোরের উপর অবশ্য সাব্যস্ত হয়। কিন্তু হস্ত কর্তন কার্যকর হওয়ার পর মালের ক্ষতিপূরণযোগ্যতা রহিত হয়ে যায়।

২। এটা যুফার (র)-এর উপস্থাপিত যুক্তির জবাব। অর্থাৎ ইমাম বা তাঁর নিযুক্ত বিচারক হস্ত কর্তন সম্পন্ন করছেন আল্লাহর হক হিসাবে, আর তারই অনিবার্য ফলরূপে মালের হেফাজত গুণ ও ক্ষতিপূরণ যোগ্যতা রহিত হচ্ছে। সুতরাং দাবী উত্থাপনকারীরা মালের হেফাজত গুণ রহিতকারী নয়।

কোন চুরির অপরাধে যদি চোরের হস্ত কর্তন করা হয়, আর চোরের কাছ থেকে যদি ঐ মাল চুরি হয়ে যায় তাহলে তার কিংবা মূল মালিকের অধিকার নেই দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তনের দাবী উত্থাপনের।

কেননা দ্বিতীয় চোরের ক্ষেত্রে উক্ত মাল মূল্যসম্পন্ন নয়। একারণেই তা নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং দ্বিতীয় চুরিটি নিজস্বভাবে হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারী রূপে সংঘটিত হয়নি।

একটি বর্ণনা মতে প্রথম চোরের মাল ফেরত দাবী করার অধিকার থাকবে। কেননা যেহেতু এই মাল মালিকের নিকট প্রত্যপর্ণ করা তার উপর আবশ্যক, সেহেতু তার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম চোরের হস্ত কর্তনের পূর্বে কিংবা সন্দেহবশত: হস্ত কর্তন রহিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় চোর উক্ত মাল চুরি করে তাহলে প্রথম চোরের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে তার হস্ত কর্তন করা হবে।

কেননা উক্ত মালের মুল্যসম্পন্নতা রহিত হওয়ার কারণ ছিলো হস্ত কর্তনের অনিবার্য ফল। আর হস্ত কর্তন এখানে সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং প্রথম চোর গছব (হরণকারীর) পর্যায়ভুক্ত হলো।

চোর যদি কিছু চুরি করে এবং শাসকের নিকট অভিযোগ দায়েরের পূর্বেই চুরির মাল মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। অভিযোগ দায়েরের পর ফেরতদানের উপর কিয়াস করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে হস্ত কর্তনের মত বর্ণিত হয়েছে। যাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ এই যে, চৌর্যাপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন হলো শর্ত। কেননা বিবাদ নিরসনের অনিবার্য প্রয়োজনেই সাক্ষ্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এখানে (মালিকের নিকট ফেরত প্রদানের কারণে) বিবাদের নিরসন হয়ে গেছে। অভিযোগ দায়েরের পরে ফেরত দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা উদ্দেশ্য অর্জনের কারণে অভিযোগ উত্থাপন পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং কার্যত: তা বিদ্যমান থাকবে।[১]

চুরির অপরাধে কারো বিরুদ্ধে হস্ত কর্তনের ফায়সালা হওয়ার পর (মালিকের পক্ষ হতে) যদি উক্ত মাল তাকে দান করা হয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না।

অর্থাৎ দান করার পর তার হাতে তা অর্পণও করা হয়ে থাকে।

তদ্রূপ যদি মালিক যদি তার কাছে তা বিক্রি করে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ অবস্থায়ও কর্তন করা হবে। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকেও প্রাপ্ত একটি বর্ণনা। কেননা সংঘটিত হওয়া ও প্রকাশ পাওয়ার দিক থেকে চৌর্যাপরাধটি পূর্ণতা লাভ করেছে। আর উদ্ভূত পরিস্থিতি দ্বারা চৌর্যাপরাধের সময় মালিকানার বিদ্যমানতা সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং কোন সন্দেহ উদ্ভূত হয়নি।

আমাদের দলীল এই যে, হদ্দ এর ক্ষেত্রে ফায়সালা কার্যকর করা বিচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কেননা হক উশূল করার মাধ্যমেই শুধু বিচারের মুখাপেক্ষিতা সমাপ্ত হয়। কারণ,

১। কেননা কোন কিছু পূর্ণতায় উপনীত হওয়া দ্বারা বাতিল হয় না, বরং সুস্থিত হয়। যেমন মৃত্যুর কারণে বিদ্যমান বিবাহ বাতিল হয় না, পূর্ণতায় উপনীত হওয়ার মাধ্যমে স্থিত হয়। পক্ষান্তরে তালাকের মাধ্যমে তা বাতিল ও রহিত হয়।

বিচারের ফায়সালা হচ্ছে বিষয়টিকে প্রকাশ করার জন্য। আর কর্তন হচ্ছে আল্লাহ্র হক আর আল্লাহ্র নিকট তো বিষয়টি আগে থেকেই প্রকাশিত।

যাই হোক ফায়সালা কার্যকর করা যখন বিচারের অন্তর্ভুক্ত হলো তখন ফায়সালা কার্যকর করার সময় পর্যন্ত অভিযোগ বিদ্যমান থাকা শর্ত। সুতরাং এটা ফায়সালা জারীর পূর্বে মালিক হয়ে যাওয়ার মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তদ্রূপ যদি উক্ত মালের মূল্য নিছাব পরিমাণ থেকে কম হয়ে যায়। অর্থাৎ বিচারের পর কার্যকরী করার পূর্বে। ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তন করা হবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এরও। মত। তারা মূল্য হ্রাসকে স্বয়ং মাল হ্রাস পাওয়ার উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, হস্ত কর্তনের জন্য নিছাবের পূর্ণতা যেহেতু শর্ত ছিলো, সেহেতু কারণে কর্তন কার্যকর করার সময়ও তার বিদ্যামানতা শর্ত হবে।

পক্ষান্তরে স্বয়ং মাল হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নষ্ট হওয়া অংশটুকু ক্ষতিপূরণযোগ্য। সুতরাং স্বয়ং বস্তু এবং তার দেয় বিদ্যমান হওয়ায় নিছাবপূর্ণ রয়েছে। যেমন সম্পূর্ণ মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মূল্য হ্রাসের বিষয়টি ক্ষতিপূরণযোগ্য নয়। সুতরাং অবস্থা দু'টি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

চোর যদি দাবী করে যে, চুরিকৃত বস্তুটি তার মালিকানার জিনিস, তাহলে সাক্ষ্য পেশ না করলেও তার হস্ত কর্তন রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ দু'জন সাক্ষী চুরি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের পর যদি সে ঐ দাবী করে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নিছক দাবী করার কারণে রহিত হবে না। কেননা কোন চোরই এমন দাবী করতে অক্ষম হবে না। সুতরাং তা হদ্দ কায়েমের দরজা বন্ধ করার দিকে উপনীত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, মালিকানায় উদ্ভূত সন্দেহ হদ্দকে রহিত করে। আর তা শুধু দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা তার দাবী সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) যা বলেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রমাণ হলো, চুরি সম্পর্কে স্বীকারোক্তির পর তা প্রত্যাহারের বৈধতা। **দু'জন লোক যদি চুরির স্বীকারোক্তি করে অতঃপর তাদের একজন বলে যে, সেটা আমার মাল তাহলে উভয়ের মধ্যে কারো হস্ত কর্তন হবে না।** কেননা প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার কার্যকর। আর অপর জনের ক্ষেত্রে তা সন্দেহ উদ্রেককারী। কারণ চৌর্যাপরাধে উভয়ের শরীক হওয়ার স্বীকারোক্তি দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছিলো।

দু'জন চুরি করার পর একজন যদি গায়েব হয়ে যায়; অতঃপর দু'জন সাক্ষী তাদের চুরি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর পরবর্তী মত অনুযায়ী (উপস্থিত) অপরজনের হস্ত কর্তন করা হবে। এটাই সাহেবায়নের মত।

প্রথম দিকে তিনি কর্তন সাব্যস্ত না হওয়ার কথা বলতেন। কেননা গায়েব লোকটি যদি উপস্থিত থাকতো তাহলে হয়ত সন্দেহ উদ্রেককারী কোন দাবী করতো।

তার পরবর্তী মতের কারণ এই যে, অনুপস্থিতি অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে চৌর্যাপরাধ সাব্যস্ত করাকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং (আলোচ্য বিষয়ে) সে অস্তিত্বহীন গণ্য হবে। আর

অস্তিত্বহীন ব্যক্তি (উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে) সন্দেহ উদ্রেককারী হতে পারে না। আর আগে বলা হয়েছে যে, সন্দেহ উদ্রেকের নিছক ধারণা বিবেচ্য নয়।

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত গোলাম যদি নির্দিষ্ট দশ দিরহাম চুরির কথা স্বীকার করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে এবং চুরিকৃত দিরহাম মালিককে ফেরত দেয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, হস্ত কর্তন করা হবে। তবে দিরহামগুলো মনিবের হবে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কর্তন করা হবে না এবং দিহরামগুলো মনিবের হবে। ইমাম যুফার (র) এরও এই মত। মাস'আলাটির অর্থ এই যে, মনিব যদি তার স্বীকারোক্তিকে মিথ্যা বলে দাবী করে।

আর যদি এমন মাল চুরি করার স্বীকারোক্তি করে, যা নষ্ট হয়ে গেছে; তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হয় তাহলে উভয় অবস্থাতেই হস্ত কর্তন করা হবে। ইমাম যুফার (র) বলেন, এ সকল ক্ষেত্রেই হস্ত কর্তন হবে না।

কেননা তার মূলনীতি এই যে, নিজের বিপক্ষে গোলামের হদ্দ ও কিছাছ সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা (হত্যার ক্ষেত্রে) তার স্বীকারোক্তি তার দেহ সত্তার উপর এবং (চুরির ক্ষেত্রে) তার অংগের উপর পতিত হয় আর এসবই হচ্ছে মনিবের মাল। অথচ অন্যের বিপক্ষে কৃত স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের ক্ষেত্রে স্বয়ং মাল কিংবা তার ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হবে। কেননা যেহেতু মনিবের পক্ষ থেকে সে আত্ম-অধিকার প্রদত্ত হয়েছে সেহেতু মাল সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত গোলামের মাল সম্পর্কিত স্বীকারোক্তিও বৈধ হবে না। আর আমাদের বক্তব্য হল, মানব সত্তা হিসাবে তার আত্মস্বীকারোক্তি বৈধ। অতঃপর তা তার সম্পদ সত্তার দিকে সম্প্রসারিত হবে। সুতরাং সম্পদ সত্তা হিসাবেও এভাবে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে।

তাছাড়া যেহেতু এতে তার নিজের ক্ষতিও রয়েছে, সেহেতু এই স্বীকারোক্তিতে তোহমতের অবকাশ নেই। আর এধরনের স্বীকারোক্তি অন্যের বিপক্ষেও গ্রহণযোগ্য। নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত গোলামের ক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, মাল সম্পর্কিত তার স্বীকারোক্তি বাতিল। এজন্যই তারপক্ষ থেকে গছব সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি বৈধ নয়। সুতরাং তা মনিবের মালরূপেই গণ্য হবে। আর মনিবের মাল চুরির ক্ষেত্রে গোলামের উপর হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয় না।

এ বিষয়টি ইমাম মুহম্মদ (র)-এর বক্তব্যকে সমর্থন করে যে, চৌর্যাপরাধের ক্ষেত্রে সম্পদ হলো প্রধান বিবেচ্য এবং হস্ত কর্তন হলো তার অনুগামী। একারণেই হস্ত কর্তন ব্যতিরেকে শুধু মাল সম্পর্কে দাবী উত্থাপন গ্রহণযোগ্য। (যেমন বললো যে, আমি হস্ত কর্তন চাইনা, শুধু মাল ফেরত চাই।) এবং হস্ত কর্তন বাতিরেকেই মাল সাব্যস্ত হবে। অথচ বিপরীত ক্ষেত্রে দাবী উত্থাপন গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং (মাল ব্যাতিরেকে শুধু) হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না।

আর মূল বিষয়ে যখন স্বীকারোক্তি বাতিল গণ্য হবে, তখন অনুগামী বিষয়েও তা বাতিল হবে। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার হাতে বিদ্যমান মাল সম্পর্কে তার স্বীকারোক্তি বৈধ। সুতরাং অনুগামী হিসাবে কর্তনের ক্ষেত্রেও তা বেধ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, সে দুটি বিষয় স্বীকার করেছে। একটি হলো হস্ত কর্তনের সাব্যস্তি। এটা হলো তার নিজের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি। সুতরাং তা বৈধ হবে। যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি। দ্বিতীয়টি হলো মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি । আর এটা হলো মনিবের বিপক্ষে। সুতরাং মনিবের ক্ষেত্রে মাল সম্পর্কে তা বৈধ হবে না। আর মাল (সাব্যস্ত হওয়া) ছাড়া হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন একজন স্বাধীন ব্যক্তি বললো, যায়দের হাতে যে কাপড় রয়েছে, তা আমি আমরের কাছ থেকে চুরি করেছি। আর যায়দ বললো যে, সেটা আমার কাপড়। এমতাবস্থায় স্বীকারোক্তিকারীর হাত কাটা যাবে। যদিও কাপড় নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না। এবং যায়দের কাছ থেকে কাপড় নিয়ে আমরকে দেয়া হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, আমাদের পূর্ববর্ণিত (মানব সত্তা সম্পর্কিত) কারণে তার হস্ত কর্তন সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি বৈধ। সুতরাং তার উপর ভিত্তি করে মাল সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিও গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা স্বীকারোক্তি বিদ্যমানতার অবস্থার সাথে সংযুক্ত হয়। আর বিদ্যমানতার অবস্থায় মাল হচ্ছে হস্ত কর্তনের অনুবর্তী। এ কারণেই হস্ত কর্তনের দিক বিবেচনা করে মালের নিরাপত্তা গুণ রহিত করা হয়। এবং মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও হস্ত কর্তন কার্যকর করা হয়।

আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তার থেকে মাল চুরি করার কারণেও হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে মনিবের মাল চুরি করার কারণে গোলামের হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং ক্ষেত্র দু'টি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

আর যদি মনিব তার সত্যতা মেনে নেয় তাহলে প্রতিবন্ধকতা বিদূরীত হওয়ার কারণে সবকটি অবস্থায়ই হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

গ্রন্থকার বলেন, যদি চুরির মাল চোরের হাতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার হস্ত কর্তন করা হয়, তাহলে উক্তমাল মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করা হবে।

কেননা তা এখনো তার মালিকানায় বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি মাল বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

আর (ইমাম কুদূরীর) এ সম্প্রর্কিত নিঃশর্ত এবারত নিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নষ্ট করে ফেলা উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর বর্ণনা। আর এটাই প্রসিদ্ধ মত। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান (বিন যিয়াদ) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নষ্ট করে ফেলার কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। কেননা হস্ত কর্তন ও ক্ষতিপূরণ দু'টি আলাদা হক, যাদের কারণও ভিন্ন। সুতরাং একটির কারণে অন্যটি রহিত হবে না।

হস্ত কর্তন হচ্ছে শরীয়তের হক, আর তার কারণ হচ্ছে শরীয়ত যে কাজ নিষেধ করেছে, তা থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে ক্ষতিপূরণ হচ্ছে বান্দার হক, আর তার কারণ হলো, অন্যের মাল নেওয়া। সুতরাং এটা হারাম শরীফে কারো মালিকানাধীন শিকার হত্যা (বা বিনষ্ট) করার মত হলো। কিংবা যিম্মীর মালিকানাধীন মদ পান করার মত হলো।

আমাদের দলীল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا غُرمَ على السارق بعد ما قطعت يمينه

ডান হস্ত কর্তিত হওয়ার পর চোরের উপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।

তাছাড়া এই কারণে যে, ক্ষতিপূরণের সাব্যস্তি হস্ত কর্তনের পরিপন্থী। কেননা ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে চুরি করার সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যায়। সুতরাং এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তার মালিকানাধী মালেই বিষয়টি ঘটেছে। সুতরাং মালিকানার সন্দেহ জনিত কারণে কর্তন রহিত হয়ে যাবে। আর যা রহিত হওয়া পর্যন্ত পৌছায়, তা নিজেই রহিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া বান্দার হক হিসাবে চুরির ক্ষেত্র (তথা চুরিকৃত মাল) নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন থাকতে পারে না। কেননা যদি তা থাকে তাহলে নিজস্ব সত্তাগতভাবে তা হালাল হবে। ফলে হালালত্বের সন্দেহজনিত কারণে হাত কর্তন রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং শরীয়তের হক হিসাবে তা হারাম গণ্য হবে; যেমন মৃত জন্তু হারাম। (আর সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয় না।)

তবে নষ্ট করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পাবে না। কেননা এটা চুরির অতিরিক্ত একটি কাজ। আর এর ক্ষেত্রে (মালের নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার) প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ সন্দেহ এ বিষয়টিকে হদ্দ অনিবার্যকারী কারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয় (যাতে কারণকে অকার্যকর করে হদ্দ রহিত করা যায়)। অন্য ক্ষেত্রে তা বিবেচায় আনা হয় না।

প্রসিদ্ধ বর্ণনার কারণ এই যে, মাল নষ্ট করণ হলো (নিজের কাজে বয় করার) উদ্দেশ্যকে পুর্ণতা দান। সুরতাং তাতে সন্দেহ বিবেচ্য হবে। তদ্রূপ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পাবে। কারণ এটা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মালের ক্ষেত্রে 'নিরাপত্তা গুণ' রহিত হওয়ার অনিবার্য দাবী। কেননা চুরিকৃত মাল ও তার ক্ষতিপূরণের মাঝে কোন সাদৃশ্য নেই।[১]

গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি কয়েকটি চুরি করে আর তন্মধ্যে একটি চুরির জন্য তার হস্ত কর্তন করা হয়, তাহলে তা সকল চুরির পরিবর্তেই গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন চুরির মালেরই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর সাহেবায়ন বলেন, যে চুরির জন্য হস্ত কর্তন করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য সব চুরির মালের ক্ষতিপূরণ সে প্রদান করবে।

মাস'আলাটির স্বরূপ এই যে, সকল চুরির বাদীদের মধ্য থেকে একজন শুধু উপস্থিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সবাই যদি উপস্থিত হয়ে থাকে এবং তাদের সবার অভিযোগ উত্থাপনের প্রেক্ষিতে তার হস্ত কর্তন করা হয়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই সবকটি চুরির কোন মালেরই ক্ষতিপূরণ সে প্রদান করবে না।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নয়। (যাতে তার অভিযোগ উত্থাপনকে সকলের অভিযোগ উত্থাপন গণ্য করা যায়।) অথচ চুরির অভিযোগ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অভিয়োগ উত্থাপন অপরিহার্য। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষে চুরির

১। অর্থাৎ যেহেতু নষ্ট হয়ে যাওয়া মালের 'নিরাপত্তা গুণ' রহিত বলে সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু নষ্টকৃত মালের ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণে তা রহিত সাব্যস্ত করতে হবে। কেননা তা না করা হলে অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, নষ্টকৃত মালের নিরাপত্তা গুণ বিদ্যমান থাকলো; কিন্তু বিনষ্ট মালে তা বিদ্যমান থাকলো না। অথচ মূল মালের সাথে ক্ষতিপূরণের মালের সাদৃশ্য জরুরী, যা এখানে নেই।

অভিযোগ সাব্যস্ত হয়নি। এবং ঐ সকল চুরির জন্য হস্ত কর্তন হয়নি। ফলে তাদের মাল নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন থেকে যাবে। (আর নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন মালের ক্ষতিপূরণ অনিবার্য)।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, আল্লাহর হক হিসাবে সকল চুরির জন্য একটি কর্তনই অবশ্য সাব্যস্ত। কেননা হদ্দ সমুহের ভিত্তি হলো একীভবনের উপর। আর অভিযোগ উত্থাপন হলো কাযীর সামনে (মামলা হিসাবে চৌর্যাপরা বৈধ) সাব্যস্তির শর্ত। পক্ষান্তরে অপরাধের হদ্দ হিসাবে যা ওয়াজিব হয়েছে, তা যখন উশুল ও কার্যকর করা হবে, তখন কার্যকরকৃত হদ্দটি সমগ্র অপরাধের অবশ্য সাব্যস্তি বলেই গণ্য হবে। (যেহেতু সবকটি চুরির মামলা তখন প্রকাশ পায়নি; যখন প্রকাশ পাবে তখন বোঝা যাবে যে, কর্তন এগুলোর জন্যও হয়েছিলো।)

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, হদ্দ এর যে উপকারিতা (অর্থাৎ শাসনের মাধ্যমে অপরাধ দমন) তা সব কটি অপরাধের সাথেই সম্পৃক্ত হচ্ছে। সুতরাং কর্তনও সব কটির পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে।

একই মতপার্থক্য হবে, যদি সব কটি চুরির সবকটি নেছাব পরিমাণ মালের মালিক একই ব্যক্তি হয় আর সে শুধু কোন একটির জন্য অভিযোগ উত্থাপন করলো।

পরিচ্ছেদ ঃ চুরিকৃত মালের পরিবর্তন সাধন

কেউ যদি কাপড় চুরি করে ঘরের ভিতরেই ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলে এরপর তা বের করে আনে আর অবস্থা এই যে, তা দশ দিরহামের সমমূল্য সম্পন্ন, তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হস্ত কর্তন হবে না। কেননা ঐ কাপড়ে তার অনুকূলে মালিকানার কারণ উদ্ভূত হয়েছে, আর তা হল সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ফেলা।

কেননা তা মূল্য ওয়াজিব করে এবং ক্ষতিপূরণ আদায়কৃত বস্তুটির মালিকানা সাব্যস্ত করবে। এখানে সে ঐ ক্রেতার মত হলো, যে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার সম্পন্ন বিক্রিত পণ্য চুরি করলো।[১]

সাহেবায়নের দলীল এই যে, এরূপভাবে বস্তুটির 'গ্রহণ' ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়েছে, মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়নি। মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অনিবার্য ফলরূপে, যাতে দুই বিনিময়, এক মালিকানা একত্র না হয়ে যায় আর এ ধরনের কর্ম (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ সাব্যস্তির কারণ রূপে গণ্য 'গ্রহণ') সন্দেহ উদ্রেককারী হতে পারে না। যেমন (খুঁত সৃষ্টি ছাড়া) শুধু গ্রহণ।[২] এবং যেমন বিক্রয়কৃত দোষযুক্ত বিক্রয়দ্রব্য বিক্রেতা কর্তৃক চুরিকরণ।[৩]

১। উভয় মাস'আলা, যোগসূত্র এই যে, এমন বস্তু চুরি করা হয়েছে, যাতে চোরের মালকিনা বিদ্যমান নেই। কিন্তু মালিকানা লাভের কারণ সৃষ্টি হয়েছে।

২। কেননা বড় ধরনের ফাড়া বা খুঁত সৃষ্টিকে যেমন মালিকানার কারণ সাব্যস্ত করার অবকাশ রয়েছে, তদ্রূপ শুধু তুলে নেয়াকেও মালিকানার কারণ সাব্যস্ত করার অবকাশ রয়েছে। অথচ সেটাকে মালিকানার সন্দেহ রূপে বিবেচনা করা হয় না।

৩। এমন অবস্থায় যে ক্রেতা দোষের কথা অবগত নয়। এখানে বিক্রেতার হস্ত কর্তন করা হবে। যদিও ফেরত দেয়ার কারণ তথা উপযুক্ত দোষ পাওয়া গেছে। তদ্রূপ আলোচ্য ক্ষেত্রেও কর্তন হবে; যদিও ক্ষতিপূরণের কারণ তথা ফাঁড়া ও খুঁত পাওয়া গেছে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র) যা উল্লেখ করেছেন তা ভিন্ন, কেননা বিক্রয় মালিকানার ফল প্রদানের জন্যই (শরীয়ত কর্তৃক) অনুমোদিত হয়েছে।

এ মতপার্থক্য হলো ঐ সময়, যখন মালিক কাপড় এবং সেই সাথে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের দিকটি বেছে নেবেন। পক্ষান্তরে যদি সে কাপড় বাদ দিয়ে তার মূল্য গ্রহণের দিকটি বেছে নেয় তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমেই তার হস্ত কর্তন হবে না। কেননা (মূল্য প্রদানের কারণে) তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে চুরি করে কাপড়টি নেয়ার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে। সুতরাং এটা দানের মাধ্যমে মালিক হওয়ার মত হলো, ফলে তা সন্দেহ উদ্রেক করেছে।

মতপার্থক্যের এই বিশদ বিবরণ তখনই হবে যখন ক্ষতি ও খুঁত গুরুতর হবে। পক্ষান্তরে সামান্য ক্ষতি হলে, সর্বসম্মতি ক্রমে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা এ অবস্থায় যেহেতু চোরের উপর সমগ্র মূল্যের দায় চাপানোর এখতিয়ার নেই সেহেতু মালিকানার কারণও বিদ্যমান নেই।

যদি বকরী চুরি করার পর তা জবাহ্ করে, তারপর তা বের করে আনে, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা এখানে (বকরীর ক্ষেত্রে নয়, বরং) গোশতের ক্ষেত্রে চৌর্যাপরাধ সম্পন্ন হয়েছে, আর গোশত চুরির অপরাধে হস্ত কর্তন নেই।

কেউ যদি এই পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য চুরি করে যাতে হস্তকর্তন সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সে তা দ্বারা দিরহাম কিংবা দীনার তৈরি করে; তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। এবং যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে, তাকে উক্ত দিরহাম ও দীনার ফেরত দিতে হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন, যার নিকট থেকে চুরি হয়েছে, সে ব্যক্তির উক্ত দিরহাম ও দীনার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

এ মতপার্থক্যের মূল ক্ষেত্র গছব বা বলপূর্বক হরণ। অর্থাৎ সাহেবায়নের মতে এটা হলো বস্তুর নতুন মুল্যমান সৃষ্টিকারী কর্ম। ইমাম আবূ হানীফা (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত অনুযায়ী হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ নয়। কেননা চোর তো চুরির মালের মালিক হচ্ছে না।

কোন কোন ভাষ্য মতে সাহেবায়নের মত অনুযায়ী হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা কর্তনের পূর্বেই চোর সেটার মালিক হয়ে গেছে।

আর কোন কোন ভাষ্যমতে কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা কর্মগত হস্তক্ষেপের কারণে তা ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে; সুতরাং সে হুবহু চুরিকৃত বস্তুটির মালিক হয়নি।

যদি কোন কাপড় চুরি করে তা লাল রংয়ে রঞ্জিত করে, তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। আর কাপড় ফেরত নেওয়া হবে না এবং মূল্য প্রদানের দায়ও চাপানো হবে না। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাপড় তার থেকে ফেরত নেয়া হবে এবং রঞ্জনের কারণে যতটুকু মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, তা চোরকে দিয়ে দেওয়া হবে।

এটাকে তিনি গছব ও হরণের পর রঞ্জিত করার উপর কিয়াস করেন। মাস'আলার মাঝে যোগসূত্র এই যে, কাপড় হলো মূল বস্তু যা বিদ্যমান রয়েছে; আর রং হচ্ছে তার অনুবর্তী বিষয়।

শায়খায়নের দলীল এই যে, এখানে রং দৃশ্যতঃ যেমন বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি গুণগতভাবেও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তো মালিক যদি রঞ্জিত অবস্থায় উক্ত কাপড় ফেরত নিতে চায় তাহলে রঞ্জনের কারণে যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, তার দায় তাকে বহন করতে হবে।

পক্ষান্তরে কাপড়ের মাঝে মালিকের অধিকার দৃশ্যতঃ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু গুণগতভাবে বিদ্যমান নেই। দেখুন না, বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অবস্থায় চোরের উপর তার ক্ষতিপূরণ নেই। তাই আমরা চোরের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

গছব বা হরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এখানে মালিক ও হরণকারী উভয়েরই হক দৃশ্যতঃ ও গুণগতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ফলে এদিক থেকে উভয়ে সমান হয়ে গেল। তাই আমরা (কাপড়টি মূল হওয়ার) যে কারণ উল্লেখ করেছি, সে প্রেক্ষিতে মালিকের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

আর যদি কালো রংয়ে রঞ্জিত করে তাহলে আবূ হানীফা (র) ইমাম মুহম্মদ (র) উভয়ের মতে কাপড় ফেরত নেওয়া হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে কালো ও লাল উভয় অবস্থা-ই সমান। কেননা তাঁর মতে লাল রংয়ের মত কালো রংও একটি অতিরিক্ত সংযোজন। ইমাম মুহম্মদ (রা)-এর মতেও লাল রংয়ের ন্যায় কালো রংও একটি সংযোজন, কিন্তু তা মালিকের হক রহিত করে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কালো রংয়ের রঞ্জন হচ্ছে একটি দোষ। ফলে তা মালিকের হক বিলুপ্তি সাব্যস্ত করে না।

পরিচ্ছেদ ঃ রাহাজানি

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন দল বা ব্যক্তি যদি প্রতিরোধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বের হয় এবং রাহাজানির উদ্যোগ নেয়; কিন্তু সম্পদ লুণ্ঠন ও মানুষ হত্যার পূর্বেই ধরা পড়ে যায়, তাহলে শাসক তাদের বন্দী করে রাখবেন, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। আর যদি তারা কোন মুসলমান বা যিম্মীর মাল লুণ্ঠন করে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য দলের সবার মাঝে বন্টন করা হলে প্রত্যেকে দশ দিরহাম বা তার বেশী ভাগ পাবে কিংবা অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি তার মূল্য দশ দিরহামের সমান হয় তাহলে শাসক তাদের হাত-পা বিপরীত ভাবে (ডান হাত ও বাম পা) কর্তন করবেন।

আর যদি তারা মাল লুণ্ঠন না করে মানুষ হত্যা করে থাকে তাহলে শাসক তাদের হদ্দ হিসেবে কতল করবেন। এক্ষেত্রে মূল দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা

উল্টোভাবে তাদের হাত পা কর্তন করা হবে কিংবা (আটকের মাধ্যমে) তাদের যমীন থেকে নির্বাসিত করা হবে।

আলোচ্য আয়াতের (أو অব্যয়টির) উদ্দেশ্য হচ্ছে— আল্লাহ্ অধিক জানেন, (বিধানের বিভিন্ন অংশকে অপরাধের) বিভিন্ন অবস্থার মুকাবেলায় বন্টন করা। আর অপরাধের অবস্থা চারটি। উল্লেখিত এই তিনটি আর চতুর্থটি ইনশাআল্লাহ্ আমরা উল্লেখ করবো। তাছাড়া অপরাধ যেহেতু বিভিন্ন অবস্থায় তারতম্যপূর্ণ হয়ে থাকে, সেহেতু অপরাধের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিধানও গুরুতর হওয়াই সমীচীন।

প্রথম প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে আটকের বিধান এজন্য যে, আয়াতে উল্লেখিত النفى (নির্বাসন) শব্দটি দ্বারা তা-ই বুঝানো হয়েছে। কেননা বন্দী করার অর্থ হলো অঞ্চলবাদসীদের থেকে অপরাধীদের দুষ্কৃতি রোধ করার মাধ্যমে তাদেরকে অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করা, তাদেরকে দৈহিক শাসনও করা হবে। কেননা তারা ভীতি সৃষ্টির অপরাধ করেছে। আর প্রতিরোধ শক্তির অধিকারী হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে এ জন্য যে, প্রতিরোধ শক্তি ছাড়া লড়াই সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় অবস্থার বিধান, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, তার দলীল আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত। আর লুণ্ঠিত মাল কোন মুসলমান বা যিম্মীর হওয়ার শর্ত এজন্য যে, মালের নিরাপত্তা গুণটি যেন স্থায়ী হয়। এ কারণেই (দারুল হরব থেকে) আগমণকারী নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তির উপরে যদি রাহাজানি করে তাহলে তাদের (হাত ও পা) কর্তন ওয়াজিব হবে না।

(লুণ্ঠনকারী দলের) প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নিছাব পূর্ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ লুণ্ঠন করা ছাড়া তার অংগকে হালাল না করা হয়।

আর আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ডান হাত ও বাম পা কর্তন, যাতে কোন অংগের সমগ্র কল্যাণ রহিত না হয়।

আর তৃতীয় অবস্থার বিধান, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, তার দলীল হলো আমাদের তিলাওয়াতকৃত আয়াত। তাদেরকে হদ্দরূপে কতল করা হবে (কিছাছরূপে নয়।) সুতরাং নিহতদের অভিভাবকরা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। কেননা এটা হলো শরীয়তের হক।

অপরাধের চতুর্থ অবস্থা এই যে, হত্যাও করল আবার মালও লুণ্ঠন করলো। এ অবস্থায় শাসকের এখতিয়ার রয়েছে। হয় তিনি তাদের হাত-পা বিপরীতভাবে কর্তন করবেন। অতঃপর হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন। আর ইচ্ছা করলে শুধু হত্যা করবেন। কিংবা ইচ্ছা করলে শুধু শূলে চড়াবেন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, শাসক শুধু হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন, তার সাথে কর্তন যোগ করবেন না। কেননা রাহাজানি হলো একটি অপরাধ। সুতরাং তা দু'টি হদ্দকে অনিবার্য করবে না। তাছাড়া হদ্দ এর ক্ষেত্রে প্রাণদন্ডের নিম্নবর্তী দন্ড প্রাণদন্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন- রাজম ও চুরির হদ্দ।

শায়খায়ন-এর দলীল এই যে, (দু'টি মিলে) এটি একটি শাস্তি, যা গুরুতর হয়েছে শাস্তির কারণ গুরুতর হওয়ার ফলে। আর সেটা হলো হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে শান্তি ভংগ করা। একারণেই বড় চুরি (ডাকাতি)তে যুগপৎ হস্ত-পদ কর্তনকে একই হদ্দ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ সাধারণ চুরিতে এটাকে দুটি হদ্দ হিসেবে গণা করা হয়েছে।

আর বিভিন্ন হদ্দ-এর মাঝে একীভবন সম্পন্ন হয়ে থাকে, একটি হদ্দ-এর বিভিন্ন অংশের মাঝে হয় না।

কুদূরীতে শূলে চড়ানো ও না চড়ানোর মাঝে এখতিয়ার প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা হলো যাহিরে রেওয়ায়েত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, শূলে চড়ানো বাদ দেয়া হবে না। কেননা এটা শরীয়তের নাছ-বর্ণিত বিষয়। আর উদ্দেশ্য হলো অধিক প্রচার, যাতে তাকে দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

আমরা বলি যে, মূল প্রচার হচ্ছে প্রাণদন্ড কার্যকর করার মাধ্যমে। আর শূলে চড়ানোতে রয়েছে অতিরিক্ত প্রচার। সুতরাং এ ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করা হবে।

অতঃপর ইমাম কুদূরী বলেন, তাকে জীবন্ত শূলে চড়ানো হবে। এবং বর্শাঘাতে তার পেট ফেড়ে ফেলা হবে। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই ফেলে রাখা হবে।

ইমাম কারখী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম তাহাবী (র) বলেন, 'মুছলাহ্' (মৃত ও জীবিত দেহ বিকৃতকরণ) পরিহার করার জন্য প্রথমে হত্যা করা হবে। এরপর শূলে চড়ানো হবে।

প্রথমোক্ত মতের— এবং এটাই বিশুদ্ধতম, কারণ এই যে, এভাবে শূলে চড়ানো অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। শূলে চড়ানোর সেটাই হলো উদ্দেশ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তিন দিনের অধিক শূলে চড়িয়ে রাখা হবে না।

কেননা এরপর লাশে-পচন ধরবে এবং মানুষ সে কারণে কষ্ট পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে ওভাবেই শূল কাষ্ঠে রেখে দেওয়া হবে, যাতে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে যায়। আর যাতে তা দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

আমরা বলি যে, আমরা যে ব্যবস্থা উল্লেখ করেছি, তাতেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। আর চরম অবস্থার পৌঁছান উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ডাকাতকে কতল করার পর লুণ্ঠনকৃত মালের ব্যাপারে তার উপর কোন দায় আরোপ করা হবে না সাধারণ চুরির উপর কিয়াস করে। আর তার কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

যদি মূল হত্যাকান্ড তাদের একজন করে থাকে তাহলে তাদের সবার উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।

কেননা এটা হলো লড়াই ও অস্ত্র ধারণের শাস্তি আর তা এভাবে সম্পন্ন হয় যে, একে অপরের সহায়ক হয়। এমন কি যখন তারা পিছপা হয়ে যায় তখন সহায়করাও তাদের সাথে যোগ দেয়। (হদ্দ প্রয়োগের) শর্ত শুধু কোন একজন থেকে হত্যাকান্ড সম্পন্ন হওয়া, আর তাতো হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হত্যাকান্ড লাঠি, পাথর ও তরবারি যা কিছু দ্বারাই হোক, তার হুকুম অভিন্ন।

কেননা, এই হদ্দ সাব্যস্ত হয় পথে পথাচারীদের উপর রাহাজানি করার অপরাধে।

আর যদি ডাকাত হত্যা ও লুণ্ঠন কোনটাই না করে থাকে বরং শুধু জখম করে থাকে তাহলে কিছাছের ক্ষেত্রে তার থেকে কিছাছ নেয়া হবে এবং দিয়াতের ক্ষেত্রে দিয়াত নেওয়া হবে। আর অভিভাবকদের এখতিয়াবে হবে।

কেননা এ পর্যায়ের অপরাধে কোন হদ্দ নেই। সুতরাং বান্দার হক (তথা) আমাদের উল্লেখকৃত কিছাছ ও দিয়াত সাব্যস্ত হবে এবং অভিভাবক তা উশুল করবে।

আর যদি মাল লুণ্ঠনের সাথে জখম করে থাকে তাহলে তার হাত-পা কর্তন করা হবে আর জখমের দায় বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা যখন আল্লাহ্‌র হক হিসাবে হদ্দ অবশ্য সাব্যস্ত হলো। তখন বান্দার হক হিসাবে মালের নিরাপত্তার ন্যায় জানের নিরাপত্তা রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি তাওবা করার পর তাদের পাকড়াও করা হয়, কিন্তু অবস্থা এই যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে, তাহলে অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে (কিছাছ রূপে) তাদের হত্যার দাবী করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারে।

কেননা এই অপরাধকর্মে তাওবার পর হদ্দ কায়েম করা হয় না। কেননা আয়াতে তাওবার ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া তাওবার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে লুণ্ঠিত মাল ফেরত দেয়ার উপর আর মাল ফেরত দেয়ার পর কর্তন সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং জানের এবং মালের ক্ষেত্রে বান্দার হক প্রকাশিত হবে। এবং অভিভাবক কিছাছ গ্রহণ করবে কিংবা মাফ করে দেবে। আর লুণ্ঠিত মাল তার হাতে নষ্ট হোক কিংবা সে নিজে নষ্ট করুক, তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

ডাকাতদের মাঝে যদি কোন বালক কিংবা পাগল কিংবা যার উপর ডাকাতি করা হয়েছে তার কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে, তাহলে অবশিষ্টদের থেকেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

বালক ও পাগলের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র) এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সুস্থ মস্তিষ্ক (ও প্রাপ্ত বয়স্করা) যদি প্রত্যক্ষভাবে ডাকাতি করে থাকে তাহলে (বালক ও পাগল ছাড়া) অন্যদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। সাধারণ চুরির ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, প্রত্যক্ষ অপরাধকারী হলো মূখ্য আর সহায়তা হলো অনুগামী। আর সুস্থ মস্তিষ্কে প্রত্যক্ষ অপরাধকারীর মাঝে কোন 'বিঘ্ন' নেই আর অনুগামীদের বিঘ্নতা বিবেচ্য নয়। আর এর বিপরীত ক্ষেত্রে বিষয়টি ও সিদ্ধান্তটি বিপরীত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র) এর দলীল এই যে, এটা অভিন্ন অপরাধ, যা সবার যোগ সাজসে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং একাংশের অপরাধ যখন হদ্দ সাব্যস্তকারী হলো না তখন অবশিষ্টদের অপরাধ 'আংশিক হেতু' হলো, আর আংশিক হেতু দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং ইচ্ছাকৃত (আঘাতকারী-এর সাথে ভুলক্রমে (আঘাতকারী) এর অবস্থানের মত হলো 'মাহরাম আত্মীয়' সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, এ সিদ্ধান্ত তখন হবে যখন লুণ্ঠিত মালের মাঝে লুণ্ঠনকৃত ব্যক্তির সাথে তার অংশীদারিত্ব হবে। বিশুদ্ধ মত এই যে, বিধানটি নিঃশর্ত। কেননা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, অপরাধটি অভিন্ন। সুতরাং কারো ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়া অবশিষ্টদের ক্ষেত্রেও তা রহিত হওয়াকে অনিবার্য করবে।

লুণ্ঠনকৃত ব্যক্তিদের মাঝে (দারুল হরবের) নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি থাকলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হলো তার (মালের) নিরাপত্তা গুণের অসম্পূর্ণতা। আর এটা তার সাথে বিশিষ্ট অবস্থা। পক্ষান্তরে আলোচ্য ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হল সংরক্ষণের অসম্পূর্তা। কেননা সমগ্র কাফেলা একটি সংরক্ষিত স্থানতুল্য।[1]

যখন হদ্দ রহিত হয়ে গেলো তখন হত্যার সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের হাতে অর্পিত হবে। কেননা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তখন বান্দার হক প্রকাশিত হয়।

সুতরাং তারা ইচ্ছা করলে হত্যার দাবী উত্থাপন করবে কিংবা মাফ করে দেবে।

যদি কাফেলার কিছু সংখ্যক লোক পর কিছু সংখ্যক লোকের উপর ডাকাতি করে তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা সংরক্ষণ অভিন্ন হওয়ার কারণে পুরো কাফেলা এক বাড়ীর সমতুল্য।

দিনে বা রাতে কেউ যদি শহরে ডাকাতি করে কিংবা 'কুফা' ও 'হিরা' এর মধ্যবর্তী কোন স্থানে ডাকাতি করে তাহলে সে ডাকাত হবে না।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কিয়াসের দাবী এই যে, সে ডাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা প্রকৃত ডাকাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, শহরের বাইরে যত নিকটবর্তী স্থানই হোক, হদ্দ সাব্যস্ত হবে। কেননা তার কাছে যথা সময়ে সাহায্য পৌছবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, যদি দিনে অস্ত্রসহ কিংবা রাতে অস্ত্র বা লাঠি সোটা নিয়ে লুণ্ঠন চালায় তাহলে তাদের ডাকাত বলে গণ্য করা হবে। কেননা অস্ত্র তো সাহায্য পৌছার অবকাশ দেবে না। আর রাত্রে সাহায্য পৌছতে বিলম্ব হয়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, রাহাজানি সম্পন্ন হয় পথিকদের লুণ্ঠন করা দ্বারা আর শহর এবং শহর সন্নিকটবর্তী স্থানে তা সম্পন্ন হতে পারে না। কেননা স্বাভাবিক অবস্থা হলো সাহায্য

১। কেননা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমগ্র কাফেলা একটি গৃহের সমতুল্য। সুতরাং এমন হলো যেন নিকটাত্মীয় তার নিকটাত্মীয়ের বাড়ী থেকে নিকটাত্মীয়ের মাল এবং সেখানে রক্ষিত অপরিচিত ব্যক্তির মাল চুরি করেছে। সুতরাং স্থানগত সংরক্ষণের সন্দেহ উদ্ভূত হওয়ার কারণে কর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা আত্মীয়ের জন্য আত্মীয় গৃহ সংরক্ষিত নয়।

পৌঁছে যাওয়া। তবে হকদারদেরকে তার হক পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের মাল ফেরত দেয়ার জন্য পাকড়াও করা হবে। আর অপরাধ সংঘটনের কারণে তাদের শাস্তি প্রদান ও বন্দী করা হবে।

আর যদি এরূপ ক্ষেত্রে তারা হত্যাকন্ড ঘটায় তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে বিষয়টি অভিভাবকদের উপর ন্যস্ত করা হবে।

কেউ যদি শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) মতে দিয়াত আসবে হত্যাকারীর 'আকিলাহর' উপর।

এটা হলো অস্ত্রছাড়া ভারী কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করার অন্তর্ভুক্ত মাসআলা। দিয়াত অধ্যায়ে ইনশআল্লাহ্ আমরা তা বর্ণনা করবো।

যদি সে শহরের মধ্যে একাধিকবার শ্বাসরোধ করে হত্যা করে থাকে তাহলে এ কারণে তাকে প্রাণদন্ড দেয়া হবে। কেননা সে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টাকারী হয়েছে। সুতরাং কতলের মাধ্যমে তার দুষ্কৃতিরোধ করা হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

كتاب السير

জিহাদ অধ্যায়

জিহাদ অধ্যায়

জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে ফিক্হর পরিভাষায় سير বলা হয়। এটা سيرة এর বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ের পথ। শরীয়তের পরিভাষায় এটি (জিহাদ ও) গাযওয়া সমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত নীতি ও পন্থার সাথে বিশিষ্ট।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, জিহাদ হলো ফরযে কিফায়া। যদি লোকদের একদল তা পালন করে তাহলে অবশিষ্টদের থেকে তার ফরয হওয়া রহিত হয়ে যায় । ফরয হওয়ার প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً

সমগ্র মুশরিকদলকে হত্যা করো যেমন তারা তোমাদের সমগ্র দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- الجهاد ماض الى يوم القيامة (জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর বিধান)।

একথা দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, তা ফরয হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

এটা কিফায়া ফরয হওয়ার কারণ এই যে, এটাকে নিজস্ব গুণের কারণে ফরয করা হয়নি। কেননা নিজস্ব সত্তাগত দৃষ্টিকোণে এটা হলো ফাসাদ সৃষ্টি। শুধু আল্লাহ্র দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বান্দাদের থেকে দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য এটাকে ফরয করা হয়েছে। সুতরাং কিছু লোকের দ্বারা উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেলে অবশিষ্টদের থেকে তা রহিত হয়ে যাবে; যেমন সালাতে যানাযা এবং সালামের উত্তর।

কিন্তু কেউ যদি তা পালন না করে তাহলে সকল মানুষ তা তরক করার কারণে গোনাহগার হবে। কেননা সকলেরই উপর তা ওয়াজিব।

(কেফায়া হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে,) সকলে তাতে নিয়োজিত হওয়ার অর্থ হলো জিহাদের উপকরণ অশ্ব ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া। সুতরাং তা কিফায়া ভিত্তিক ওয়াজিব হবে। তবে যদি ব্যাপকভাবে আহ্বান করা হয় তখন এটা ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেননা, (এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

তোমরা বের হয়ে পড় লঘু রণ সম্ভার সহ কিংবা গুরু রণসম্ভার সহ (৯ঃ৪১)।

জামে ছাগীর কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন, জিহাদ হলো ওয়াজিব ; তবে মুসলমানের জন্য অবকাশ রয়েছে, যতক্ষণ না তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়।

তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ ফরযে কেফায়া হওয়ার ইংগিতবাহী এবং শেষাংশ ব্যাপক আহ্বানের ইংগিতবাহী। কেননা ব্যাপক প্রয়োজনের সময় সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া উদ্দেশ্য হাছিল হবে না। সুতরাং সকলের উপর তা ফরয হবে। **যেহেতু আয়াত ও হাদীস নিঃশর্ত ও**

সাধারণ, সেহেতু কাফিররা সূচনা না করলেও (প্রয়োজন হওয়া মাত্র) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের উপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা বালকরা হলো দয়ার পাত্র। দাস ও স্ত্রীলোকদের উপরও ফরয নয়। কেননা মনিব ও স্বামীর হক অগ্রবর্তী।

অন্ধ, প্রতিবন্দী ও কর্তিত অংগ ব্যক্তির উপরও ফরয নয়। কেননা তারা অক্ষম। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি কোন শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সকলের উপর প্রতিরোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস মনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে পড়বে।

কেননা তখন তা ফরযে আইন হয়ে পড়েছে আর ফরযে আইনের মোকাবেলায় দাসত্ব বন্ধন ও বিবাহ বন্ধন বিবেচিত হবে না। যেমন সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে।

ব্যাপক প্রয়োজনের পূর্ববর্তী অবস্থাটি ভিন্ন। কেননা দাস ও স্ত্রী লোক ছাড়াও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সুতরাং মনিব ও স্বামীর হক বাতিল করার প্রয়োজন নেই।

মুজাহিদদের দেওয়ার জন্য লোকদের নিকট থেকে যুদ্ধ কর নির্ধারণ করা মাকরূহ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের (বায়তুল মালে) 'ফায়'-এর মাল থাকে।

কেননা এটা পারিশ্রমিকের সদৃশ। আর তার প্রয়োজন নেই। কেননা বায়তুল মাল তো মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্যই।

যদি তা না থাকে তাহলে একে অপরকে শক্তি যোগানো দোষণীয় নয়।

কেননা এত বড় ক্ষতি রোধ করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষতি গ্রহণ করা হলো।

এ সিদ্ধান্তের সমর্থক এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ছাফওয়ান থেকে কিছু সংখ্যক বর্ম নিয়েছিলেন। এবং হযরত ওমর (রা) বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে (তার খরচে) অবিবাহিত যুবককে যুদ্ধে পাঠাতেন এবং ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির ঘোড়া যুদ্ধে গমনকারীকে (সাময়িকভাবে) দান করতেন।

পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি

মুসলিম বাহিনী যখন দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করবে তখন তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি দাওয়াত না দিয়ে কোন কাওমের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি।

যদি তারা দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকবে।

কেননা উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

আর যদি তারা সাড়া দানে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে জিযয়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। প্রেরিত বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই আদেশ করেছেন।

তাছাড়া আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী জিযয়া হচ্ছে লড়াই থেকে বিরত থাকার পন্থাসমূহের অন্যতম।

এটা হলো তাদের বেলায়, যাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে মোরতাদ ও আরবের মূর্তিপূজক যাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের বিধান নেই, তাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের আহ্বান জানানোতে কোন ফায়দা নেই। কেননা তাদের থেকে তো ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ্ বলেছেন تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ (ইসলাম গ্রহণকরা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।)

যদি তারা জিযয়া দিতে সম্মত হয় তাহলে মুসলমানদের যাবতীয় সুবিধা তাদের জন্য হবে এবং মুসলমানদের উপর আরোপিত যাবতীয় দায় তাদের উপর হবে।

কেননা, হযরত আলী (রা) বলেছেন, তারা জিযয়া এজন্যই ব্যয় করেছে যে, তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই (নিরাপদ) হয়ে যায় এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই (নিরাপদ) হয়ে যায়।

- মতনে যে 'বদল' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে এ সম্পর্কে যে 'এ'ত' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, এ উভয়টির দ্বারা 'জিয্য়া প্রদান' গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। আল্লাহই অধিক অবগত।

যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি, তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছাড়া লড়াই শুরু করা জায়েয নেই।

কেননা বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের উপদেশ প্রদানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فادعهم إلى شهادة أن لا اله الا الله

তখন আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দাও।

তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমেই তারা জানতে পারবে যে, দীনের বিষয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, সম্পদ লুণ্ঠন ও পরিবার-পরিজনকে দাস বানানোর উদ্দেশ্য নয়। তাতে হয়ত তারা দাওয়াতে সাড়া দিবে। আর আমরাও লড়াইয়ের পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবো।

যদি দাওয়াতের পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে তাহলে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে গোনাহ্গার হবে। তবে কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা প্রাণরক্ষাকারী এখানে অনুপস্থিত, আর তা হলো দীন গ্রহণ কিংবা দারুল ইসলামে আশ্রয় গ্রহণ। সুতরাং অমুসলিম নারী বা শিশুদের হত্যার মত হলো।

আর যাদের কাছে ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌছেছে, তাদেরও দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। অতিরিক্ত সতর্কীকরণ হিসেবে; তবে তা ওয়াজবি নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসতর্ক অবস্থায় বনী মুস্তালিকের উপর হামলা করেছিলেন এবং উসামা (রা) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার। আর অসতর্ক হানা দাওয়াত দিয়ে হয় না।

ইমাম কুদূরী বলেন, যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে।

কেননা সোলায়মান বিন বুরায়দা (রা) সম্পর্কিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তারা দাওয়াত অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে যিযয়া প্রদানের আহ্বান জানাও। এরপর তিনি বলেছেন, যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

আর যেহেতু আল্লাহ্ই তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্যকারী এবং তাঁর শত্রুদের ধ্বংসকারী। সুতরাং সকল বিষয়ে তারই সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। **আর তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (কামান) মোতায়েন করবে।** যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাও পোড়াও চালাবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোয়াইরা অঞ্চল (প্রয়োজনে) জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (বাঁধ ভেংগে বা অন্য উপায়ে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দেবে এবং তাদের বৃক্ষ নিধন করবে এবং তাদের ফসল নষ্ট করবে।

কেননা এসব দ্বারা তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করা হয়, তাদের প্রতিপত্তি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তাদের সংহতি বিচ্ছিন্ন করা হয়। সুতরাং তা বৈধ হবে।

তাদের মাঝে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী থাকলেও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে বাধা নেই। কেননা তীর বর্ষণে ইসলামের কেন্দ্র থেকে প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষতিরোধ করা হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বন্দী ও ব্যবসায়ী নিহত হওয়ায় সীমিত ক্ষতি। তাছাড়া খুব কম দুর্গই কিছুসংখ্যক মুসলমান থেকে খালি হয়। সুতরাং তা বিবেচনা করে যদি বিরত থাকতে হয় তাহলে তো জিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি তারা মুসলিম বালকদের কিংবা বন্দীদের 'ঢাল' রূপে ব্যবহার করে তাহলে (আমাদের বর্ণিত কারণে) তাদের প্রতি তীর বর্ষণ থেকে বিরত থাকবেনা। অবশ্য কাফিরদের প্রতি তীর বর্ষণের নিয়ত করবে। কেননা কার্যতঃ পার্থক্য করা অসম্ভব হলেও উদ্দেশ্যগতভাবে তা সম্ভব। আর আদেশ পালনের দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী। আর ঐ মুসলমানদের যে কজন তাদের তীর বর্ষণের শিকার হবে তাদের দিয়ত মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব হবে না। আর কাফফারারও ওয়াজিব হবে না।

কেননা জিহাদ হলো ফরয, আর ফরয পালনের সাথে 'দন্ড' যুক্ত হতে পারে না। জীবনাশংকাপূর্ণ ক্ষুধার সময় অন্যের মাল গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ক্ষতিপূরণের ভয়ে কেউ তা থেকে বিরত থাকে না। কারণ তাতে নিজের জীবন বাঁচানোর বিষয় রয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদের ভিত্তি হল প্রাণনাশ করার উপর। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুসলিম বাহিনীর সাথে নারীদেরকে এবং কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়ায় বাধা নেই, যদি এমন বড় বাহিনী হয়, যাতে নিরাপত্তার উপর নির্ভর করা যায়। কেননা এক্ষেত্রে নিরাপত্তাই প্রবল, আর যা প্রবল তা সুনিশ্চিতের মত। **কিন্তু নিরাপদ নয় এমন ক্ষুদ্র বাহিনী সাথে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ।**

কেননা এতে তাদের জান ও মান-সম্মান বিনষ্ট করার সম্মুখীন করা হয়। আর কুরআন শরীফকে অসম্মানের মুখে ফেলা হয়। কেননা মুসলমানদের প্রতি ক্রোধবশতঃ তারা কুরআনের অবমাননা করে বসবে। আর এটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত নিষেধ বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা لاتسافروا بالقران فى أرض العدو (শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করোনা।)

পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি নিরাপত্তা নিয়ে তাদের দেশে প্রবেশ করে এবং তারা যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হয়, তাহলে সাথে কোরআন শরীফ বহন করায় কোন দোষ নেই।

কেননা এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করাই স্বাভাবিক।

বড় বাহিনীতে 'বয়স্কা' নারীদের তাদের উপযোগী সেবা কর্মে অংশ নেওয়ার জন্য বের হওয়াতে বাধা নেই। যেমন, রান্না, পানি পান করানো এবং শুশ্রূষা প্রদান। পক্ষান্তরে যুবতীদের ক্ষেত্রে গৃহে অবস্থানই অধিক ফেতনা রোধক।

আর বিনা প্রয়োজনে বয়স্কা নারীরাও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করবে না। কেননা এটা দ্বারা মুসলমানদের দুর্বলতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু সহবাস ও খিদমতের উদ্দেশ্য তাদের সাথে নেওয়া ভালো নয়। যদি একাজে নিতেই চায় তাহলে স্বাধীন নারীদের পরিবর্তে দাসীদের নেয়াই ভালো।

স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া লড়াই করবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে শত্রু যদি কোন শহরের উপর চড়াও হয়; প্রয়াজনের তাগিদে।

মুসলমানদের উচিত তারা যেন বিশ্বাস ভংগ না করে, গনীমতের মাল চুরি না করে এবং লাশ বিকৃত না করে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا

তোমরা গনীতের খেয়ানত করো না, বিশ্বাস ভংগ করো না এবং লাশ বিকৃত করো না। আর অর্থ হল গনীমতের মাল থেকে চুরি করা আর হক খেয়ানত করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করা।

আর উপরোক্ত ঘটনায় লাশ-বিকৃতের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা দ্বারা রহিত। এরূপই বর্ণিত হয়েছে। **আর স্ত্রীলোক বালক, অতিবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অন্ধকে হত্যা করবে না।** কেননা আমাদের মতে লড়াই হচ্ছে হত্যার বৈধতা দানকারী। আর তাদের দ্বারা তো লড়াই হয় না। একারণেই একপাশ যাদের অবশ এবং যাদের ডান হাত কর্তিত এবং যাদের হাত ও পা বিপরীতভাবে কাটা, তাদের হত্যা করা যায় না।

অতিবৃদ্ধ, পঙ্গু ও অন্ধ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তাঁর মতে কুফর হলো হত্যার বৈধতা দানকারী। আমরা যা বর্ণনা করেছি তা-ই হলো এর বিপক্ষে প্রমাণ।

আর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক ও নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং একবার এক নিহত নারীকে দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, আহা, এতো লড়াইকারী ছিল না। তাহলে কেন একে হত্যা করা হলো?

গ্রন্থকার বলেন, তবে এদের কেউ যদি যুদ্ধে বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা হয় কিংবা স্ত্রীলোক যদি 'অধিপতি' হয়।

কেননা তার 'অনিষ্ট' অন্য লোকদের পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। তদ্রূপ এদের কেউ যদি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাদের হত্যা করা হবে। তাছাড়া কারণ এই যে, তাদের পক্ষ থেকে লড়াই মূলতঃ কতলকে বৈধতা দান করে।

আর কোন পাগলকে হত্যা করবে না। কেননা সে শরীয়তের সম্বোধন পাত্র নয়। তবে সে যদি লড়াই করে তাহলে তার অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।

অবশ্য বালক ও পাগলকে যতক্ষণ তারা লড়াইরত থাকে ততক্ষণ শুধু হত্যা করা যাবে। পক্ষান্তরে অন্যদের বন্দী করার পরেও হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা শরীয়তের সম্বোধন তাদের অভিমুখী হওয়ার কারণে সে শাস্তির পাত্র।

যদি কখনো সুস্থ থাকে আবার কখনো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তাহলে সুস্থ অবস্থায় সে সুস্থ ব্যক্তির সমতুল্য। **মুশরিক পিতাকে নিজে অগ্রগামী হয়ে হত্যা করা মাকরূহ হবে।**

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

দুনিয়ার জীবনে সদাচারণের সাথে তাদেরকে সংগ দান কর।

তাছাড়া এজন্য যে, পুত্রের তো কর্তব্য হলো ভরণ পোষণের মাধ্যমে পিতার জীবন রক্ষা করা। সুতরাং তার প্রাণ নাশের নিঃশর্ত অনুমতি প্রদান করা এর পরিপন্থী । যদি সে তাকে সামনে পেয়ে যায় তাহলে নিজে এমনভাবে বাধাগ্রস্ত করতে যাবে, যাতে অন্য কেউ হত্যা করতে পারে। কেননা নিজে গোনাহে লিপ্ত না হয়ে অন্যের দ্বারাই উদ্দেশ্য হাছিল হতে পারে।

আর পিতা যদি তাকে হত্যা করতে এমনভাবে উদ্যত হয় যে, হত্যা করা ছাড়া তাকে রোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে তাকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। কেননা তার উদ্দেশ্য তো হলো আত্মরক্ষা করা। দেখুন না মুসলিম পিতা যদি পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করে আর হত্যা করা ছাড়া যদি তাকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয় তাহলে আমাদের বর্ণিত কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ। সুতরাং এক্ষেত্রে তা আরো উত্তম।

পরিচ্ছেদ ঃ সন্ধিস্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়

শাসক যদি যুদ্ধ-লিপ্ত সম্প্রদায়ের সাথে কিংবা তাদের কোন দলের সাথে সন্ধি করা সংগত মনে করেন এবং এতে মুসলমানদের উপকার থাকে তাহলে সন্ধিতে কোন দোষ নেই।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়ার বছর এ শর্তে মক্কাবাসীদের সংগে সন্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ও তাদের মাঝে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকবে।

তাছাড়া মুসলমানদের জন্য যদি কল্যাণকর হয় তাহলে সন্ধিও গুণগতভাবে জিহাদ। কেননা অনিষ্ট প্রতিরোধের উদ্দেশ্য তা দ্বারা অর্জিত হয়। আর হোদায়বিয়ার ঘটনায় বর্ণিত সময়ের সাথে বিধান বিশিষ্ট হবে না। কেননা অন্তর্গত উদ্দেশ্য অধিকতর সময়ের দিকে সম্প্রসারিত হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি তা কল্যাণকর না হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা তাতে বাহ্যত: ও গুণগত উভয় দিকে থেকেই জিহাদ পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

যদি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা হয় এরপর শাসক সন্ধি রদ্দ করাকেই অধিকতর কল্যাণকর মনে করেন তাহলে তাদের সন্ধি প্রত্যাখ্যানের খবর দিবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শাসক লড়াই শুরু করবেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও মক্কাবাসীদের মাঝে সম্পন্ন সন্ধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাছাড়া এই কারণে যে, কল্যাণের দিক যখন পরিবর্তিত হয়েছে, তখন সন্ধি বর্জনই হবে জিহাদ। পক্ষান্তরে সন্ধি রক্ষা করা হবে ব্যাহত: ও গুণগত উভয় দিক থেকে জিহাদ বর্জন। সুতরাং চুক্তি ভংগ পরিহার করার জন্য সন্ধি প্রত্যাখ্যান অবহিত করা জরুরী হবে। বিশেষতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বলেছেন, وفاء لا غدر (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো, ভংগ করো না)।

আর এতটা সময়কাল বিবেচনা করা অপরিহার্য, যাতে তাদের মূল দলের কাছে সন্ধি বর্জনের খবর পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে এই পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়া যথেষ্ট যাতে তাদের শাসক সন্ধি বর্জনের খবর অবগত হওয়ার পর তার রাজ্যের বিভিন্ন দিকে খবর পৌঁছে দিতে পারে। কেননা এর দ্বারা চুক্তি ভংগের অভিযোগ আসবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি তারাই বিশ্বাস ভংগ করে বসে এবং তা তাদের মূল নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে শাসক সন্ধি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন। কেননা তারাই চুক্তি ভংগকারী হয়েছে। সুতরাং আমাদের তা ভংগ করার প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে যদি তাদের বিচ্ছিন্ন কোন দল অনুপ্রবেশ করে রাহাজানি করে এবং তাদের পর্যাপ্ত শক্তিবল না তাকে তাহলে এটাকে চুক্তি ভংগ ধরা হবে না। আর যদি তাদের শক্তিবল থাকে এবং তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে চুক্তিভংগ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। কেননা এটা তাদের শাসকের বিনা অনুমতিতে হয়েছে। সুতরাং তাদের পদক্ষেপের দায় অন্যদের উপর আরোপিত হবে না। অবশ্য যদি এটা তাদের শাসকের সম্মতিতে ঘটে থাকে তাহলে সমগ্র সম্প্রদায় চুক্তি ভংগকারী হবে। কেননা গুণগতভাবে এটা তাদের সবার সম্মতিক্রমেই ঘটেছে।

শাসক যদি যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের সাথে আর্থিক সুবিধা গ্রহণপূর্বক সন্ধি করা কল্যাণকর মনে করেন তাহলে এতে কোন দোষ নেই। কেননা যখন অর্থ ছাড়া সন্ধি করা জায়েয রয়েছে, তবে অর্থের বিনিময়েও জায়িয হবে।

তবে এটা তখনই জায়েয হবে যখন মুসলমানদের অর্থের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু যদি প্রয়োজন না থাকে তবে তা জায়েয নয়। কারণ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি (যে, উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র দীনকে বুলন্দ করা, সম্পদ লাভ করা নয়)।

আর গৃহীত অর্থ জিযয়ার খাতে ব্যয় করা হবে। অবশ্য এটা তখন যখন তারা যুদ্ধের মাঠে অবতীর্ণ না হয়ে দূত মারফত অর্থ প্রেরণ করে। কেননা এটা জিযয়ার সমার্থক।

পক্ষান্তরে যদি মুসলিম বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে অতঃপর অর্থগ্রহণপূর্বক সন্ধি করে, তাহলে তা গনীমতের মাল হবে। এবং পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালের জন্য) রেখে অবশিষ্ট মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা হবে। কেননা গুণগতভাবে এটা বলপূর্বক লব্ধ।

আর মোরতাদদের সংগে শাসক তাদেরকে নিজেদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় পর্যন্ত সন্ধি করতে পারেন। কেননা তাদের পুনঃইসলাম গ্রহণ প্রত্যাশিত। সুতরাং তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বিলম্বিত করা বৈধ।

তবে এর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করবেনা। কেননা তাদের থেকে হিযয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন নয়। এর কারণ আমরা (জিযয়া অধ্যায়ে) বর্ণনা করবো।

আর যদি অর্থ গ্রহণ করে ফেলে, তবে তা ফেরত দেয়া হবে না। কেননা এ সম্পদ নিরাপত্তাগুণ রহিত।

আর যদি শত্রুবাহিনী মুসলমানদের অবরোধ করে এবং মুসলমানগণ তাদের পক্ষ থেকে অর্থ পরিশোধ করার শর্তে সন্ধি দাবী করে তাহলে শাসক তা করবেনা। কেননা এটা হলো মুক্তিপণ প্রদান এবং মুসলিম উম্মাহ্‌কে লাঞ্ছিত করণের নামান্তর। অবশ্য ধ্বংস হওয়ার আশংকা হলে ভিন্ন কথা। কেননা সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে ধ্বংস রোধ করা অপরিহার্য।

হরবী কাফিরদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা উচিত নয়। এবং তাদের দিকে যেন যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরবী কাফিরদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে এবং তাদের কাছে অস্ত্র নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, এতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের শক্তি যোগানো হয়। সুতরাং তা নিষেধ করা হবে।

আমাদের বর্ণিত একই কারণে ঘোড়া সম্পর্কেও একই হুকুম। তদ্রূপ লৌহ। কেননা তা হলো অস্ত্রের মূল উপাদান। সন্ধির পরও তা একইভাবে নিষিদ্ধ হবে। কেননা সন্ধিতো ভঙ্গ হওয়ার কিংবা সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্মুখীন। সুতরাং তারা আমাদের ক্ষতি করতে পারে।

খাদ্যবস্ত্র সম্পর্কে এটাই হল কিয়াসের দাবী। তবে এর বৈধতা আমরা হাদীসের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামাহ (রা) কে মক্কা বাসীকে খাদ্য সরবরাহের আদেশ করেছিলেন অথচ তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ

কোন স্বাধীন মুসলিম নর বা নারী যদি কোন কাফিরকে কিংবা কোন দলকে কিংবা কোন দুর্গে অবস্থানকারীদের কিংবা কোন শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে তাদের নিরাপত্তা দান বৈধ হবে। তখন মুসলমানদের কারো পক্ষেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার থাকবে না।

এক্ষেত্রে মূল দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم

মুসলমানদের সকলের রক্ত সমান এবং তাদের 'আদনা' ব্যক্তিও তাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করতে পারে।

এখানে 'আদনা' অর্থ সংখ্যায় আদনা, অর্থাৎ একজন মাত্র ব্যক্তি।

তাছাড়া এই কারণে যে, সে শক্তি-বলের অধিকারী এবং যুদ্ধক্ষম হওয়ার কারণে শত্রুরা তাকে ভয় করবে। সুতরাং তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রদান সাব্যস্ত হতে পারে। কারণ তা যথা স্থানের (অর্থাৎ উভয়ের পাত্রের) সাথে যুক্ত হয়েছে। অতঃপর তা তার থেকে অন্যদের দিকে সম্প্রসারিত হবে। কেননা নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার লাভের কারণ, অর্থাৎ ঈমান তা বিভাজ্য নয়। সুতরাং নিরাপত্তা প্রদানও বিভাজ্য হবে না। সুতরাং তা পূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন বিবাহ প্রদানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে।

গ্রন্থকার বলেন, তবে যদি তাতে মুসলমানের জন্য অনিষ্ট থাকে তাহলে তা তাদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে ফেলা হবে। যেমন শাসক যদি স্বয়ং নিরপত্তা প্রদান করেন অতঃপর তা প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে মনে করেন। বিষয়টি আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

আর শাসক যদি কোন দুর্গ অবরোধ করেন, আর বাহিনীর কোন একজন নিরাপত্তা প্রদান করে অথচ তাতে অনিষ্ট রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ইমাম আমাদের বর্ণিত কারণে প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং নিজের এবং নিজের মতে আগে বাড়ার কারণে তাকে শাসন করবেন। তবে তাতে কল্যাণ থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা হয়ত বিলম্বের কারণে কল্যাণ হাত ছাড়া হয়ে যেতো। তাই তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে।

কোন যিম্মীর নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়। কেননা সে তাদের ব্যাপারে তোহমতের পাত্র। তদুপরি মুসলমানদের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই।

গ্রন্থকার বলেন, তদ্রূপ কোন বন্দীর কিংবা তাদের এলাকায় গমনকারী কোন ব্যবসায়ীর অধিকার নেই। কেননা তারা উভয়ে তাদের কর্তৃত্বাধীনে অসহায়। সুতরাং তাদের তারা ভয় পাবে না, অথচ নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি ভীতিপ্রদ লোকের সাথে বিশিষ্ট।

তাছাড়া তাদের নিরাপত্তা দানে বাধ্য করা হতে পারে। ফলে নিরাপত্তা প্রদান কল্যাণ বিযুক্ত হবে। আর এ জন্য যে, যখনই তাদের অবস্থা গুরুতর হবে তখনই তারা কোন বন্দী বা ব্যবসায়ীকে হাতে পেয়ে তার প্রদত্ত নিরাপত্তা দ্বারা রেহাই পেয়ে যাবে। ফলে আমাদের জন্য যুদ্ধ জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হবে না। **কেউ যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাদের দারুল ইসলামে হিজরত না করে তাহলে তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে না।** কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে কর্ম স্বাধীনতা রহিত দাসের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়, কিন্তু যদি মনিব তাকে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার নিরাপত্তা দান সহীহ হবে।

এটাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী (র) এর সঙ্গে একমত আর অন্য বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (র) এর সঙ্গে একমত।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী- أمان العبد أمان (দাসের নিরাপত্তা প্রদানও নিরাপত্তা) আবূ মূসা আশা'আরী (র)-এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এই কারণে যে, সে শক্তি বলের অধিকারী মু'মিন। সুতরাং তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে। তিনি তাকে লড়াইয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের এবং স্থায়ী নিরাপত্তার[১] উপর কিয়াস করেন। (নিরাপত্তা প্রদানের জন্য) ঈমানের শর্ত আরোপের কারণ এই যে, ইবাদতের জন্য তা শর্ত এবং জিহাদ একটি ইবাদত। আর শক্তি বলের অধিকারী হওয়া শর্ত এজন্য যে, তা দ্বারা ভয় বিদূরীত হওয়া সাব্যস্ত হয়।

উভয় প্রকার গোলামের মাঝে যোগসূত্র হলো দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানদের জামাতের অনুকূলে স্বার্থ রক্ষা করা। কেননা কথা তো এধরনের ক্ষেত্রেই হচ্ছে।

তবে তার আগ বেড়ে জিহাদে যেতে না পারার কারণ হলো তাতে মনিবের স্বার্থ নষ্ট হয়। পক্ষান্তরে শুধু কথা দেওয়ায় স্বার্থ নষ্ট হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, যেহেতু সে লড়াই থেকে নিষেধকৃত, সেহেতু তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়, কেননা তারা তো তাকে ভয় পাবে না। সুতরাং নিরাপত্তা প্রদান যথা স্থানে যুক্ত হয়নি। লড়াইয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার প্রতি ভীতি সাব্যস্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় দলীল এই যে, সে আগ বেড়ে জিহাদ করতে না পারার কারণ এই যে, এটা মনিবের অধিকারে এমন হস্তক্ষেপ, যা তার বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। আর নিরাপত্তা প্রদানও এক প্রকার যুদ্ধ আর তাতে আমাদের উল্লেখিত (মনিবের ক্ষতির) দিকটি রয়েছে। কেননা সে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তাতে গনীমত লাভের পথ রুদ্ধ হয়।

অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মনিব তো তাতে সম্মত হয়েছে। আর যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের কারণে তার ভুল করার সম্ভাবনা কম।

স্থায়ী নিরাপত্তার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটা হলো ইসলাম গ্রহণের স্থলবর্তী। সুতরাং তা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদানের সমতুল্য। তাছাড়া এটা যিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আর তাদের পক্ষ থেকে যিম্মী চুক্তি প্রার্থনা করার পর শাসকের জন্য তা মঞ্জুর করা ফরয হয়ে পড়ে। আর ফরয দায়িত্ব আদায় করে দেওয়া কল্যাণজনক। সুতরাং উভয় প্রকার গোলামের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেলো।

বালক যদি বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন না হয় তাহলে তার নিরাপত্তা দান বৈধ হবে না। যেমন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আর যদি বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন হয় কিন্তু লড়াই থেকে নিষেধকৃত হয়, তাহলে তা একই মতপার্থক্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে লড়াইয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হলে বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে সর্বসম্মতিক্রমে তা বৈধ হবে।

১। অর্থাৎ হারবী যদি কোন গোলামের সাথে যিম্মী চুক্তি করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হয় এবং যিম্মী হওয়ার সুবাদে সে স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করে।

باب الغنائم وقسمتها

পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল ও তা বন্টন

পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল ও তা বন্টন

শাসক যদি কোন শহর বলপূর্বক জয় করেন তাহলে তার এখতিয়ার রয়েছে, যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের ক্ষেত্রে করেছেন। আর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে শহরের অধিবাসীদেরকেই সেখানে বহাল রাখতে পারেন। তখন তাদের উপর জিযয়া এবং তাদের ভূমির উপর খারাজ নির্ধারণ করবেন।

ইরাকের ক্ষেত্রে সাহাবা কেরামের সম্মতিক্রমে ওমর (রা) এরূপই করেছিলেন এবং যিনি এর বিপক্ষমত প্রকাশ করেছিলেন, তাকে প্রশংসার চোখে দেখা হয়নি। বস্তুত: উভয় পদক্ষেপেই আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে। তাই এখতিয়ার প্রদান করা হবে।

কারো কারো মতে বিজয়ী মুসলমানদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি উত্তম; পক্ষান্তরে প্রয়োজন না থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় পদক্ষেপটি উত্তম, যাতে পরবর্তীকালের জন্য তা সঞ্চয় হিসেবে থাকে।

(বহাল রাখার) এ সিদ্ধান্ত হলো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে 'স্বতন্ত্র'[1] অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, সেগুলো তাদেরকে ফেরত দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বৈধ নয়। কেননা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত শরীয়তে বর্ণিত হয়নি।

আর স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

কেননা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার অর্থ মুজাহিদদের হক বাতিল করা কিংবা তাদের মালিকানা বাতিল করা। সুতরাং সমতুল্য বিনিময় গ্রহণ ছাড়া অনুগ্রহ প্রদর্শন বৈধ হবে না। আর কতলের পরিবর্তে খারাজ সাব্যস্ত করা ঐ ভূমির সমতুল্য বিনিময় নয়।

মানুষের উপর মালিকানার বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ শাসক তাদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বন্টন ও করতে পারেন আবার অনুগ্রহ বশত: ছেড়েও দিতে পারেন।) কেননা ইমামের তো অধিকার রয়েছে তাদের হত্যা করার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মুজাহিদদের হক বাতিল করে দেয়ার।

তাঁর বিপক্ষে আমাদের প্রমাণ হল আমরা ওমর (রা) এর যে পদক্ষেপের কথা বর্ণনা করেছি। তা ছাড়া এই কারণে যে, তাতে কল্যাণ রয়েছে। কেননা তারা কৃষিকাজে অভিজ্ঞ কৃষক হিসাবে মুসলমানদের হয়ে কাজ করবে। আবার চাষ-বাসের খরচের ভারও মুসলমানদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। তদুপরি পরবর্তীতে যারা আসবে তারা এর সুফল ভোগ করতে পারেন। আর বর্তমান হিসাবে খারাজ যদিও পরিমাণে কম; কিন্তু স্থায়ী হিসাবে তার পরবর্তী পরিমাণ অধিক।

১। অর্থাৎ ইমাম যদি ভালো মনে করেন তাহলে ভূমির সাথে ভূমির অনুপাতী হিসাবে প্রয়োজনীয় অস্থাবর জিনিস দান করতে পারেন। কিন্তু আলাদা অস্থাবর সম্পদ অনুগ্রহ হিসাবে দান করতে পারেন না।

শাসক যদি তাদের আযাদ করে এবং ভূমিদান করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহলে তাদেরকে এই পরিমাণ অস্থাবর সম্পদও দান করবেন, যাতে (ভূমি চাষবাস ও জীবন ধারণের) কাজ চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। যাতে বিষয়টি মাকরূহের সীমা থেকে বহির্ভূত হয়।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বন্দীদের ব্যাপারে শাসকের এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন বন্দীকে হত্যা করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, তাতে ফাসাদের উপাদান নিশ্চিহ্ন করা হয়।

আবার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের দাস বানাতে পারেন।

কেননা তাতে মুসলমান উপকার অর্জনসহ তাদের দুষ্কর্ম মথিত হয়।

আবার ইচ্ছা করলে তাদের স্বাধীন রূপে ছেড়ে দিতে পারেন, মুসলমানদের যিম্মী হিসাবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি (যে, হযরত ওমর তা করেছেন।)

কিন্তু অপর মুশরিকদের এবং মোরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন।

বিষয়টি ইনশাআল্লাহ্ (জিযয়া পরিচ্ছেদে) আমরা বর্ণনা করবো।

তবে এ বন্দীদেরকে দারুল হরবে ফেরত পাঠানো জায়েয নয়।

কেননা তাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। **তবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হত্যা করবে না।** কারণ হত্যা ছাড়াই তাদের দুষ্কর্ম বিদুরীত হয়ে গেলো।

আর তিনি তাদের দাসও বানাতে পারেন। যাতে মালিকানার কারণ বিদ্যমান হওয়ার পর পুর্ণরূপে উপকার অর্জিত হয়। অবশ্য বন্দী করার পূর্বে তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে মালিকানার কারণ সংঘটিত হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। সাহেবায়ন বলেন, তাদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের গ্রহণ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) এরও এ'মত। কেননা এতে মুসলমান ছাড়া পাচ্ছে আর তা কাফিরকে হত্যা করা কিংবা (দাসরূপে) তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেয়ে উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, এতে কাফেরদের সাহায্য করা হয়। কেননা সে আমাদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা হয়ে ফিরে আসবে। আর তার লড়াইয়ের ক্ষতিরোধ করা মুসলিম বন্দীকে রক্ষার চেয়ে উত্তম। কেননা সে যদি তাদের হাতে বন্দী থেকে যায় তাহলে তার দিক থেকে এটা হবে একটা পরীক্ষা, যার দায় দায়িত্ব আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কিন্তু তাদের বন্দীকে তাদের হাতে অর্পণের দ্বারা সাহায্য করার দায়-দায়িত্ব আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

পক্ষান্তরে তাদের থেকে মুক্তিপণের অর্থ গ্রহণ করা আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে জায়েয নেই। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি (যে, এতে তাদেরকে শক্তি যোগানো

১। অর্থাৎ যদি তাদেরকে আযাদ করে ভূমি দান করা হয় আর তাদের স্ত্রী সন্তান ও যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয় তাহলে জায়েয হলেও মাকরূহ হবে। কেননা এতে তাদের পক্ষে জীবন ধারণ ও কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং মাকরূহ এর সীমা পরিহার করার জন্য ঐ পরিমাণ সম্পদ তাদেরকে দেয়া উচিত।

হয়।) তবে বদরের বন্দীদের উপর কিয়াস করে সিয়ারে কাবীর কিতাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তাদের মুক্তিপণ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই।

আর যদি বন্দীরা আমাদের হাতে থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের হাতে বন্দী কোন মুসলমানের বিনিময়ে তাকে মুক্তিপণরূপে ফেরত দেয়া হবে না। কেননা এতে কোন উপকার লাভ হবে না। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয় এবং সে তার ইসলাম রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করা (এবং দাস না বানিয়ে কিংবা যিম্মী না করে কিংবা হত্যা না করে তাদের এমনি ছেড়ে দেয়া) **জায়েয নেই।**

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে কোন কোন বন্দীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো।)

তাছাড়া এই কারণে যে, বন্দী করে হাতের মুঠোয় আনার মাধ্যমে তাকে দাস বানানোর হক সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কোন লাভ ও বিনিময় ছাড়া উক্ত হক রহিত করা জায়েয হবে না। আর তাঁর বর্ণিত হাদীস আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।

(দারুল হরব থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় ইমামের সাথে যদি পশুপাল থাকে আর তিনি তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসতে সক্ষম না হন তাহলে সেগুলো জবাই করে জ্বালিয়ে ফেলবেন। আর এ সকল পশুর হাত পা কাটবেনা কিংবা এমনি ছেড়ে দেবেনা।

কর্তন করবেন না এবং ফেলেও আসবেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র) ফেলে আসার কথা বলেছেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া বকরী জবাই করতে নিষেধ করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, কোন সৎ উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা জায়েয আছে। আর শত্রুর শক্তি খর্ব করার চেয়ে অধিক সৎ উদ্দেশ্য কিছুই হতে পারে না। অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, যাতে কাফেরদের তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ না থাকে। সুতরাং তা বাড়ী ঘর নষ্ট করে দেওয়ার মতই হলো।

জবাই করার পূর্বে পোড়ানোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (হাদীসে) তা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ হাত-পা কর্তনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো মুছলাহ (বা দেহের বিকৃতি সাধন)।

অস্ত্র শস্ত্রও জ্বালিয়ে (নষ্ট করে) ফেলা হবে। আর যা জ্বালানো সম্ভব নয়, তা কাফেররা খোঁজ পাবে না, এমন স্থানে পুঁতে ফেলা হবে। উদ্দেশ্য হলো তাদের ফায়দা গ্রহণের সুযোগ নষ্ট করা।

দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বে দারুল হরবে গনীমতের মাল বণ্টন করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাতে কোন দোষ নেই।

বিষয়টির মূল ভিত্তি এই যে, আমাদের মতে দারুল ইসলামের সীমানায় এনে সংরক্ষণের পূর্বে মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে সাব্যস্ত হয়ে যায়। এই মূল ভিত্তিতে কয়েকটি মাসআলা অহরিত হয়, যা আমরা 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে উল্লেখ করেছি।

তাঁর দলীল এই যে, মালিকানার কারণ হলো মোবাহ মালে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যেমন শিকারের পশু-পাখীর ক্ষেত্রে। আর দখল প্রতিষ্ঠার অর্থ কজা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তা তো (দারুল হরবেই) সম্পন্ন হয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল হরবে গনীমতের মাল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়েও (আমাদের ও তাঁর মাঝে) মত ভিন্নতা রয়েছে। আর গুণগতভাবে বণ্টনও বিক্রির সমার্থক। সুতরাং সেটাও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্গত হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, দখল প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো রক্ষা ও স্থানান্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর দ্বিতীয়টি এখানে অবিদ্যমান। কেননা তাদের পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা রয়েছে। আর (তাদের সীমানায় অবস্থান পর্যন্ত) সেটা হওয়াই স্বাভাবিক।

আর কেউ কেউ বলেছেন, মত ভিন্নতার ক্ষেত্র এই যে, শাসক যদি নিজস্ব ইজতিহাদ ছাড়া বণ্টন করেন তাহলে এই বণ্টনের উপর মালিকানার যাবতীয় আহকাম প্রযুক্ত হবে কিনা। কেননা মালিকানার আহকাম তো মালিকানা ছাড়া সাব্যস্ত হতে পারে না।

কোন কোন মতে (আমাদের মাযহাব মতে) নিষেধের অর্থ (জায়েয না হওয়া নয়; বরং) মাকরূহ হওয়া এবং ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে এটা মাকরূহে তানযীহী। কেননা তিনি বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে দারুল হরবে বণ্টন করা জায়েয নয়। আর ইমাম মুহম্মদ এর মতে দারুল ইসলামে বণ্টন করা উত্তম।

মকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, সর্তকতার দাবী হিসাবে অবৈধতার দলীল অগ্রাধিকার যোগ্য। কিন্তু (সর্বসম্মতিক্রমে বিশেষ বিবেচনায়) বৈধতা রহিত করণ থেকে বিরত থাকা হয়েছে। সুতরাং কারাহাত সাব্যস্তকরণ থেকে বিরত থাকা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাহিনীতে সাহায্যকারী এবং মূল লড়াইকারী উভয়ে (গনীমতের ব্যাপারে) সমান (হকদার)।

কেননা গনীমতের হকদার হওয়ার হেতুর ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। আর তা হলো (আমাদের মতে লড়াইয়ের নিয়তে) সীমান্ত অতিক্রম করা কিংবা ইমাম (শাফেয়ী (র)-এর মতে) যুদ্ধে উপস্থিত থাকা। যেমন আলোচিত হয়েছে।

তদ্রূপ সমান হকদার হবে যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে লড়াইতে অংশ গ্রহণ না করে। কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

গনীমতের মাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বেই সাহায্যকারী দল যদি দারুল হরবে তাদের সাথে গিয়ে যুক্ত হয় তাহলে তারাও গনীমতের অংশীদার হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। লড়াই শেষ হওয়ার পর এই মতভিন্নতার ভিত্তি সেই নীতির উপর, যা আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করে এসেছি।

আর আমাদের মতে দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করা দ্বারা কিংবা দারুল হরবে ইমাম কর্তৃক বণ্টন করা দ্বারা কিংবা তথায় গনীমতের মালগুলো বিক্রি করার দ্বারা অংশীদার হওয়ার হক রহিত হয়ে যায়। কেননা এই তিনটির যে কোন একটি দ্বারা মালিকানা সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে সাহায্যকারী দলের অংশীদারিত্বের হক রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গনীমতের মালে সেনাবাহিনীর জন্য যারা বাজার বসায় তাদের কোন হক নেই, তবে যদি তারা লড়াইয়ে শরীক হয় তা ভিন্ন কথা।

ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি মতে তিনি বলেন, তাদের জন্যও হিসসা নির্ধারণ করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

الغنيمة لمن شهد الوقعة।

(গনীমত তাদের জন্য, যারা ঘটনায় রয়েছে)

আর এই কারণে যে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে গুণগতভাবে তারাও জিহাদে শামিল রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, লড়াইয়ের নিয়তে সীমান্ত অতিক্রম পাওয়া যায়নি। ফলে (গনীমতের হকদারির) প্রকাশিত কারণটি অবিদ্যমান হয়েছে। সুতরাং (তাদের ব্যাপারে)। কারণ অর্থাৎ লড়াইয়ের বিষয়টিই বিবেচিত হবে। আর লড়াইয়ের সময় নিজের অবস্থা হিসেবে অশ্বারোহীর কিংবা পদাতিকের হিসসার হকদার হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বর্ণিত হাদীসটি ওমর (রা) এর উপর মাওকূফ কিংবা তার ব্যাখ্যা এই যে, লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধের ঘটনায় উপস্থিত হবে।

ইমামের নিকট যদি গনীমতের মাল বহন করে আনার মত বাহন না থাকে তাহলে তিনি আমানত হিসাবে যোদ্ধাদের মাঝে তা বণ্টন করে দেবেন, যাতে তারা সেগুলো দারুল ইসলাম পর্যন্ত বহন করে আনে। অতঃপর তাদের থেকে ফেরত নিয়ে (নিয়ম মাফিক) বণ্ট করবেন।

হেদায়া গ্রন্থার বলেন, ইমাম কুদূরী এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের সম্মতির শর্ত আরোপ করেননি। সিয়ারে কাবীরের বর্ণনাও তাই।

এ বিষয়ে মৌলিক কথা এই যে, গনীমতের মালের মধ্যেই যদি বাহন থেকে থাকে তাহলে ইমাম তাতেই গনীমতের মাল বহন করবেন। কেননা বাহন এবং বাহিত দ্রব্য সবই মুসলমানদের। তদ্রূপ যদি বাইতুল মালে অতিরিক্ত বাহন থাকে। কেননা সেগুলোও মুসলমানদের মাল।

পক্ষান্তরে যদি মুজাহিদদের কিংবা তাদের একাংশের বাহন থেকে থাকে তাহলে সিয়ারে ছাগীর কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের বাধ্য করা যাবে না। কেননা এটা হচ্ছে নতুন ভাবে ভাড়া নেওয়া। (যা সম্মতি সাপেক্ষ) সুতরাং তা এমন হয়ে গেল, যেমন যদি মরুভূমিতে বাহন হালাক হয়ে যায়, আর তার সফর সংগীর সাথে অতিরিক্ত বাহন থাকে। কিন্তু সিয়ারে কাবীরের বর্ণনা মতে তাদের বাধ্য করা হবে। কেননা এটা হলো ব্যক্তিগত ক্ষতি বরদাশত করার মাধ্যমে সমষ্টিগত ক্ষতি রোধ করা।

বণ্টনের পূর্বে দারুল হরবে গনীমতের মাল বিক্রি করা জায়েয নয়।

কেননা এর পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) এর ভিন্নমত রয়েছে। আর আমরা এর নীতি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

দারুল হরবে গনীমত লাভ কারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মারা যায় গনীমতের মালে তার কোন হক নেই। কিন্তু দারুল ইসলামে গনীমত নিয়ে আসার পর যে মারা যায় তার হিসসা তার ওয়ারিছরা পাবে।

কেননা মালিকানাভুক্ত জিনিসে মীরাছ জারী হয়। আর দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পূর্বে মালিকানা অর্জিত হয় না। বরং তার পরে মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পরাজয় সুস্থির হওয়ার পর যে মুজাহিদ মারা যাবে, তার হিসসার মাঝে মীরাছ জারী হবে। কেননা তাঁর মতে তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা আমরা পূর্ব বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বাহিনী দারুল হরবে পশুকে চারা-দানা খাওয়াতে পারে এবং খাদ্য দ্রব্য পেলে তা থেকে নিজেও খেতে পারে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী বিষয়টি নিঃশর্ত রেখেছেন, প্রয়োজনের শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করেননি। কিন্তু ইমাম মুহম্মদ (র) একটি বর্ণনায় শর্তযুক্ত করেছেন আবার অন্য বর্ননায় শর্তযুক্ত করেননি। প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, এতে সকল গনীমত লাভ কারীদের মধ্যে শরীকানা রয়েছে। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না। যেমন বস্ত্র ও বাহনের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল হলো খায়বারে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান كلوها واعلفوها ولاتحملوها (এগুলো তোমরা খেতে পারো পশুকে খাওয়াতে পারো কিন্তু বহন করে নিয়ে যাবে না।)

আর যুক্তিগত এই কারণে যে, বিধান প্রয়োজনের প্রমাণের উপর আবর্তিত হয়। আর প্রয়োজনের প্রমাণ হলো দারুল হরবে তার উপস্থিতি। কেননা সাধারণতঃ মুজাহিদ দারুল হরবে তার অবস্থানের পূর্ণ মেয়াদের জন্য নিজের খাবার এবং পশুর চারা সাথে নিয়ে যায় না। আর রসদ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মূল বৈধতার উপরই হুকুম বিদ্যমান থাকবে।

অস্ত্রের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুজাহিদ এগুলো সাথে নিয়ে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণ অনুপস্থিত। তবে এক্ষেত্রেও কখনো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচ্য হবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করে প্রয়োজন শেষে আবার গনীমতের ভান্ডারে ফেরত দেবে। আর বাহন অস্ত্রের অনুরূপ। খাদ্যদ্রব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রুটি, গোশত এবং তাতে ব্যবহৃত ঘি তৈল।

ইমাম কুদূরী বলেন, জ্বালানী কাষ্ঠ ব্যবহার করতে পারবে। কোন কোন অনুলিপিতে حطب (কাষ্ঠ) এর পরিবর্তে طيب (খুশবু) উল্লিখিত হয়েছে।

আর তেল ব্যবহার করতে পারবে এবং তা দ্বারা বাহনকে মালিশ করতে পারবে।

কেননা এ সবের প্রয়োজন দেখা দেয়। **আর প্রাপ্ত অস্ত্র দ্বারা লড়াই করতে পারবে এবং এ সবই বন্টন ছাড়া।**

আর এর ব্যাখ্যা এই যে, যদি এতে তার প্রয়োজন হয় যেমন, তার অস্ত্র নেই। আমরা এর কারণ বর্ণনা করে এসেছি। **এসবের কোন কিছু বিক্রি করা জায়েয হবে না। এবং এগুলোকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারবে না।**

কেননা বিক্রি মালিকানার উপর নির্ভরশীল হয়। আর আমাদের পূর্ব বিবরণ অনুযায়ী এগুলোতে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বরং ব্যবহারের বৈধতা দান করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মত হলো, যার জন্য (মালিকের পক্ষ থেকে) খাবার বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

কুদূরীর ব্যবহৃত শব্দ لَا يَتَمَوَّلُونَ (এগুলোকে সম্পদে পরিণত করা যাবে না) এর দ্বারা এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়েও এগুলো বিক্রি করতে পারবে না। কেননা তা করার প্রয়োজন নেই। যোদ্ধাদের কেউ যদি তা বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য গনীমতের মালে জমা দিতে হবে। কেননা এই মূল্য হচ্ছে এমন বস্তুর বদল যার মালিকানা ছিলো সমগ্র জামাতের।

আর বস্ত্র ও অন্যান্য আসবাব বন্টনের পূর্বে বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা মাকরূহ সবার অংশীদারিত্বের কারণে। অবশ্য বস্ত্র, বাহন এবং অন্যান্য আসবাব ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে শাসক দারুল হরবেই তাদের মাঝে তা বন্টন করে দেবেন। কেননা প্রয়োজনের জন্য হারাম জিনিসও মোবাহ হয়ে যায়। সুতরাং মাকরূহ মোবাহ হওয়া আরো স্বাভাবিক।

এর কারণ এই যে, সাহায্যকারী দলের (আগমন এবং উক্ত মালে তাদের) হক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি সম্ভাবনাভুক্ত। পক্ষান্তরে এদের প্রয়োজন হলো সুনিশ্চিত। সুতরাং এটাই অধিক বিবেচনা যোগ্য।

অস্ত্র বন্টনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র ও বস্ত্রের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা কারো প্রয়োজন হয়ে পড়লে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা জায়েয রয়েছে; সুতরাং যদি সবারই প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই বন্টন করা হবে। পক্ষান্তরে দাসদাসীর প্রয়োজন দেখা দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। সেগুলো বন্টন করা হবে না। কেননা এসবের প্রয়োজন হলো মৌলিক প্রয়োজন থেকে ভিন্ন।

ইমাম কুদূরী বলেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে অর্থাৎ দারুল হরবের মধ্যে, সে তার ইসলাম দ্বারা নিজেকে নিরাপদ করে নিলো।

কেননা ইসলাম গ্রহণ প্রাথমিক দাসত্বের পরিপন্থী। এবং তার ছোট সন্তানদিগকেও নিরাপদ করে নিলো। কেননা তার ইসলাম গ্রহণের কারণে অনুগামী হিসাবে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য।

আর তার সে সমস্ত ধন-সম্পদ নিরাপদ করে নিলো, যা তার কব্জায় রয়েছে।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ (যে ব্যক্তি কোন মাল নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে সে মাল তারই হবে।)

তাছাড়া এই কারণে যে, এ মালের উপর তার কব্জা বিজয়ীদের বিজয়গত কবজা থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে।

কিংবা কোন মুসলমান বা যিম্মীর হাতে আমানত স্বরূপ রক্ষিত মালকেও সে নিরাপদ করে নিলো।

কেননা তা বৈধ ও সম্মানযোগ্য হস্তে রয়েছে। আর আমানত রক্ষাকারীর হস্ত তারই হস্ত সমতুল্য[১]।

যদি আমরা দারুল হরবে জয়লাভ করি তাহলে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি গনীমত রূপে গণ্য হবে।

১। বৈধ হস্ত দ্বারা গছব ও হরণকারীর কবজার বাদ দেয়া হয়েছে এবং সম্মানযোগ্য দ্বারা হারবীর কবজা বাদ দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের কবজায় থাকলে তা গনীমত রূপে গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সেটা তারই থাকবে। কেননা তার কবজায় রয়েছে। সুতরাং তা অস্থাবর সম্পদের মতই হলো।

আমাদের দলীল এই যে, উক্ত ভূসম্পদ দেশের অধিবাসীদের এবং দেশের শাসকের কবজায় রয়েছে। কেননা তা দারুল হরবের সমগ্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তা তার কবজায় নেই।

কেউ কেউ বলেন, এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর পরবর্তী মত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর প্রথম মত অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অন্যান্য সম্পদের ন্যায়।

এর ভিত্তি এই যে, শায়খায়নের মতে স্থাবর সম্পদে প্রকৃত কব্জা সাব্যস্ত হয় না। আর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে তা সাব্যস্ত হয়। **আর তার স্ত্রী গনীমতের মাল রূপে গণ্য হবে।**

কেননা সে কাফের হারবী রমণী। ইসলামের ক্ষেত্রে সে স্বামীর অনুগামিনী নয়।

ঐ স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান গনীমত রূপে গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় গর্ভস্থ সন্তানও অনুগামী রূপে মুসলমান বিবেচিত হবে।

আমাদের দলীল এই, গর্ভস্থ সন্তান স্ত্রীরই অংশ। তার দাসত্বের কারণে সেও দাস রূপে গণ্য হবে।

আর মুসলিম অন্যের অনুগামী হিসাবে মালিকানার পাত্র হতে পারে[১]। ভূমিষ্ঠ সন্তানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অংশত্ব বিদ্যমান না থাকার কারণে সে স্বাধীন হয়ে যায়।

তার সাবালক সন্তানরা গনীমতের মাল রূপে গণ্য। কেননা তারা কাফের হারবী আর (সাবালকরা) অনুগামী হয় না। **তার গোলামদের মধ্যে যারা লড়াই করেছে তারা গনীমতের মাল হবে।**

কেননা মনিবের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তারা তার কবজা থেকে বের হয়ে গেছে। ফলে দারুল হরবের অধিবাসীদের অনুগামী হয়ে পড়েছে।

কোন হারবীর হাতে তার যে মাল রয়েছে তা গনীমতের মাল হবে। গছবকৃত হোক কিংবা আমানতই হোক। কেননা তার কবজা সম্মানিত নয়।

আর তার যে মাল কোন মুসলমান কিংবা যিম্মীর কব্জায় গছবের মাল হিসাবে রয়েছে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা গনীমতের মাল হবে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তা গনীমতের মাল হবে না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সিয়ারে কাবীর কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) এরূপ মতভিন্নতাই উল্লেখ করেছেন। আর জামে ছাগীরের বাখ্যা গ্রন্থে ভাষ্যকারগণ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতামত ইমাম মুহম্মদ (র) এর অনুকূলে উল্লেখ করেছেন। ছাহেবায়নের দলীল এই যে, মাল হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার অনুবর্তী। আর তার ব্যক্তি সত্তা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা নিরাপদ হয়েছে। সুতরাং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার মাল তার ব্যক্তি সত্তার অনুবর্তী হবে।

১। যেমন মুসলমান যদি অন্যের দাসী বিবাহ করে তাহলে দাসীর সন্তান মায়ের অনুগামী রূপে দাসই হয়। যদিও পিতার অনুগামী রূপে মুসলিম গণ্য হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, উক্ত মাল হচ্ছে মোবাহ মাল[১]। সুতরাং দখল দ্বারা দখলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর ব্যক্তিসত্তা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা নিরাপদ হয়নি।

দেখুননা, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তা মূল্য সম্পন্ন নয়[২]। তবে শরীয়তের বিধান প্রাপ্ত হওয়ার কারণে মূলতঃ তার উপর হস্তক্ষেপ হারাম। কিন্তু তার দুষ্কৃতির অবস্থার কারণে তার উপর হস্তক্ষেপ (অর্থাৎ হত্যা করা) বৈধ ছিল। আর দুষ্কৃতির উপসর্গ ইসলাম গ্রহণের কারণে দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু মালের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নগণ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তা মালিকানার পাত্র হয়েছে। আর নিয়মতান্ত্রিকতা তার কবজায় নেই, সুতরাং তার নিরাপত্তাগুণ সাব্যস্ত নয়।

মুসলমানগণ যখন দারুল হরবের সীমানা থেকে বের হয়ে আসবে তখন থেকে গনীমতের চারা দানা খাওয়ানো এবং গনীমতের খাদ্য দ্রব্য আহার করা জায়েয নয়।

কেননা প্রয়োজন দূরীভূত হয়ে গেছে। আর প্রয়োজনের ভিত্তিতেই বৈধতা ছিলো।

তাছাড়া এখন মুসলমানদের হক দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। একারণেই মুজাহিদের প্রাপ্ত হিসসায় মীরাছ জারী হয়। অথচ দারুল ইসলামে নিয়ে আসার আগে তা এরূপ ছিল না।

যার কাছে অতিরিক্ত চারা দানা বা খাদ্যদ্রব্য রয়ে গেছে সে তা গনীমতের মালের মধ্যে ফেরত দেবে।

অর্থাৎ যদি বণ্টন না হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র) থেকেও আমাদের মতামতের অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তাঁর পক্ষ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরত দিতে হবে না। এটা হলো দারুল হরব থেকে চোরাইকৃত মালের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে।

আমাদের দলীল এই যে, উক্ত বিশেষ বিধান ছিলো প্রয়োজনের অনিবার্য কারণে। আর তা বিদূরীত হয়েছে। চুরি করে হস্তগতকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পূর্বে সেই সেটার অধিক হকদার ছিলো। সুতরাং পরেও অধিক হকদার হবে।

আর যদি বণ্টন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে স্বচ্ছল ব্যক্তি হলে তা সাদকা করে দেবে। আর অভাবগ্রস্ত হলে নিজেই ব্যবহার করবে। কেননা যোদ্ধাদের হাতে ফেরত দেয়া দুঃসাধ্য হওয়ার কারণে তা লুকতার (কুড়িয়ে পাওয়া) মালের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।

আর যদি দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পর ব্যবহার করে থাকে এবং অবস্থা এই যে, এখনো গনীমত বণ্টিত হয়নি। তাহলে তার মূল্য ফেরত দেবে। পক্ষান্তরে গনীমত বণ্টিত হয়ে গিয়ে থাকলে সচ্ছল ব্যক্তি তার মূল্য ছাদাকা করবে আর অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

কেননা মূল্য মূল বস্তুর স্থলবর্তী হয়। সুতরাং মূল্য মূল বস্তুর বিধান গ্রহণ করবে।

১। অর্থাৎ মুসলমান কিংবা যিম্মী ইসলাম গ্রহণকারী হারবীর কাছে থেকে যে মাল গছব বা হরণ করেছে, তা মোবাহ মাল অর্থাৎ নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন মাল নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে কিংবা গুণগতভাবে, কোন ভাবেই তা সংরক্ষিত অবস্থায় নেই। প্রকৃত পক্ষে যে নেই তা তো বোঝাই যায়। কেননা মালিকের নিজের হস্ত নিয়ন্ত্রণে নেই। তদ্রূপ গুণগতভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় না থাকার কারণ এই যে, তা গছবকারীর হস্ত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর গছবকারী তার বৈধ স্থলবর্তী নয়। যেমন আমানতদার ব্যক্তি হচ্ছে মালিকের বৈধ স্থলবর্তী। আর নিরাপত্তা গুণ বর্জিত অসংরক্ষিত যে কোন মোবাহ মাল দখল প্রতিষ্ঠা দ্বারা মালিক হওয়া যায়।

২। অর্থাৎ এটা আমরা স্বীকার করি না যে, ব্যক্তি সত্তা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন হয়েছে। সেটা হয় দারুল ইসলামে অবস্থান গ্রহণ দ্বারা। একারণেই আমাদের মতে কোন মুসলমান তাকে হত্যা করলে কিসাস বা দিয়াত আসে না। তবে তা নিরাপত্তা গুণ লাভ করেছে শরীয়তের 'বিধান পাত্র' হওয়ার কারণে। কেননা অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ছাড়া বিধান পালন সম্ভব নয়। আর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয় নিরাপত্তাগুণ ছাড়া।

অনুচ্ছেদ ঃ গণীমতের মাল বণ্টন পদ্ধতি

ইমাম কুদূরী বলেন, শাসক গনীমতের মাল বণ্টন করতে গিয়ে তার পঞ্চমাংশ বের করে নেবেন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা পঞ্চমাংশকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করে বলেছেন, فان لله خمسه وللرسول আল্লাহর জন্য তার পঞ্চমাংশ এবং রাসূলের জন্য।

অতঃপর পাঁচ ভাগের অবশিষ্ট চারভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করবেন।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের মাঝে তা বণ্টন করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য দুই হিসসা আর পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক হিসসা। আর ছাহেবায়ন বলেন, অশ্বারোহী পাবে তিন হিসসা। এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত।

কেননা ইবনে ওমর (র) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্বারোহীকে তিন হিসসা এবং পদাতিককে এক হিসসা দিয়েছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, হকদার সাব্যস্ত হলে কার্য সম্পাদনের নিরিখে আর তার কার্য সম্পাদন হচ্ছে পদাতিকের তিন গুণ। কেননা অশ্বারোহীর ভূমিকা হলো হামলা, প্রত্যাবর্তন ও অবিচলিত থাকা। পক্ষান্তরে পদাতিকের ভূমিকা অবিচল ক্ষেত্রে, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্বারোহীকে দুই হিসসা এবং পদাতিককে এক হিসসা প্রদান করেছেন। ফলে দুটি বর্ণনায় তাঁর কার্য আপাত বিরোধপূর্ণ হলো। তাই তাঁর বক্তব্যের দিকে ফিরে যাওয়া হবে। আর তিনি বলেছেন যে,

للفارس سهمان وللرجل سهم

অশ্বারোহীর জন্য দুই হিসসা এবং পদাতিকের জন্য এক হিসসা।

সর্বোপরি স্বয়ং ইবনে ওমর (র) হতে বর্ণিত রয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্বারোহীর জন্য দুই হিসসা এবং পদাতিকের জন্য এক হিসসা বন্টন করেছেন। এভাবে ইবন ওমর (র) এর দুটি বর্ণনা যখন বিরোধপূর্ণ হলো তখন অন্যের বর্ণনাই অগ্রাধিকার লাভ করবে।

তাছাড়া এ কারণে যে, আক্রমণ ও প্রত্যাবর্তন এক জাতীয় কাজ। সুতরাং তার কার্য সম্পাদন পদাতিকের কার্য সম্পাদনের দ্বিগুণ হলো। সুতরাং তার উপর এক হিসাবে অধিক প্রাপ্য হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, যেহেতু কার্য সম্পাদনের আধিক্যের প্রকৃত পরিমাণ জানা অসম্ভব সেহেতু আধিক্যের পরিমাণ বিবেচনার কাজও অসম্ভব। সুতরাং বাহ্যিক কারণের উপর বিধান আবর্তিত হবে। আর অশ্বারোহীর অনুকূলে দুটি কারণ রয়েছে। অর্থাৎ তার নিজস্ব ব্যক্তি এবং অশ্ব। পক্ষান্তরে পদাতিকের অনুকূলে কারণ শুধু একটি। সুতরাং অশ্বারোহীর হকদারি পদাতিকের দ্বিগুণ হবে।

আর শুধু একটি ঘোড়ার হিসাব নির্ধারণ ফরয হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দুটি ঘোড়ার হিসাব প্রদান করা হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি ঘোড়ার জন্য হিসসা দিয়েছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, একটি ঘোড়া কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার অন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হবে।

তারফায়নের দলীল এই যে, হযরত বারা বিন আউস (র) দুটি ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি ঘোড়ার হিসসা দিয়ে ছিলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, একই সংগে তো দুটি ঘোড়া দ্বারা লড়াই সম্পাদিত হয় না। সুতরাং বাহ্যিক কারণ দুই ঘোড়ার দ্বারা লড়াই পর্যন্ত গড়ায় না। সুতরাং এক ঘোড়ায় জন্যই হিসসা দেওয়া হবে। একারণেই (কারো মতে) তিন ঘোড়ার হিসসা দেওয়া হয় না।

আর তাঁর বর্ণিত হাদীসটি নফল ও অতিরিক্ত দানের উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন (রসূলুল্লাহ (স) সালামা ইবনুল আকওয়া (র) কে পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও দুই হিসাব প্রদান করেছিলেন।

আজমী ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া সমান। কেননা কুরআনের আয়াতে 'ভীতি সৃষ্টি করণ' অশ্বশ্রেণীরই সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

আর অশ্বারোহী প্রস্তুত রাখবে, এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।

আর الخيل। (বা অশ্ব) শব্দটি অভিন্ন প্রয়োগে আজমী ঘোড়া, আরবী ঘোড়া ও উভয়ের মিশ্র ঘোড়ার উপর প্রযুক্ত হয়।

তাছাড়া আরবী ঘোড়া যদি হামলায় ও ছোটায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে, তবে আজমী ঘোড়া আধিক কষ্টসহিষ্ণু ও অতি সহজে অঙ্গ সঞ্চালনকারী। সুতরাং উভয়ের প্রতিটিতেই বিবেচনাযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং দুটোই সমান হবে।

কেউ যদি অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করে, অতঃপর তার ঘোড়া হালাক হয়ে যায় সে অশ্বারোহীদের হিসসা লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে পদাতিক অবস্থায় প্রবেশ করার পর একটি ঘোড়া খরিদ করে নেয়, সে পদাতিকের হিসসাই পাবে।

উভয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর (র) সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে ইবনুল মোবারক এরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ (প্রবেশের পর) ঘোড়া ক্রয়কারী অশ্বারোহীদের হিসাসার হকদার হবে।

মোট কথা আমাদের নিকট বিবেচ্য হলো সীমান্ত অতিক্রম করার অবস্থা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট বিবেচ্য হলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার অবস্থা।

তাঁর দলীল এই যে, গনীমতের হকদারির হেতু হলো বিজয় ও লড়াই। সুতরাং যোদ্ধার সে সময়ের অবস্থাই হবে বিবেচ্য আর সীমান্ত অতিক্রম হলো 'হেতু' পর্যন্ত উপনীত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন গৃহ থেকে বের হওয়া।

আর লড়াইয়ের সাথে গনীমতের বিভিন্ন আহকাম শর্ত যুক্তকরণ প্রমাণ করে যে, লড়াইয়ের অবস্থা অবনত হওয়া সম্ভব। আর যদি (লড়াই করেছে কি করেনি তা) জানা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য হয় তাহলে যুদ্ধে উপস্থিতির সাথে শর্তযুক্ত করা যেতে পারে। কেননা এটা যুদ্ধের নিকটতম অবস্থা। আমাদের দলীল এই যে, স্বয়ং সীমান্ত অতিক্রম যুদ্ধভুক্ত বিষয়। কেননা এতেই শত্রুদের উপর ভীতি সঞ্চারিত হয়। এর পরবর্তী অবস্থা হলো যুদ্ধের চলমান অবস্থা. আর সেটি বিবেচ্য নয়।

তাছাড়া লড়াইয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য বিষয়; তদ্রূপ যুদ্ধে উপস্থিতির বিষয়টিও। কেননা তা হলো দুই শত্রু সারির মুখোমুখি হওয়ার অবস্থা। সুতরাং সীমান্ত অতিক্রমকেই এর স্থলবর্তী করা হবে। কেননা বাহ্যত: সেটাই হলো যুদ্ধে উপনীত করার কারণ। যদি তা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং অশ্বরোহী বা পদাতিক যেই হোক, সীমান্ত অতিক্রমের অবস্থাই হবে বিবেচ্য।

(দারুল হরবে) অশ্বারোহী অবস্থায় প্রবেশ করে যদি স্থান সংকীর্ণতার কারণে পদাতিক অবস্থায় লড়াই করে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমেই সে অশ্বারোহীদের হিসসার হকদার হবে। পক্ষান্তরে যদি অশ্বারোহী অবস্থায় প্রবেশ করার পর ঘোড়া বিক্রি করে কিংবা দান করে কিংবা ভাড়ায় খাটায় কিংবা বন্ধক রাখে (আর নিজে পদাতিক হিসাবে লড়াই করে) তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাসান বিন যিয়াদের বর্ণনা মতে অতিক্রমের অবস্থার বিবেচনায় সে অশ্বারোহীদের হিসসার হকদার হবে। আর যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী পদাতিকের হিসসার হকদার হবে। কেননা এ সকল পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, এই সীমান্ত অতিক্রমের উদ্দেশ্য অশ্বারোহী রূপে লড়াই করা ছিলো না।

আর যদি লড়াই থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর বিক্রি করে তাহলে অশ্বারোহীদের হিসসা নাকচ হবে না। কারো কারো মতে লড়াই চলাকালে যদি বিক্রি করে তাহলেও একই হুকুম হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, এ হিসসা রহিত হয়ে যাবে। কেননা বিক্রয় প্রমাণ করে যে, তার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা করা। সে শুধু ঘোড়ার চাহিদার সৃষ্টির অপেক্ষা করছিলো।

কোন দাস, স্ত্রী লোক, বালক, পাগল আর যিম্মীকে গনীমতে হিসসা প্রদান করা হবে না। তবে শাসক নিজে বিবেচনা অনুযায়ী কিছু 'থোক' দিয়ে দেবেন।

কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোক, বালক ও দাসদের হিসসা প্রদান করেতন না। তবে তাদের কিছু থোক প্রদান করতেন।

তদ্রূপ (খায়বার যুদ্ধে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহুদীদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তখন তাদের তিনি গনীমত থেকে কিছুই দেননি। অর্থাৎ তাদের জন্য হিস্‌সা নির্ধারণ করেননি।

তাছাড়া এই কারণে যে, জিহাদ হলো ইবাদত। অথচ যিম্মী ইবাদত আদায়ের যোগ্য নয়। আর বালক ও স্ত্রীলোক লড়াইয়ে অক্ষম। এজন্যই তাদের উপর জিহাদের ফরজিয়ত আরোপিত হয়নি। আর গেলামকে তো মনিব সুযোগ দেবে না। বরং তার অধিকার রয়েছে বাধা প্রদানের।

তবে তাদের মর্যাদা- নিম্নতা প্রকাশ করার পাশপাশি লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শাসক তাদের জন্য কিছু থোক প্রদান করবেন।

আর দাসত্ব বন্ধন এবং অক্ষমতার ধারণা বিদ্যমান থাকার কারণে মুকাতাব দাসও সাধারণ দাসের পর্যায়ভুক্ত হবে। এবং মনিব তাকে যুদ্ধ গমনে বাধা প্রদান করতে পারবেন।

অবশ্য গোলাম যদি লড়াই করে তাহলেই শুধু তার জন্য থোক নির্ধারণ করা হবে। কেননা সে মনিবের সেবার জন্য দারুল হরবে এসেছে। সুতরাং সে ব্যবসায়ীর মত হলো।

তদ্রূপ স্ত্রীলোককে কিছু থোক প্রদান করা হবে যদি সে আহতদের শুশ্রূষা করে এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করে। কেননা সে তো মূল যুদ্ধে অক্ষম। সুতরাং এ ধরনের সহযোগিতামূলক কাজ গুলোকেই লড়াইয়ের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে।

দাসের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে তো মূল যুদ্ধে সক্ষম।

যিম্মীকে থোক দেওয়া হবে, যদি সে লড়াই করে। কিংবা লড়াই না করে পথ দেখিয়ে দেয়। কেননা এতে মুসলমানদের উপকার রয়েছে। তবে পথ বাতলে দেয়ার ক্ষেত্রে যদি তাতে বড় ধরনের ফায়দা থাকে তাহলে মুজাহিদদের সাধারণ হিসসার চেয়ে তাকে পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সেটা মুজাহিদদের হিসসার সমান হবে না। কেননা লড়াই হলো জিহাদ। কিন্তু পথ প্রদর্শন জিহাদের আমলভুক্ত বিষয় নয়। আর জিহাদ সংশ্লিষ্ট কোন হুকুমের ক্ষেত্রে তার ও মুসলমানের মাঝে সমতা সব্যস্ত করা যায় না[১]।

আর পঞ্চমাংশকে তিনভাগ করা হবে। একভাগ এতীমদের জন্য। একভাগ দরিদ্রদের জন্য এবং এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়বর্গের যারা দরিদ্র তারা এই তিন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের ধনীদের প্রদান করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নবী (স) এর আত্মীয় স্বজনের জন্য গনীমতের এক পঞ্চামাংশের পঞ্চমাংশ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের ধনী-দরিদ্র সমান হবে। একজন পুরুষের জন্য দু'জন স্ত্রী লোকের হিসসা এই নিয়মে তাদের মাঝে তা বন্টন করা হবে। এবং তা শুধু বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য হবে। অন্যদের জন্য নয়[২]।

ধনী দরিদ্রের শর্তযুক্ত হওয়ার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ না করেই لذى القربى (আত্মীয়বর্গের জন্য) বলেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, চার খোলাফায়ে রাশেদীন আমাদের উল্লেখকৃত হিসাবেই এটাকে তিন ভাগ করেছিলেন। আর অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে তাঁরা যথেষ্ট।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يامعشر بنى هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة للناس
واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس

১। মোট কথা যদি সে পদাতিক হয় তাহলে মুসলিম পদাতিকের হিসসা থেকে কম পাবে। তদ্রূপ অশ্বারোহী হলে মুসলিম অশ্বারোহীর হিসসা থেকে কম পাবে।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরিচয় হলো মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের ছিলো পাঁচ পুত্র, হাশেম মুত্তালিব, নাওফেল, আবদে শামস ও আবু আমর। শেষোক্ত জন পুত্রহীন ছিলেন।

হে বনুহাশিম গোষ্ঠী। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের ময়লা ধোয়া পানি এবং তাদের আবর্জনা অপছন্দ করেছেন। এবং তার বিনিময়ে তোমাদের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।

· আর বিনিময় তো তার পক্ষেই সাব্যস্ত হতে পারে যার পক্ষে বিনিময় কৃত বস্তু সাব্যস্ত রয়েছে। আর তাঁরা হলেন দরিদ্রগণ।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দান করেছেন (তাঁর প্রতি তাদের) নোছরত ও সাহায্যের জন্য। দেখুন না তিনি এই বলে কারণ উল্লেখ করেছেন,

انهم لن يزالوا معى هكذا فى الجاهلية والاسلام

ইসলাম ও জাহেলী যুগে তারা আমার সাথে এমনভাবে জড়িত ছিলো।

একথা বলে তিনি দুই হাতের আংগুলগুলো পরস্পর প্রবেশ করে দেখালেন।

এটা প্রমাণ করে যে, 'নাছ' এর বর্ণিত নৈকট্য দ্বারা নোছরত ও সাহায্যে নৈকট্য উদ্দেশ্য। আত্মীয় নৈকট্য মূল উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ যে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন সেটা শুধু তাঁর নামের বরকত দিয়ে বক্তব্য শুরু করার জন্য। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিসসা তাঁর ওয়াফাতের মাধ্যমেই রহিত হয়ে গেছে, যেমন নিজের জন্য 'বাছাই' রহিত হয়ে গেছে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালাতের সুবাদে এর হকদার হতেন। আর তাঁর পরে কোন রাসূল নেই।

আর صفى বলা হয় ঐ জিনিষকে, যা নবী (স) গনীমত থেকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিতেন। যেমন একটি বর্ম বা তরবারি বা দাসী।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিস্সা এখন খলীফার জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে। তার বিপরীত প্রমাণ হল যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় তাঁর নিকটআত্মীয় বর্গ হিসসার হকদার হতেন সাহায্যের কারণে।

প্রমাণ আমাদের বর্ণিত হাদীস। ইমাম কুদূরী বলেন, তাঁর ওফাতের পরে দারিদ্র্যের কারণে।

হেদায়া গ্রন্থকার আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন— বলেন, ইমাম কুদূরী (র) যা উল্লেখ করেছেন তা হলো ইমাম কারখীর মত। পক্ষান্তরে, ইমাম তাহাবী (র) বলেন, তাদের মধ্যে ফকীরদের হিস্সা রহিত হয়ে গেছে আমাদের পূর্ব বর্ণিত ইজমা-ই মতের প্রেক্ষিতে।

তাছাড়া এ কারণে যে, খরচের খাত বিবেচনায় এতে ছাদাকার গুণগত দিক রয়েছে। সুতরাং তা হারাম হবে যেমন (যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত হাশেমীর জন্য) যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম। প্রথমোক্ত মতের–এবং কথিত হয়েছে যে এটাই বিশুদ্ধতম, প্রমাণ হলো এই বর্ণনা যে, ওমর (রা) তাদের দরিদ্রদেরকে তা প্রদান করতেন।

আর ইজমা তো সংঘটিত হয়েছে তাদের ধনীদের হিসসা ব্যহত হওয়ার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে তাদের দরিদ্ররা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শাসকের অনুমতি ছাড়া একজন বা দুজন যদি দারুল হরবে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে এবং কোন কিছু হস্তগত করে তাহলে তা থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে না।

কেননা গনীমত হলো যা শক্তিবলে বিজয়ের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, ছিনতাইয়ের মাধ্যম নয়, চুরির মাধ্যমে নয়। আর পঞ্চমাংশ হচ্ছে গনীমত সংশ্লিষ্ট বিধান।

পক্ষান্তরে একজন বা দুজন যদি শাসকের অনুমতি ক্রমে গিয়ে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, তার থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে।

কেননা শাসক তাদের যখন অনুমতি প্রদান করলেন, তখন তিনি সাহায্য যুগিয়ে তাদের মদদ করার দায় গ্রহণ করলেন। সুতরাং তারা শক্তিবল সম্পন্নই হলো।

আর যদি শক্তিবল সম্পন্ন কোন দল ঢুকে পড়ে এবং কোন কিছু হস্তগত করে তাহলে শাসক তাদের অনুমতি প্রদান না করলেও তা থেকে পঞ্চমাংশ নেয়া হবে।

কেননা শক্তি বলে ও বিজয়ের মাধ্যমে লাভ করা হয়েছে। সুতরাং এটা গনীমত হবে।

তাছাড়া এ অবস্থায় শাসকের অবশ্য কর্তব্য হবে তাদের সাহায্য করা। কেননা তিনি যদি তাদেরকে বর্জন করেন তাহলে তাতে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

পক্ষান্তরে এক দুজনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদেরকে সাহায্য করা শাসকের অবশ্য কর্তব্য নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ নফল বা হিস্সার অতিরিক্ত প্রদান

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, লড়াইয়ের অবস্থায় লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শাসক হিসসার অতিরিক্ত নফল (বা পুরস্কার) ঘোষণা করাতে কোন দোষ নেই। যেমন তিনি বললেন যে, কোন শত্রুকে যে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় জিনিসপত্র তারই হবে; আর কোন ক্ষুদ্র দলকে বললেন, পঞ্চমাংশের পর তোমাদের জন্য চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলাম। অর্থাৎ পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর। কেননা উদ্বুদ্ধ করা শরীয়তের পছন্দনীয় বিষয়। আল্লাহ বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ -

হে নবী, আপনি মু'মিনগণকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন।

আর এটাও এক ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ। আর নফল বা পুরস্কার ঘোষণা উল্লেখিত পরিমাণ দ্বারা হতে পারে। কিংবা অন্য ভাবেও হতে পারে। তবে শাসকের কর্তব্য হলো লব্ধ গনীমতের সবটুকুই পুরস্কার ঘোষণা না করা।

কেননা এতে সকলের হক বাতিল করা হয়। তা সত্ত্বেও যদি তিনি কোন যোদ্ধা দলের ক্ষেত্রে এটা করেন তাহলে জায়েয হবে। কেননা হস্তক্ষেপের অধিকার তাঁর আর তাতে কল্যাণ ও বৃহৎ স্বার্থ থাকতে পারে।

তবে গনীমতের মাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর নফল ঘোষণা করা যাবে না। কেননা সংরক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত মালে অন্যদের হক সুদৃঢ় হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে পঞ্চমাংশ থেকে করা যাবে।

কেননা পঞ্চমাংশে যোদ্ধাদের কোন হক নেই। নিহতের কাছ থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র যদি হত্যাকারীর জন্য ঘোষণা করা না হয়ে থাকে, তাহলে তা সমগ্র গনীমতের অংশ হবে। আর ঐ ক্ষেত্রে হত্যাকারী ও অন্যরা সমান হকদার হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হত্যাকারী যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের জন্য গনীমত থেকে হিসসা দেওয়া যেতে পারে, আর সে শত্রুকে সামনা সামনি হত্যা করেছে, তাহলে নিহতের থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র এককভাবে তারই হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে من قتل قتيلا فله سلبه (যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র তারই হবে।)

এ হাদীস দ্বারা এ-ই স্বাভাবিক যে, এ বক্তব্য দ্বারা তিনি শরীয়তের একটি বিধান প্রবর্তন করেছেন। কেননা এ জন্যইতো তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

আর এই জন্য যে, সামনা সামনি দুশমনকে হত্যাকারী অধিক উপকার করল। সুতরাং তার ও অন্যদের সাথে পার্থক্য প্রকাশের জন্য নিহতের লব্ধ জিনিসপত্র তার জন্য বিশিষ্ট হবে।

আমাদের দলীল এই যে, তার জিনিসগুলো বাহিনীর শক্তিতে লব্ধ হয়েছে। সুতরাং গনীমত হবে এবং গনীমতের মত বর্ণিত হবে, যেমন 'নাছ'-এ বর্ণিত হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবীব বিন আবু সালামা (রা) কে বলেছেন

ليس لك من سلب قتيلك الا ماطابت به نفس امامك

তোমার হাতে নিহত ব্যক্তি লব্ধ জিনিসগুলোর মধ্যে ততটুকুই তোমার জন্য বৈধ, যাতে তোমার শাসকের সন্তুষ্টি রয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা যেমন শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের সম্ভাবনাপূর্ণ, তেমনি পুরস্কার ঘোষণারও সম্ভাবনাপূর্ণ। সুতরাং আমাদের বর্ণিত হাদীসটির কারণে দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই আমরা তা প্রয়োগ করবো।

আর একই শ্রেণীর বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক উপকারের বিষয় বিবেচ্য নয়। যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি। 'প্রাপ্ত সম্পদ' (সালাব) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নিহত ব্যক্তির সংগের বিদ্যমান পোষাক, অস্ত্র ও বাহন; অদ্রূপ বাহনে যুক্ত জিন ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম; অদ্রূপ তার সংগের বাহনের কিংবা তার কোমরের থলিতে রক্ষিত মাল ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যান্য বস্তু প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) নয়।

তার গোলামের সংগে অন্য বাহনে যা কিছু রয়েছে 'সালাব' নয়।

আর পুরস্কার ঘোষণা করার ফলশ্রুতি হলো অন্যদের হক রহিতকরণ। পক্ষান্তরে মালিকানা সাব্যস্ত হবে দারুল ইসলামে স্থানান্তর পূর্বক সংরক্ষণ করা দ্বারা।

এর কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শাসক যদি এরূপ বলেন যে, কেউ কোন দাসীকে হস্তগত করলে সেটা তার। অতঃপর কোন মুসলমান কোন দাসী হস্তগত করলো এবং তার 'গর্ভশূন্যতা' নিশ্চিত করে নিলো তখন, তবুও তার সংগে সহবাস করা তার জন্য বৈধ হবে না। অদ্রূপ তাকে বিক্রি করতেও পারবে না।

এহল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, তার সাথে সহবাস করতে পারবে এবং তাকে বিক্রি করতে পারবে।

কেননা তাঁর মতে পুরস্কার ঘোষণা দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়; যেমন দারুল হরবে বন্টন সম্পন্ন হওয়া দ্বারা এবং হারবীর কাছ থেকে খরিদ করা দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

আর পুরস্কার রূপে ঘোষণাকৃত 'সালাব' কেউ নষ্ট করে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে কারো কারো মতে উক্ত মতবিরোধ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ কাফিরদের দখল ও আধিপত্য বিস্তার

তুর্কীরা যদি রোমকদের উপর বিজয় অর্জন করে ও তাদের বন্দী করে এবং তাদের সম্পদ অধিকার করে তাহলে তারা সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে।

কেননা মোবাহ মালের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা বর্ণনা করবো যে, এটা হলো কোন বস্তুর মালিকানা লাভের কারণ।

অতঃপর আমরা যদি তুর্কীদের উপর বিজয় লাভ করি, তাহলে তাদের অন্য সকল সম্পদের উপর কিয়াস করে প্রাপ্ত ঐ সকল সম্পদেও আমরা মালিকানা লাভ করবো।

আল্লাহ না করুন তারা যদি আমাদের সম্পদের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদের দেশে স্থানান্তর পূর্বক সংরক্ষণ করে ফেলে তাহলে তারা সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তারা সেগুলোর মালিক হবে না।

কেননা (দারুল ইসলামে) প্রথম অবস্থায় এবং (দারুল হরবে) সমাপ্তি অবস্থায়— উভয় অবস্থায় তাদের এই দখল প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ। আর উছূলে ফেকাহ্ শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, নিষিদ্ধ বিষয় মালিকানার কারণ হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, মোবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বান্দার প্রয়োজন নিরসনের জন্য মালিকানার কারণ রূপে তা সাব্যস্ত হবে। যেমন তাদের মালের উপর আমাদের দখল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হয়।

(তাদের দখল প্রতিষ্ঠা মোবাহ মালের উপর হয়েছে) এটা একারণে যে, মালিকের উপকার লাভের সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনে দলীলের বিপরীতে মালের নিরপত্তা গুণ সাব্যস্ত হয়েছে[১]। সুতরাং যখনই নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হবে তখন মাল (তার আসল অবস্থায় অর্থাৎ) মোবাহ অবস্থায় ফিরে আসবে। অবশ্য দখল সম্পদ হবে না আপন ভূখণ্ডে (স্থানান্তর পূর্বক) সংরক্ষণ করা ছাড়া। কেননা 'দখল' অর্থ 'সম্পদ পাত্রের' উপর বর্তমানে ও পরবর্তীতে (উপকার লাভের) সক্ষমতা অর্জন।

আর পার্শ কারণে নিষিদ্ধ বিষয় যদি মালিকানার চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ের তথা পরকালীন ছাওয়াব লাভের কারণ হতে পারে তাহলে ইহকালীন মালিকানা লাভের (হেতু হওয়া) সম্পর্কে তোমার কি ধারনা[২]?

মুসলমানগণ যদি ঐ সম্পদের উপর আধিপত্য লাভ করে আর বন্টনের পূর্বেই তার পূর্ববর্তী মালিকরা সে মাল পেয়ে যায়, তাহলে বিনামূল্যেই সেগুলো তাদের হয়ে যাবে। আর যদি বন্টনের পর পায়, তাহলে ইচ্ছা করলে মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে।

১। অন্যথায় আল্লাহর তা'আলার বাণী خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর সকল সম্পদ সবার জন্য মোবাহ। অথচ তাতে মানুষ কোন বস্তুর নিয়ন্ত্রণ ও দখল লাভ করার পরও তা দ্বারা নিরুদ্বেগভাবে উপকৃত হতে পারবে না।

২। জবর দখলকৃত ভূমিতে নামায পড়া নিষিদ্ধ। তবে এই নিষিদ্ধতা নামাযের সত্তাগত দোষের জন্য নয়। পার্শ্ব দোষের কারণে। কিন্তু পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ এই নামায আখেরাতের ছাওয়াব লাভের হেতু রূপে গণ্য হবে। তদ্রূপ অন্যের মালিকানার মালের উপর দখলদারির নিষিদ্ধতা মালের নিজস্ব কারণে নয়। কেননা নিজস্ব সত্তাগত ভাবে তা মোবাহ। শুধু মালিকের হকের কারণে তা নিষিদ্ধ।

কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন,

إن وجدته قبل القسمة فهولك بغير شئ وان وجدته بعد القسمة فهولك بالقيمة

যদি বণ্টনের পূর্বে তুমি তা পেয়ে যাও তাহলে কোন বিনিময় ছাড়াই তা তোমার। আর যদি বণ্টনের পরে পাও তাহলে মূল্যের বিনিময়ে তা তোমার হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে, পূর্ববর্তী মালিকের মালিকানা তার সম্মতি ছাড়াই বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং তার কল্যাণের বিবেচনা করে তার জন্য ফেরত নেয়ার হক সাব্যস্ত হবে। তবে বণ্টনের পর নেওয়ার ক্ষেত্রে যার কাছে থেকে নেওয়া হবে, তার ক্ষতি রয়েছে। কেননা তার ব্যক্তিমালিকানা নাকচ করা হবে। সুতরাং সে তা মুল্যের বিনিময়ে নেবে, যাতে উভয় তরফের কল্যাণ সমানভাবে রক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে বণ্টনের পূর্বে অংশীদারিত্ব হচ্ছে ব্যাপক। ফলে তাতে ক্ষতি হয় সামান্য। সুতরাং বিনা মূল্যেই সে তা নিতে পারে।

কোন ব্যবসায়ী যদি দারুল হরবে গিয়ে ঐ জিনিস ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে প্রথম মালিকের এখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারে।

কারণ বিনামূল্যে নিয়ে নিলে ক্রয়কারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, সে তো এর বিনিময় প্রদান করেছে, সুতরাং আমরা যা বলেছি, তাতেই কল্যাণ-ভারসাম্য রয়েছে।

আর যদি সে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করে থাকে তাহলে ঐ দ্রব্যের সমমূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

আর যদি দারুল হরবের লোকে কোন মুসলমানকে তা দান করে থাকে তাহলে তার মূল্যের বিনিময়ে সে তা নিতে পারে।

কেননা দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যক্তিমালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং মূল্যের বিনিময় ছাড়া ব্যক্তি মালিকানা রহিত হবে না।

আর যদি ঐ বস্তুটি শক্ত বলে ও আধিপত্য বলে দখলকৃত হয়ে থাকে; আর বস্তুটি (মূল্য নির্ভর নয়, বরং) সদৃশ নির্ভর (مثلى) তাহলে বণ্টনের পূর্বে বিনিময় ছাড়া নিয়ে নেবে। কিন্তু বন্টনের পর নিতে পারবে না। কেননা সদৃশ বস্তুর বিনিময়ে সদৃশ বস্তু গ্রহণ অর্থহীন। তদ্রূপ বস্তুটি দানকৃত হলে একই কারণে পূর্ববর্তী মালিক তা আর নিতে পারবে না। তদ্রূপ যদি বস্তুটি মান ও পরিমাণ উভয় দিক থেকে সদৃশ বস্তুর বিনিময়ে ক্রয়কৃত হয় তাহলেও পূর্ববর্তী মালিক তা আর নিতে পারবে না।[১]

১। কেননা (উদাহরণ স্বরূপ) উৎকৃষ্ট দশ মিছকালের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট দশ মিছকাল গ্রহণ করা অর্থহীন। 'মানে ও পরিমাণে সদৃশ' এই শর্ত আরোপের সার্থকতা এই যে, যদি মুসলমান উক্ত মালকে তার চেয়ে কম পরিমাণ মাল দ্বারা কিংবা অন্য জিন্‌স বা শ্রেণীর মাল দ্বারা খরিদ করে তাহলে সে খরিদকৃত বস্তুর সদৃশ বস্তুর বিনিময়ে তা নিতে পারবে। এটা রিবা বা সুদ হবে না। কেননা সে তো পূর্ব থেকে বিদ্যমান মালিকানার বস্তু উদ্ধার করছে; সূচনামূলক ক্রয় সম্পন্ন করছে না

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, যদি তারা কোন গোলামকে বন্দী করে নিয়ে যায়; অতঃপর একজন লোক তা ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। আর তার চক্ষু উপড়ে ফেলা হয় এবং ক্রয়কারী তার দিয়ত উশুল করে। এখন সাবেক মনিব (নিতে চাইলে) শত্রুর থেকে ক্রয় করা মূল্যের বিনিময়ে তাকে নিতে পারে।

ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে নেয়ার কারণ তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। দিয়তের অর্থ সে নিতে পারবে না।

কেননা গোলামের মালিকানা সিদ্ধ[১] হয়েছে। সুতরাং এখন যদি সে দিয়ত গ্রহণ করতে চায় তাহলে সদৃশ পরিমাণ মাল দ্বারা তা নিতে হবে। আর এ দ্বারা সে উপকৃত হবে না।

আর সৃষ্ট খুঁতের কারণে ক্রয় মূল্য থেকে কোন পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না। কেননা গুণের বিনিময়ে মূল্যের কোন অংশ বিবেচনা হয় না।

শোফার মাস'আলাটি ভিন্ন। কেননা বিক্রয় চুক্তি যখন শোফা-দাবীকারীর হাতে হস্তান্তরিত হয় তখন বিক্রিত বস্তুটি ক্রেতার হাতে 'অসিদ্ধ ক্রয়' দ্বারা ক্রয়কৃত বস্তুর পর্যায়ভুক্ত হয়ে বিদ্যমান থাকে আর এ ক্ষেত্রে বস্তুর গুণাবলী দায়ভুক্ত যেমন, গছবের মধ্যে।

পক্ষান্তরে অসিদ্ধভাবে ক্রয় করলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে গুণকে মূল্য যোগ্য মনে করা হয়। পক্ষান্তরে এখানে মালিকানাটি সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মাসআলা দুটি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো।

যদি তারা কোন গোলামকে বন্দী করে নিয়ে যায় অতঃপর কোন লোক তাকে এক হাযার দেরহাম দিয়ে খরিদ করে এর পর তারা দ্বিতীয় বার তাকে বন্দী করে দারুল হরবে নিয়ে যায়। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এক হাযার দেরহাম দিয়ে খরিদ করে তাহলে প্রথম মালিক তাকে দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করার অধিকার পাবে না।

কেননা দ্বিতীয় বন্দিত্ব তার মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি। **অবশ্য প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে।** কেননা দ্বিতীয় বন্দিত্ব তার মালিকানায় সম্পন্ন হয়েছে।

অতঃপর প্রাক্তন মালিক ইচ্ছে করলে দুই হাযার দেরহামের বিনিময়ে তা ফেরত নিতে পারে। কেননা প্রথম ক্রেতার প্রতিকূলে ঐ বস্তুটির দুটি মূল্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দুই মূল্যের বিনিময়ে সে তা নিতে পারে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় বার যার কাছ থেকে বন্দী করা হয়েছে (অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা) সে যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে প্রাক্তন মালিক গোলামটি নিতে পারবে না। এটাকে তার উপস্থিতির অবস্থার উপর কিয়াস করা হয়েছে।

শত্রুপক্ষ দখল প্রতিষ্ঠার কারণে আমাদের প্রতিকূলে আমাদের মুদাব্বার উম্মে ওয়ালাদ মুকাতাব দাসদাসী এবং আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিদের মালিক হবে না। কিন্তু আমরা তাদের প্রতিকূলে ঐ সব কিছুর মালিক হবো।

১। সিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, ক্ষতিপূরণ লাভ করাটা তার মালিকানাধীনে সম্পন্ন হয়েছে। এটা পূর্ব মালিকানার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না। সাথে সাথে সাবেক মনিব তার হকদার হতে পারে। দেহ সত্তার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে।

পক্ষান্তরে অসিদ্ধ ক্রয় করলে বিষয়টি ভিন্ন হয়। কেননা সেক্ষেত্রে গুণকে মূল্যযোগ্য মনে করা হয়।

কেননা মালিকানার কারণ মালিকানা লাভের পরেই শুধু মালিকানা কার্যকরী হতে পারে। আর মোবাহ মালই হচ্ছে মালিকানা লাভের বৈধ পাত্র। আর স্বাধীন ব্যক্তি নিজস্ব সত্তাগত ভাবেই নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন। তদ্রূপ উল্লেখিত অন্যান্যরাও। কেননা তাদের মাঝে আংশিক স্বাধীনতা সাব্যস্ত রয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের দেহ সত্তার অবস্থা ভিন্ন। কেননা শরীয়ত তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদের নিরাপত্তা গুণ রহিত করে দিয়েছে। এবং তাদের 'দাস' সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে এদের দিক থেকে কোন অপরাধ নেই।

কোন মুসলমানের (এবং যিম্মীর) কোন মুসলিম গোলাম যদি পালিয়ে গিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে আর তারা তাকে পাকড়াও করে নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তারা তার মালিক হবে না। সাহেবায়ন বলেন, মালিক হয়ে যাবে।

কেননা গোলামের মাঝে বিদ্যমান নিরাপত্তা গুণটি হলো মালিকের অধিকারের কারণে। কেননা তার নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিলো। আর এখন তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একারণেই তো দারুল ইসলাম থেকে তাকে ধরে নিয়ে গেলে তারা মালিক হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, আমাদের দারুল ইসলাম থেকে বের হওয়ার কারণে তার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা তার উপর মনিবের নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ রহিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিলো, যাতে মনিবের অনুকূলে উপকার লাভের সক্ষমতা থাকে। আর এখন মনিবের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং তার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত হবে। এবং নিজস্ব সত্তাগতভাবেই সে নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ফলে মালিকানা লাভের পাত্র রইল না।

দারুল ইসলামের ঘুরতে থাকা পলাতক গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দারুল ইসলামের (অধিবাসীদের) নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকার কারণে মনিবের নিয়ন্ত্রণ (গুণগতভাবে) বিদ্যমান রয়েছে। ফলে তার 'আত্ম নিয়ন্ত্রণ' এর প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

যাই হোক ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যখন দারুল হরবের লোকদের মালিকানা সাব্যস্ত হলো না, তখন প্রাক্তন মালিক তাকে বিনা মূল্যে নিয়ে নিতে পারবে। হোক সে হেবাকৃত কিংবা ক্রয়কৃত কিংবা বন্টনপূর্ব গনীমতের মাল। পক্ষান্তরে বন্টন পরবর্তী হলে বায়তুল মালের পক্ষ থেকে তার বিনিময় আদায় করা হবে। কেননা মুজাহিদদের আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে এবং তাদের পুনঃ সমাবেশ দুঃসাধ্য হওয়ার কারণে পুনঃবন্টন করা সম্ভব নয়। (এতদিন গোলামের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে ছিলো) তাকে গোলামের শ্রম লব্ধ অর্থ মালিককে ফেরত দিতে হবে না। কেননা তার ধারণায় যেহেতু গোলামটি তার মালিকানাধীন, সেহেতু সে তাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করেছে। (প্রাক্তন মনিবের কাজে নয়।)

উট যদি ভেগে দারুল হরবে চলে যায়, আর তারা তা ধরে ফেলে তাহলে তারা তার মালিক হয়ে যাবে। কেননা বোবা জানোয়ারের আত্ম, নিয়ন্ত্রণ নেই, যা দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। সুতরাং তার উপর তাদের দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আমাদের উল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে গোলামের বিষয়টি ভিন্ন হবে। **আর যদি কোন লোক ঐ উট খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে উটের মালিক ইচ্ছা করলে ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে।** এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

কোন গোলাম যদি ঘোড়া ও মালামাল সহ তাদের কাছে পালিয়ে যায়, আর তারা এসব কিছু অধিকার করে নেয়, এরপর কোন লোক সেগুলো খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে; তাহলে মনিব গোলামটি বিনামূল্যে নিতে পারবে। আর ঘোড়া ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে। এহল ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর ছাহেবায়ন বলেন, ইচ্ছা করলে গোলাম ও মালামাল ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে।

(এ সিদ্ধান্ত হয়েছে) এগুলোর একত্র অবস্থাকে পৃথক অবস্থার উপর কিয়াস করে। আর (ইতিপূর্বে) আমরা প্রতিটির পৃথক বিধান বর্ণনা করেছি।

হারবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং কোন মুসলিম (বা যিম্মী) গোলাম খরিদ করে দারুল হরবে নিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। ছাহেবায়ন বলেন, আযাদ হবে না।

কেননা একটি নির্ধারিত পন্থায় অর্থাৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে[১] মালিকনা বিলুপ্ত করা অনিবার্য ছিলো। কিন্তু দারুল ইসলাম থেকে নিয়ে যাওয়ার কারণে তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং সে তার হাতে গোলাম রূপেই থেকে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, মুসলমানকে কাফিরের লাঞ্ছনা মুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং (তার মালের নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার) শর্তটিকে অর্থাৎ দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের ভিন্নতাকে (নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার) কারণ ও হেতুর স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হবে, যাতে তাকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। আর সেই হেতু হচ্ছে (আদালতের পক্ষ হতে) আযাদ করা। যেমন দারুল হরবে স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তিন হায়য সময়কালের অতিক্রমকেই বিচ্ছেদ করণের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হয়।

কোন হারবীর গোলাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে চলে আসে, কিংবা দারুল হরব বিজিত হয়, তাহলে সে আযাদ গণ্য হবে। একই হুকুম হবে যদি তাদের দাসগণ বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর কাছে আসে, তবে তারা আযাদ গণ্য হবে।

কেননা বর্ণিত আছে যে, তায়েফের একদল গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে এসেছিলো। আর তিনি তাদের আযাদ হওয়ার ফয়সালা দিয়ে বলেছিলেন, এরা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাদকৃত।

তাছাড়া এ কারণ যে, সে মনিবের অধীনতা ছিন্ন করে আমাদের কাছে চলে আসার মাধ্যমে কিংবা দারুল হরব জয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বাহিনীতে এসে পড়ার মাধ্যমে নিজেকে সংরক্ষিত করে নিয়েছে। আর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করার চেয়ে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

কেননা তার আপন সত্তার উপর তার নিজের নিয়ন্ত্রণ অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজন হলো সাব্যস্ত নিয়ন্ত্রণকে অধিকতর দৃঢ়তা দান। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো সূচনা থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণকে বিবেচনা করাই উত্তম হবে।

১। বিধান এই যে, কাফের কোন মুসলমান দাস ক্রয় করলে তাকে তা বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য করা হবে। সে বিক্রয় না করলে কাযী বিক্রয় করে তাকে তার মূল্য দিয়ে দিবেন।

পরিচ্ছেদ ঃ নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি

(নিরাপত্তা অর্জনকারী) মুসলমান যদি ব্যবসায়ী হিসাবে দারুল হরবে গমন করে তখন তার জন্য জায়েয হবে না তাদের জান-মালে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা।

কেননা সে নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার দায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং এর পরে হস্তক্ষেপ করা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আর বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম।

তবে তাদের শাসক যদি নিরাপত্তা অর্জনকারী মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের মালামাল দখল করে নেয় কিংবা তাদের বন্দী করে কিংবা শাসকের জ্ঞাতসারে অন্য কেউ তা করে আর শাসক তাকে বাধা প্রদান না করে (তবে ঐ মুসলমানের হস্তক্ষেপকে বিশ্বাসঘাতকতা গণ্য করা হবে না)। কেননা তারাই প্রথমে বিশ্বাস ভংগ করেছে।

বন্দীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত নয়। সুতরাং যে কোন হস্তক্ষেপ করা তার জন্য বৈধ হবে। যদিও তারা স্বেচ্ছায় তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়। নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যবসায়ী যদি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং কোন কিছু হাতিয়ে নিয়ে চলে আসে তাহলে সে নিষিদ্ধ পন্থায় তার মালিকানা লাভ করবে। কেননা মোবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে যেহেতু তা বিশ্বাসঘাতকতা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, সেহেতু তা দোষযুক্ত হয়েছে। তাই তাকে ঐ জিনিস সাদাকা করে দেয়ায় আদেশ করা হবে। এর (মালিকানা গ্রহণযোগ্য হওয়ার) কারণ এই যে, পার্শ্ব কারণে নিষিদ্ধ হওয়া মালিকানার হেতু সাব্যস্ত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

কোন মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর কোন হারবী যদি তাকে ঋণ প্রদান করে কিংবা সে কোন হারবীকে ঋণ প্রদান করে কিংবা একে অপরের কোন জিনিস গছব করে, এরপর ঐ মুসলমান দারুল ইসলামে ফিরে আসে এবং হারবীও নিরাপত্তা নিয়ে এখানে আগমন করে তখন একজনের অনুকূলে অপর জনের প্রতিকূলে কোন কিছুর ফাসালা দেওয়া হবে না।

ঋণের বিষয়টি এ কারণে যে, ফায়সালা জারি করার ক্ষমতা হাসিল হওয়ার উপর নির্ভর করে; অথচ ঋণ আদান প্রদানের সময় কারো উপরই ক্ষমতা ছিলো না, এবং ফায়সালা জারি করার সময় নিরাপত্তাধারী হারবীর উপরও ক্ষমতা নেই। কেননা সে তার বিগত সময়ের কোন আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান পালনের দায় গ্রহণ করেনি। বরং (দারুল ইসলামে অবস্থান কালে) তা পালনের দায় গ্রহণ করেছে।

পক্ষান্তরে 'গসব'-এর ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দখল ও নিয়ন্ত্রণ লাভের পর সেটা গসবকারীর মালিকানাধীন হয়ে গেছে। কেননা এই গসব ও নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তা গুণ রহিত মালের সাথে যুক্ত হয়েছে। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

অনুরূপ হুকুম, যদি দুই হারবী এরূপ কিছু করার পর নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল ইসলামে আগমন করে। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি (যে, ফায়সালা অভিভাবকত্ব ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।)

আর যদি উভয়ে মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে ঋণের বিষয়ে তো উভয়ের মাঝে ফায়সালা দেওয়া হবে; কিন্তু 'গছব' সম্পর্কে ফায়সালা দেওয়া হবে না।

ঋণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, উভয়ের সম্মতিতে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা সিদ্ধ রূপে সম্পন্ন হয়েছে। আর উভয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের দায় গ্রহণের কারণে ফায়সালা জারির অবস্থায় উভয়ের উপর ক্ষমতা সাব্যস্ত রয়েছে।

পক্ষান্তরে গসবের ক্ষেত্রে কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, বস্তুটি তার মালিকানাধীন হয়ে গেছে। আর হারবীর মালিকানায় (যদি বিশ্বাস ভংগের মাধ্যমে না হয়ে থাকে) কোন দোষ নেই, যাতে ফেরত দেয়ার হুকুম দিতে হবে।

কোন মুসলমান যদি নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং কোন হারবীর মাল গসব করে। অতঃপর উভয়ে মুসলমান অবস্থায় দারুল ইসলামে চলে আসে। তাহলে তাকে গসবকৃত মাল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। অবশ্য কাযী এ ফয়সালা তার বিরুদ্ধে দিবে না।

ফায়সালা না দেয়ার কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, এটা তার মালিকানাভুক্ত হয়েছে আর ফেরত দেয়ার নির্দেশ, যে ব্যাপারে ফতোয়া রয়েছে বলে ইমাম মুহম্মদ (র) মত দিয়েছেন, তা এ জন্য যে, প্রতিশ্রুতি ভংগের হারাম কাজ মালিকানার সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে মালিকানা ফাসিদ হয়ে গেছে।

দুই মুসলমান যদি নিরাপত্তা গ্রহণ পূর্বক দারুল হরবে প্রবেশ করে। অতঃপর একে অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর উপর তার নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, কুরআনের আয়াত (স্থানগত) শর্ত থেকে মুক্ত[১]। আর দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, দারুল ইসলামে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে সাব্যস্ত নিরাপত্তা গুণ দারুল হরবে নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক সাময়িক অবস্থানের 'উপসর্গ' দ্বারা রহিত হয় না।

তবে কিছাছ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ এই যে, শক্তি বল দ্বারা তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। আর ইমাম ও মুসলমানদের দলগত উপস্থিতি ছাড়া শক্তিবল সাব্যস্ত হয় না। আর দারুল হরবে তা বিদ্যমান নেই।

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তার মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, শরীয়তের বিধানে 'আকলাহ' (নিকট পুরুষ আত্মীয়) গণ ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায় বহন করবে না। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দুই দেশের ভিন্নতার কারণে তাকে রক্ষা করার সামর্থ্য তাদের নেই। অথচ 'রক্ষা দায়িত্ব' বর্জনের ভিত্তিতেই তাদের উপর দিয়ত অবশ্য আরোপিত হয়।

আর যদি মুসলিম ও কাফির দুজন বন্দী হয় এবং সে অবস্থায় একে অপরকে হত্যা করে কিংবা (নিরাপত্তাধারী) কোন মুসলিম ব্যবসায়ী যদি কোন বন্দীকে হত্যা করে

১। وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ কেউ যদি কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে একটি মুমিন দাস আযাদ করতে হবে। এখানে হত্যার ঘটনাটি দারুল ইসলামে হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি।

তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে হত্যাকারীর উপর কোন শাস্তি ধার্য হবে না। তবে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর সাহেবায়ন বলেন, উক্ত দুই বন্দীর ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত উভয় অবস্থায় দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বন্দিত্বের 'উপসর্গের' কারণে নিরাপত্তা গুণ বাতিল হয় না, যেমন সাময়িক নিরাপত্তা গ্রহণের কারণে তা বাতিল হয় না।

তবে কিছাছ রহিত হওয়ার কারণ হলো শক্তি বলের অবিদ্যমানতা। আর তার নিজের মালে দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কারণ সেটাই, যা আমরা (এইমাত্র) বলে এসেছি।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বন্দিত্বের কারণে যেহেতু সে তাদের হাতে অসহায় হয়ে পড়েছে। সেহেতু সে তাদের অনুবর্তী সাব্যস্ত হবে। একারণেই তাদের মুকীম অবস্থায় সেও মুকীম হয় এবং তাদের মুসাফির অবস্থায় সেও মুসাফির হয়। সুতরাং অনুবর্তিতার কারণে তার সংরক্ষণ অবস্থা সম্পূর্ণতঃ বাতিল হবে এবং সে ঐ মুসলমানের মত হয়ে যাবে, যে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসতে পারে নি।

কাফফারার বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত হত্যার সাথে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, আমাদের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যায় কাফফারা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হারবী যদি নিরাপত্তা গ্রহণ পূর্বক আমাদের দেশে আগমন করে তাহলে পূর্ণ এক বছর তাকে থাকার সুযোগ দেয়া হবে না। বরং শাসক তাকে বলে দেবেন যে, যদি তুমি পূর্ণ বছর অবস্থান করো তাহলে তোমার উপর জিযিয়া আরোপ করবো।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, দাসত্ব কিংবা জিযিয়া ছাড়া কোন হারবীকে স্থায়ী অবস্থানের অবকাশ প্রদান করা হবে না। কেননা তখন সে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর ও সাহায্যকারী হয়ে যাবে। ফলে মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হবে।

তবে স্বল্প সময় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। কেননা তাও নিষেধ করার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ, আমদানী-রপ্তানী ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং উভয় অবস্থানের মাঝে এক বছর সময়কাল দ্বারা আমরা পার্থক্য নিধারণ করেছি। কেননা এসময় কালে জিযিয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তখন তার অবস্থান হবে জিযিয়ার স্বার্থে। অতঃপর শাসকের বক্তব্যের পরে যদি সে বছর পূর্তির পূর্বেই স্বদেশে চলে যায়, তাহলে তাকে বাধা দেয়ার অবকাশ নেই। আর যদি এক বছর অবস্থান করে তাহলে যিম্মী হয়ে যাবে। কেননা ইমামের ঘোষণার পর এক বছর অবস্থানের মাধ্যমে সে জিযিয়ার দায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং যিম্মী হয়ে যাবে। অবশ্য শাসকের অধিকার রয়েছে এক্ষেত্রে এক বছরের কম সময় নির্ধারণ করার। যেমন– একমাস, দুমাস।

ইমামের ঘোষণা দেয়ার পর যদি (এক বছর) অবস্থান করে, তবে আমাদের কথিত কারণে সে যিম্মী হয়ে যাবে। তখন আর তাকে দারুল হরবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা যিম্মি চুক্তি ভঙ্গ করা যায় না। কিভাবে তাকে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া যাবে?

অথচ এর জিযিয়া বন্ধ হবে এবং (সে ও) তার সন্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হবে আর তাতে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিই রয়েছে।

হারবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করে এবং কোন খারাজী ভূমি ক্রয় করে আর তার ওপর খারাজ ধার্য করা হয় তাহলে সে যিম্মী হয়ে যাবে। কেননা ভূমির ট্যাক্স ব্যক্তি ট্যাক্সের সমপর্যায়ের। আর যখন সে উক্ত দায় গ্রহণ করলো তখন যেন আমাদের দারুল ইসলামে বসবাসের দায় গ্রহণ করলো। কিন্তু শুধু ভূমি ক্রয় দ্বারা যিম্মী হবে না। কেননা সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে পারে। যখন তার ভূমির খারাজ ধার্য হয়ে যাবে তখন পরবর্তীতে আগামী বছরের জন্য তার উপর যিযিয়া লাগু হয়ে যাবে। কেননা খারাজ লাগু হওয়ার কারণে সে যিম্মী হয়ে গেছে। সুতরাং তা আরোপিত হওয়ার সময় থেকে যেমন বিবেচনা করা হবে।

আর কিতাবে যে বলা হয়েছে "যদি তার উপর খারাজ নির্ধারণ করা হয় তাহলে সে যিম্মী হয়ে যাবে" এ হলো খারাজ ধার্যের সুস্পষ্ট শর্ত এবং একে কেন্দ্র করে বহু হুকুম বেরং হবে। সুতরাং এটি যেন উপেক্ষা করা না হয়।

কোন হারবী নারী যদি নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক আগমন করে এবং কোন যিম্মীকে বিবাহ করে তাহলে সেও যিম্মী হয়ে যাবে। কেননা স্বামীর অনুবর্তিনীরূপে সেও অবস্থানের দায় গ্রহণ করেছে।

আর যদি কোন হারবী পুরুষ নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং কোন যিম্মী স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তাহলে সে যিম্মী হবে না।

কেননা তার পক্ষে তো সম্ভব তাকে তালাক দিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া। সুতরাং সে অবস্থানের দায় গ্রহণ করছে বলা যায়না।

কোন হারবী যদি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, অতঃপর দারুল হরবে ফিরে যায় কিন্তু মুসলমান বা যিম্মীর কাছে কোন আমানত গচ্ছিত রেখে যায় কিংবা তাদের কাছে কোন ঋণ পাওনা রেখে যায় তাহলে সম্পর্কের এই রেশটুকু থাকা সত্ত্বেও ফিরে যাওয়ার কারণে তার খুন হালাল হয়ে যাবে।

কেননা সে প্রদত্ত নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছে। আর দারুল ইসলামে বিদ্যমান তার সম্পদ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। যদি সে বন্দী হয় কিংবা দারুল হরব বিজিত হয়

১। দারুল হরবে তার ফিরে যাওয়ার নিষিদ্ধতা, তার ও মুসলমানের মাঝে কিসাস প্রয়োগ, এবং কোন মুসলমান তার মালিকানাধীন শরাব বা শূকর ধ্বংস করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া, এবং সে অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে দিয়ত ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি।

এবং নিহত হয় তাহলে তার প্রাপ্য ঋণগুলো রহিত হয়ে যাবে এবং গচ্ছিত আমানত গনীমতের মাল হয়ে যাবে।

কেননা গচ্ছিত আমানত গুণগতভাবে তার হাতেই রয়েছে। এ কারণে যে আমানত রক্ষাকারীর হাত তার নিজের হাতেরই মতো। সুতরাং তার আপন দেহসত্তার অনুবর্তী হয়ে ঐ মালও গনীমত রূপে গণ্য হবে।

আর ঋণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, ঋণের উপর তার হস্ত নিয়ন্ত্রণের সাব্যস্তি তাগাদা প্রদানের মাধ্যমে হয়। অথচ তাগাদায় অধিকার রহিত হয়ে গেছে। আর যার হাতে ঋণ রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মুসলমানের নিয়ন্ত্রণ থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং সেটা তার সাথেই বিশিষ্ট হবে।

আর যদি সে নিহত হয় কিন্তু দারুল হরব বিজিত না হয় তাহলে ঋণ ও গচ্ছিত আমানত তার উত্তরাধিকারীরা পাবে।

তদ্রূপ স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও একই হুকুম হবে। কেননা তার দেহসত্তা গনীমত হয়নি। সুতরাং তার সম্পদও গনীমত হবে না।

এটা এ কারণে যে, তার মালের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিরাপত্তা এখনো বহাল রয়েছে। সুতরাং ঐ মাল তাকে কিংবা তার পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারীদেরকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর মুসলমানগণ যদি যুদ্ধ ছাড়া ধাওয়া করে হারবীদের মাল কব্জা করে নেয়, তাহলে সেগুলো মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন খারাজের অর্থ ব্যয় করা হয়।**

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটা অমুসলমানদের উৎখাতপূর্বক প্রাপ্ত ভূমি এবং যিযিয়ার মালের মত হলো। আর এ থেকে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) গনীমতের মালের উপর কিয়াস কর বলেন, এতে পঞ্চমাংশ ধার্য হবে।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত এ রেওয়ায়েত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাজার অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের উপর) এবং ওমর (রা) (ইরাকীদের উপর) এবং মু'আয (রা) (ইয়ামানীদের উপর) জিযিয়া নির্ধারণ করেছেন এবং পঞ্চমাংশ পৃথক না করে তা বাইতুল মালে জমা করেছেন।

তাছাড়া এই কারণে যে, এগুলো হচ্ছে মুসলমানদের শক্তি বলে বিনা যুদ্ধে লব্ধ মাল। পক্ষান্তরে গনীমতের মাল হচ্ছে মুজাহিদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এবং মুসলমানদের শক্তি বলে লব্ধ মাল। সুতরাং এ কারণে (অর্থাৎ মুসলমানদের ভীতির) কারণে পঞ্চমাংশের হক সাব্যস্ত হবে এবং আর একটি কারণে (অর্থাৎ মুজাহিদদের প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের কারণে) মুজাহিদদের হক সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে আলোচ্য ক্ষেত্রে একটি মাত্র কারণ রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং পঞ্চমাংশ ধার্য করার কোন যুক্তি নেই।

হারবী যদি নিরাপত্তা গ্রহণ করে আমাদের দারুল ইসলামে আসে এমন অবস্থায় যে, দারুল হরবে তার স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান রয়েছে। আর সম্পদের অংশবিশেষ কোন যিম্মীর কাছে এবং অংশবিশেষ কোন হারবীর কাছে এবং অংশ বিশেষ কোন

মুসলমানদের কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত রয়েছে। এ অবস্থায় সে এখানে ইসলাম গ্রহণ করলো অতঃপর দারুল হরব বিজিত হলো তাহলে ঐ সবকিছু গনীমত হয়ে যাবে।

স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। কেননা তারা প্রাপ্তবয়স্ক হারবী, তার অনুবর্তী নয়। তদ্রূপ স্ত্রী গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ সন্তানও গনীমতের মাল হবে। এর কারণ ইতিপূর্বে আমরা বলেছি (যে, সেটা স্ত্রীলোকটির অংশ বিশেষ)।

আর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান পিতার ইসলামের কারণে তার অনুবর্তীরূপে মুসলমান গণ্য হবে, যদি তার নিয়ন্ত্রণে ও অভিভাবকত্বে থাকে। আর দুই দেশের ভিন্নতার অবস্থায় অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না।

তদ্রূপ দুই দেশের ভিন্নতার কারণে তার দেহসত্তোর নিরাপত্তা লাভের সুবাদে তার সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করবে না। সুতরাং সবকিছু গনীমতের মাল হয়ে যাবে।

যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণের পর দারুল ইসলামে চলে আসে অতঃপর দারুল হরব বিজীত হয় তাহলে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা তাদের পিতার অনুগামী রূপে স্বাধীন মুসলমান গণ্য হবে। কেননা যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে তখন দেশের অভিন্নতার কারণে তারা তার অভিভাবকত্বাধীনে ছিলো।

আর কোন মুসলমান বা যিম্মীর কাছে যে মাল আমানত রেখেছিলো তা তার হবে।

কেননা তা একটি সম্মানযোগ্য কব্জায় ছিলো। আর সেই কব্জা তারই কব্জার মতো এছাড়া সবকিছু গনীমতের মাল হবে।

স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রে কারণ তা-ই যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

হারবীর হাতে রক্ষিত আমানতের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, হারবীর যেহেতু সম্মানযোগ্য নয় সেহেতু উক্ত মাল নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন হয়নি।

কোন হারবী যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে আর কোন মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে আর সেখানে তার মুসলিম উত্তরাধিকারী রয়েছে তাহলে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফ্‌ফরা ছাড়া আর কোন দায় আরোপ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিছাছ ওয়াজিব হবে।

কেননা সম্মান হাসিলকারী হিসাবে ইসলাম হলো (জানমাল) রক্ষাকারী। সুতরাং রক্ষাকারী বিদ্যমান থাকার কারণে (এটা স্বতঃসিদ্ধ যে,) সে একটি নিষ্পাপ প্রাণ হত্যা করেছে।

আর তা এজন্য যে, নিরাপত্তাই হলো মূলতঃ গুনাহগার হওয়ার কারণ। কেননা গুনাহের ভীতি দ্বারাই সতর্কতা অর্জিত হয়। আর তা এখানে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান রয়েছে[১]।

১। যে বিশ্বাস করবে যে, হত্যার কারণে যে পাপগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই তা থেকে সভয়ে নিবৃত্ত হবে। এটাই বিশুদ্ধ স্বভাবের দাবী। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এই পাপবোধই নিরাপত্তা গুণের মূল বিষয় আর তা এখানে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এমন মত কেউ প্রকাশ করেননি যে, মুসলমানকে হত্যা করা পাপ নয়। যেখানেই ঘটুক হত্যাকাণ্ড।

পক্ষান্তরে মূল্য সাব্যস্তকারী গুণটি হচ্ছে মূল নিরাপত্তা গুণের পূর্ণতার পর্যায়। কেননা তাতে অপরাধ থেকে পূর্ণ নিবৃত্তি অর্জিত হয়[১]। সুতরাং এটা হবে মূল নিরাপত্তা গুণের অতিরিক্ত একটি গুণ। তাই মূল নিরাপত্তাগুণ যার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে (অর্থাৎ ইসলাম) পূর্ণতা গুণসম্পন্ন নিরাপত্তাগুণও তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে। (সুতরাং দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী হিজরত না করা ব্যক্তিকে হত্যা করার ফলে দিয়ত ও কাফফারা দুটোই সাব্যস্ত হবে)।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

যদি (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের হয় আর সে মুমিন হয়, তাহলে একটি মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দাসমুক্ত করাকে অবশ্য সাব্যস্ত বিধানের সমগ্র রূপে নির্ধারণ করেছেন আর তা বোঝা গেলো جزاء বা পরিণতি জ্ঞাপক অব্যয় فاء এর দিকে লক্ষ্য করে। কিংবা এদিকে লক্ষ্য করে যে, এটা হচ্ছে উল্লেখিত সমগ্র দন্ড। সুতরাং অন্য সবকিছু নাকচ হয়ে গেলো।

তাছাড়া এই কারণে যে, পাপ সাব্যস্তকারী নিরাপত্তা গুণ সাব্যস্ত হয় মানবত্ব গুণের কারণে। কেননা মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে শরিয়তের বিধান পালনের দায় বহনকারী রূপে। আর তা পালন করা সম্ভব তার উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম হওয়ার মাধ্যমে[২]।

আর সম্পদ হচ্ছে মানবত্ব গুণের অনুবর্তী।

পক্ষান্তরে মূল্য সাব্যস্তকারী 'নিরাপত্তা গুণ' এর ক্ষেত্রে সম্পদ হলো মূল। কেননা মূল্য সম্পন্নতা ক্ষতিপূরণের ইঙ্গিতবাহী। আর তা মালের ক্ষেত্রে হতে পারে, জানের ক্ষেত্রে হতে পার না। কেননা ক্ষতি পূরণের জন্য সাদৃশ্য হলো শর্ত। আর তা মালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান, জানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে জান হলো মালের অনুবর্তী।

আর মালের ক্ষেত্রে মূল্য সাব্যস্তকারী নিরাপত্তা গুণ সাব্যস্ত হবে দারুল ইসলামে সংরক্ষণের মাধ্যমে। কেননা শক্তি বল দ্বারাই সম্মান অর্জিত হয়। সুতরাং (মালের অনুবর্তী) জানের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

তবে শরীয়ত কাফেরদের শক্তির বিবেচনাকে রহিত করেছে। কেননা শরিয়ত তা বাতিল করে দিয়েছে।[৩]

আর মোরতাদ এবং আমাদের দারুল ইসলামে আগমনকারী নিরাপত্তাধারী ব্যক্তি গুণগতভাবে দারুল হরবেরই অধিবাসী। কেননা উভয়ের নিয়ত হলো তথায় স্থানান্তর।

১। কেননা হত্যার কারণ যদি পাপ ও দণ্ড দুটোই সাব্যস্ত হয় তাহলে তা শুধু পাপ সাব্যস্ত হওয়ার তুলনায় অধিক নিবৃত্ত করবে।

২। জীবন ধারণ করা সম্ভব না হলে আহকাম ও বিধান পালন সম্ভব নয়। সুতরাং তার প্রাণনাশ পাপ হবে।

৩। আর দারুল হরবে যখন শক্তির বিদ্যমানতা সাব্যস্ত হলোনা তখন সংরক্ষণ অবস্থাও সাব্যস্ত হলোনা। ফলে মূল্যসম্পন্নতা সাব্যস্তকারী নিরাপত্তা গুণও সাব্যস্ত হলো না। ফলে দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

কেউ যদি যার ওয়ালী সেই এমন কোন মুসলমানকে হত্যা করে কিংবা নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক দারুল ইসলামে আগমন করার পর ইসলাম গ্রহণকারী কোন হারবীকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর 'আকিলাহ'দের উপর শাসকের অনুকূলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কেননা একটি নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন প্রাণকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। সুতরাং তাকেও অন্যান্য সকল সংরক্ষিত প্রাণের উপর কিয়াস করা হবে।

শাসকের অনুকূলে ইমাম মুহম্মদ (র) এর এ কথার অর্থ এই যে, উপরোক্ত অর্থ গ্রহণের হক হলো শাসকের। কেননা তার তো কোন ওয়ারিছ নেই।

আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয় তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে কতল করবেন, আবার ইচ্ছে করলে দিয়ত গ্রহণ করবেন। কেননা জান হলো নিরাপত্তা গুণসম্পন্ন আর হত্যা হলো ইচ্ছাকৃত এবং অভিভাবক হলো জ্ঞাত অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান কিংবা শাসক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

السلطان ولى من لا ولى له

যার কোন অভিভাবক নেই শাসকই হলেন তার অভিভাবক। (আবূ দাউদ)

ইমাম মুহম্মদ (র) এর উক্তি 'ইচ্ছা করলে দিয়ত গ্রহণ করবেন' এ কথার অর্থ হলো সমঝোতার ভিত্তিতে। কেননা, ইচ্ছাকৃত হত্যার অবশ্য সাব্যস্ত শাস্তি হলো স্বয়ং কিছাছ।

দিয়ত গ্রহণের অবকাশ এজন্য যে, আলোচ্য বিষয়ে কিছাছের চেয়ে দিয়ত গ্রহণই অধিক কল্যাণজনক। এ কারণেই অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করার অধিকার তার রয়েছে।

কিন্তু শাসকের ক্ষমা করার অধিকার নেই।

কেননা (কিছাছ বা দিয়তের মূল) হক হলো সাধারণের। আর শাসকের অভিভাবকত্ব হচ্ছে কল্যাণভিত্তিক অথচ কোন বিনিময় ছাড়া সাধারণের হক রহিত করার মধ্যে কল্যাণের কোন দিক নেই।

পরিচ্ছেদ ঃ উশর ও খারাজ প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী বলেন, সমগ্র আরব ভূমি হচ্ছে উশরী ভূমি। আর তার সীমানা হচ্ছে ওযায়ব থেকে নিয়ে ইয়ামানের হাজার অঞ্চলের শেষে সীমা পর্যন্ত তথা মাহরাহ অঞ্চল থেকে শামের সীমানা পর্যন্ত।

আর ইরাকের ভূমি হচ্ছে খারাজী ভূমি। আর তার সীমানা হলো ওযায়ব থেকে হোলওয়ান-এর অধিত্যকা পর্যন্ত ছালাবা (বা অলাছ) থেকে আব্বাদান পর্যন্ত।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন আরব ভূমি থেকে খারাজ গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া এই জন্য যে, খারাজ হচ্ছে গনীমতের সমতুল্য। সুতরাং তা তাদের ভূমিতে সাব্যস্ত হবে না, যেমন তাদের দেহসত্তায় সাব্যস্ত হয়না। এর কারণ এই যে, খারাজ নির্ধারণের শর্ত হলো ঐ ভূমির অধিবাসীদেরকে কুফরির উপর বহাল থাকতে দেয়া।

যেমন ইরাকের ভূখণ্ডে হয়েছে। অথচ আরবের মুশরিকদের বেলায় ইসলাম কিংবা তলোয়ার ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ করা হয় না।

আর ওমর (রা) ইরাক ভূমি জয় করার পর সাহাবা কেরামের উপস্থিতিতে তাতে খারাজ ধার্য করেছেন। তদ্রূপ আমর ইবনুল আছ যখন মিশর জয় করেন তখন তিনি তাতে খারাজ নির্ধারণ করেছেন। তদ্রূপ শামের উপর খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবা কেরাম একমত হয়েছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইরাকের ভূমি তার অধিবাসীদের মালিকানাধীন। তাদের ঐ ভূমি ক্রয়-বিক্রয় এবং তাতে অন্যান্য ব্যবহার বৈধ রয়েছে।

কেননা শাসক যখন কোন ভূখণ্ড শক্তি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেন, তখন তার অধিকার রয়েছে যে, সেই ভূমির বাসিন্দাদের ঐ ভূমিতে বহাল রাখার এবং সেই ভূমির উপর এবং ভূমির বাসিন্দাদের উপর খারাজ নির্ধারণের। তখন ঐ ভূমি ঐ বাসিন্দাদের মালিকানাধীন থেকে যায়। আর ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করে এসেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে সকল ভূমির অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা বলপূর্বক জয় করার পর তা মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা হয়, সেগুলো হলো উশরীভূমি।

কেননা এখানে প্রয়োজন হলো মুসলমানের উপর আর্থিক দায় আরোপের সূচনা করা। আর যেহেতু উশরের মধ্যে ইবাদতের গুণ রয়েছে, সেহেতু সেক্ষেত্রে উশর নির্ধারণই উপযুক্ত। তদ্রূপ তা লঘুতর। কেননা তা উৎপাদিত ফসলের সাথে সম্পৃক্ত।

আর যে সকল ভূমি বলপূর্বক জয় করা হয়েছে এবং ভূমির অধিবাসীদেরকে তাতে বহাল রাখা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে খারাজী ভূমি। একই হুকুম হবে যদি শাসক তাদের সাথে সন্ধি করে থাকেন। কেননা এখানে প্রয়োজন হচ্ছে কাফেরের উপর আর্থিক দায় আরোপের সূচনা করা। আর তার ক্ষেত্রে খারাজই হলো অধিকতর সঙ্গত।

আর মক্কা এই বিধান থেকে ব্যতিক্রম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলপূর্বক তা জয় করেছেন এবং তথাকার অধিবাসীদের তাতে বহাল রেখেছেন কিন্তু তাদের উপর খারাজ ধার্য করেননি।

আর জামেছাগীর কিতাবে বলা হয়েছে যে, যে সকল ভূমি বলপূর্বক জয় করা হয়েছে অতঃপর তাতে খালের পানি দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা হলো খারাজী ভূমি। আর যাতে খালের পানির সেচের ব্যবস্থা করা হয়নি বরং তাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা হলো উশরী ভূমি।

কেননা উশরের সম্পর্ক হলো উৎপাদন গুণ বিশিষ্ট ভূমির সাথে আর ভূমির উৎপাদন গুণের সম্পর্ক হলো পানির সাথে। সুতরাং উশরী পানি দ্বারা কিংবা খারাজী পানি দ্বারা সেচ দেয়ার বিষয়টির বিবেচনা করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি কোন পতিত ভূমি আবাদ করে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর নিকট তা পার্শ্ববর্তী ভূমির সাথে বিবেচ্য হবে। সুতরাং যদি তা খারাজী ভূমির পাশ্ববর্তী হয় তাহলে খারাজী ভূমি হবে। আর যদি উশর ভূমির পার্শ্ববর্তী হয় তাহলে উশরী ভূমি হবে আর তাঁর মতে বসরার সমগ্র এলাকা হল উশরী ভূমি— যেহেতু এ ব্যাপারে ছাহাবা কেরামের ইজমা রয়েছে।

কেননা কোন কিছুর পার্শ্ববর্তীকে তারই হুকুম প্রদান করা হয়। যেমন বাড়ির সংলগ্ন (পতিত) ভূমিকে বাড়ির পর্যায়ভুক্ত ধরা হয়। এমন কি (মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও) তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বাড়ির মালিকের জন্য বৈধ রয়েছে। তদ্রূপ আবাদ ভূমির সন্নিকটবর্তী (পতিত) ভূমিকে আবাদ করা জায়েয নেই। (কেননা তা আবাদভূমির হুকুমভুক্ত)।

বছরার ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি ছিলো খারাজী ভূমি হওয়া। কেননা তা খারাজী ভূমির নিকটবর্তী। কিন্তু ছাহাবা কেরাম তাতে উশর নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তাঁদের ইজমা-এর কারণে কিয়াস বর্জন করা হয়েছে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, কূপ খননের মাধ্যমে কিংবা ঝরণা উৎসারিত করার মাধ্যমে কিংবা দজলা ফোরাতের পানি দ্বারা অথবা বড় নদীর পানি দ্বারা যা মানুষের মালিকানাধীন হয়না– যদি এ সকল পানি দ্বারা যমীন আবাদ করা হয় তাহলে তা উশরীভূমি হবে। তদ্রূপ উশরী হবে যদি বৃষ্টির পানি দ্বারা আবাদ করা হয়।

আর যদি অনারব আজমীদের খননকৃত খালের পানিতে আবাদ করা হয়, যেমন– বাদশাহ নাওশেরাওয়ার (খননকৃত) খাল এবং ইয়াজদাজারদ এর (খননকৃত) খাল, তাহলে সেটা খারাজী ভূমি হবে। এজন্য যে, পানির বিবেচনার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা পানিই হলো ভূমির উৎপাদনশীলতার কারণ।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুসলমানের উপর জবরদস্তি প্রথম পর্যায়ে খারাজের দায় আরোপ সম্ভব নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে পানির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কেননা খারাজী পানি দ্বারা সেচ দান খারাজের দায়গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

ইমাম কুদূরী বলেন, ওমর (রা) ইরাকবাসীদের উপর যে হারে খারাজ নির্ধারণ করেছিলেন, তা এই– প্রতি জারীব[১]। সেচ প্রাপ্ত ফসলী জমিতে হাশেমী এক কাফীয অর্থাৎ এক ছা' শস্য এবং এক দেরহাম। আর তরিতরকারীর জমিতে জারীব প্রতি পাঁচ দেরহাম এবং নিরেট আঙ্গুর বা খেজুর বাগানে জারীব প্রতি দশ দেরহাম[২]।

হযরত ওমর (রা) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। কেননা তিনি ওসমান বিন হুনায়ফ (র) কে ইরাকের ভূমি জরিপের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং হযরত হোযায়ফা (রা)কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। জরিপে জমির পরিমাণ হয়েছিল ছত্রিশ লক্ষ জারীব। সেই জমিতে আমাদের বর্ণিত হারে হযরত ওমর (রা) সাহাবা কেরামের উপস্থিতিতে খারাজ নির্ধারণ করেছেন এবং কোন প্রতিবাদ হয়নি। ফলে এতে তাদের পক্ষ থেকে ইজমা (সর্বসম্মতি) সাব্যস্ত হয়েছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, উৎপাদন ব্যয় ও শ্রমের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। আংগুর বাগানের ব্যয় সবচে কম। আর ফসলী জমির খরচ সবচে বেশি। এবং তরিতরকারীর জমিতে খরচ উভয়ের মধ্যবর্তী। আর উৎপাদন খরচের তারতম্যে ধার্যকৃত ভূমিকর তারতম্যপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই আঙ্গুর বাগানে সর্বোচ্চ কর এবং ফসলী জমিতে সর্ব নিম্ন কর এবং তরতকারীর জমিতে মধ্যবর্তী কর ধার্য করা হয়েছে।

১। জারীব অর্থ ষাট হাত দৈর্ঘ্য এবং ষাট হাত প্রস্থ বিশিষ্ট ভূমি, প্রতি হাত হলো সাত মুষ্টি। আর দেরহাম দ্বারা ওযনে সাব'আ-এর দেরহাম উদ্দেশ্য।

২। যদি ফসলী জমির ফাঁকে ফাঁকে তার চার পাশে আঙ্গুর গাছ বা খেজুর গাছ রোপণ করা হয় তাহলে তার উপর কোন কর আসবেনা।

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ এছাড়া অন্য প্রকার উৎপাদনে যেমন জাফরানের চাষ এবং বাগবাগিচা ইত্যাদিতে অবস্থা ভেদে সাধ্য অনুযায়ী খারাজ নির্ধারণ করা হবে।

কেননা এসকল ক্ষেত্রে ওমর (রা) থেকে নির্ধারিত খারাজ সাব্যস্ত নেই। আর তাঁর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু সাধ্যের তারতম্যের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে, সেহেতু যে সকল ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারণ নেই সেখানে আমরা সাধ্য অনুপাতে বিবেচনা করব।

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, সাধ্যের চূড়ান্ত সীমা হলো ধার্যকৃত কর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক হওয়া। এর বেশি ধার্য করা যাবেনা। কেননা অর্ধা-অর্ধি করা পূর্ণ ন্যায়ানুগ বিষয়। বিশেষতঃ আমাদের তো অধিকার ছিলো সমগ্রকেই মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেওয়ার।

আর বাগান বলতে দেওয়াল বেষ্টিত যমি বুঝান হয়েছে। যাতে ফাঁকে ফাঁকে খেজুর গাছ এবং অন্যান্য গাছ রয়েছে।

আমাদের (ফারগানা) দেশে সর্বপ্রকার জমিতে দেরহাম দ্বারা কর ধার্য করা হয়েছে এবং এভাবেই তা চালু রাখা হয়েছে। কেননা অবশ্য কর্তব্য হলো কর নির্ধারণ যেন সাধ্য পরিমাণে হয়, তা যে জিনিস দ্বারাই হোক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ভূমি যদি ধার্যকৃত কর বহন করতে না পারে তাহলে শাসক তা হ্রাস করবেন।

ফসল কম হওয়ার ক্ষেত্রে হ্রাস করা সর্বসম্মতভাবেই বৈধ। দেখুন না, হযরত ওমর (র) বলেছেন,

لعلكما حملتما الأرض مالاتطيق فقالا بل حملناهاماتطيق ولو زدناها لاطاقت

হয়ত তোমরা ভূমির উপর সাধ্যাতীত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তারা দু'জন বললেন, না, বরং আমরা সহনীয় পরিমাণেই চাপিয়েছি। এমন কি যদি আরো বৃদ্ধি করতাম তাহলে ভূমি তাও বহনযোগ্য ছিল। এ বক্তব্য হ্রাস করার বৈধতা প্রমাণ করে।আর হ্রাস করার উপর কিয়াস করে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে ফসলের বেশি ফলনের সময় কর বৃদ্ধি করা জায়েয। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে তা বৈধ নয়। কেননা ওমর (রা) কে অতিরিক্ত বহন ক্ষমতা বিদ্যমান থাকার কথা অবহিত করা সত্ত্বেও তিনি তা বৃদ্ধি করেন নি।

খারাজী জমি যদি অতি পানি বা অল্প পানির সংকটে নিপতিত হয় কিংবা ফসল কোন আপদ বিশিষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাতে খারাজ আসবে না।

কেননা (পানি সমস্যার ক্ষেত্রে) ফসল উৎপন্ন করার সক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ সামর্থ্যই হলো গুণগত ফলনশীলতা যা খারাজের ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

পক্ষান্তরে ফসল বিপদগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বছরের কিয়দংশে গুণগত ফলনশীলতা বিলুপ্ত হয়েছে; অথচ পূর্ণ বছরের জন্য ফলনশীল হওয়া শর্ত। যেমন যাকাতের সম্পদের ক্ষেত্রে। কিংবা বিষয়টি এমন যে, ফসল উৎপন্ন হওয়ার অবস্থায় প্রকৃত ফলনশীলতার উপরই বিধান আবর্তিত হবে। (কিন্তু প্রকৃত ফলনশীলতা বিনষ্ট হয়েছে। সুতরাং খারাজ রহিত হবে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ভূমিওয়ালা যদি ভূমি চাষাবাদ ফেলে রাখে তাহলে তার উপর খারাজ আসবে। কেননা সামর্থ্য তো বিদ্যমান ছিলো। সে নিজেই তা হাত ছাড়া করেছে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, বিনা ওজরে যদি উচ্চ মানের চাষের পরিবর্তে নিম্নমানের চাষ গ্রহণ করে তাহলে তার উপর উচ্চ হারের খারাজই ধার্য হবে। কেননা অধিক লাভের সুযোগ সে-ই নষ্ট করেছে। এ বিধান নীতিগতভাবে তো জানা থাকা উচিত। তবে এর অনুকূলে ফতোয়া প্রদান করা হবে না, যাতে জালিম শাসকেরা মানুষের অর্থ হরণে দুঃসাহসী না হয়ে উঠে।

খারাজীদের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার থেকে যথা পূর্ব খারাজ গ্রহণ করা হবে। কেননা তাতে 'ভূমির দায়' বহনের দিক রয়েছে। সুতরাং চলমান অবস্থার ক্ষেত্রে ভূমির দায় বহনের দিকটি বিবেচনা করা হবে। এ হিসাবে মুসলমানের উপর তা বহাল রাখা সম্ভব।

মুসলমানের জন্য জিম্মীর কাছ থেকে খারাজী ভূমি ক্রয় করা জায়েয আছে এবং তার থেকে খারাজ নেয়াও হবে। এর কারণ আমরা এইমাত্র বলেছি। আর বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত যে, সাহাবা কেরাম খারাজী ভূমি ক্রয় করেছেন এবং তারা খারাজই আদায় করতেন। সুতরাং তা মুসলমানের জন্য খারাজী ভূমি ক্রয়ের, খারাজ পরিশোধের এবং উশুলের বৈধতা প্রমাণ করে, কোন প্রকার কিরাহাত ব্যতীত।

খারাজী ভূমির উৎপন্ন ফসলে উশর নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উশর ও খারাজ একত্র করা হবে। কেননা এ হচ্ছে ভিন্ন দুটি হক যা পৃথক দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন দুই কারণে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং এ দুটি স্ববিরোধী নয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– لا يجتمع عشر وخراج فى ارض مسلم কোন মুসলমানের ভূমিতে খারাজ ও উশর একত্রিত হবেনা। তাছাড়া ন্যায়বিচারক কিংবা অত্যাচারী কোন শাসকই দুটিকে একত্রে আরোপ করেননি। আর তাদের ইজমা ও সর্বসম্মতি প্রমাণ রূপে যথেষ্ট।

তাছাড়া এ কারণে যে, খারাজ ওয়াজিব হয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে বিজিত ভূমির উপর। আর উশর ওয়াজিব হয় ঐ ভূমিতে, যার অধিবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এ দুটি অবস্থা একটি ভূমিতে একত্রিত হতে পারেনা। তদুপরি উভয় হক সাব্যস্ত হওয়ার হেতু অভিন্ন। অর্থাৎ ফলনশীল ভূমি। তবে উশর ক্ষেত্রে বাস্তবগত ফলনশীলতা বিবেচ্য। পক্ষান্তরে খারাজের ক্ষেত্রে গুণগত ফলনশীলতা বিবেচনা করা হয়। এ কারণেই উভয়টিকেই ভূমির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

দুটির কোন একটির সাথে যাকাত আরোপ করার বিষয়টিও একই মতবিরোধপূর্ণ।

এক বছরের একাধিক ফলনের কারণে একাধিক খারাজ আরোপিত হবে না।

কেননা হযরত ওমর (র) খারাজ পুনঃ পুনঃ ধার্য করেন নি। উশরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা প্রতিটি উৎপন্ন ফসল উশর সাব্যস্ত না হলে উশর তথা দশমাংশ বাস্তবায়িত হবে না।

পরিচ্ছেদ ঃ জিযিয়া

জিযিয়া দু'প্রকার। এক প্রকার জিযিয়া পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়। সুতরাং যে পরিমাণের উপর ঐকমত্য হয়, সে পরিমাণই হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের সাথে এক হাযার দিরহাম ও দুইশ প্রস্থ পোষাকের উপর সমঝোতা করেছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে, এখানে পারস্পরিক সম্মতিই সাব্যস্তকারী। সুতরাং যে পরিমাণের উপর ঐক্যমত হয়েছে তা লংঘন করে অন্য পরিমাণ ধার্য করা যাবে না।

আরেক প্রকার জিযিয়া হলো কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করা এবং তাদেরকে তাদের সহায়-সম্পদের উপর বহাল রাখার পর শাসক নিজেই শুরুতে যা নির্ধারণ করেন।

সেক্ষেত্রে মালদার ব্যক্তির উপর প্রতি বছর আটচল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ করবেন এবং প্রতিমাসে চার দেরহাম হারে উশুল করবেন। আর মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উপর চব্বিশ দেরহাম জিযিয়া ধার্য করবেন এবং প্রতিমাসে দুই দেরহাম উশুল করবেন। আর শ্রমে নিযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তির উপর বার দেরহাম ধার্য করবেন এবং মাস প্রতি এক দেরহাম উশুল করবেন।

এটা আমাদের মত। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, সর্বাবস্থায় এক দীনার বা দীনারের সমপরিমাণ ধার্য করা হবে। এক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র সমান। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (র) কে বলেছিলেন,

خذمن كل حالم وحالمة دينارا او عدله معافر

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নর ও নারী থেকে এক দীনার কিংবা তার সম পরিমাণ 'মাআফেরী চাদর' উশুল করো।

এখানে ধনী দরিদ্রের মাঝে পার্থক্য করেননি। তাছাড়া এই কারণে যে, জিযিয়া ওয়াজিব হয় হত্যার পরিবর্তে। এ কারণেই যাদেরকে কুফুরির কারণে হত্যা করা জায়েয নেই তাদের উপর জিযিয়া ওয়াজিব হয় না। যেমন– শিশু ও স্ত্রী লোক। আর এই গুণগত দিক ধনী-দরদ্র উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদের মাযহাব হযরত ওমর, ওসমান ও আলী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। আর আনসার ও মুহাজিরদের কেউ তাঁদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেননি।

তাছাড়া এ কারণে যে, তা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা হিসাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং ভূমির খারাজের মত তারতম্যের ভিত্তিতেই জিযয়া সাব্যস্ত হবে।

এর প্রমাণ এই যে, জিযিয়া ওয়াজিব হয়েছে যুদ্ধে জান ও মাল দ্বারা সাহায্য করার বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে।[১] আর তা সম্পদের প্রাচুর্য ও সল্পতার কারণে পার্থক্য করা হয়।[২]

১। কেননা ধর্ম বিশ্বাস ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে দারুল হরবের প্রতি তার দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। এ কারণে একজন যিম্মী দেশ রক্ষা ও দেশ জয়ের যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারুল ইসলামকে সাহায্য করার যোগ্যতা রাখেনা। তাই মুজাহিদদের জন্য ব্যয়িত খারাজকে তার স্থলবর্তী করা হয়েছে।

২। কেননা মুসলমান যদি উচ্চবিত্ত হতো তাহলে একজন অশ্বারোহী ও তার অশ্বারোহী গোলামকে সাহায্য করতো পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত ব্যক্তি শুধু একজন অশ্বারোহীকে সাহায্য করতো আর নিম্নবিত্ত ব্যক্তি শুধু পদাতিকের সাহায্য করতো।

সুতরাং যা তার স্থলবর্তী তাও পার্থক্যপূর্ণ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা এক্ষেত্রে প্রযুক্ত যে, তা সমঝোতার ভিত্তিতে হয়েছিলো। এ কারণেই তিনি তাকে আদেশ করেছেন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর নিকট থেকে গ্রহণের অথচ তার থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কিতাবী ও মাজুসীদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে (তাদের সঙ্গে লড়াই কর) যতক্ষণ না তারা জিযিয়া প্রদান করে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাজুসীদের উপর জিযিয়া ধার্য করেছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এবং আজমের মূর্তি পূজকদের উপর।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন. আল্লাহর আদেশ وَقَاتِلُوْهُمْ এর কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অবশ্য কর্তব্য। তবে কিতাবীদের ক্ষেত্রে লড়াই পরিহার করার বৈধতা আমরা কিতাবুল্লাহর দ্বারা জেনেছি। আর মাজুসীদের ক্ষেত্রে হাদীস দ্বারা জেনেছি। সুতরাং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিধানটি মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, যেহেতু তাদেরকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ, সেহেতু তাদের উপর জিযয়া আরোপ করাও বৈধ হবে। কেননা উভয়ের প্রতিটি দেহসত্তার স্বত্ব হরণ করার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে এভাবে যে সে উপার্জন করে মুসলমানদেরকে প্রদান করে অথচ তার ভরণ-পোষণ নিজের উপার্জনের উপর।

যদি জিযিয়া নির্ধারণের আগেই তাদের উপর বিজয় অর্জিত হয় তাহলে তারা, তাদের স্ত্রীরা এবং তাদের সন্তানরা মালে গনীমত হবে। যেহেতু তাদের গোলাম বানানো বৈধ।

আরবের মূর্তিপূজকদের উপর এবং (আরব-অনারব) মোরতাতদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করা হবে না।

কেননা তাদের কুফরী গুরুতর। আরবের মুশরিকদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং কোরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে মুজিযা অধিক প্রকাশিত।

আর মোরতাদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তার প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে, তাকে ইসলামের দিক পথ প্রদর্শন এবং ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য অবগত করার পর। সুতরাং অধিক শাস্তি হিসাবে উভয় দল থেকে ইসলাম কিংবা তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে আরব মুশরিকদের দাস বানানো যাবে। তাঁর জবাব তা-ই, যা আমরা পূর্বে বলেছি। যদি তাদের উপর বিজয় অর্জিত হয়, তবে তাদের স্ত্রী ও

সন্তানরা মালে গনীমত হবে। কেননা, মোরতাদ হওয়ার অপরাধে হযরত আবূ বকর (র) বনী হানীফ গোত্রের স্ত্রীলোকদের এবং সন্তানদের দাস বানিয়েছিলেন এবং তাদের মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করেছিলেন।

তাদের পুরুষদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করা হবে আমাদের উল্লেখকৃত কারণে।

কোন স্ত্রীলোক এবং কোন সন্তানের উপর জিযিয়া আরোপ করা হবে না।

কেননা তা হত্যার কিংবা লড়াইয়ে যোগ দেয়ার বিকল্প হিসাবে ওয়াজিব হয়। আর এদেরকে হত্যাও করা যায় না এবং লড়াইয়েও নিযুক্ত করা যায় না। কেননা তাদের সে যোগ্যতা নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পঙ্গু ও অন্ধের উপরও নয়।

তদ্রূপ অর্ধাঙ্গ রোগাক্রান্ত এবং অতি বৃদ্ধের উপরও নয়। কারণ আমরা বর্ণনা করেছি (যে তাদেরকে হত্যা করা যায়না এবং লড়াইয়ে নিযুক্ত করা যায় না)।

আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার মাল থাকলে ধার্য করা হবে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে সে হত্যাযোগ্য, যদি সে মন্ত্রণাদাতা হয়।

কর্মহীন[১] দরিদ্রের উপরও নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার দলীল হলো মু'আয (রা) সংশ্লিষ্ট হাদীসের নিঃশর্ততা। আর আমাদের দলীল এই যে, হযরত উসমান (রা) কর্মহীন দরিদ্রের উপর জিযিয়া ধার্য করেননি। আর এ সিদ্ধান্ত সাহাবা কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছিলো।

তাছাড়া এই কারণে যে, যে ভূমির সামর্থ্য নেই তার উপর ভূমির খারাজ ধার্য করা হয়না। সুতরাং এই খারাজও সামর্থ্য ছাড়া ধার্য করা হবেনা।

আর হাদীসটি শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।

সাধারণ দাস-দাসী মুকাতাব, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ দাসীর উপর জিযিয়া ধার্য করা হবে না।

কেননা তাদের ক্ষেত্রে এটা হত্যার বিকল্প আর আমাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধে সাহায্য করার বিকল্প। দ্বিতীয় দিক থেকে জিযিয়া ধার্য হতে পারেনা। সুতরাং সন্দেহের কারণে ধার্য হবে না। **তাদের পক্ষ থেকে তাদের মনিবগণও পরিশোধ করবে না।**

কেননা তাদের কারণে মনিবগণ অতিরিক্ত পরিমাণ বহন করেছে। **আর ঐ সব রাহিবদের উপর ধার্য করা হবেনা যারা লোকদের সাথে মেলামেশা করেনা।**

ইমাম কুদূরী (র) এখানে এরূপই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুহম্মদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা যদি কর্মক্ষম হয় তাহলে তাদের উপর ধার্য করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এরও এই মত।

ধার্য করার কারণ এই যে, সে নিজেই তার কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগায়নি। সুতরাং খারাজী জমিকে অনাবাদ রেখে দেয়ার মত হলো।

ধার্য না করার কারণ এই যে, তারা যদি মানুষের সাথে সংস্রব না রাখে তাহলে তাদের হত্যা করা যায় না। অথচ তাদের দিক থেকে জিযিয়া আরোপের কারণ হলো হত্যা-শাস্তি রহিত হওয়া।

১। কাজ করতে অক্ষম কিংবা যোগাড় করতে অক্ষম।

আর শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির সুস্থ হওয়া জরুরী। অবশ্য বছরের অধিকাংশ সময় সুস্থ থাকাই যথেষ্ট হবে।

জিযিয়া ধার্যকৃত যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তার উপর থেকে জিযিয়া রহিত হয়ে যাবে।

তদ্রূপ যদি কাফের অবস্থায় মারা যায়। উভয় ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা জিযিয়া ওয়াজিব হয়েছে নিরাপত্তা গুণ লাভের বিনিময়ে কিংবা বসবাসের অধিকার লাভের বিনিময়ে আর বিনিময় (তথা নিরাপত্তা গুণ ও বসবাসের অধিকার) তার কাছে পৌঁছে গেছে। সুতরাং বিনিময়ে সাব্যস্ত জিনিস এই উদ্ভূত কারণে রহিত হবেনা। যেমন ভাড়ার ক্ষেত্রে এবং কিছাছের পরিবর্তে সমঝোতাকৃত রক্তপণের[১] ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ليس على مسلم جزية (الترمذى) (কোন মুসলমানের উপর জিযিয়া নেই।)

তাছাড়া এ কারণে যে, এটা কুফুরির শাস্তি রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। এ কারণেই এটাকে جزية বলে। বস্তুত جزية ও جزاء অভিন্ন অর্থপূর্ণ। আর কুফুরির শাস্তি ইসলামের কারণে রহিত হয়ে গেছে। আর মৃত্যুর পর শাস্তি কার্যকর করা যায় না।

আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, দুনিয়াতে শাস্তি প্রবর্তন করা হয় শুধু দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য। আর তা মৃত্যুর কারণে এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে দূরীভূত হয়ে গেছে।

আর তৃতীয় কারণ এই যে, আমাদের দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে (যুদ্ধে) সাহায্য করার পরিবর্তে। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর সে নিজস্বভাবেই সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে।

আর নিরাপত্তা গুণ তার মানবত্ব গুণের কারণে সাব্যস্ত হয়। আর যিম্মী তো তার নিজস্ব মালিকানাধীন স্থানে বাস করে। সুতরাং নিরাপত্তা গুণের এবং বসবাসের অধিকারের বিনিময়ে জিযিয়া ধার্য করার কোন অর্থ নেই।

যদি তার উপর দুই বছরের জিযিয়া একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে উভয় জিযয়া একীভূত হয়ে যাবে।

জামেছাগীরের এ যাবত এরূপ যার কাছ থেকে তার মাথার খারাজ (অর্থাৎ জিযয়া) উসুল করা হয়নি, এমন কি বছর অতিক্রান্ত হয়ে নতুন বছর এসে গেছে; তাহলে বিগত বছররে খারাজ নেয়া হবে না।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, নেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)ও এই মত।

আর যদি বছর পূর্তির মাথায় সে মারা যায় তাহলে সকলের মতেই তার থেকে জিযিয়া নেয়া হবে না। বছরের যে কোন অংশে মারা গেলেও একই হুকুম।

১। অর্থাৎ যিম্মী যদি ভাড়াকৃত বাড়ির পূর্ণ উপকার ভোগ করে নেয়। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে এই উদ্ভূত কারণে ভাড়া বাড়ির ভাড়া রহিত হয় না। কেননা যে জিনিসের বিনিময়ে ভাড়া সাব্যস্ত হয়েছে তাতো তার কাছে পৌঁছে গেছে। সুতরাং বিনিময়ে সাব্যস্ত ভাড়া রহিত হবেনা। তদ্রূপ হত্যা করার পর যদি সে নির্ধারিত রক্তপণের ভিত্তিতে কিছাছ থেকে সমঝোতা করে নেয় এরপর মৃত্যুবরণ করে বা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে নির্ধারিত রক্তপণ রহিত হবেনা। কেননা যার বিনিময়ে এই রক্তপণ, অর্থাৎ তার জানের নিরাপত্তা সেটাতো তার কাছে পৌঁছে গেছে। সুতরাং বিনিময়ে সাব্যস্ত রক্তপণও রহিত হবেনা। আলোচ্য ক্ষেত্রেও একই কথা।

মৃত্যুর বিষয়ে তো আমরা কারণ উল্লেখ করেছি। আর কেউ কেউ বলেন যে, জমির খারাজ সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য। কিন্তু কারো কারো মতে সর্বসম্মত ভাবেই তাতে একীভূত হওয়ার অবকাশ নেই।

মত পার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে সাহেবায়নের দলীল এই যে, খারাজ তো বিনিময়রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। আর কতগুলো বিনিময় যদি একত্র হয়ে যায় এবং সেগুলো উশুল করা সম্ভব হয় তাহলে সেগুলো অবশ্যই উশুল করা হবে। আর আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে কয়েক বছর পরও তা সম্ভব।

কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন।.কেননা ঐ অবস্থায় তার নিকট থেকে উশুল করা সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলিল এই যে, এটা কুফুরির উপর হঠকারী হয়ে থাকার শাস্তিরূপে সাব্যস্ত হয়েছে; যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি। এ কারণেই যদি সে তার নায়েবের হাতে তা পাঠিয়ে দেয় তাহলে বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে তা গ্রহণ করা হবে না। বরং তাকে স্বশরীরে তা জমা দেয়ার আদেশ করা হবে। এবং সে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রদান করবে। আর গ্রহণকারী তা বসে গ্রহণ করবে। আর অন্য এক বর্ণনা মতে জামার বুক ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে বলা হবে এই যিম্মী, মতান্তরে এই আল্লাহর দুশমন, জিয়য়া দাও। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এটা শাস্তি। আর শাস্তিসমূহ একত্র হলে একীভূত হয়ে পড়ে; যেমন– হদ্দসমূহের ক্ষেত্রে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাদের দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে হত্যার বিকল্প হিসাবে। আর আমাদের দিক থেকে সাব্যস্ত হয়েছে (যুদ্ধে) সাহায্য করার (বাধ্যবাধকতার) বিকল্প হিসাবে। যেমন– আমরা উল্লেখ করে এসেছি। তবে ভবিষ্যতের হত্যার বিকল্প বিগত কালের হওয়ার বিকল্প নয়।

কেননা হত্যা-শাস্তিতো কার্যকর করা হয় বর্তমানে বিদ্যমান যুদ্ধের কারণে, বিগত যুদ্ধের কারণে নয়। তদ্রূপ সাহায্য করার বিষয়টিরও ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যা বিগত হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে।

আর জামেছাগীর কিতাবে জিযয়া সম্পর্কে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর বক্তব্য, অন্য একবছর এসে গেছে। এটাকে কোন কোন মাশায়েখ রূপক অর্থে বিগত হওয়া ধরেছেন এবং বছর শেষে জিযয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং দুই জিযয়া একত্র হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বছর অতিক্রান্ত হওয়া অনিবার্য। তখন দুই জিযয়া একীভূত হবে।

পক্ষান্তরে কোন কোন ম্যাশায়েখের মতে এটা প্রকৃত অর্থেই প্রযুক্ত। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বছর শুরু হওয়া দ্বারাই ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং বছর শুরু হওয়া দ্বারাই দুই জিযয়া একত্র সমাবেশ বিদ্যমান হয়ে যাবে।

বিশুদ্ধতম মত এই যে, আমাদের মতে বছরের শুরুতেই وجوب সম্পন্ন হয়ে যায়।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে যাকাতের উপর কিয়াস করে বছরের শেষে ওজুব (وجوب) সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, যে জিনিসের বিনিময় রূপে তা সাব্যস্ত হচ্ছে, সেটা ভবিষ্যতেই শুধু সম্পন্ন হয়: যেমন আমরা প্রমাণ করে এসেছি। সুতরাং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বছরের শুরুতে সাব্যস্ত করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ

দারুল ইসলামে গীর্জা ও উপাশনালয় নতুনভাবে তৈরি করা জায়েয নয়।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– لاخصاء في الاسلام ولاكنيسة (ইসলামে খোজা করণ ও গীর্জার অবকাশ নেই।) উদ্দেশ্য হলো নতুনভাবে তৈরি করা।

যদি প্রাচীন গীর্জা বা উপাসনালয় ভেঙ্গে যায় তাহলে সেগুলোর পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

কেননা ভবন তো চিরস্থায়ী থাকেনা। অথচ শাসক যখন দারুল ইসলামে তাদের বহাল করেছেন তখন (ধরে নেয়া হবে যে,) তিনি তাঁদের পুনর্নির্মাণের সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাদের উহা স্থানান্তারের সুযোগ দেয়া হবে না।

কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা নতুন বানানো। আর নির্জনতার জন্য 'সাধুনিবাস' গীর্জার সমতুল্য। তবে ঘরে প্রার্থনাস্থল নির্ধারণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা বাসস্থানের অনুবর্তী। (নিষেধাজ্ঞার) এ বিধান শহরের সাথে সীমিত. গ্রামে প্রযোজ্য নয়। কেননা শহরেই ইসলামের বিশিষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রভিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। সুতরাং তার বিপরীত কিছু প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবেনা।

কোন কোন মতে আমাদের দেশে গ্রামেও নিষেধ করা হবে। কেননা সেখানেও কতিপয় ইসলামী নিদর্শন রয়েছে। আর মাযহাব প্রধান ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো কুফার গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে। কেননা সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী হলো যিম্মী।

আরব ভূখণ্ডে শহরে গ্রামে সর্বত্রই নিষেধ করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– لايجتمع دينان في جزيرة العرب

জারীরাতুল আরবে দুটি দীন একত্র হতে পারবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যিম্মীদেরকে তাদের পোষাকে, বাহনে জিন বা গদিতে এবং টুপিতে মুসলমানদের থেকে ভিন্নতা রক্ষা করতে বাধ্য করা হবে। সুতরাং তারা ঘোড়ায় চড়বে না এবং অস্ত্র বহন করবে না।

জামে ছাগীর কিতাবে রয়েছে যে, যিম্মীদের বাধ্য করা হবে তাদের ধর্মীয় ডোর প্রকাশ্যভাবে বাঁধতে এবং গাধার পিঠে ব্যবহৃত জিনের অনুরূপ জিন ব্যবহার করতে।

এ বিষয়ে বাধ্য করার কারণ হচ্ছে তাদের প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করা[১] এবং দুর্বল মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করা।[২]

১। যিম্মীগণ যেহেতু মুসলিম সমাজে মিশে থাকে, সেহেতু উভয়ের মাঝে পরিচয় চিহ্ন অপরিহার্য। যেন না চেনার কারণে কাফেরের সাথে মুসলমানের ন্যায় আচরণ না করা হয়। যেমন না বুঝে তাকে মুসলমানের মত সম্মান করা হলো যা জায়েয নয়। তাছাড়া হয়ত পথে আকস্মিক মৃত্যু হলো আর তার পরিচয়হীনতার কারণে তার জানাযা পড়া হলো, ইত্যাদি। মদীনার ইহুদীরা যেহেতু চেনাজানা ছিলো সেহেতু তাদেরকে আলাদা পরিচয় চিহ্ন ধারণের আদেশ দেয়া হয়নি। আর পরিচয় চিহ্ন যখন ধারণ করতেই হবে তখন এমন কিছুই ধারণ করতে হবে, যাতে মর্যাদা না বোঝায় বরং হীনতা বোঝায়।

২। অর্থাৎ জৌলুস দেখে যেন হীনমন্যতায় না ভোগে এবং নিজের ঈমানের ব্যাপারে সন্দীহান না হয়ে পড়ে যে, আমরা হক হলে আমাদের অবস্থা এমন তুচ্ছ এবং তাদের অবস্থা এমন শানদার কেন?

তাছাড়া মুসলমান হলো সম্মান করার যোগ্য আর যিম্মী হলো অসম্মান করার যোগ্য। তাকে আগে সালাম দেওয়া যাবেনা, এবং রাস্তায় তাকে পাস কেটে যেতে বাধ্য করা হবে। অথচ তার মাঝে যদি পার্থক্যকারী কোন চিহ্ন না থাকে তাহলে হয়ত তার সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হবে, যা জায়েয নয়।

আর চিহ্ন হতে হবে পশমের মোটা ডোর যা তাদের বাঁধবে। রেশমের ডোর বাঁধতে পারবেনা। কেননা এতে মুসলমানদের প্রতি হামবড়াই ভাব রয়েছে।

পথে ঘাটে ও হাম্মামখানায় তাদের নারীরা আমাদের নারীদের থেকে পৃথক পরিচয় বহন করবে এবং তাদের বাড়ি ঘরেও পরিচয় চিহ্ন রাখবে, যাতে তাদের দুয়ারে ভিক্ষুক গিয়ে না দাঁড়ায় এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ না করে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, বরং অধিকতর সংগত হলো প্রয়োজন ছাড়া তাদেরকে বাহনে আরোহণ করতে না দেয়া। আর প্রয়োজনে আরোহণ যদি করেই তাহলে মুসলমানদের সমাবেশস্থলে যেন নেমে যায়। আর যদি প্রয়োজনে বাধ্য হয়, তবে উপরে বর্ণিত কারণে জিন যেন ব্যবহার করে। আলেম, বুজুর্গ ও অভিজাত লোকদের বিশিষ্ট পোষাক ব্যবহার করা থেকে তাদের বিরত রাখা হবে।

কেউ যদি জিযিয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকে; কিংবা কোন মুসলমানকে হত্যা করে কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় কিংবা কোন মুসলিম নারীর সাথে যিনা করে তাহলে তার যিম্মী চুক্তি ভঙ্গ হবেনা।

কেননা যে চূড়ান্ত সীমা দ্বারা লড়াইয়ের ইতি হয় সেটা হলো জিযয়ার দায় গ্রহণ করে নেওয়া, আদায় করা নয়। আর দায় গ্রহণ করার বিষয়টি তো এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে চুক্তি ভঙ্গ হবে। কেননা সে মুসলমান হলে তার ঈমান ভংগ হতো সতুরাং নিরাপত্তা ভঙ্গ হবে। কেননা যিম্মী চুক্তি হচ্ছে ঈমানের স্থলবর্তী।

আমাদের দলীল এই যে, নবীকে গালি দেওয়া হল তার পক্ষ থেকে কুফুরি। আর তার সাথে গোড়া থেকে জড়িত কুফুরি যখন তার নিরাপত্তা রহিত করে না তখন পরে উদ্ভূত কুফুরিও তা রহিত করবেনা।

ইমাম কুদূরী বলেন, যিম্মীর চুক্তি শুধু এ অবস্থায়ই ভঙ্গ হবে যদি সে দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হয় অথবা কোন স্থানে আধিপাত্য বিস্তার করে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কেননা তাতে সে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পক্ষ হয়ে গেলো ফলে যিম্মী চুক্তি অর্থহীন হয়ে যায়। আর চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের অনিষ্ট রোধ করা।

আর যিম্মী যদি চুক্তিভঙ্গ করে তাহলে সে মোরতাদদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

এর অর্থ এই যে, দারুল হরবে পলায়নের কারণে তার প্রতি মৃত্যুর হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা সে কাফের মৃতদের সাথে মিলিত হয়ে গেছে।

তদ্রূপ যে মাল সাথে নিয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও সে মোরতাদ তুল্য হবে। তবে পার্থক্য এই যে, বন্দী করা হলে তাকে দাস বানানো হবে। কিন্তু মোরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন।

অনুচ্ছেদ ঃ

বনী তাগলির গোত্রে নাছারাদের মাল থেকে মুসলমানদের থেকে নেয়া যাকাতের পরিমাণের দ্বিগুণ নেয়া হবে। কেননা হযরত ওমর (রা) সাহাবাদের উপস্থিতিতে এই শর্তে তাদের সাথে সমঝোতা করেছিলেন। আর তাদের নারীদের থেকেও নেয়া হবে কিন্তু তাদের নাবালকদের থেকে নেয়া হবে না।

কেননা যাকাতের দ্বিগুণ নির্ধারণের উপর সমঝোতা হয়েছে। আর স্ত্রীলোকদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। কিন্তু নাবালকদের উপর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং দ্বিগুণের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

ইমাম যুফার (র) বলেন, তাদের স্ত্রীলোকদের থেকেও নেয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) এরও এই মত।

কেননা প্রকৃতপক্ষে এ হল জিযয়া। যেমন হযরত ওমর (রা) বলেছেন,

هذه جزية فسموها ماشئتم

এটা তো জিযিয়া, তোমাদের ইচ্ছা যে নামে নামকরণ কর।

এ কারণেই একে জিযিয়ার খাতে খরচ করা হয়। আর স্ত্রীলোকদের উপর জিযয়া ধার্য হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, এ মাল সমঝোতার মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে। আর স্ত্রী লোক, এ ধরনের মাল তার উপর ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য।

আর বাইতুল মালের মাল হিসেবেই মুসলমানদের জনকল্যাণকর কাজকর্মই হলো এর ব্যয়ক্ষেত্র। আর এ ব্যয় ক্ষেত্র জিযয়ার সাথে বিশিষ্ট নয়। দেখুন না এটা গ্রহণের ক্ষেত্রে জিযিয়ার শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয় না।

তাগলাবীর আযাদকৃত দাসের উপর খারাজ তথা জিয্য়া এবং ভূমির খারাজ ধার্য করা হবে। যেমন কোরায়শীর আযাদ কৃত দাসের ক্ষেত্রে।

ইমাম যুফার (র) বলেন, তার ক্ষেত্রেও দ্বিগুণ করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إن مولى القوم منهم কোন কাওমের আযাদকৃত দাস ঐ কাওমের অন্তর্ভুক্ত।

দেখুন না, যাকাতের মাল হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে হাশেমী আযাদকৃত গোলাম হাশেমীর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, দ্বিগুণ গ্রহণের অর্থ হলো (তাগলিবী পরিচয়ের কারণে বিধানটিতে) লঘুতা আনয়ন। (কেননা জিযয়ায় অপদস্থতা বিদূরীত হয়েছে।) আর লঘুতার ক্ষেত্রে মাওলা মূল মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। এ কারণেই মুসলমানের আযাদকৃত (অমুসলিম) দাসের উপর জিযয়া আরোপ করা হয়, যদি সে নাছরাণী হয়।

যাকাত হারাম হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সন্দেহ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং হাশেমীর হকের ক্ষেত্রে হাশেমীর 'মাওলা'কেও তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ধনীর মাওলার ক্ষেত্রে যাকাত হারাম না হওয়ার কারণে আপত্তি উত্থাপিত হবে না। কেননা ধনীও সত্তাগতভাবে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। কিন্তু স্বচ্ছলতা হচ্ছে প্রতিবন্ধক, যা তার মাওলার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে হাশেমী কোন অবস্থাতেই এই দানের উপযুক্ত নয়। কেননা তার সম্মান ও মর্যাদাকে মানুষের ময়লা থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। সুতরাং তার মাওলাকেও তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে সমস্ত খারাজ ভাগলাবী থেকে উশুলকৃত মাল এবং মুসলিম শাসককে হারবীদের প্রদত্ত উপহার ও জিযয়ার মাল যা শাসক সংগ্রহ করেন, সেগুলো মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন সীমান্ত রক্ষার কাজে, পুল ও সেতু নির্মাণের কাজে ব্যয় হবে। আর মুসলমানদের বিচার কার্য ও শাসন কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং আলিমদের তা থেকে প্রয়োজন পরিমাণ প্রদান করা হবে। আর তা থেকে যোদ্ধা এবং তাদের সন্তানদের (ও পরিবার পরিজনদের) ভাতা দেওয়া হবে।

কেননা বিনা লড়াইয়ে যেহেতু তা মুসলমানদের হাতে এসেছ সেহেতু এটা বাইতুল মালের মাল আর বাইতুল মাল মুসলমানদের কল্যাণ কার্যের জন্যই নিবেদিত। আর উল্লেখিত সকলে মুসলমানদের সেবা কর্মে নিয়োজিত। আর সন্তান সন্ততি (ও পরিবার পরিজনের) ভরণ পোষণ পিতার দায়িত্বে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ মাল প্রদান না করা হলে তারা উপার্জনে নিয়োজিত হতে বাধ্য হবে। ফলে লড়াইয়ের জন্য অবসর পাবে না।

আর উল্লেখিত লোকদের যে কেউ বছরের মাঝে মারা যায়, কোন ভাতা তার প্রাপ্য হবে না।

কেননা এটা এক ধরনের দান। প্রাপ্য ঋণ নয়। এ কারণেই এটাকেও عطاء বা দান বলা হয়। সুতরাং হস্তগত করার পূর্বে তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না এবং মৃত্যুর কারণে তা রহিত হয়ে যাবে।

আমাদের যুগে ভাতার হকদাররা হলেন কাজী (বিচারক), মুদাররিস (দীনী শিক্ষক) ও মুফতী প্রমুখ। আল্লাহই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ঃ মোরতাদদের বিধানসমূহ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আল্লাহ পানাহ, মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি তার মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তার সন্দেহ দূর করা হবে।

কেননা, হতে পারে যে, তার মনে কোন সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং তা নিরসন করা উচিত। আর তাতে (হত্যা কিংবা পুনঃ ইসলাম গ্রহণ এই) দুই পন্থার উত্তম পন্থায় তার দুষ্কৃতি প্রতিরোধ করা হয়। তবে মাশায়েখগণ বলেছেন যে, ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়। কেননা তার কাছে তো (ইসলামের) দাওয়াত পৌছেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তাকে তিনদিন আটক রাখা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

আর জামে ছাগীর কিতাবে রয়েছে, মোরতাদ স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম, তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

প্রথম বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, সে (চিন্তা-ভাবনা ও মতবিনিময়ের জন্য) সময় প্রার্থনা করলে তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে। কেননা এ হচ্ছে ওজর অজুহাত পরীক্ষা করে দেখার জন্য শরীয়ত নির্ধারিত সময় সীমা। (যেমন ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভালোমন্দ ভেবে দেখার জন্য তিনদিন সময় দেয়া হয়।)

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় প্রার্থনা করুক বা না করুক, তাকে তিন দিন অবকাশ দেয়া মুসতাহাব।

ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিন দিন সময় দেয়া শাসকের অবশ্য কর্তব্য। এর পূর্বে তাকে হত্যা করা তাঁর জন্য বৈধ হবে না।

কেননা বাহ্যতঃ মুসলমানের ধর্মত্যাগ উদ্ভূত কোন সন্দেহের কারণেই হয়ে থাকবে। সুতরাং এমন একটা সময় সীমা অপরিহার্য, যা তাকে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিবে। আর সেটাকে আমরা তিন দিন নির্ধারণ করেছি।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ (মুশরিকদের হত্যা করো)।

এখানে অবকাশ প্রদানের শর্ত নেই। অদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।

তাছাড়া এই কারণে যে, সে হলো এক হারবী কাফের, যার নিকট দাওয়াত পৌছেছে। সুতরাং অবকাশ প্রদান ছাড়া তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা যাবে। এর কারণ এই যে,একটি ধারণাজাত বিষয়ের কারণে ওয়াজিব কাজে বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

স্বাধীন ও গোলামের মাঝে পার্থক্য না করার কারণ হলো দলীলসমূহের নিঃশর্ততা।

তার তাওবার ছুরত এই যে, সে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মের সাথে নিজের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করবে। কেননা তার তো কোন ধর্ম নেই।

আর যদি যে ধর্ম সে গ্রহণ করেছে তা থেকে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করে তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইসলাম পেশ করার পূর্বেই যদি কোন হত্যাকারী তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে হত্যাকারীর উপর কোন দায় সাব্যস্ত হবে না। এখানে কারাহাত (বা মাকরূহ হওয়া) এর অর্থ হলো মোস্তহাব বা পছন্দনীয় কাজ তরক করা। ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ এই যে, কুফুরি হচ্ছে হত্যাকে বৈধতা দানকারী একটি অবস্থা। আর দাওয়াত পৌছার পর ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়।

মোরতাদদের স্ত্রীলোককে হত্যা করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তাকে হত্যা করা হবে। এর কারণ আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া এ কারণে যে, পুরুষের ধর্মত্যাগ এদিক থেকে হত্যাকে বৈধতা দানকারী যে, তা একটি গুরুতর অপরাধ। সুতরাং তার সাথে গুরুতর শাস্তি সম্পৃক্ত হবে। আর অপরাধের গুরুত্বের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ধর্মত্যাগ পুরুষের ধর্মত্যাগের সমকক্ষ। সুতরাং অপরাধের পরিণতির ক্ষেত্রেও তাকে সমান অংশীদার করবে।

আমাদের দলীল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের হত্যা করাও নিষেধ করেছেন। তাছাড়া দলীল এই যে, মূল তো হলো অপরাধের শাস্তি আখেরাত পর্যন্ত স্থগিত রাখা। কেননা তড়িৎ শাস্তি প্রদান পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করে। এ বিধান থেকে সরে আসা হয়েছে শুধু তাৎক্ষণিক অনিষ্ট রোধ করার জন্য। আর তা হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ। পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকদের থেকে তো দেহকাঠামোগত যোগ্যতার অভাবের কারণে সে আশংকা দেখা দেবে না। পুরুষদের বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং মোরতাদ নারী আসল কাফের নারীর মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তবে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে।

কেননা সে আল্লাহর হক স্বীকার করার পর তা আদায় করা থেকে বিরত রয়েছে। সুতরাং আটক করে তাকে তা আদায় করতে বাধ্য করা হবে। যেমন বান্দার হকের ক্ষেত্রে। আর **জামে ছাগীর কিতাবে রয়েছে; স্ত্রীলোক স্বাধীন হোক কিংবা দাসী, তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। আর দাসীকে তার মনিব বাধ্য করবে।**

বাধ্য করার কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

আর মাওলার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ এই যে, তাতে (আল্লাহর হক এবং মনিবের হক) দুটি হকের সমাবেশ রয়েছে। আরো বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন তাকে প্রহার করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ধর্মত্যাগের কারণে মোরতাদদের যাবতীয় মালামাল থেকে তার মালিকানা সংরক্ষিত অবস্থায় বিলুপ্ত হবে। সুতরাং যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মালিকানা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। মাশায়েখগণ বলেছেন, এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। আর ছাহেরায়নের মতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। কেননা সে দায়িত্ববান মুহতাজ (প্রয়োজন গ্রস্ত) ব্যক্তি। সুতরাং কতল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার মালিকানা বহাল থাকবেঃ যেমন কিছাছ ও রজম-এর শাস্তি দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, সে হচ্ছে আমাদের করতলগত এক হারবী। তাই তাকে হত্যার বিধান রয়েছে। অথচ হারব বা যুদ্ধ ছাড়া হত্যা হতে পারেনা। আর আমাদের করতলগত হারবী হওয়া তার সত্ব ও স্বত্ত্বাধিকার এর বিলুপ্তিকে অবশ্য সাব্যস্ত করে।

তবে যেহেতু সে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্ত। আর ইসলামে তার প্রত্যাবর্তন আশা করা যায়। তাই তার ব্যাপারে আমরা তার স্বত্ব স্থগিত রেখেছি।

যদি সে পুনঃইসলাম গ্রহণ করে তাহলে (মালিকানা বিলুপ্তির) এই হুকুমের ক্ষেত্রে এই উদ্ভূত উপসর্গটিকে ধরে নেয়া হবে যেন তার অস্তিত্বই হয়নি। এবং যেন সে অব্যাহত ভাবে মুসলমানই রয়েছে: আর (মালিকানা বিলুপ্তির) কারণ কার্যকরী হয়নি।

আর যদি ধর্মত্যাগের অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, কিংবা দারুল হরবে পৌছে যায় আর (আদালতের পক্ষ হতে) তার চলে যাওয়ার ঘোষণা জারি হয়ে যায় তাহলে তার কুফুরি স্থায়ী হয়ে যাবে কাজেই কারণ কার্যকরী হবে এবং তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর যদি সে মোরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় তাহলে মুসলমান অবস্থায় যা উপার্জন করেছিল, তা তার মুসলিম উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তরিত হবে। আর মোরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করবে তা মালে গনীমত হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ বলেন, উভয় অবস্থার উপার্জন তার উত্তরাধিকারীদের জন্য হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় অবস্থার উপার্জন মালে গনীমত হবে। কেননা কাফির অবস্থায় মারা গেছে। আর মুসলমান ফকিরের উত্তরাধিকারী হয় না। তারপর এ হলো হারবীর নিরাপত্তা গুণ বঞ্চিত মাল। সুতরাং তা মালে গনীমত হবে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, মোরতাদ হওয়ার পরও উভয় অবস্থায় উপার্জনের মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং তা তার মৃত্যুর পর পর উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হবে। এবং এই উত্তরাধিকার লাভ তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বমুহূর্তের সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা ধর্মত্যাগ হলো মৃত্যুর কারণ। সুতরাং এই হিসাবে মুসলমান থেকে মুসলমানের উত্তরাধিকার লাভ হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, ইসলামের অবস্থায় উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে এই সম্পৃক্ততা সম্ভব। কেননা তা ধর্মত্যাগের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্ম ত্যাগের পরবর্তী উপার্জনের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা সম্ভব নয়। কেননা ধর্মত্যাগের পূর্বে তা বিদ্যমান ছিল না। অথচ উত্তরাধিকার লাভের সম্পৃক্ততার জন্য রিদ্দাতের পূর্বেই তা বিদ্যমান হওয়া শর্ত।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে উত্তরাধিকারী সেই হতে পারবে, যে লোকটির ধর্মত্যাগের অবস্থায়ও তার উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলো এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত উত্তরাধিকারীরূপে বহাল ছিলো। তিনি সম্পৃক্ততার বিষয়টির বিবেচনা করেছেন।

তার পক্ষ থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, রিদ্দাতের সময় যে তার উত্তরাধিকারী (হওয়ার যোগ্য) ছিলো সে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং (মোরতাদের মৃত্যুর পূর্বে) তার মৃত্যু হওয়ার কারণে তার উত্তরাধিকারের হকদারি বাতিল হবে না। বরং তার উত্তরাধিকাররা তার স্থলবর্তী হবে।

কেননা রিদ্দাত বা ধর্মত্যাগ মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত।

তাঁর পক্ষ হতে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ণনা এই যে, তিনি মোরতাদের মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন।

কেননা কার্যকারণ অস্তিত্ব লাভ করার পর পূর্ণতা লাভের পূর্বে সম্পন্ন কার্য (মূলতঃ) অস্তিত্ব লাভের পূর্বে সম্পন্ন কার্যের অনুরূপ। যেমন দখল গ্রহণের পূর্বে বিক্রিত (পশু বা দাসী)-এর গর্ভ থেকে জন্মলাভকারী সন্তান।

রিদ্দাতের অবস্থায় যদি সে মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় আর তার মুসলিম স্ত্রী ইদ্দতের অবস্থায় থাকে তাহলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা সে মীরাছ ফাঁকিদানকারী গণ্য হবে। যদিও মোরতাদ হওয়ার সময় সে সুস্থ থেকে থাকে।

আর মোরতাদ নারীর উপার্জন তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। কেননা তার পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশংকা নেই। সুতরাং মালে গনীমত হওয়ার কারণ বিদ্যমান হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর নিকট মোরতাদের বিষয়টি ভিন্ন।

আর সে যদি অসুস্থ অবস্থায় মোরতাদ হয় তাহলে তার মুসলিম স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা সে তার উত্তরাধিকার বাতিল করার ইচ্ছে করেছে। আর (মোরতাদ হওয়ার সময়) সুস্থ থাকলে স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা তাকে তো হত্যা করা হয় না। সুতরাং রিদ্দাত বা ধর্মত্যাগের কারণে তার মালের সাথে তার হক সম্পৃক্ত হয় না। কিন্তু মোরতাদের বিষয়টি ভিন্ন।

ইমাম কুদূরী বলেন, আর যদি সে মোরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায় এবং শাসক তার অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা জারি করেন, তাহলে তার মোদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদ (দাস-দাসীরা) আযাদ হয়ে যাবে এবং তার ঋণগুলো দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর মুসলমান অবস্থায় যা সে উপার্জন করেছে সেগুলো তার মুসলমান উত্তরাধিকারীর কাছে হস্তান্তরিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার মাল স্থগিত অবস্থায় থাকবে। (দারুল হরবে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে) যেমন ছিল।

কেননা এ হল এক ধরনের নিরুদ্দেশ হওয়া। সুতরাং দারুল ইসলামের নিরুদ্দেশ হওয়ার সদৃশ হবে।

আমাদের দলীল এই যে, দারুল হরবে চলে যাওয়ার মাধ্যমে সে (চূড়ান্ত) মোরতাদ সাব্যস্ত হয়ে গেলো। আর ইসলামের যাবতীয় আহকামের ক্ষেত্রে তারা মৃত তুল্য। কেননা তাদের উপর বিধান আরোপ করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়; যেমন মৃতদের থেকে রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এ হল মৃত্যু তুল্য।

তবে আদালতের ফায়সালা ছাড়া তার অন্তর্ভুক্তি স্থিতিবান হবে না। কেননা দারুল ইসলামে তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আদালতের পক্ষ হতে ফায়সালা হওয়া অপরিহার্য। আর যখন তার গুণগত মৃত্যু স্থিতিবান হয়ে গেলো তখন সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো, যা আমরা উল্লেখ করেছি, তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন প্রকৃত মৃত্যুর ক্ষেত্রে।

অতঃপর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে মোরতাদদের দারুল হরবে চলে যাওয়ার সময় তার উত্তরাধিকার বিবেচ্য হবে। কেননা দারুল হরবে অন্তর্ভুক্তিই হলো কারণ। আদালতের ফায়সালার প্রয়োজনীয়তা শুধু বিষয়টির নিশ্চয়তার জন্য, যাতে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা (আইনসঙ্গতভাবে) রহিত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আদালতের ফায়সালার সময় উত্তরাধিকার বিবেচ্য। কেননা আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে (তার গুণগত মৃত্যু স্থির হবে এবং) সে মৃত বলে গণ্য হবে। মোরতাদ স্ত্রীলোক দারুল হরবে চলে গেলে তার হুকুমের ব্যাপারেও এ মতভেদ রয়েছে।

মুসলমান অবস্থায় যে সকল ঋণ তার উপর চেপেছে সেগুলো মুসলমান অবস্থার উপার্জন দ্বারা শোধ করা হবে। আর মোরতাদ অবস্থার ঋণ মোরতাদ অবস্থার উপার্জন দ্বারা শোধ করা হবে।

অধম বান্দা (হেদায়া গ্রন্থকার) বলে, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন– এটা হল ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা। তাঁর আরেকটি বর্ণনা এই যে, মুসলমান অবস্থার উপার্জন দ্বারা ঋণ পরিশোধ শুরু করা হবে। যদি তা দ্বারা পরিশোধ পূর্ণ না হয় তাহলে মোরতাদ অবস্থার উপার্জন থেকে শোধ করা হবে।

তার পক্ষ থেকে এর বিপরীত বর্ণনাও পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, দুই কারণে (অর্থাৎ দুই সময়ের ঋণ গ্রহণ দ্বারা) সাব্যস্ত ঋণের মাঝে (গুণগত) ভিন্নতা রয়েছে। এবং উভয় উপার্জনের প্রতিটি ঐ 'কারণ' এর সাথে বিবেচ্য হবে যা দ্বারা ঋণ অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে।[১]

সুতরাং প্রতিটি ঋণ ঐ উপার্জন দ্বারা পরিশোধিত হবে, যে উপার্জন ঐ ঋণের অবস্থায় উপার্জিত হয়েছে। যাতে দায় ভোগ ফল ভোগের বিনিময়ে হয়।[২]

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল এই যে, মুসলমান অবস্থার সম্পদ হচ্ছে তার মালিকানাধীন। এ কারণেই ঐ সম্পদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী তার স্থলবর্তী হয়। আর উত্তরাধিকারগত স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো 'মুরিছ'[৩]-এর হক থেকে সম্পদ মুক্ত হওয়া। সুতরাং ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে উত্তরাধিকারের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মোরতাদ অবস্থার ঋণ তার মালিকানাধীন নয়। কেননা ইমাম সাহেবের মতে 'রিদ্দাত' বা ধর্মত্যাগের কারণে মালিকানার যোগ্যতা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে না। যদি না অন্য ক্ষেত্র থেকে (অর্থাৎ মুসলমান অবস্থায় উপার্জন থেকে) তা শোধ করা অসম্ভব হয়। তখন অবশ্য এখান থেকেও শোধ করা হবে। যেমন জিম্মী যদি 'লাওয়ারিছ' অবস্থায় মারা যায়। তখন তার সম্পদ মুসলিম জন সাধারণের হয়ে যায়। আর যদি তার উপর কোন ঋণের দায় থাকে তাহলে উক্ত সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করা হবে। এখানেও অনুরূপ হবে।

তৃতীয় বর্ণনার কারণ এই যে, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ ওয়ারিছদের হক। আর মোরতাদ অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ হল তার নিজস্ব হক। সুতরাং তা থেকে ঋণ পরিশোধ করাই অধিকতর সঙ্গত হবে। তবে যদি তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব হয়, তখন মুসলমান অবস্থায় উপার্জন দ্বারাও তা পরিশোধ করা হবে, তার হককে অগ্রাধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে।

১। অর্থাৎ উপার্জনে নিযুক্ত হওয়ার 'অনুপ্রেরিকা' হচ্ছে ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থের সংস্থান করা। কেননা ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে প্রধানতম কর্তব্য। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, সাব্যস্ত ঋণ পরিশোধের জন্যই সে উপার্জন করেছে। সুতরাং উপার্জন প্রকারান্তরে ঋণেরই সুফল। সুতরাং ঐ ঋণের পরিশোধ ঐ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যাতে সুফলের সাথেই দায় সম্পৃক্ত হয়।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– الغرم بالغنم। (দায়ভোগ ফলভোগের বিনিময়ে হবে।)

৩। মুরিছ অর্থ ঐ ব্যক্তি যার মৃত্যুর পর অন্যরা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, উভয় উপার্জন থেকেই তার ঋণসমূহ পরিশোধ করা হবে। কেননা উভয় সম্পদই তার মালিকানাধীন, যে জন্য উভয় সম্পদে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়। আল্লাহই অধিক অবগত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোরতাদ অবস্থায় যে যা বিক্রি করে বা খরিদ করে বা আযাদ করে বা দান করে বা বন্ধক রাখে বা নিজের সম্পদে যে কোন ব্যবহার করে, তা স্থগিত থাকবে। যদি পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার উক্ত মেলামেশাসমূহ বৈধ হয়ে যাবে। আর যদি মারা যায় বা নিহত হয় বা দারুল হরবে চলে যায় তাহলে সেগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, উভয় অবস্থায় কৃতকার্য বৈধতা লাভ করবে।

উল্লেখ্য যে, মোরতাদের কৃত কার্যসমূহ কয়েক প্রকার ঃ

১. সর্বসম্মত রূপে কার্যকর। যেমন– দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ করা এবং তালাক দেওয়া। কেননা (প্রথম ক্ষেত্রে) প্রকৃত মালিকানার প্রয়োজন হয় না। আর (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে) পূর্ণ শরীয়তি কর্তৃত্ব প্রয়োজন হয় না।

২. সর্বসম্মতরূপে তা বাতিল। যেমন– বিবাহ এবং তার যবাইকৃত পশু। কেননা এ দুটো দ্বীন নির্ভর বিষয়। অথচ তার কোন মিল্লাত নেই।

৩. সর্বসম্মত রূপে তা স্থগিত। যেমন– শিরকাতুল মুফাওযা (ব্যবসায় সম অংশিদারিত্ব)। কেননা এ অংশিদারিত্ব সমতার উপর নির্ভর করে। অথচ পুনঃ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত মোরতাদ ও মুসলমানের মাঝে সমতা নেই।

৪. স্থগিত থাকার মধ্যে মতপার্থক্য আর তা হলো আমাদের উপরোল্লেখিত বিষয়সমূহ।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, বৈধতা নির্ভর করে যোগ্যতার উপর আর কার্যকারিতা নির্ভর করে মালিকানার উপর। আর যেহেতু মোরতাদ শরীয়তের সম্বোধন পাত্র সেহেতু যোগ্যতার বিদ্যমানতা সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা নেই। তদ্রূপ মালিকানাও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা বহাল থাকে। এ কারণেই যদি রিদ্দতের ছয় মাসের মাথায় মুসলিম স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে সে তার ওয়ারিস হবে। পক্ষান্তরে রিদ্দাতের পর মৃত্যুর পূর্বে যদি উক্ত সন্তান মারা যায় তাহলে সে তার ওয়ারিস হবে না।

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, তার মৃত্যুর পূর্বের কার্যসমূহ বৈধতা লাভ করল, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এ বৈধতা একজন সুস্থ লোকের বৈধতার অনুরূপ। কেননা ইসলামের দিকে তার পুনঃপ্রত্যাবর্তনই স্বাভাবিক, যদি সন্দেহ নিরসন করা হয়। তখন তাকে আর হত্যা করা হবে না। যেমন– মোরতাদ নারীকে কতল করা হয় না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে এ বৈধতা (মৃত্যুশয্যায়) অসুস্থ ব্যক্তির বৈধতার অনুরূপ হবে। কেননা কেউ যখন কোন ধর্মমত গ্রহণ করে। বিশেষতঃ ঐ ধর্ম ত্যাগ করে যার উপর সে প্রতিপালিত হয়েছে তখন নতুন ধর্মমত খুব কমই সে পরিত্যাগ করে থাকে। ফলে তা কতল পর্যন্ত গড়ানোই স্বাভাবিক। মোরতাদ নারীর বিষয়টা ভিন্ন। কেননা তাকে তো হত্যা করা হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অপদস্থ হারবী যেমন আমরা মালিকানা স্থগিত হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনা করে এসেছি। আর কার্যকারিতা স্থগিত হওয়া মালিকানা স্থগিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তার অবস্থা নিরাপত্তা ছাড়া দারুল ইসলামে প্রবেশকারী হারাবীর মত হলো। পাকড়াও করা হবে এবং অপদস্থ করা হবে আর যেহেতু তার অবস্থা ঝুলন্ত সেহেতু তার কার্যকারিতা সমূহ স্থগিত থাকবে। আর মোরতাদও অনুরূপ।

আর হারবী ও মোরতাদ উভয়ের ক্ষেত্রে হত্যা যোগ্যতার কারণ হচ্ছে (আল্লাহ প্রদত্ত) নিরাপত্তা গুণ রহিত হয়ে যাওয়া। সুতরাং এটি তার যোগ্যতাকে বিঘ্নিত করবে। কিন্তু যিনাকারী ও ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের ক্ষেত্রে হত্যা যোগ্যতার কারণ হচ্ছে অপরাধের শাস্তি।

মোরতাদ নারীর বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সে হারবী নারী নয়। তাই তাকে হত্যা করা হয় না।

মোরতাদ যদি তার দারুল হরবে পলায়নের ঘোষণা জারি হওয়ার পর পুনঃ মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ওয়ারিসদের হাতে তার যে মাল হুবহু বিদ্যমান পাবে তা সে নিয়ে নিবে।

কেননা মোরতাদ তার মালের প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণেই ওয়ারিস সেই মালের ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তী হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে আসে তখন সে ঐ সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। সুতরাং তাকে ওয়ারিসদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

তবে ওয়ারিস যদি ঐ মালকে তার মালিকানাচ্যুত করে ফেলে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অদ্রূপ তার উম্মে ওয়ালাদ ও মোদাব্বারদের বিষয়টিও ভিন্ন হবে। কেননা বৈধতা দানকারী প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে আদালতের রায় বৈধ হয়েছিলো। সুতরাং তা বাতিল হবে না। আর যদি ফাঁসীর রায় ঘোষিত হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণপূর্বক ফিরে আসে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যেন মুসলিম রূপেই বহাল রয়েছে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি (যে, আদালতের ঘোষণা ছাড়া তার পলায়ন স্থিত হয় না)।

মোরতাদ যদি মুসলিম অবস্থায় তার যে খ্রিস্টান (বা ইহুদী) দাসী ছিলো তার সাথে সহবাস করে আর ঐ দাসী রিদ্দাত থেকে নিয়ে ছয় মাসের বেশি সময় পরে সন্তান প্রসব করে আর সে পিতৃত্ব দাবী করে তাহলে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং নবজাতক তার পুত্র রূপে স্বাধীন হবে। কিন্তু তার উত্তরাধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে দাসী যদি মুসলিম হয় আর সে মোরতাদ অবস্থায় মারা যায় কিংবা দারুল হরবে দাখিল হয়ে যায় তাহলে ঐ সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে।

সন্তান উৎপাদনের বৈধতার কারণ তো আমরা পূর্বেই বলেছি (যে, এর জন্য প্রকৃত মালিকানার প্রয়োজন নেই।) আর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দাসী মাতা যখন খৃষ্টান হবে এবং ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের বাধ্যবাধকতার কারণে মোরতাদ ইসলামের নিকটবর্তী হিসাবে সন্তান যখন (ধর্মের ক্ষেত্রে) তার অনুবর্তী হবে তখন সে সন্তান মোরতাদের হুকুমভুক্ত হবে। আর মোরতাদ মোরতাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। পক্ষান্তরে মুসলিম দাসী হলে তার অনুবর্তীরূপে সন্তানও মুসলিম হবে। কেননা ধর্মতঃ উভয়ের মাঝে সেই উত্তম। আর মুসলিম মোরতাদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

মোরতাদ যদি নিজ সম্পদসহ দারুল হরবে চলে যায় এরপর মুজাহেদীন বিজয়ী হয়ে ঐ সম্পদের উপর কব্জা করে, তাহলে তা গনীমতরূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি একা চলে যায় এরপর ফিরে এসে সম্পদ নিয়ে আবার দারুল রবে চলে যায় এরপর মোজাহেদীন বিজয়ী হয়ে ঐ মালের উপর কব্জা করে। এমতাবস্থায় ওয়ারিসগণ যদি গনীমত বন্টনের পূর্বে ঐ মাল পেয়ে যায়, তাহলে তা তাদেরকে অর্পণ করা হবে।

কেননা প্রথমোক্ত সম্পদ এমন যাতে উত্তরাধিকার আদৌ কার্যকর হয়নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত সম্পদ কাজী কর্তৃক তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার ঘোষণা দেয়ার কারণে উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছিলো। সুতরাং ওয়ারিস ঐ সম্পদের পূর্ববর্তী মালিক বিবেচিত হবে।

মোরতাদ যদি তার গোলাম রেখে দারুল হরবে চলে যায় আর ঐ গোলাম তার পুত্রের মালিকানাভুক্ত বলে ঘোষিত হয় এবং পুত্র তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করে এরপর মোরতাদ পুনঃ ইসলাম গ্রহণপূর্বক ফিরে আসে, তাহলে কিতাবাত চুক্তি বৈধ থাকবে। তবে কিতাবাতের অর্থ এবং তার উত্তরাধিকারী হওয়ার হক এবং ওয়ালা বা মুক্তিদান সম্পর্ক পুনঃ ইসলাম গ্রহণকারী মোতাদের জন্য হবে।

কেননা কার্যকরকারী দলীল বিদ্যমান থাকার কারণে যেহেতু কিতাবাত চুক্তি কার্যকর হয়েছে, সেহেতু তা বাতিল হওয়ার কোন কারণ নেই। সুতরাং উত্তরাধিকারীকে যে তার স্থলবর্তী হয়েছিলো– তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ওকীল বিবেচনা করবো। আর কিতাবাত চুক্তির অধিকার ও দায় মোয়াক্কেলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর গোলামের মুক্তি যার পক্ষ থেকে হয় ওয়ালা (বা মুক্তিদান সম্পর্ক) তার অনূকূলেই সাব্যস্ত হয়।

মোরতাদ যদি কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করে দারুল হরবে দাখিল হয়ে যায় কিংবা ধর্মচুত্যির কারণে তাকে হত্যা করা হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শুধু তার মুসলিম অবস্থায় উপার্জিত অর্থের দ্বারা দিয়ত আদায় হবে। সাহেবায়নের মতে ইসলাম ও রিদ্দত উভয় অবস্থায় উপার্জিত সমস্ত সম্পদ থেকে দিয়ত আদায় হবে।

কেননা এখানে 'সাহায্য সম্পর্কর' অনুপস্থিতির কারণে নিকটবর্তী আত্মীয়গণ মোরতাদের রক্ত পণের দায় গ্রহণ করবে না। সুতরাং তার সম্পদেই দিয়ত সাব্যস্ত হবে। আর সাহেবায়নের মতে উভয় অবস্থার উপার্জনই তার সম্পদ রূপে বিবেচিত। কেননা উভয় অবস্থাতেই সম্পদের উপর তার ব্যবহার কার্যকর হয়। আর এ কারণেই তাদের মতে উভয় উপার্জনে উত্তরাধিকার প্রয়োগ হয়।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে মুসলিম অবস্থার উপার্জনই হলো তার সম্পদ। কেননা শুধু ঐ সম্পদেই তার ব্যবহার কার্যকর হয়। মোরতাদ অবস্থার উপার্জন তার সম্পদ নয়। কেননা তাতে তার ব্যবহার স্থগিত থাকে। এ কারণেই তাঁর মতে প্রথমোক্ত সম্পদ হলো মীরাছ আর দ্বিতীয়োক্ত সম্পদ হলো গনীমত।

কোন মুসলমানের হাত যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কেটে ফেলা হয় এরপর আল্লাহ না করুন সে মোরতাদ হয়ে যায় এবং ঐ ক্ষতের কারণে রিদ্দাতের অবস্থায় মারা যায়, কিংবা দারুল হরবে দাখিল হয়ে যায় অতঃপর পুনঃ ইসলাম গ্রহণপূর্বক ফিরে আসে এবং ঐ

ক্ষতের কারণে মারা যায়; তাহলে কর্তনকারীর উপর তার মাল থেকে অর্ধেক দিয়ত সাব্যস্ত হবে এবং তা মোরতাদের ওয়ারিছরা পাবে।

প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে কারণ এই যে, (কর্তনজনিত ক্ষতের) সংক্রমণ নিরাপত্তাগুণ বর্জিত স্থানে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার দায় বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মোরতাদের হাত কাটা হলে এবং পুনঃ ইসলাম গ্রহণের পর ঐ কারণে তার মৃত্যু হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে (অর্থাৎ কোন দিয়ত সাব্যস্ত হবে না)।

কেননা কোন অপরাধ দন্ডহীন সাব্যস্ত হওয়ার পর তা বিবেচনা যোগ্যতা ফিরে পায় না। পক্ষান্তরে বিবেচিত অপরাধ দায়মুক্ত করে দিলে দন্ডহীন হয়ে যায়। সুতরাং রিদ্দাতের কারণেও বিবেচিত অপরাধ দন্ডহীন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দারুল হরবে দাখিল হওয়া এবং আদালত থেকে চলে যাওয়া ঘোষিত হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ এই যে, গুণগতভাবে সে মৃত সাব্যস্ত হয়েছে। আর মৃত্যু ক্ষতের সংক্রমণ রহিত করে। এরপর ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে গুণগতভাবে উদ্ভূত নব জীবন। সুতরাং প্রথম অপরাধের হুকুম ও বিবেচ্যতা প্রত্যাবর্তন করবে না।

কিন্তু কাজী যদি দারুল হরবে তার চলে যাওয়া ঘোষণা না করেন, তাহলে বিষয়টা মতপার্থক্য পূর্ণ হবে, যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বর্ণনা করব।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি দারুল হরবে দাখিল না হয় (বরং দারুল ইসলামেই) পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে অতঃপর (ঐ কারণে) মারা যায় তাহলে তার উপর পূর্ণ দিয়ত সাব্যস্ত হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানিফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ এর মত।

ইমাম মুহম্মদ (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে এ সকল ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়ত হবে।

কেননা মাঝখানে উদ্ভূত মোরতাদ অবস্থা ক্ষতের সংক্রমণকে দন্ডহীন সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের কারণে তা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্তকারী রূপে পরিবর্তিত হবে না। যেমন মোরতাদের হাত কর্তন করার পর যদি ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

শায়খায়নের দলীল এই যে, অপরাধটি নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে এবং সেখানেই সম্পন্ন হয়ছে। সুতরাং জানের ক্ষতিপূরণ (তথা পূর্ণ দিয়ত) ওয়াজিব হবে। যেমন– মোরতাদ অবস্থার মধ্যবর্তী না হলে (পূর্ণ দিয়ত সাব্যস্ত হতো)।

এর কারণ এই যে, অপরাধের বিদ্যমানতার অবস্থায় নিরাপত্তা গুণের বিদ্যমানতা বিবেচ্য নয়। বরং বিবেচ্য হলো কারণ সংঘটিত হওয়ার অবস্থার মধ্যে এবং হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার অবস্থার মধ্যে নিরাপত্তা গুণটি বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে বিদ্যমানতার অবস্থা এসব কিছু থেকে পৃথক। সুতরাং এটা ইয়ামীন তথা আরোপিত শর্তের বিদ্যমানতার অবস্থার মালিকানার বিদ্যমানতার অনুরূপ হল[২]।

১। অর্থাৎ এরপর ঐ কর্তনের কারণে মারা গেলে কিছাছ আসবে না। আর না মারা গেলে হাতের ক্ষতিপূরণও আসবে না।

২। অর্থাৎ ইয়ামীনের প্রলম্বন ও বিদ্যমানতার অবস্থায় মালিকানা বিদ্য নয় বা বিবেচ্য নয় বরং শর্ত আরোপের সময় এবং শর্ত অস্তিত্ব লাভ করার তথা ফলাফল সাব্যস্ত হওয়ার সময় মালিকানা বিদ্যমান থাকা শর্ত।

মোকাতাব গোলাম যদি মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং মোরতাদ অবস্থায় সম্পদ উপার্জন করে এরপর (ইমামের হাতে) মালসহ তাকে পাকড়াও করা হয় এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করার কারণে তাকে হত্যা করা হয় তাহলে তার মনিবকে কিতাবাত চুক্তির পুরো অর্থ পরিশোধ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তার ওয়ারিছদের হবে।

সাহেবায়নের মূলনীতি অনুযায়ী এতো পরিষ্কার। কেননা মোরতাদ অবস্থার আযাদ ব্যক্তির উপার্জন তার মালিকানাভুক্ত হয়। সুতরাং মোকাতাবের উপার্জনও তাই হবে। আর আবূ হানীফা (র) এর মতে কারণ এই যে, কিতাবাত চুক্তির কারণেই মোকাতাব আপন উপার্জনের মালিক হয়। আর কিতাবাত চুক্তি রিদ্দাতের কারণে স্থগিত হয় না। সুতরাং তার উপার্জনও স্থগিত হবে না। দেখুন না রিদ্দাতের চেয়ে শক্তিশালী কারণ হলো দাসত্ব। অথচ তাতে তার ব্যবহার স্থগিত হয় না। সুতরাং নিম্নতর কারণ দ্বারা আরো স্বাভাবিক ভাবেই তার হস্তক্ষেপ স্থগিত হবে না।

আল্লাহ না করুন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, আর সেখানে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে কিংবা তাদের সন্তানের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে অতঃপর তাদের সবার উপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সমস্ত সন্তান গনীমত গণ্য হবে।

কেননা মোরতাদ নারীকে তো দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে। সুতরাং তার সন্তানও তার আনুবর্তী হবে।

আর তাদের প্রত্যক্ষ সন্তানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সন্তানের সন্তানকে বাধ্য করা হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে হাসান (বিন যিয়াদ) বর্ণনা করেছেন যে, তাকেও দাদার অনুবর্তী রূপে বাধ্য করা হবে। এর মূল সূত্র হচ্ছে ইসলামের ক্ষেত্রে অনুবর্তী হওয়া। এ হলো সেই চার মাসয়ালার একটি যেসবগুলো সবই দুই মতে বিভক্ত।[১] দ্বিতীয় হলো ছাদাকাতুল ফিতর[২] তৃতীয় হলো ওয়ালো সম্পর্ক সাব্যস্ত করা[৩] এবং চতুর্থ হলো 'নিকটাত্মীয়' এর অনুকূলে মালের অছিয়ত করা।

ইমাম কুদূরী বলেন, বোধসম্পন্ন বালকের ধর্মত্যাগ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে ধর্মত্যাগ রূপে বিবেচ্য। সুতরাং তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা

১। অর্থাৎ যাহির রেওয়ায়েতে তাকে দাদীর অনুবর্তী সাব্যস্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে হাসান যিয়াদ হতে প্রাপ্ত বর্ণনায় দাদীর অনুবর্তী সাব্যস্ত করা হবে।

২। অর্থাৎ দাদা যদি ধনী হয় এবং পিতা না থাকে কিংবা পিতা যদি অসচ্ছল বা দাস হয় তাহলে যাহির রেওয়ায়েত দাদার উপর বালকের ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তর হাসান বিন যিয়াদের বর্ণনায় ওয়াজিব হবে।

৩। অর্থাৎ আযাদকৃত দাসী যদি কোন দাসকে বিবাহ করে, আর ঐ দাসের পিতাও দাস হয়। তাহলে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে মায়ের অনুবর্তী রূপে স্বাধীন হবে এবং তার ওয়ালা সম্পর্ক মাকে আনন্দদানকারী মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে। এরপর দাদা যদি আযাদ হয় তাহলে জাহিরে রেওয়ায়েতে দাদার অনুবর্তী রূপে নাতীর ওয়ালা সম্পর্ক মায়ের মাওলা থেকে দাদাকে আযাদকারী মাওলার দিকে স্থানান্তরিত হবে না। হাসানের বর্ণনা মতে পিতাকে আযাদকারী মাওলার অনুকূলে যেমন স্থানান্তরিত হবে তেমনি দাদাকে আযাদকারী মাওলার অনুকূলেও স্থানান্তরিত হবে।

হবে এবং (গ্রহণ না করলে) হত্যা করা হবে না। তদ্রূপ তার ইসলাম গ্রহণও বিবেচ্য হবে। সুতরাং তার পিতা মাতা কাফের হলে সে তাদের উত্তরাধিকারী হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার ধর্মত্যাগ রিদ্দাত রূপে বিবেচ্য নয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য হবে। ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ কোনটাই বিবেচ্য নয়।

ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলীল এই যে, ধর্মমতের দিক থেকে সে তার পিতা-মাতার অনুবর্তী। সুতরাং তাকে মূল ও স্বতন্ত্র ধরা হবে না।

তাছাড়া এক্ষেত্রে তার উপর এমন কিছু আহকাম ও বিধান আরোপিত হবে, যাতে ক্ষতি মিশ্রিত। সুতরাং তাকে ইসলাম গ্রহণের উপযোগী গণ্য করা হবে না।

ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে আমাদের দলীল এই যে, হযরত আলী (রা) বালক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বৈধতা দান করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর গর্ব সুপ্রসিদ্ধ।

তাছাড়া এই কারণে যে, ইসলামের হাকীকত তথা অন্তরের বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে মৌখিক স্বীকৃতি সে সম্পন্ন করেছে। আর যথাস্থানে এ আলোচিত হয়েছে যে, স্বেচ্ছা স্বীকৃতি তার বিশ্বাসেরই প্রমাণ। আর কোন হাকীকত (ও বাস্তব সত্য) প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। (কেননা প্রত্যাখ্যান দ্বারা তা অস্তিত্বহীন হবে না।)

আর ইসলাম গ্রহণের সাথে যে বিষয়ের সম্পর্ক সেটা হলো অনন্ত সৌভাগ্য এবং পরকালীন মুক্তি, যা শ্রেষ্ঠতম লাভ। এটাই হলো ইসলামের মূল হুকুম বা ফলাফল। অতঃপর অন্যান্য হুকুম ও ফলাফল তার উপর ভিত্তিকৃত হয়। সুতরাং তাতে ক্ষতির মিশ্রণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না।

ধর্মত্যাগ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ, যুফার ও শাফেয়ী (র)-এর দলীল এই যে, এ হল নিরঙ্কুশ ক্ষতি।[1] পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (এই মাত্র) আলোচনা বিগত হয়েছে যে, তার সাথে সর্বোচ্চ লাভ সম্পৃক্ত হয়।

রিদ্দাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর দলীল এই যে, তা একটি বাস্তব সত্যরূপে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর বাস্তব সত্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। যেমন ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে আমরা বলে এসেছি। তবে ইসলাম গ্রহণে তাকে বাধ্য করা হবে। কেননা তাতে কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু হত্যা করা হবে না। কেননা, এ হল শাস্তি। আর বালকদের প্রতি করুণাবশতঃ যাবতীয় শাস্তি তাদের থেকে তুলে নেয়া হয়েছে।

এ মতপার্থক্য হলো বোধসম্পন্ন বালকের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যে বালকের বোধশক্তি গড়ে উঠেনি তার ধর্মত্যাগ বিবেচ্য নয়। কেননা তার স্বীকারোক্তি, আকীদা ও বিশ্বাস পরিবর্তন করার প্রমাণ নয়। বিকৃত মস্তিষ্ক বুদ্ধিভ্রষ্ট মাতালও একই হুকুমভুক্ত।

১। আর যে পদক্ষেপ নিরঙ্কুশ ক্ষতির কারণ তা বালকের ক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য নয়। এ কারণেই সে তালাক প্রদান করলে কিংবা আযাদ করলে তা কার্যকর হয় না।

পরিচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহী দল প্রসঙ্গ

মুসলমানদের কোন দল যদি কোন শহর অধিকার করে নেয় এবং শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে শাসক 'জামাতে' ফিরে আসার জন্য তাদের আহবান জানাবেন এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করবেন। কেননা হযরত আলী (রা) কুফার সন্নিকটবর্তী হারুরা বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার পূর্বে তা করেছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে, এ হলো দুই বিষয়ের মধ্যে লঘুতর। আর আশা করা যায়, এ দ্বারাই অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে। সুতরাং তা দ্বারাই পদক্ষেপ শুরু করবে (যাতে লড়াইয়ের প্রয়োজন না হয়।)

আর শাসক লড়াই শুরু করবে না যতক্ষণ না তারা শুরু করে। যদি তারা লড়াই শুরু করে তাহলে শাসক তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। যতক্ষণ না তাদের গোষ্ঠী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

'অধম বান্দা' বলছে 'আল মুখতাছার' কিতাবে ইমাম কুদূরী এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে খাতের যাদাহ (র) নামে পরিচিত ইমাম বলেন, বিদ্রোহী দল যদি সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং সংঘবদ্ধ হয় তাহলে আমাদের মতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা জায়েয ।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তারা বাস্তবতঃ লড়াই শুরু না করা পর্যন্ত (ইমামের লড়াই শুরু করা) জায়েয হবে না।

কেননা প্রতিরোধের প্রয়োজন ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয নয়। আর বিদ্রোহীরা মুসলমান। কাফিরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাঁর মতে স্বয়ং 'কুফুর'ই হত্যাকে বৈধতা দান করে।

আমাদের দলীল এই যে, এখানে হুকুম বা বিধান আবর্তিত হবে (লড়াইয়ের) প্রমাণের উপর। আর তা হচ্ছে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং আনুগত্য থেকে বিরত থাকা।

এটা এজন্য যে, শাসক যদি তাদের পক্ষ থেকে বাস্তব লড়াই শুরু হওয়ার অপেক্ষা করেন, তাহলে হয়ত তাদের প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের অনিষ্ট রোধ করার অনিবার্য প্রয়োজনে প্রমাণের উপরই বিধান আবর্তিত হবে।

যদি শাসকের কাছে এই মর্মে সংবাদ আসে যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র ক্রয় করছে এবং লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাহলে যথাসম্ভব অনিষ্ট রোধ করার স্বার্থে তাঁর কর্তব্য হলো তাদের ধরপাকড় ও বন্দী করা, যাতে তারা তা থেকে বিরত হয় এবং তাওবা করে।

আর ইমাম আবূ হা[illegible]া (র) এর পক্ষ থেকে যে বাড়িতে বসে থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে তা কোন শাসকের অনুপ[illegible]তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

পক্ষান্তরে সঙ্গতি ও [illegible]মর্থ্য থাকলে হাক্কানি শাসককে সাহায্য করা ওয়াজিব।

আর য[illegible] তাদের [illegible]ংঘবদ্ধ দল থাকে তাহলে তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য আহতকে হ[illegible]া করে [illegible]না হবে এবং তাদের পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হবে। তাদের অনিষ্ট রাধ[illegible]রার উদ্দে[illegible] যাতে তারা দলে গিয়ে যোগ দিতে না পারে। পক্ষান্তরে যদি তাদের সংঘ[illegible]দ্ধ কোন [illegible] না থাকে তাহলে আহতকে হত্যা এবং পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হবে না

কেননা তা ছাড়াই তাদের অনিষ্ট রোধ হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কোন অবস্থাতেই তা বৈধ হবে না।

কেননা যখন তারা লড়াই ত্যাগ করল, তখন তাদের হত্যা করা অনিষ্ট রোধ করার জন্য হয় না।

এ বক্তব্যের উত্তরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, লড়াইয়ের প্রমাণ বিদ্যমান থাকাই হলো বিবেচ্য, প্রকৃত লড়াই বিদ্যমান থাকা বিবেচ্য নয়।

তাদের সন্তানসন্ততিকে বন্দী করা হবে না এবং তাদের সম্পদ বন্টন করা হবে না।

কেননা জামাল যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রা) বলেছেন,

ولا يقتل اسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال

কোন বন্দীকে হত্যা করা হবে না, কারো আবরু উন্মুক্ত করা হবে না আর কারো মাল কবজা করা হবে না।

আর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তিনিই হলেন আদর্শ।

বন্দী প্রসঙ্গে তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, যদি তাদের সংঘবদ্ধ দল না থাকে। পক্ষান্তরে সংঘবদ্ধ দল থাকলে শাসক বন্দীকে হত্যা করবেন। কিংবা ইচ্ছা করলে তাদের বন্দী রাখবেন। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

তাছাড়া তারা হলো মুসলমান। আর ইসলাম জানমালের নিরাপত্তা দান করে।

মুসলমানদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বিদ্রোহীদের অস্ত্র দ্বারা লড়াই করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা জায়েয নয়। উট (ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম) সম্পর্কে একই মতপার্থক্য।

তাঁর দলীল এই যে, এগুলি মুসলমানের মাল। সুতরাং তার সম্মতি ছাড়া তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, আলী (রা) বসরায় তাঁর অনুগামীদের মাঝে অস্ত্র বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর এই বন্টন ছিলো প্রয়োজনের জন্য, মালিকানা প্রদানের জন্য নয়।

তাছাড়া শাসকের জন্য তো প্রয়োজনে অনুগত প্রজার সম্পদেও এমন হস্তক্ষেপ বৈধ রয়েছে। সুতরাং বিদ্রোহীর সম্পদে আরো অধিক অধিকার থাকবে।

এর গুঢ় মর্ম হলো বৃহত্তর ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যে লঘুতর ক্ষতি গ্রহণ করা।

শাসক তাদের সম্পদ আটক করবেন। তবে তাদেরকে ফেরত দেবেন না এবং মুজাহিদদের মাঝেও বন্টন করবেন না, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। তাওবার পর তাদের মাল তাদের ফেরত দেবেন।

বন্টন না করার কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হযরত আলী (রা) এর বাণী।

আর আটক করার কারণ হলো তাদের শক্তি খর্ব করার মাধ্যমে তাদের অনিষ্ট রোধ করা। এ কারণেই শাসক উক্ত সম্পদ তাদের ফেরত না দিয়ে আটক রাখবেন, যদিও তিনি এ সম্পদের প্রয়োজন বোধ না করেন।

তবে উট (ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম যা রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন) বিক্রি করে দেবেন। কেননা মূল্য সংরক্ষণ করা অধিকতর সহজ ও কল্যাণকর।

তাওবার পর ফেরত দেয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। আর তাতে গনীমতের বিধান নেই।

ইমাম কুদূরী বলেন, দখলীকৃত অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীরা খারাজ উশর আদায় করে থাকলে শাসক দ্বিতীয়বার তা আদায় করবেন না।

কেননা নিরাপত্তা দানের ভিত্তিতেই শাসক তা আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। অথচ তিনি তাদের নিরাপত্তা দিতে পারেন নি।

বিদ্রোহীরা যদি উশুলকৃত মাল যথাক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে, তাহলে যাদের থেকে উশুল করা হয়েছে তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা হক তার প্রাপকের কাছে পৌঁছেছে।

আর যদি তারা যথা ক্ষেত্রে ব্যয় না করে থাকে তাহলে আল্লাহর মাঝে ও তাদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের দাবি হিসাবে তাদের কর্তব্য হলো পুনরায় তা আদায় করা।

কেননা মাল তার হকদারের কাছে পৌঁছেছে। অধম বান্দা (হেদায়া গ্রন্থকার) বলে, আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, খারাজের ক্ষেত্রে পুনঃ আদায় করা জরুরী নয়।

কেননা বিদ্রোহীরা যুদ্ধবাজ। সুতরাং স্বচ্ছল হলেও তারা ব্যয়ক্ষেত্র।

উশুলের ক্ষেত্রে যদি তারা দরিদ্র হয় তাহলে তারা বৈধ ব্যয় ক্ষেত্র। কেননা উশর হল দরিদ্রদের হক। যাকাত অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি।

ভবিষ্যতে শাসক তা আদায় করবেন। কেননা তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তিনি অঞ্চলবাসীকে নিরাপত্তা দান করছেন।

বিদ্রোহী সৈন্যদের মধ্যে এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে। এরপর তাদের উপর বিজয় অর্জিত হয়, তাহলে তাদের উপর (কিছাছ বা দিয়ত) কিছুই ওয়াজিব হবে না।

কেননা হত্যাকাণ্ডের সময় ন্যায়পরায়ণ শাসকের কোন কর্তৃত্ব ছিলো না। সুতরাং এটাও কিছাছ ওয়াজিবকারীরূপে তা সংঘটিত হয়নি। যেমন দারুল হরবের সংঘটিত হত্যা।

যদি তারা কোন শহর দখল করে। আর কোন শহরবাসী কোন শহরবাসীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। এরপর শহরের উপর শাসকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে হত্যাকারী থেকে কিছাছ নেয়া হবে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যদি শহরবাসীদের উপর বিদ্রোহীদের আইন জারী না হয়ে থাকে। এর আগেই যদি তারা উৎখাত হয়ে গিয়ে থাকে। কেননা এক্ষেত্রে (গুণগতভাবে) শাসকের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়নি। সুতরাং কিছাছ ওয়াজিব হবে।

শাসকের অনুগত কোন ব্যক্তি যদি কোন বিদ্রোহীকে হত্যা করে (আর উভয়ের মাঝে উত্তরাধিকারের আত্মীয়তা থাকে) তাহলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী যদি তাকে হত্যা করে আর দাবী করে যে, আমি আগেও হকের উপর ছিলাম এখনো হকের উপর রয়েছি, তাহলে হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিস হতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি বলে যে, একথা জেনেই তাকে হত্যা করেছি যে, আমি অন্যায়ের উপর আছি, তাহলে সে তার ওয়ারিস হবে না। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উভয় অবস্থায়ই বিদ্রোহী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) ও এই বক্তব্য।

এই মতপার্থক্যের মূল ভিত্তি এই যে, ইমামের অনুগত ব্যক্তি যদি বিদ্রোহীর প্রাণ বা সম্পদ নষ্ট করে তাহলে সে তার ক্ষতি পূরণের দায় বহন করে না এবং গোনাহগার হয় না। কেননা তাদের অনিষ্ট বোধ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সে আদিষ্ট রয়েছে।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহী যদি ন্যায়পরায়ণ (অর্থাৎ শাসকের অনুগত) ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে আমাদের মতে সে তার ক্ষতি পূরণের দায় বহন করবে না। তবে সে গোনাহগার হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর পূর্ববর্তী মতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) ও আমাদের মাঝে একই মতভিন্নতা রয়েছে, যদি মোরতাদ কোন জান বা মাল নষ্ট করার পর তাওবা করে।

তাঁর দলীল এই যে, সে নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন মাল নষ্ট করেছে অথবা নিরাপত্তাসম্পন্ন জান হত্যা করেছে। সুতরাং প্রতিরোধ শক্তি লাভের পূর্ববর্তী অবস্থার উপর কিয়াস করে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হলো ছাহাবা কিয়ামের ইজমা, যা ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া এই কারণ যে, বিদ্রোহী ভুল ব্যাখ্যাভিত্তিতে জান বা মাল নষ্ট করেছে। আর ভুল ব্যাখ্যা জনিত পদক্ষেপের সাথে যদি প্রতিরোধ শক্তি যুক্ত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে তা নির্ভুল পদক্ষেপের সাথে সংযুক্ত হবে। হারবীদের প্রতিরোধ শক্তি ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেমন।

এর কারণ এই যে, শরীয়তের বিধান আরোপের জন্য শাসকের পক্ষ হতে বাধ্যবাধকতা আরোপের কিংবা নিজের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা গ্রহণ অপরিহার্য। আর এখানে বাধ্যবাধকতা গ্রহণ অনুপস্থিত। কেননা সে নিজস্ব ব্যাখ্যার ভিত্তিতে (স্বীয় ধর্মকে) বৈধ বলে বিশ্বাস করছে। আর প্রতিরোধ শক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে শাসকের কর্তৃত্বের অনুপস্থিতির দরুণ বাধ্যবাধকতাও নেই।

পক্ষান্তরে প্রতিরোধ শক্তি অর্জনের পূর্বে শাসকের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। তদ্রূপ বৈধতার নিজস্ব ব্যাখ্যা না থাকলে আকীদা ও বিশ্বাসের পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা গ্রহণের দিকটি বিদ্যমান হয়।

পাপের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারীর মোকাবেলায় প্রতিরোধ শক্তি কার্যকর নয়।

যখন ইহা সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলবো, শাসকের অনুগত ব্যক্তি কর্তৃক বিদ্রোহীকে হত্যা করা হলো বৈধ হত্যা। সুতরাং তা উত্তরাধিকার রহিত করবে না।

বিদ্রোহী কর্তৃক শাসকের অনুগত ব্যক্তিকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, শুধু ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচনা হবে, অথচ এখানে প্রয়োজন হচ্ছে উত্তরাধিকার যোগ্যতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে। সুতরাং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হবে না।

এক্ষেত্রে তারফায়নের দলীল এই যে, ক্ষতিপূরণ রোধ করার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি মীরাছ বঞ্চনা রোধ করার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা নিকটাত্মীয়তা হলো উত্তরাধিকার লাভের কারণ। সুতরাং এক্ষেত্রেও ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হবে। তবে সে জন্য শর্ত হলো আপন বিশ্বাসের উপর তার বহাল থাকা। সুতরাং যদি সে বলে যে, আমি অন্যায়ের উপর ছিলাম, তখন 'রোধকারী' বিদ্যমান। সুতরাং ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ফিতনাকারী (ও বিদ্রোহী)দের কাছে এবং তাদের বাহিনীতে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ (তাহরিমী)।

কেননা এ হলো অন্যায়ের সাহায্য করা। আর কুফার (যে কোন শহরে) কুফাবাসীদের কাছে এবং যে ব্যক্তি ফিতনাকারীরূপে পরিচিত নয় তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে কোন দোষ নেই। কেননা শহরে সৎ লোকদেরই প্রাধান্য থাকে।

আর নিষিদ্ধ হল প্রকৃত অস্ত্র বিক্রি করা। এমন সামগ্রী বিক্রি করা নিষিদ্ধ নয়, যা দ্বারা কারিগরি দ্বারা তৈরি করা ছাড়া লড়াই করা যায় না। দেখুন না, বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ কিন্তু যন্ত্র তৈরীর উপাদান কাঠ বিক্রি করা মাকরূহ নয়। মদ্য ও আঙ্গুর প্রসঙ্গেও একই কথা।

অধ্যায়ঃ কুড়িয়ে পাওয়া শিশু

لقيط অর্থ কুড়িয়ে পাওয়া শিশু। তবে পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে লকীত বলা হয়, যেহেতু তাকে কুড়িয়ে নেওয়া হবে। শিশুকে কুড়িয়ে নেয়া মোস্তাহাব। কেননা এতে তার প্রাণ রক্ষা করা হয়। আর যদি তার প্রাণহানির প্রবল আশংকা হয় তাহলে কুড়িয়ে নেয়া ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন।

কেননা স্বাধীনতাই হলো আদম সন্তানের আসল। আর এজন্য যে, বাসস্থান হলো স্বাধীন মানুষের আবাসভূমি। তাছাড়া আধিক্যের অনুকূলেই হুকুম হয়ে থাকে।

আর তার ভরণ পোষণ বায়তুল মাল থেকে হবে। হযরত ওমর (রা) ও হযরত আলী (রা) থেকে এ-ই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ জন্য যে, সে উপার্জনে অক্ষম মুসলমান, যার নিজস্ব মাল নেই এবং কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। সুতরাং এমন পঙ্গুর সদৃশ হলো, যার কোন মাল নেই।

তাছাড়া এ কারণে যে, তার মীরাছ বায়তুল মালের হয়ে থাকে। আর খারাজ (প্রাপ্তির অধিকার) আর্থিক দায় বহনের বিনিময়ে হয়ে থাকে। এ কারণেই তার কৃত অপরাধের দায় বায়তুল মালের উপর আসে।

যে কুড়িয়ে আনল সে তার জন্য খরচ করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাদানকারী হবে। কেননা তার তো (শিশুটির বিষয়ে) কোন কর্তৃত্ব নেই। তবে কাযী যদি তাকে খরচ করার আদেশ দেয় তাহলে তা ঐ শিশুটির প্রতিকূলে ঋণ হিসেবে থাকবে। (যা সে কর্মক্ষম হওয়ার পর পরিশোধ করবে)। কেননা কাযীর ব্যাপক কর্তৃত্ব রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন লোক যদি তাকে কুড়িয়ে আনে তাহলে তার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেয়ার অন্য কারো অধিকার নেই।

কেননা তার হস্ত নিয়ন্ত্রণ অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে 'সংরক্ষণ অধিকার' তার জন্য সাব্যস্ত হবে।

কেউ যদি দাবী করে যে, এটা তার সন্তান তাহলে তার দাবীই গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ যে কুড়িয়ে এনেছে সে যদি তার বংশ সম্পর্ক দাবি না করে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবী এই যে, তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা এ দাবীর মধ্যে কুড়ানো ব্যক্তির হক বাতিল হওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ দাবীর মধ্যে শিশুর কল্যাণকর বিষয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। কেননা শিশুটি বংশ পরিচয়ের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। আর বংশ পরিচয়হীনতা দ্বারা সে তিরস্কৃত হয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, 'কুড়ানোওয়ালা ব্যক্তির' হস্তনিয়ন্ত্রণ বাতিল না করে দাবিদারের ক্ষেত্রে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। আর কারো কারো মতে এর উপর ভিত্তি করে গুদামওয়ালার নিয়ন্ত্রণ বাতিল হয়ে যাবে।

আর কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি যদি (প্রথমে লাকীত বা কুড়িয়ে পেয়েছে বলে স্বীকার করার পর) তার বংশ সম্পর্ক দাবী করে, তাহলে কোন কোন মতে কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াস উভয় বিচারেই এ দাবী শুদ্ধ হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাতে কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী ভিন্ন রয়েছে। মাবসূতে তার বিশদ আলোচনা রয়েছে।

আর দুই ব্যক্তি যদি তার বংশ সম্পর্ক দাবী করে আর একজন শারীরিক কোন আলামত বলতে পারে তাহলে সে তার অধিক হকদার হবে।

কেননা শারীরিক আলামত তার বক্তব্যের অনুযায়ী হওয়ার কারণে বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। পক্ষান্তরে উভয়ের কেউ যদি কোন আলামত বলতে না পারে তাহলে কারণ দাবীর ক্ষেত্রে উভয়ের সমকক্ষতার কারণে সে উভয়ের সন্তান হবে। আর যদি একজন আগে দাবী উত্থাপন করে তাহলে সে তার পুত্র হয়ে যাবে। কেননা তার দাবী এমন সময়ে সাব্যস্ত হয়েছে যখন তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তবে যদি অপর পক্ষ প্রমাণ পেশ করে তবে তা ভিন্ন কথা। 'সাক্ষ্য প্রমাণ' অধিকতর শক্তিশালী।

মুসলমানদের কোন শহরে বা মুসলমানদের কোন গ্রামে যদি তাকে পাওয়া যায় আর কোন যিম্মী তাকে আপন পুত্র বলে দাবী করে, তাহলে তার সাথে তার বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। শিশুটি মুসলিম গণ্য হবে।

এ হল সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কেননা তার দাবী বংশ সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত করে, যা ছোট শিশুর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রূপ তা বাসভূমির আনুবর্তিতা দ্বারা সাব্যস্ত মুসলিম পরিচয় নাকচ করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং শিশুর জন্য কল্যাণকর বিষয়ে তার দাবী বৈধ হতে ক্ষতিকর বিষয়ে নয়।

যদি যিম্মীদের কোন লোকালয়ে কিংবা ইহুদী উপাসনালয়ে কিংবা গীর্জায় পাওয়া যায় তাহলে যিম্মী রূপে গণ্য হবে।

উদ্ধারকারী ব্যক্তি যিম্মী হওয়ার ক্ষেত্রে এ হুকুম হওয়া সম্পর্কে একই রেওয়াত রয়েছে। পক্ষান্তরে এসকল স্থান থেকে উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, কিংবা মুসলমানদের স্থান থেকে উদ্ধারকারী ব্যক্তি যদি যিম্মী হয়, তাহলে সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতে ভিন্নতা রয়েছে। 'মাবসূত' এর লাকীত পর্বে স্থানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা স্থানের সাথে তার সম্পর্ক অগ্রবর্তী হয়েছে। পক্ষান্তরে মাবসূতের কোন কোন অনুলিপিতে কিতাবুদ্দাওয়ার মধ্যে উদ্ধারকারী বিবেচনা করা হয়েছে। কবজার ব্যাপারটি শক্তিশালী হওয়ার প্রেক্ষিতে এটি ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে ইবনে সাম্মাআ-এর বর্ণনা।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, এ কারণেই পিতামাতার অনুবর্তিতা বাসভূমির অনুবর্তিতা থেকে প্রাধান্য রয়েছে। এমনকি শিশুর সাথে যদি পিতামাতার কোন একজন বন্দী হয় তাহলে শিশুটিকে কাফির বিবেচনা করা হয়।

আর কোন কোন অনুলিপিতে শিশুর কল্যাণের প্রেক্ষিতে মুসলিম পরিচয় বিবেচিত হয়েছে।

কেউ যদি দাবী করে যে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি তার গোলাম, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেননা বাহ্যতঃ সে স্বাধীন। তবে যদি গোলাম হওয়ার অনুকূলে 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' পেশ করতে পারে তবে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি কোন দাস তাকে নিজের পুত্র বলে দাবী করে তাহলে তার সাথে তার বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

কেননা এটা তার জন্য কল্যাণকর হবে। **আর শিশুটি স্বাধীন হবে।** কেননা স্বাধীন স্ত্রী দাসের ঔরসের সন্তান প্রসব করতে পারে। সুতরাং নিছক সন্দেহের কারণে বাহ্যতঃ সাব্যস্ত স্বাধীনতা বাতিল হবে না।

'লাকীতের' বংশ সম্পর্ক দাবী করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তি গোলামের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। যিম্মীর চেয়ে মুসলমান অগ্রাধিকার পাবে—

তার ক্ষেত্রে যেটা অধিকতর কল্যাণজনক সেটাকে অগ্রাধিকার প্রদান করার প্রেক্ষিতে।

লাকীতের সাথে জড়িত অবস্থায় যদি কোন মাল পাওয়া যায় তাহলে তা তারই হবে। এটা হবে বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনার প্রেক্ষিতে। উল্লেখিত কারণে একই হুকুম হবে যদি মাল বাহনের সাথে বাঁধা থাকে আর সে বাহনের উপরে থাকে।

অতঃপর উদ্ধারকারী কাযীর আদেশে ঐ মাল শিশুর জন্য ব্যয় করবে। কেননা এ মাল বিনাশ-মুখী। আর কাযীর এ ধরনের মাল তার জন্য ব্যয় করার কর্তৃত্ব রয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন, কাযীর আদেশ ছাড়াই সে লাকীতের জন্য ব্যয় করতে পারে। কেননা বাহ্যতঃ তা লাকীতেরই মাল।

সেই মাল থেকে তার জন্য অপরিহার্য সামান খরিদ ও অন্যান্য খরচ করার অধিকার উদ্ধাকারীর রয়েছে।

যেমন খাদ্য ও বস্ত্র। কেননা তা তার জন্য খরচ করার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্ধারকারীর পক্ষ হতে তাকে বিবাহ দেওয়া বৈধ নয়।

কেননা অভিভাবকত্বের কারণ তথা আত্মীয়তা, মালিকানা ও শাসনে কর্তৃত্ব কোনটাই তার জন্য বিদ্যমান নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, লাকীতের মালে কারবার করা তার জন্য বৈধ নয়।

(এ সিদ্ধান্ত হয়েছে লাকীতের) মায়ের অবস্থার উপর বিশ্বাস করে। আর তা এজন্য যেন কারবারের অধিকার প্রদান করা হয় মাল পরিবর্ধনের জন্য। আর তা বাস্তবায়িত হতে পারে পূর্ণ বিচক্ষণতা এবং পূর্ণ স্নেহ দ্বারা। অথচ উভয়ের প্রত্যেকের মাঝে দুটি গুণের একটি বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উদ্ধাকারী তার অনুকূলে দান গ্রহণ করতে পারে।

কেননা এটা নিরংকুশ কল্যাণজনক। এ কারণেই নাবালক বোধসম্পন্ন হলে নিজেও তা গ্রহণ করতে পারে। আর মা এবং তার জন্য নিযুক্ত 'অছী' (অভিভাবক) তা গ্রহণ করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (রা) বলেন, উদ্ধারকারী তাকে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করতে পারবে।

কেননা এ হল তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং তার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (রা) বলেন, তাকে মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগাতে পারবে।

অধম বান্দা বলে, এটা হচ্ছে নিজস্ব মোখতাছার কিতাবে সংকলিত ইমাম কুদূরীর বর্ণনা। পক্ষান্তরে জামে ছাগীরের বর্ণনা মতে তা বৈধ নয়। ইমাম মুহম্মদ (র) মাকরূহ বিষয়ক আলোচনায় তা উল্লেখ করেছেন। এ-ই বিশুদ্ধতম মত।

প্রথমোক্ত মতের কারণ এই যে, এটা তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলার সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয়োক্ত মতের কারণ এই যে, সে তার 'শ্রম-সুবিধা' বিনষ্ট করতে পারেনা। সুতরাং সে শিশুর চাচার সমতুল্য হলো।

মায়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মা তা করার অধিকার রাখে। মাকরূহ বিষয়ক অংশে ইনশাআল্লাহ আমরা তা উল্লেখ করবো।

অধ্যায় ঃ লোকতা বা কুড়ানো বস্তু প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু আমানত হিসাবে থাকবে যখন কুড়ানোওয়ালা এই মর্মে সাক্ষী রাখবে যে, সে হেফাজত করা এবং মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা উঠিয়ে নিচ্ছে।

কেননা এই নিয়মে তুলে নেয়াও শরীয়ত অনুমোদিত। বরং এ-ই উত্তম অধিকাংশ উলামার মতে। অর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা ওয়াজিব। (আমাদের মাশায়েখগণ) এরূপই বলেছেন।

আর এরূপ হলে তা তার যিম্মায় দায়যোগ্য হবে না।

তদ্রূপ দায়যোগ্য হবে না যদি উদ্ধারকারী ও মালিক এ বিষয়ে একমত হয় যে, সে মালিককে ফেরত দেয়ার জন্যই তুলেছিলো। কেননা, তাদের পরস্পরকে সমর্থন করা তাদের ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে বিবেচিত। সুতরাং এটি 'বাইয়িনাহ' বা সাক্ষ্য-প্রমাণের সমতুল্য হলো।

আর যদি সে স্বীকার করে যে, নিজে দখল করার জন্য তুলেছিলো তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই সে তার যামীন হবে। কেননা সে অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া এবং শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া নিয়েছে।

আর যদি (কুড়িয়ে নেওয়ার সময়) এ বিষয়ে সে সাক্ষী না রাখে এবং বলে যে, মালিককে ফেরত দেয়ার জন্যই তা তুলেদিলাম, কিন্তু মালিক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)এর মতে সে যামীন হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে যামীন হবে না। বরং উদ্ধারকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে এই হিসাবে যে, (স্বভাবতঃই) সে পুণ্যের পথ গ্রহণ করছে। পাপের পথ নয়।

তারফায়নের দলীল এই যে, সে যামীন হওয়ার কারণ স্বীকার করে নিয়েছে, আর তা হলো অন্যের মাল তুলে নেওয়া। সেই সাথে দায়মুক্ত করার মত বিষয় দাবী করেছে। আর তা হলো মালিককে ফেরত দেয়ার জন্য উদ্বাস্তু করা। আর এ ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সুতরাং সে দায়মুক্ত হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) যে বাহ্যিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ একটি বাহ্যিক অবস্থা তার বিপরীতে রয়েছে। কেননা বাহ্যতঃ কোন পদক্ষেপ গ্রহণকারী নিজের জন্যই কার্যসম্পন্ন করে থাকে।

সাক্ষী বানানোর ক্ষেত্রে উদ্ধারকারী ব্যক্তির এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যাকে কোন হারানো বস্তুর অনুসন্ধান ঘোষণা প্রদান করতে শুনবে তাকে তোমরা আমার ঠিকানা বলে দেবে। উদ্ধারকৃত বস্তু এক প্রকার হোক বা বিভিন্ন প্রকার। (শুধু হারানো বস্তু বলাই যথেষ্ট) কেননা শব্দটি ব্যাপক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি বস্তুটির মূল্য দশ দিরহাম থেকে কম হয় তাহলে কয়েকদিন ঘোষণা দেবে। পক্ষান্তরে দশ দিরহাম বা তার বেশি হলে এক বছর ঘোষণা দেবে।

অধম বান্দা (গ্রন্থকার) বলে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা। আর ইমাম কুদূরী (র) কথিত কয়েকদিন অর্থ শাসক যে কয়দিন সমীচীন মনে করেন। ইমাম মুহম্মদ (র)

মাবসূত কিতাবে কম ও বেশি পরিমাণের মাঝে পার্থক্য না করে এক বছর নির্ধারণ করেছেন। আর এটা ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থক্য নির্দেশ না করে বলেছেন,

من التقط شيئا فليعرفه سنة

যে ব্যক্তি কোন বস্তু কুড়িয়ে নেয় সে যেন একবছর তা প্রচার করে।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, উক্তএক বছরের সময় সীমা নির্ধারণ এমন لقطة (বা কুড়ানো বস্তু) এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যা ছিল একশ দিনার সমান এক হাযার দিরহাম। আর চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে এবং লজ্জাস্থান হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে দশ ও দশোর্দ্ধ সংখ্যা এক হাযারের সমগুণ সম্পন্ন। কিন্তু যাকাতের বিধান সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তা এক হাযারের সমগুণ সম্পন্ন নয়। (কেননা দশ দিরহামে যাকাত হয় না।) তাই আমরা সতর্কতা হিসাবে এক বছর ঘোষণা প্রদানকে ওয়াজিব করেছি। পক্ষান্তরে দশ দিরহামের কম পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই এক হাযারের সমগুণ সম্পন্ন নয়। তাই বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

কোন কোন মতে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, এ ধরনের কোন 'সময় পরিমাণ' আবশ্যকীয় নয়। বরং উদ্ধারকারী ব্যক্তির বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। সে এমন প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত প্রচার চালাবে যে এরপর উক্ত বস্তুর মালিক আর তা খোঁজ করবে না। অতঃপর সে তা ছাদাকা করে দেবে।

আর যদি বস্তুটি এমন হয় যে, স্থায়ী থাকবে না, তাহলে ঘোষণা দিবে এবং যখন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন সাদাকা করে দেবে।

বস্তুটি যেখানে পেয়েছে সেখানে প্রচার করা উচিত। জামে ছাগীরে বলা হয়েছে যে এটা মালিক পর্যন্ত পৌছার নিকটতম উপায়।

আর যদি এমন বস্তু হয় যে, বোঝা দায়, মালিক তা খোঁজ করবে না, যেমন দানা বা আনারের খোসা, তাহলে তা ফেলে রেখে যাওয়া মোবাহ হওয়ার প্রমাণ; এমন কি প্রচার করা ছাড়াই তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে। তবে তা মালিকের মালিকানায় বহাল থাকবে। কেননা অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মালিকানা প্রদানের বৈধতা নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ঘোষণার পর যদি ঐ বস্তুর মালিক আসে তাহলে তো ভালো; অন্যথায় তা ছাদাকা করে দেবে।

যাতে হকদারের কাছে হক পৌছানো হয় আর যথাসম্ভব তা করা ওয়াজিব। আর তার উপায় হলো মালিকের খোঁজ পাওয়া গেলে স্বয়ং বস্তুটি পৌছানো কিংবা বিনিময় তথা ছাওয়াব পৌছানো এই ধারণার ভিত্তিতে যে, ছাদাকা করার বিষয়টি মালিক অনুমোদন করবে।

আর ইচ্ছা করলে মালিকের খোঁজ পাওয়ার আশায় তা নিজের কাছে রেখেও দিতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ছাদাকা করার পর যদি মালিক এসে হাজির হয় তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ছাদাকা বহাল রাখবে এবং ছাওয়াব তার হবে।

কেননা যদিও ছাদাকা শরীয়তের অনুমোদনে হয়েছে। কিন্তু তার অনুমতি তো পাওয়া যায়নি। সুতরাং তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে।

আর অনুমতির পূর্বেই দরিদ্রের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং (অনুমোদন দানের সময়) পাত্রের (তথা বস্তুটির) বিদ্যমানতার উপর অনুমোদন স্থগিত থাকবে না।

ফুযূলী (বা অনাহূত) ব্যক্তির বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন। (তখন অনুমোদন কালে পাত্র তথা বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী)। কেননা তার ক্ষেত্রে মালিকের অনুমোদন বের করেই শুধু ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

আর ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারীকে সে যামীন করতে পারে।

কেননা সে তার অনুমতি ছাড়া তার মাল অন্যের কাছে হস্তান্তর করেছে। তবে শরীয়তের পক্ষ থেকে বৈধ ছিল। আর তা (অর্থাৎ শরীয়তের অনুমোদন) বান্দার হক হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ আরোপের পরিপন্থী নয়। যেমন– ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় অন্যের মাল ভক্ষণের ক্ষেত্রে। আবার ইচ্ছা করলে গ্রহীতা দরিদ্রকে ক্ষতিপূরণের দায়যুক্ত করতে পারে। যদি বস্তুটি তার হক নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে।

কেননা সে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার মাল গ্রহণ করেছে।

আর যদি তার হাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা নিয়ে নেবে। কেননা সে তার মাল হুবহু পেয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বকরী, গরু ও উট কুড়িয়ে নেওয়ার বৈধতা রয়েছে।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র) বলেন, উট ও গরু যদি মরুভূমিতে (খোলা প্রান্তরে) পাওয়া যায় তাহলে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। ঘোড়া সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য। উভয়ের দলীল এই যে, অন্যের মাল নেওয়া হারাম হওয়াই হলো মূল বিধান। আর তা মোবাহ হওয়ার কারণ নষ্ট হওয়ার আশংকা। সুতরাং যদি বস্তুটির সাথে নিজেকে রক্ষা করার মত কিছু থাকে তাহলে নষ্ট হওয়ার আশংকা কমে যায়। অবশ্য সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং গ্রহণ করা মাকরূহ হওয়ার এবং ছেড়ে দেওয়া উত্তম হওয়ার বিধান দেওয়া হবে।

আমাদের দলীল এই যে, এটা এমন হারানো বস্তু যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মানুষের মাল হেফাজত করার স্বার্থে তা গ্রহণ করা এবং ঘোষণা দেয়া মুস্তাহাব হবে, যেমন– বকরীর ক্ষেত্রে।

উদ্ধারকারী যদি শাসকের নির্দেশ ছাড়া তার রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ ব্যয় করে তাহলে সে স্বেচ্ছাদানকারী হবে।

কেননা মালিকানার দায়ের দিক থেকে তার কর্তৃত্ব অসম্পূর্ণ। আর যদি শাসকের আদেশে ব্যয় করে তাহলে তা মালিকের যিম্মায় ঋণ গণ্য হবে। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির কল্যাণের স্বার্থে তার সম্পদের উপর বিচারকের (ও শাসকের) কর্তৃত্ব রয়েছে। আর অর্থ ব্যয়ের মাঝেই তার কল্যাণ থাকতে পারে, যেমন– সামনে আমরা বর্ণনা করবো।

আর উদ্ধারকারী যখন বিষয়টি শাসকের গোচরীভূত করবে তখন তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। যদি পশু-টির শ্রম যোগ্যতা থাকে তাহলে তাকে ভাড়ায় খাটাতে বলবেন। ঐ ভাড়া থেকে সে তার জন্য ব্যয় করবে।

কেননা এতে ঋণের দায় আরোপ করা ছাড়াই হুবহু বস্তুটিকে তার মালিকানায় রাখা হয়। পলাতক গোলামের ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আর যদি পশুটির শ্রমযোগ্যতা না থাকে আর আশংকা হয় যে, খরচ তার মূল্যকে বেষ্টন করে ফেলবে তাহলে শাসক তা বিক্রি করে তার মূল্য সংরক্ষণ করার আদেশ দেবেন। যাতে বাহ্য সত্তা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে গুণগত সত্তা রক্ষা করা হয়।

আর যদি তার জন্য অর্থ ব্যয় করা অধিকতর কল্যাণকর হয় তাহলে এর জন্য অনুমতি দিবেন এবং খরচের অর্থ মালিকের যিম্মায় ঋণ রূপে ধার্য করবেন।

কেননা শাসককে জনগণের কল্যাণ রক্ষাকারী হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। আর এ ব্যবস্থার মধ্যে (মালিক ও উদ্ধারকারী) উভয়পক্ষের কল্যাণ রয়েছে।

মাশায়েখগণ বলেছেন. মালিক হাযির হবে–এই আশায় ইমাম দু'দিন বা তিন দিন. যা ভালো মনে করেন খরচ করার আদেশ দিলে এর মধ্যে হাজির না হলে বিক্রি করে ফেলার আদেশ দিবেন। কেননা স্থায়ী খরচ স্বয়ং প্রাণীটিকেই (মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে) শেষ করে দেবে। সুতরাং দীর্ঘদিন খরচ করার মধ্যে (মালিকের) কোন কল্যাণ নেই।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাবসূত কিতাবে ব্যয় করার পূর্বে উদ্ধারকারীর উপর 'সাক্ষ্য প্রমাণ' উপস্থাপনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা এটি তার হাতে গসব কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে খরচ করার আদেশ দিবেন না। বরং আমানতরূপে রক্ষিত মালের ক্ষেত্রেই এ আদেশ দিবেন। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন। আর সাক্ষ্য প্রমাণ শুধু বিচার কার্যের জন্যই পেশ করা হয় না। অবস্থা প্রকাশের জন্যও করা হয়।

আর যদি সে বলে যে, আমার 'সাক্ষ্য প্রমাণ' নেই, তাহলে কাযী তাকে বলবেন, যদি তোমার বক্তব্যে সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে সে বাবদ খরচ করো, যাতে সত্যবাদী হলে মালিকের কাছ থেকে খরচ ফেরত নিতে পারে। আর যদি গছবকারী হয়ে থাকো তাহলে ফেরত নিতে পারবে না।

কিতাবে ইমাম কুদূরী (র) এর মন্তব্য 'খরচ মালিকের যিম্মায় থাকবে'– এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মালিক উপস্থিত হওয়ার পরই ফেরত নেবে। কাযী যদি মালিক থেকে ফেরত নেয়ার শর্ত আরাপ করেন তাহলে কুড়ানো প্রাণীটি (এজন্য) বিক্রি করা যাবেনা। এটি একটি বর্ণনা এবং এটাই বিশুদ্ধতম। (কোন কোন মতে শুধু আদেশ বলেই রুজু করতে পারবে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন সে হাজির হয়, অর্থাৎ মালিক তখন খরচের টাকা বুঝিয়ে দেওয়া পর্যন্ত উদ্ধারকারী লুকতার জন্তু আটক রাখতে পারে।

কেননা তার খরচেই পশুটি বেঁচে রয়েছে। সুতরাং যেন সে তার দিক থেকে মালিকানা লাভ করেছে। ফলে তা বিক্রিত বস্তুর সদৃশ হয়েছে। এরচেয়ে নিকটতর সদৃশ হলো। পলাতক গোলাম ফেরতদানকারী। কেননা 'জোল' (বা খরচ) উশুল করার জন্য সে গোলাম আটক রাখতে পারে আমাদের উল্লেখিত কারণে।

আটক করার পূর্বে যদি উদ্ধারকারীর হাতে তা মারা যায় তাহলে খরচের ঋণ রহিত হবে না। পক্ষান্তরে আটকের পর মারা গেলে রহিত হয়ে যাবে। কেননা আটক করা দ্বারা এটা বন্ধক সদৃশ হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, হারাম শরীফ এলাকার এবং তার বাইরের প্রাপ্ত লুকতার হুকুম সমান।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, হারামের লুকতা এর ক্ষেত্রে মালিক হাজির হওয়া পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাকা ওয়াজিব।

কেননা হারাম সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ولا يحل لقطتها إلا لمنشرها

হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই তুলে নেওয়া বৈধ যে তার ঘোষণা দিবে।

আমাদের প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة

পড়ে থাকা বস্তুর থলি এবং তার বাঁধন চিনে রাখো এবং এক বছর ঘোষণা দাও অতঃপর (হারাম শরীফ ও বাইরের) কোন পার্থক্য নেই।

তাছাড়া এই কারণে যে, এটা হচ্ছে লোকতা (বা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু) আর ঘোষণার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ছাদাকা করাতে একদিক থেকে (অর্থাৎ সাওয়াব লাভের দিক থেকে) মালিকের মালিকানা রক্ষা করা হয়। সুতরাং উদ্ধারকারী ব্যক্তি তা করতে পারবে। যেমন অন্যান্য লোকতার ক্ষেত্রে করতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, ঘোষণা ও প্রচার করার উদ্দেশ্য ছাড়া 'তুলে দেওয়া' বৈধ নয়— এই বক্তব্যকে হারামের সাথে বিশিষ্ট করার কারণ হলো একথা বয়ান করে দেওয়া যে, বাহ্যতঃ এটা মুসাফিরদের জিনিস এই সম্ভাবনার কারণে প্রচার ও ঘোষণার দায়দায়িত্ব রহিত হবে না।

কেউ এসে যদি লোকতার মালিকানা দাবী করে তাহলে 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' পেশ করা পর্যন্ত তার হাতে অর্পণ করা হবে না। যদি সে কোন আলামত বা চিহ্নের কথা বলে তাহলে উদ্ধারকারীর জন্য বৈধ হবে তার হাতে লোকতা তুলে দেওয়া। কিন্তু আদালতীভাবে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বাধ্য করা হবে।

আলামতের উদাহরণ এই যে, দিরহামের ওজন এবং সংখ্যা, দিরহামের থলিয়া ও বাঁধন-এর উল্লেখ করল। উভয় ইমামের দলীল এই যে, হস্তগতকারী হস্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কিন্তু মালিকানার ক্ষেত্রে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। সুতরাং একদিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান থাকার কারণে লোকতার পরিচয় পেশ করা শর্ত হবে। কিন্তু আরেকদিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার কারণে সাক্ষ্য পেশ করা শর্ত হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, মালিকানার মত হস্তনিয়ন্ত্রণও উদ্দিষ্ট হক। সুতরাং প্রমাণ অর্থাৎ সাক্ষ্য ছাড়া সে তার অধিকারী হবে না। (এ সিদ্ধান্ত) মালিকানার উপর কিয়াস করে।

তবে আলামত সঠিকভাবে বলার ক্ষেত্রে অর্পণ করা তার জন্য বৈধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فان جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها اليه

যদি মালিক আসে এবং সেটির থলে এবং তার সংখ্যার পরিচয় বলতে পারে তাহলে তার হাতে তা অর্পণ করো।

প্রসিদ্ধ হাদীসের উপর আমল করার জন্য এই হাদীসের 'আদেশ' কে বৈধতার অর্থেও নেওয়া হবে।

প্রসিদ্ধ হাদীসটি হলো, البينة على المدعى। (প্রমাণ উপস্থিত করা বাদীর দায়িত্ব)।

এবং তার পক্ষ থেকে একজন কাফীল বা জামিনদার গ্রহণ করবে।

যখন বস্তুটি তার হাতে অর্পণ করবে, তা নির্ভরতার উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে কারো মত ভিন্নতা নেই। কেননা সে নিজের জন্য কাফীল গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অনুপস্থিত ওয়ারিছের অনুকূলে কাফীল গ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন[১]।

১। অনুপস্থিত ওয়ারিছদের জন্য ইমাম আবু হানিফার মতে কাফীল গ্রহণ করা হবেনা। কিন্তু সাহেবায়নের মতে গ্রহণ করা হবে।

উদ্ধারকারী যদিও তাকে সত্যায়ন করে, কেউ কেউ বলেছেন, তাহলেও তাকে অর্পণ করতে বাধ্য করা যাবে না। যেমন– আমানতের মাল ফেরত গ্রহণের অকীলের ক্ষেত্রে তাকে অর্পণে বাধ্য করা যাবে না। যদিও সে সত্যায়ন করে।

আর কোন কোন মতে বাধ্য করা হবে। কেননা মালিক এখানে অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আমানতের ক্ষেত্রে আমানত গচ্ছিতকারী হলো স্পষ্টতঃ মালিক[১]। **লোকতা কোন ধনী লোককে ছাদাকা করবে না।**

কারণ শরীয়তের নির্দেশ হলো সাদাকা করা। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فان لم يأت فليتصدق به

মালিক যদি না আসে তাহলে বস্তুটি যেন সে ছাদাকা করে দেয়।

আর ছাদাকা ধনীকে প্রদান করা যায় না। সুতরাং তা ফরয ছাদাকার সদৃশ হয়ে গেল।

আর যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি ধনী হয় তাহলে সে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন জায়েয হবে। কেননা উবাঈ (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فان جاء صاحبها فادفعها اليه وإلا فانتفع بها

যদি ঐ বস্তুটির মালিক এসে যায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দাও। অন্যথায় তুমি নিজে তা দ্বারা উপকৃত হও। অথচ তিনি সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে, দরিদ্রের জন্য তা বৈধ হওয়ার কারণ হচ্ছে জিনিসটিকে হেফাযতের জন্য উঠিয়ে নিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। আর এ বিষয়ে ধনী ব্যক্তির বেলায় উক্ত কারণ সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের দলীল এই যে, এটা পরের সম্পত্তি। সুতরাং মালিকের সম্মতি ছাড়া তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হতে পারে না। কেননা (অন্যের মাল ভোগ করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত) আয়াতসমূহ নিঃশর্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে দরিদ্রের জন্য বৈধতা এসেছে আমাদের বর্ণিত হাদীসটির কারণে। কিংবা ইজমা-এর ভিত্তিতে। সুতরাং দরিদ্রের উপকার লাভের বৈধতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল বিধান বহাল থাকবে।

আর সচ্ছল ব্যক্তি ঘোষণাকালীন সময়ে অসচ্ছল হয়ে পড়ার সম্ভাবনার কারণে কুড়িয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তি ঘোষণাকালীন সময়ে সচ্ছল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণে কুড়িয়ে নিতে অনাগ্রহ বোধ করতে পারে।

আর হযরত উবাঈ (রা)-এর উপকৃত হওয়ার বিষয়টি ইমামের অনুমতিতে হয়েছে। আর ইমামের অনুমতিক্রমে তা জায়েয।

আর যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি দরিদ্র হয় তাহলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোন বাধা নেই। কেননা তাতে উভয় পক্ষের কল্যাণ বাস্তবায়িত হয়। এ কারণেই অন্য দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করাও জায়িয রয়েছে। **তদ্রূপ** (উপকৃত হতে বাধা নেই) **যদি দরিদ্র ব্যক্তি তার পিতা, সন্তান বা স্ত্রী হয় আর সে নিজে ধনী হয়।** এর কারণ আমরা যা উল্লেখ করেছি। আল্লাহই অধিক অবগত।

১। উপস্থিত লোকটির অনুকূলে হস্তগত করার অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছে মাত্র। মালিকানার অধিকার স্বীকার করা হয়নি। আর অন্যের মালিকানার দ্রব্য হস্তগত করার অধিকার স্বীকার করার কারণে হস্তগত করার সুযোগ দান বাধ্যতামূলক নয়।

كتاب الاباق

অধ্যায় ঃ দাস-দাসীর পলায়ন

অধ্যায় দাস-দাসীর পলায়ন

যার পাকড়াও করার সামর্থ্য রয়েছে, তার জন্য পলাতককে পাকড়াও করাই উত্তম।

কেননা এতে মালিকের হক সংরক্ষণ করা হয়। আর কোন কোন মতে পথ হারা গোলামেরও হুকুম অনুরূপ। আর কোন কোন মতে তাকে ছেড়ে রাখাই উত্তম। কেননা তাতে সে একই স্থানে অবস্থান করবে। ফলে মালিক তাকে পেয়ে যাবে। কিন্তু পলাতকের বিষয়টি এমন নয়।

আর পলাতককে পাকাড়ওকারী তাকে নিয়ে শাসকের কাছে হাজির করবে। কেননা সে নিজে তো তাকে হেফাজত করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিষয় ভিন্ন।

আর পলাতককে শাসকের সমীপে উপস্থিত করার পর তিনি তাকে বন্দী করবেন। কিন্তু পথহারা গোলামকে উপস্থিত করা হলে তাকে বন্দী করবেন না।

কেননা পলাতকের দ্বিতীয়বার পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু পথহারা গোলামের বিষয়টি ভিন্ন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কিংবা তার বেশি দূরত্ব থেকে পলাতককে তার মনিবের কাছে ফেরত এনে দেয় সে চল্লিশ দেরহাম পরিতোষিক পাবে। আর যদি এরচেয়ে কম দূরত্ব থেকে এনে দেয় তাহলে সেই হিসাবে পাবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। সাধারণ কিয়াস মতে পূর্বশর্ত ছাড়া সে কিছুই পাবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (রা)-এর মত। কেননা সে তার উপকারিতা স্বেচ্ছায় দান করেছে। সুতরাং পথ হারিয়ে ফেলা গোলামের অনুরূপ হলো।

আমাদের দলীল এই যে, ছাহাবাগণ মূল পারিতোষিক ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তবে কেউ চল্লিশ দিরহাম আর কেউ তার চেয়ে কম সাব্যস্ত করেছেন। তাই আমরা সফরের দূরত্বে চল্লিশ দিরহাম এবং এর চেয়ে কম দূরত্বে তার চেয়ে কম সাব্যস্ত করেছি। উদ্দেশ্য হলো উভয় সিদ্ধান্তের মাঝে সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করা।

তাছাড়া এ কারণে যে, মূল পারিতোষিক সাব্যস্ত করার অর্থ হলো গোলামকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা শুধু দাওয়াতের অন্বেষণে কাজ করা বিরল। সুতরাং তাতে মানুষের মালের হেফাজতের বিষয়টি হাসিল হবে।

আর পরিমাণ নির্ধারণ শরীয়তের পক্ষ হতে 'শ্রুতি'র উপর নির্ভরশীল। অথচ পথহারা গোলামের ক্ষেত্রে কোন পরিমাণ শ্রুত হয়নি। তাই সে ক্ষেত্রে (পরিমাণ নির্ধারণে) বিরত থাকা হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, পথহারা গোলামকে হেফাজতের প্রয়োজন পলাতক গোলামকে হেফাজতের প্রয়োজনের চেয়ে কম। কেননা পথহারা গোলাম আত্মগোপন করবে না, অথচ পলাতক গোলাম আত্মগোপন করবে।

আর সফরের কম দূরত্ব থেকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে থোক পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে উভয়ের সমঝোতার মাধ্যমে কিংবা কাযীর মতামতের উপর সোপর্দ করা হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন চল্লিশ দিরহামকে তিন দিনের হিসাবে বন্টন করা হবে। কেননা তিন দিনই হলো সফরের সর্ব নিম্ন সময়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, গোলামের মূল্য যদি চল্লিশ দিরহামের কম হয় তাহলে ফেরত দানকারীর জন্য তার মূল্য প্রদানের ফায়সালা করা হবে। অবশ্য তা থেকে এক দিরহাম কম।

গ্রন্থকার বলেন, এ-ই ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সে চল্লিশ দেরহাম পাবে।

কেননা হাদীসের দ্বারা এই মান সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা থেকে হ্রাস করা যাবে না। এ কারণেই তো অতিরিক্ত পরিমাণের উপর সমঝোতা করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে তার চেয়ে কম পরিমাণের উপর সমঝোতা করা জায়েয। কেননা এর অর্থ হলো নির্ধারিত পরিমাণ থেকে হ্রাস করা।

ইমাম মোহাম্মদ (র) এর দলীল এই যে, পারিতোষিক নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো তাকে গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার উদ্বুদ্ধ করা, যাতে মালিকের মাল সংরক্ষিত থাকে।

সুতরাং এক দিরহাম কমিয়ে দেয়া হবে, যাতে মালিকের উপকার বাস্তবায়িত হয়।

এ বিষয়ে উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার সাধারণ দাসের নাম পর্যায়ভুক্ত, যদি প্রত্যর্পণ মনিবের জীবদ্দশায় হয়। কেননা এতে তার মালিকানা সংরক্ষণ করা হয়। পক্ষান্তরে যদি তার মৃত্যুর পর প্রত্যর্পণ করা হয় তাহলে ঐ দু'জনের ক্ষেত্রে কোন পারিতোষিক প্রদান করা হবে না। কেননা মনিবের মৃত্যুতে তারা আযাদ হয়ে যায়। সাধারণ দাসের বিষয়টি ভিন্ন।

প্রত্যর্পণকারী যদি মনিবের পিতা বা পুত্র হয় আর পিতা বা পুত্র তার পোষ্য পরিবারভুক্ত হয় কিংবা স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি অপর জনের গোলাম ধরে আনে তাহলে পারিতোষিক পাবে না। কেননা সাধারণতঃ এরা প্রত্যর্পণের ব্যাপারে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে থাকে। কুদূরীতে বর্ণিত বক্তব্যের নিঃশর্ততা এদের অন্তর্ভুক্ত করবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে ধরে এনেছে তার কাছ থেকে যদি পালিয়ে যায় তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না।

কেননা এটা তার হাতে আমানত ছিলো। তবে এটা তখন হবে যখন এ বিষয়ে সে সাক্ষ্য রাখবে। কুড়িয়ে পাওয়া 'লোকতার' ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীর কোন কোন অনুলিপিতে এরূপ রয়েছে যে, তার অনুকূলে কিছুই সাব্যস্ত হবে না। এটি সঠিক মত।

কেননা গুণগতভাবে সে মালিকের নিকট বিক্রয়কারী। এ কারণেই পারিতোষিক উশুল করা পর্যন্ত পলাতক গোলামকে সে আটক রাখতে পারে, যেমন বিক্রেতা মূল্য উশুল করার জন্য বিক্রিত দ্রব্য আটক রাখতে পারে।

তদ্রূপ যদি তার হস্তগত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমাদের বর্ণিত একই কারণে তার উপর কিছুই আরোপিত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মনিব যদি তাকে পাওয়া মাত্র আযাদ করে দেয় তাহলে আযাদ করার মাধ্যমে সে কব্জা করে নিয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে— ক্রয়কৃত গোলামের ক্ষেত্রে।

একই হুকুম হবে যদি প্রত্যর্পণকারীর কাছেই তা বিক্রি করে। কেননা মালিকের অনুকূলে গোলামের বিনিময় তথা মূল্য সংরক্ষিত রয়েছে।

আর প্রত্যর্পণ যদিও বিক্রয়ের হুকুম রাখে, কিন্তু তা এক দৃষ্টিকোণে বিক্রয়। সুতরাং তা কবজা করার আগে বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই তা বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন সে তাকে পাকড়াও করবে তখন তার কর্তব্য হবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য রাখা যে, সে তাকে প্রত্যর্পণের জন্য ধরে নিয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে পলাতকের ব্যাপারে সাক্ষ্য রাখা তার উপর অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং যদি পাকড়াও করার সময় সাক্ষ্য না রেখে থাকে তাহলে, তাঁদের মতে ফেরত দেওয়ার বেলায় সে পরিতোষিক লাভের হকদার হবে না।

কেননা সাক্ষ্য রাখার বিষয়টি পরিহার করা এ কথার পরিচায়ক যে, সে নিজের জন্যই পাকড়াও করেছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন সে পাকড়াওকারীর কাছ থেকে খরিদ করেছে। কিংবা উপহার রূপে বা মীরাছ রূপে লাভ করেছে, অতঃপর মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করেছে। এমতাবস্থায় তো প্রত্যর্পণকারী পারিতোষিক লাভের হকদার হয় না। কেননা সে নিজের জন্য প্রত্যর্পণ করছে।

তবে যদি সে এই মর্মে সাক্ষ্য রাখে যে, সে প্রত্যর্পণ করার জন্য খরিদ করছে, তাহলে পারিতোষিকের হকদার হবে। আর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সে স্বেচ্ছাদানকারী গণ্য হবে।

পলাতক গোলাম যদি বন্ধকী মাল হয় তাহলে বন্ধক গ্রহণকারীর উপর পারিতোষিক আরোপিত হবে।

কেননা প্রত্যর্পণের মাধ্যমে সে গোলামের অর্থ মূল্য সংরক্ষণ করেছে। আর বন্ধক গ্রহণকারীই হচ্ছে ঐ অর্থ মূল্যের বর্তমান হকদার। কেননা ঐ অর্থ মূল্য থেকেই তো সে তার প্রাপ্য উশুল করবে। আর পারিষোতিক তো সাব্যস্ত হয় অর্থ মূল্য সংরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত করার বিপরীতে। সুতরাং তার উপরই তা আরোপিত হবে।

আর বন্ধক প্রদানকারীর জীবদ্দশায় ও তার পরে প্রত্যর্পণ একই রকম। কেননা মৃত্যুর কারণে বন্ধক বাতিল হয় না।

বন্ধক গ্রহণকারীর উপর পারিতোষিক আসবে যদি গোলামের মূল্য ঋণের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয়। পক্ষান্তরে ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে ঋণের পরিমাণ তার উপর আসবে আর বাদবাকী বন্ধক দাতার উপর আসবে।

কেননা তার হক জামানতের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এটা গোলামের জন্য খরচকৃত ঔষধের মূল্য এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে গোলামকে অপরাধের দায়মুক্ত করার মত হলো।

আর (অনুমতি প্রাপ্ত) পলাতক গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে মনিব ঋণ পরিশোধ করার বিষয়টি গ্রহণ করলে পারিতোষিক তার উপর আরোপিত হবে। পক্ষান্তরে গোলামকে

বিক্রি করা হলে প্রথমে পারিতোষিক আদায় করা হবে। তারপর অবশিষ্ট অর্থ পাওনাদাররা পাবে। কেননা এটা হচ্ছে মালিকানার দায়বদ্ধ খরচ। আর এক্ষেত্রে উক্ত মালিকানা স্থগিত মালিকানার মত। সুতরাং যার অনুকূলে মালিকানা স্থিত হবে তার উপর পারিতোষিক দায় আরোপিত হবে।

আর যদি পলাতক গোলাম অপরাধ সংঘটন করে থাকে এবং মনিব ক্ষতিপূরণ আদায়ের দিকটি গ্রহণ করে তাহলে মনিবের উপর পারিতোষিকের দায় আরোপিত হবে। কেননা প্রত্যর্পণের লাভ তার দিকে ফিরে আসছে।

পক্ষান্তরে মনিব যদি গোলামকে ক্ষতিগ্রস্তের অভিভাকদের হাতে তুলে দেয় তাহলে তাদের উপর পারিতোষিকের দায় আসবে। কেননা প্রত্যর্পণের লাভ তাদের দিকে ফিরে আসছে।

আর যদি গোলামটি উপহাররূপে প্রদত্ত হয় তাহলে গ্রহীতার উপর আসবে। যদিও প্রত্যর্পণের পর দাতা তার দান ফেরত নিয়ে নেয়। কেননা লাভটুকু দাতার কাছে প্রত্যর্পণের সুবাদে আসেনি বরং প্রত্যর্পণের পর গ্রহীতা দানকৃত গোলামের মাঝে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার কারণে এসেছে।

পলাতক গোলাম যদি বালকের হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে পারিতোষিক প্রদত্ত হবে। কেননা এ হলো তার মালিকানায় দায়বদ্ধ খরচ। আর প্রত্যর্পণকারী যদি উক্ত বালকের অছী হয় তাহলে তার অনুকূলে কোন পারিতোষিক সাব্যস্ত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ গ্রহণের দায়িত্ব তিনি নিজে পালন করতেন।

كتاب المفقود

অধ্যায় ঃ নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ

অধ্যায় ঃ নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ

কোন ব্যক্তি যদি এমন ভাবে নিরুদ্দেশ হয় যে, তার অবস্থান স্থল জানা যাচ্ছে না এবং সে জীবিত না মৃত কিছুই জানা যাচ্ছে না, তাহলে কাযী একজন (উপযুক্ত) ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, যে তার সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করবে এবং তার প্রাপ্য হক উশুল করবে।

কেননা নিজের কল্যাণ বিধান করতে অক্ষম এমন সকল ব্যক্তির কল্যাণ বিধান করার জন্যই কাযীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর নিখোঁজ ব্যক্তি এমনই অক্ষমতার অবস্থাসম্পন্ন। ফলে সে বালক ও পাগলের ন্যায় হলো। আর তার মালের সংরক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপনাকারী নিযুক্ত করাতে তার কল্যাণ বিধান রয়েছে।

আর কুদূরীর এ মন্তব্য 'সে তার প্রাপ্য উশুল করবে'— দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, সে তার ক্ষেতের শস্য কব্জা করবে এবং তার দেনাদারদের মধ্যে মধ্যে কেউ ঋণের কথা স্বীকার করবে তা সে উশুল করবে। কেননা এটা সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। আর নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পাদিত চুক্তি বলে যে পাওনা সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলোর ব্যারে সে দাবী দাওয়া করবে। কেননা সে তার নিজের কর্মসম্পৃক্ত হকের ব্যাপারে মূল ব্যক্তি। কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তি যে সকল ঋণের দায়িত্ব নিয়েছিল সে ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তি দাবী-দাওয়া করতে পারবে না। তদ্রূপ কোন ভূসম্পত্তিতে তার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে কিংবা কোন ব্যক্তির কবজায় রক্ষিত কোন দ্রব্যের ব্যাপারে দাবী-দাওয়া করতে পারবে না।

কেননা সে মালিকও নয় আবার নিখোঁজ ব্যক্তির নায়েবও নয়। বরং সে শুধু কাযীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পাওনা উশুলের উকীল মাত্র। আর (কাযীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত) কবজা করার উকীল যে দাবী-দাওয়ার অধিকারী নয় তাতে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য দ্বিমত রয়েছে মালিকের পক্ষ থেকে ঋণ কবজা করার (জন্য নিযুক্ত) উকীলের ক্ষেত্রে। আর বিষয়টা যখন এরূপ হলো তখন ঐ সম্পর্কিত রায় প্রদানের অর্থ হবে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান আর তা বৈধ নয়; তবে কাযী যদি তা সমীচীন মনে করেন এবং তার ফায়সালা দেন, (তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে)। বিষয়টিতে মুজতাহিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আর যা নষ্ট হওয়ায় আশংকা রয়েছে, তা কাযী বিক্রি করে দেবেন। কেননা আকৃতিগতভাবে তা রক্ষা করা দুঃসাধ্য। সুতরাং গুণগতভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে তার কল্যাণ বিধান করা হবে।

আর যা নষ্ট হওয়ার আশংকা নেই তা ভরণ পোষণের বা অন্য কোন প্রয়োজনে বিক্রি করা যাবে না।

কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল সংরক্ষণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তার উপর কাযীর কোন কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আকৃতিগত সংরক্ষণের দিকটি সম্ভব অবস্থায় তা পরিহার করা তাঁর জন্য বৈধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তার স্ত্রীর এবং তার সন্তানদের জন্য তার মাল থেকে খরচ করা হবে।

আর এ বিধান শুধু তার সন্তানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জন্মসূত্রে সকল আত্মীয়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যে কেউ তার উপস্থিতিতে আদালতের রায় ছাড়াই তার মাল থেকে ভরণ-পোষণের হকদার হয়। লোকটির অনুপস্থিতিকালীন সময়ে তার মাল থেকে তার জন্য খরচ করা হবে।

কেননা তখন আদালতের ফায়সালের অর্থ হবে হকদারকে (হক লাভে) সাহায্য করা।

পক্ষান্তরে তার উপস্থিতিতে যারা আদালতের ফায়সালা ছাড়া ভরণ-পোষণের হকদার হয় না, তার অনুপস্থিতিতে তার মাল থেকে তাদের জন্য খরচ করা হবে না।

কেননা তখন তো ভরণ-পোষণের খরচ আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে অথচ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালা প্রদান নিষিদ্ধ।

প্রথমোক্তদের উদাহরণ হলো ছোট ছোট সন্তানরা এবং প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্দী পুরুষরা।

দ্বিতীয়োক্তদের উদাহরণ হলো ভাই-বোন, মামু ও খালা।

আর ইমাম কুদূরী (র) এর এ মন্তব্য "তার সম্পদ থেকে"-এর উদ্দেশ্য হলো দেরহাম ও দীনার (নগদ অর্থ)। কেননা তাদের প্রাপ্য হক হলো অন্ন ও বস্ত্র। সুতরাং তার সম্পদে যদি অন্য দ্রব্য ও বস্ত্র দ্রব্য না থাকে, তখন মূল্যের ফায়সালা প্রদানের প্রয়োজন হবে। আর তা হলো নগদ অর্থ। এই বিধানের ক্ষেত্রে আর স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড দেরহামও দীনারের পর্যায়ভুক্ত। কেননা মোহরাংকিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় সেটাও মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

এ বিধান হবে তখন যখন মাল কাযীর হাতে থাকবে। পক্ষান্তরে যদি আমানত বা ঋণ অবস্থায় (অন্যের কাছে) থাকে আর আমানত গ্রহণকারী এবং ঋণগ্রহণকারী ঋণ ও আমানতের কথা স্বীকার করে তদ্রূপ যদি বিবাহ ও বংশ পরিচয়-এর বিষয়টি স্বীকার করে তাহলে তাদের দুজনের কাছ থেকে নিয়ে তাদের উপর খরচ করা হবে।

বিবাহ ও বংশ পরিচয় এবং ঋণ ও আমানত স্বীকার করার প্রশ্ন তখনই আসবে যখন কাজীর নিকট সেগুলো প্রমাণিত না থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাযীর নিকট প্রমাণিত থাকে, তাহলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

আর যদি দুটির একটি প্রমাণিত হয় তাহলে যেটি প্রমাণিত নয় সেটির ক্ষেত্রে স্বীকার করার থাকবে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

আর যদি আমানত গ্রহণকারী কিংবা ঋণ গ্রহণকারী কাযীর নির্দেশ ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে প্রদান করে তাহলে আমানত গ্রহণকারী দায় বহন করবে এবং ঋণগ্রহণকারী ঋণমুক্ত হবে না। কেননা সে তা হকদারের নিকট কিংবা তার স্থলবর্তী ব্যক্তির নিকট প্রদান করেনি। আর কাযীর আদেশে প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কাযী হলেন নিরুদ্দিষ্টের স্থলবর্তী।

আর যদি আমানত গ্রহণকারী ও ঋণগ্রহণকারী মূল আমানত ও ঋণের বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা বিবাহ সম্পর্ক ও বংশ সম্পর্ক অস্বীকার করে তাহলে খোরপোষকের হকদারদের কেউ এ বিষয়ে বাদী রূপে দাঁড়াতে পারবে না।

কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলের যে মালের দাবি তারা করছে, সেটা তাদের খোরপোষের হক সাব্যস্ত হওয়ার কারণ রূপে নির্ধারিত নয়। কেননা সেটা এই মালে যেমন সাব্যস্ত হতে পারে, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তির অন্য মালেও সাব্যস্ত হতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা দেওয়া হবে না।

ইমাম মালিক (র) বলেন, চার বছর অতিক্রান্ত হলে কাযী তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সম্পন্ন করবেন। এবং তার স্ত্রী মৃত্যুর ইদ্দত পালন করলে অতঃপর যাকে ইচ্ছা বিবাহ করবে।

কেননা, মদীনায় যে ব্যক্তিকে জ্বিনেরা নিয়ে গিয়েছিল, তার সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) এরূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন। আর অনুকরণীয় হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।

তাছাড়া এই কারণে যে, অনুপস্থিতির মাধ্যমে সে তার স্ত্রীর হক রোধ করেছে। সুতরাং ঈলা ও পুরুষত্বহীনতার উপর কিয়াস করে একটা সময় পার হওয়ার পর কাযী তাদের মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবেন। আর এই কিয়াসের পর সময়সীমা উভয়টি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে– চার (মাসের ইদ্দত) নেয়া হয়েছে ঈলা থেকে আর চার বছরের মেয়াদ নেয়া হয়েছে পুরুষত্বহীনতা থেকে যাতে উভয় সদৃশের উপর আমল হয়ে যায়।

আমাদের দলীল হলো নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্য যে, তার কাছে প্রমাণ আসা পর্যন্ত সে তার স্ত্রী থাকবে।

আর হযরত আলী (রা) এর এ ধরনের স্ত্রী সম্পর্কে এই বক্তব্য যে, সে তার স্ত্রী, তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। সুতরাং মৃত্যু বা তালাকের বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত সে সবর করবে।

এ হল বর্ণিত 'মারফূ' হাদীসে বয়ানের ব্যাখ্যা।

তাছাড়া এই কারণে যে, বিবাহ সাব্যস্ত তো সুপ্রমাণিত। আর 'অনুপস্থিতি' বিচ্ছেদকে অনিবার্য করেনা। পক্ষান্তরে মৃত্যুর বিষয়টি হচ্ছে সম্ভাবনার পর্যায়ে। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে বিবাহ বিলুপ্ত হবে না।

আর হযরত ওমর (রা) হযরত আলী (রা) এর মতের দিকে ফিরে এসেছেন।

আর বিষয়টিকে ঈলা-এর উপর কিয়াস করা যায় না। কেননা (জাহেলিয়াতের যুগে)- এটা অবলম্বিত তালাক রূপে গণ্য ছিলো। পরে শরীয়ত এটিকে বিলম্বিত তালাক রূপে গণ্য করেছে। তাই তা বিচ্ছেদ সাব্যস্তকারী হয়েছে।

তদ্রূপ পুরুষত্বহীনতার উপরও কিয়াস করা যায় না। কেননা অনুপস্থিতির পর ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

পক্ষান্তরে পুরুষত্বহীনতা এক বছর অব্যাহত থাকার পর খুব কমই তা দূরীভূত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিখোঁজ লোকটির জন্মের দিন থেকে হিসাব করে যখন একশ কুড়ি বছর পূর্ণ হবে, তখন আমরা তার মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করবো।

এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে হযরত হাসানের বর্ণনা। আর যাহিরে রেওয়ায়েত মতে তার সমবয়সীদের মৃত্যুর সাথে সীমা নির্ধারণ করা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে একশ বছরের মেয়াদ বর্ণিত হয়েছে। আর কোন কোন মাশায়েখ নব্বই বছর নির্ধারণ করেছেন। তবে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ না করাই হলো অধিকতর কেয়াস সম্মত। আর নব্বই বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করা অধিকতর সহজ।

যখন মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করা হবে তখন তার স্ত্রী ঘোষণার সময় থেকে ওয়াফাতের ইদ্দত পালন করবে।

আর সেই সময়ে বিদ্যমান ওয়ারিসদের মাঝে তার মাল বন্টন করা হবে।

যেন চাক্ষুসভাবেই সে ঐ সময় মৃত্যু বরণ করেছে। কেননা ফয়সালার ব্যাপারটি প্রকৃত মৃত্যুর সাথে বিবেচ্য।

এর পূর্বে যে সকল ওয়ারিছ মারা যাবে তারা তার থেকে মীরাছ পাবে না।

কেননা ঐ সময় তো তার মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করা হয়নি। সুতরাং এমনই হলো যেন তার জীবিত থাকা পরিজ্ঞাত রয়েছে।

নিখোঁজ ব্যক্তি তার নিখোঁজ অবস্থায় মারা যাওয়া কারো ওয়ারিছ হবেনা।

কেননা ঐ সময়ে তাকে জীবিত ধরাটা চলমান অবস্থার সাথে অনুগমনের (استصحاب الحال)-এর ভিত্তিতে হয়েছে। আর গোটা হকদারি সাবস্তের ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে বিবেচ্য হয় না।

তদ্রূপ যদি নিখোঁজ ব্যক্তির অনুকূলে অছিয়ত করা হয় আর অছিয়াতকারী মারা যায় তাহলে সেই অছিয়ত কার্যকর হবে না।

নিখোঁজ ব্যক্তির মালের ক্ষেত্রে মূল সূত্র এই যে, নিখোঁজ ব্যক্তির সঙ্গে যদি এমন কোন ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে, যে তার দ্বারা 'মাহজুব' (বঞ্চিত) হয় না, তবে তার দ্বারা তার হকের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহলে দুই হিসসার অল্পতরটা তাকে প্রদান করা হবে। আর অবশিষ্ট স্থগিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি তার সঙ্গে এমন ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে, যে তার দ্বারা বঞ্চিত হয় তাহলে তাকে কোন হিসসাই প্রদান করা হবে না।

সুরতে হালের বিশদ বিবরণ এই যে, একজন লোক দুটি কন্যা, একজন নিখোঁজ পুত্র এবং একজন পুত্রের পুত্র এবং একজন পুত্রের কন্যা রেখে মারা গেলো আর সম্পদ রয়েছে ওয়ারিছগণ বহির্ভূত কারো হাতে। এখন সকলে পুত্র নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করলো। আর কন্যাদ্বয় মীরাছ দাবী করলো। এমতাবস্থায় তাদের দু'জনকে সম্পদের অর্ধেক প্রদান করা হবে। কেননা এই পরিমাণ প্রাপ্তি তো নিশ্চিত। আর অপর অর্ধেক স্থগিত থাকবে। পক্ষান্তরে পুত্রের সন্তানদেরকে কোন হিসসা প্রদান করা হবে না। কেননা নিখোঁজ

ব্যক্তির জীবদ্দশা দ্বারা তারা বঞ্চিত হয়। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় তারা মীরাছের হকদার হবে না।

আর ওয়ারিছগণ বহির্ভূত ব্যক্তির নিকট থেকে খেয়ানত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট সম্পদ ফিরিয়ে আনা হবে না।

অর্ধেক সম্পদ স্থগিতকরণের ক্ষেত্রে এ সদৃশ হলো গর্ভস্থ সন্তান। কেননা তার অনুকূলে একজন পুত্র সন্তানের পরিমাণ হিসসা স্থগিত রাখা হয়, এর উপরই হলো ফতোয়া।

আর যদি গর্ভস্থ সন্তানের সঙ্গে অন্য এমন ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে যার দ্বারা কোন অবস্থায় তার হিসসা রহিত না হয় এবং পরিবর্তিত না হয়, তাহলে তার পূর্ণ হিসসা দিয়ে দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে ওয়ারিছ যদি এমন হয় যে, গর্ভস্থ সন্তান দ্বারা তার হিসসা রহিত হয় তাহলে তাকে কিছুই প্রদান করা হবে না। আর যদি এমন হয় যে, গর্ভস্থ সন্তান দ্বারা তার হিসসা পরিবর্তিত হয়, তাহলে কম পরিমাণের হিসসা প্রদান করা হবে। কেননা এই পরিমাণ প্রাপ্তি তো সুনিশ্চিত; যেমন নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে। বিষয়টি আমি কিফায়াতুল মুনতাহী কিভাবে অধিকতর পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করেছি।

كتاب الشركة
অধ্যায় ঃ অংশীদারিত্ব

অধ্যায় ঃ অংশীদারিত্ব

অংশীদারিত্ব শরীয়ত সম্মত।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রেরিত হয়েছিলেন তখন লোকেরা অংশীদারির মোয়ামেলা করতো আর তিনি তাদের এর উপর বহাল রেখেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অংশীদারিত্ব দু'ধরনের। মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব।

মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব হলো দু'জনের যৌথভাবে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া কিংবা দুইজন যৌথভাবে কোন সম্পত্তি খরিদ করা। তখন একজনের অধিকার থাকবেনা অপরজনের অনুমতি ছাড়া তার হিসসা ব্যবহার করা। আর উভয়ের প্রত্যেক অপরের হিস্‌সায় পরের মত হবে।

আর এ আংশীদারিত্ব কুদূরী কিতাবে উল্লেখিত ক্ষেত্রদ্বয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন– দু'জনে একত্রে কোন সম্পদ গ্রহণ করলো। কিংবা একত্রে আধিপত্যের মাধ্যমে মালিকানা লাভ করলো। কিংবা দুজনের কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া পরস্পরের সম্পদ মিশ্রিত হয়ে গেলো কিংবা নিজেদের উদ্যোগে মিশ্রিত করলো এমন ভাবে যে, কোন ক্রমেই তা পার্থক্য করা যায় না কিংবা বিনাকষ্টে পার্থক্য করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত সকল প্রকারেই প্রত্যেকে নিজের অংশ অপর অংশীদারের কাছে এবং তার অনুমতি ছাড়াই অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারে। তবে মিশ্রিত হওয়া এবং মিশ্রিত করার হুকুম ভিন্ন। অর্থাৎ শরীকদারের অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ নয়। কিফায়াতুল মুনতাহী গ্রন্থে পার্থক্যের কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় প্রকার হলো চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব।

অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হওয়ার রোকন বা মূল স্তম্ভ হলো ইজাব ও কবুল। যেমন একজন বলে, আমি এই বিষয়ে তোমারে অংশীদার করলাম আর অপর জন বলে আমি তা গ্রহণ করলাম।

এই চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো যে কর্ম ওকীল বানানোর যোগ্যতা রাখে, যাতে উক্ত কর্মের মাধ্যমে যা অর্জিত হবে তা উভয়ের শরীকানাভুক্ত থাকবে এবং অংশীদারি চুক্তির কাঙ্ক্ষিত ফল সাব্যস্ত হতে পারবে।

এই অংশীদারিত্ব চার প্রকার। মুফাওযা (مفاوضة), আনান (العنان) শিরকাতুছ ছানায়ে (شركة الصنائع) শিরকাতুল উজূব (شركة الوجوب) শিরকাতুল মুফাওযা (বা সমঅংশীদারিত্ব) এই যে, দুই ব্যক্তি নিজেদের সম্পদের ক্ষেত্রে এবং সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে আর ঋণের ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার হয়।

কেননা এটা হচ্ছে সর্বপ্রকার ব্যবসায়ে সাধারণ অংশীদারিত্ব। তাতে উভয়ের প্রত্যেকে অংশীদারির বিষয়টি অপরের হাতে নিঃশর্তভাবে ন্যস্ত করে। কেননা শব্দটি ক্ষমতার অর্থ নির্দেশ করে।

যেমন আরবের একটি কবিতায় এই অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

সুতরাং সূচনা ও সমাপ্তি প্রতিটি পর্বেই সমতা বিধান করা অপরিহার্য। আর এই সমতা বিধান হবে এমন সম্পদের ক্ষেত্রে, যাতে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হয়। যে সকল সম্পদে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হয় না সে সকল ক্ষেত্রে কম-বেশি হওয়া বিবেচ্য নয়।

তদ্রূপ ব্যবহারের অধিকারের ক্ষেত্রের সমতা অপরিহার্য। কেননা একজন যদি এমন ব্যবহারের অধিকারী হয় যার অধিকারী অন্যজন হয়না, তাহলে সমতা বিনষ্ট হবে। তদ্রূপ ঋণের ক্ষেত্রেও সমতা বিধান অপরিহার্য। এর কারণ ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করবো।

আমাদের নিকট এই সম অংশীদারিত্ব সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী জায়িয। পক্ষান্তরে কিয়াস অনুযায়ী জায়িয হয় না। আর তা-ই ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত।

মালিক (র) বলেন, শিরকাতুল মুফাবায কী জিনিস তা আমি জানি না।

কিয়াসের দলীল এই যে, এটা জাতিগতভাবে অজ্ঞাত বিষয়ের এমন ওয়াকীল (প্রতিনিধি) হওয়া এবং কাফীল (জামিনদার) হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ উভয়টি স্বতন্ত্রভাবে করলে ফাসিদ হয়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের বাণী–

فاوضوا فانه اعظم للبركة

তোমরা শিরকাতে মুফাবায করো। কেননা তা অধিক বরকতপূর্ণ। তাছাড়া শুরু থেকেই মানুষ বিনা বাধায় এই মুআমালা করে আসছে আর এভাবে প্রচলনের (تعامل) কারণে কিয়াস বর্জন করা হয়।

আর (তথা সমতা বিধানের) অনুবর্তী হিসেবে অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, যেমন মোদারাবার ক্ষেত্রে।

'মুফাবাযা' শব্দ ছাড়া এই শরীকানা সংঘটিত হবে না।

কেননা এর শর্তসমূহ সাধারণের জ্ঞান থেকে বহির্ভূত। অবশ্য উভয়ে যদি (শব্দটি উল্লেখ না করে) এবং যাবতীয় শর্ত উল্লেখ করে তবে 'শিরকাতুল মোফাবাযা' সম্পন্ন হবে। কেননা উদ্দেশ্যই হলো বিবেচ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, সুতরাং স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক দুই মুসলমান কিংবা দুই যিম্মীর মাঝে তা সম্পন্ন হতে পারে।

যেহেতু (পূর্ণ রূপে) সমতা সাব্যস্ত হয়েছে।

যদি একজন কিতাবী আর অপরজন মাজূসী হয় তাহলেও শিরকাতুল মোফাবাযা জায়েয হবে।

কারণ আমরা (উপরে) যা বলে এসেছি।

দাস ও স্বাধীন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কের মাঝে তা বৈধ হবে না।

কেননা সমতা বিদ্যমান নেই। কারণ স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মুআমিলা প্রয়োগের ও দায় গ্রহণের অধিকারী। পক্ষান্তরে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া এর মধ্যে কোনটিরই অধিকারী নয়। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক দায় গ্রহণের অধিকারী নয়। এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মু'আমিলা সম্পাদনের অধিকারী নয়।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন, মুসলমান ও কাফিরের মাঝেও বৈধ হবে না।

এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র)ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যেহেতু ওয়াকীল ও কাফীল হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়েই সমান, কাজেই তা বৈধ হবে। দুজনের একজন যে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী তা বিবেচ্য হবে না। যেমন শাফেয়ী মাযহাব ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী দুজনের মাঝে শিরকাতুল মোফাবাযা বৈধ হয়। অথচ বিসমিল্লাহ বর্জিত পশুর বিষয়ে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা চুক্তির ক্ষেত্রে যিম্মী জায়েয ও না জায়েয সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না।

তারফায়নের দলীল এই যে, মুআমিলার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা নেই। কেননা যিম্মী যদি মূল পুঁজি দ্বারা মদ বা শূকর ক্রয় করে তাহলে তা বৈধ। অথচ মুসলমান তা ক্রয় করলে বৈধ হবেনা।

দুই দাসের মাঝে, দুই বালকের মাঝে এবং দুই মুকাতাবের মাঝে শিরকাতুল মুফাবাযা জায়েয নয়।

কেননা তাদের পক্ষে কাফীল হওয়া বৈধ নয়।

আর যে সকল ক্ষেত্রে শর্ত আবিদ্যমান হওয়ার কারণে শিরকাতুল মোফাবাযা বৈধ হয়নি আর উক্ত শর্তটি শিরকাতুল আনান এ প্রযোজ্য নয়; সে সকল ক্ষেত্রে শিরকাতুল মোফাবাযা 'শিরকাতুল আনান'-এ রূপান্তরিত হবে। এই হিসাবে যে তাতে শিরকাতুল আনান-এর যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। কারণ শিরকাতুল আনান বিশেষ ক্ষেত্রেও হয়, এবং কখনো সাধারণ ক্ষেত্রেও হয়।

ইমাম কুদূরী বলেন, আর শিরকাতুল মুফাবাযা উকীল ও কাফীল হওয়ার ব্যাপারে সংঘটিত হয়।

উকীল হওয়ার ব্যাপারটি এজন্য যে, তাতে উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আর তা হলো সম্পদের অংশিদারিত্ব। যেমন– উপরে আমরা বর্ণনা করেছি।

কফীল হওয়ার ব্যাপারটি এই যাতে ব্যবসা বাণিজ্যের অপরিহার্য বিষয়গুলোর মধ্যেই সমতা সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো দায়ও তাগাদা উভয়ের প্রতি আরোপিত হওয়া।

ইমাম কুদূরী বলেন, উভয়ের প্রত্যেকে যা কিছু ক্রয় করবে তা অংশীদারিত্বমূলক হবে, পরিবার পরিজনের জন্য ক্রয়কৃত খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া। তদ্রূপ তার নিজের পরিধেয় ছাড়া। তদ্রূপ তরকারী ইত্যাদি।

কেননা চুক্তির দাবী হচ্ছে সমতা । আর লেনদেনের ব্যাপারে উভয়ের প্রত্যেকে অপর জনের স্থলবর্তী। সুতরাং তাদের একজনের খরিদ করা উভয়ের খরিদ করার সমার্থক হবে। তবে কিতাবে যেগুলোকে ব্যতিক্রম গণ্য করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া।

এ হচ্ছে সূক্ষ্ম কেয়াসের দাবী। কেননা প্রয়োজনের তাগিদে এগুলোকে 'শিরকাতুল মোফাবাযা' থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

কারণ ধারাবাহিক প্রয়োজন সংঘটিত হওয়া তো জানাই রয়েছে। আর সেগুলো তার শরীকদারের উপর আরোপ করা এবং তার মাল থেকে খরচ করা সম্ভব নয়। অথচ খরিদ করা

ছাড়াও উপায় নেই। সুতরাং প্রয়োজনের তাকিদে এটি তার জন্য বিশিষ্ট থাকবে। যদিও আমাদের বর্ণিত কারণে কিয়াসের দাবী হলো এটাও অংশীদারির ভিত্তিতে হওয়া।

আর মূল্য উশুলের ব্যাপারে বিক্রেতা উভয়ের যে কারো কাছে তাগাদা করতে পারে।

ক্রেতার কাছে তো মৌলিক সূত্রে, আর শরীকদারের কাছে কাফালাত সূত্রে। অবশ্য কাফীল যে পরিমাণ আদায় করেছে তার থেকে নিজের অংশ ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেবে।

কেননা সে উভয়ের শরীকানার মাল থেকে ক্রেতার উপর সাব্যস্ত ঋণ শোধ করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে অংশীদারি বৈধ তার বিনিময়ে যে ঋণ উভয়ের যে কোন একজনের উপর আরোপিত হবে অপরজন তার জামিনদার হবে ,যাতে সমতা সাব্যস্ত হয়। আর যে সকল ক্ষেত্রে অংশীদারি বৈধ হয় সেগুলো হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাড়া নেওয়া।

আর এর বিপরীত প্রকার হল (যে গুলিতে অংশীদারি বৈধ নয়)

কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ, বিবাহ ও খোলা। এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার দন্ডের কারণে এবং বাধ্যতামূলক ভরণ পোষণের সমঝোতা রূপে সাব্যস্ত মাল।

(ইমাম মুহম্মদ) বলেন, দুজনের একজন যদি তৃতীয় কারো পক্ষ থেকে কাফীল হয় (অর্থাৎ ঋণের দায় গ্রহণ করে।) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে শরীকাদারের উপরও তা আরোপিত হবে।

সাহেবায়ন বলেন, তার উপর আরোপিত হবে না। কেননা, তা হল স্বেচ্ছাদান।

এ কারণেই বালকের পক্ষ থেকে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের পক্ষ থেকে এবং মুকাতারের পক্ষ হতে কাফালাত বৈধ নয়। এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির পক্ষ হতে দায় গ্রহণ সংঘটিত হলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকেই তা বৈধ হবে। সুতরাং তা ঋণদান এবং কারো জানের বদলে কাফালাত-এর ন্যায় হলো।

উমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তা হল স্বেচ্ছা দান এবং শেষ পরিণতিতে তা বিনিময়। কেননা কাফীল (বা দায়গ্রহণকারী) যা আদায় করবে তার ক্ষতিপূরণ ঐ ব্যক্তির উপর অবশ্য সাব্যস্ত হয় যার পক্ষ হতে আদায় করা হয়েছে, যদি তার অনুমতিক্রমে আদায় করা হয়ে থাকে।

সুতরাং পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকে তা শিরকাতুল মোফাবাযা অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে প্রাথমিক পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বৈধ হবে না। আর মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে বৈধ হবে।

জানের বদলে কাফালাতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা প্রাথমিক ও পরিণতি উভয় পর্বেই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত।

ঋণদান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনায় শরীকদারের উপরও তা আরোপিত হবে।

যদি আরোপিত না হওয়ার বর্ণনা মেনে নেয়া হয় তাহলে পার্থক্যের কারণ এই যে, তাহলো 'আরিয়াত' বা ঋণ দান। সদৃশ বস্তুটির উপর মূল বস্তুটির বিধান আরোপিত হবে,

বিনিময়ের বিধান আরোপিত হবে না। এ কারণেই তাতে মেয়াদ নির্ধারণ বৈধ নয়। সুতরাং বিনিময় আদান-প্রদান সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি দায় গ্রহণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ মতে শরীকদারের উপর তা আরোপিত হবে না। কেননা এতে মুফাবাযাহর গুণ বিদ্যমান নেই।

আর জামে ছাগীর কিতাবে বর্ণিত নিঃশর্ত বিধানটি শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গসব এবং ধ্বংস করে ফেলার ক্ষতিপূরণের বিষয়টি কাফালাত পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা পরিণতি পর্বে এ দুটোও বিনিময় লেনদেনের নামান্তর।

জামে ছাগীরে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, দু'জনের একজন যদি এমন সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, যাতে অংশীদারিত্ব বৈধ কিংবা যদি তাকে হেবা করা হয় আর তা তার কবজায় পৌছে যায় তাহলে শিরকাতুল মোফাবাযাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তা শিরকাতুল আনান-এ রূপান্তরিত হবে।

কেননা যে মাল মূলধন হওয়ার যোগ্য তাতেও সমতা বিনষ্ট হয়েছে। অথচ শিরকাতুল মোফাবাযাহ-এর ক্ষেত্রে প্রথমে ও স্থায়িত্বে উভয় অবস্থায় তা বিদ্যমান থাকা শর্ত।

এটা এজন্য যে, যে যা প্রাপ্ত হয়েছে অপরজনের ক্ষেত্রে অংশীদারির কারণ বিদ্যমান না থাকায় সে তাতে অংশীদার হতে পারবে না। তবে সম্ভাবনা থাকার কারণে তা শিরকাতুল আনান-এ রূপান্তরিত হবে। কেননা তাতে সমতার শর্ত নেই। আর শিরকাতুল আনানের স্থায়িত্বকালের বিধান তার প্রাথমিক বিধানের অনুরূপ। কেননা কোন পক্ষের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। উভয়ের কোন একজন যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কোন 'দ্রব্য সম্পদ' লাভ করে তাহলে তা তার একক মালিকানায় থাকবে এবং শিরকাতুল মোফাবাযা বাতিল হবে না।

'ভূ-সম্পদ' লাভের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে। কেননা তাতে অংশীদারিত্ব বৈধ নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সমতারও শর্ত হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ

দেরহাম দীনার ও চালু মুদ্রা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে শিরকাতুল মোফাবাযাহ সংঘটিত হবে না। ইমাম মালিক (র) বলেন, 'দ্রব্য সম্পদ' এবং মাপা ও ওজনের বস্তু যদি এক জাতীয় হয় তাহলে তাতেও শিরকাতুল মুফাবিযা বৈধ হবে।

কেননা এখানে পরিজ্ঞাত মূলধনের উপর শিরকাতুল মোফাবাযাহ সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং মুদ্রার সদৃশ হলো।

মোদারাবাহর বিষয়টি ভিন্ন। (তা স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে বিশিষ্ট।) কেননা তাতে দায়হীন মাল থেকে মুনাফা অর্জিত হয়। এ কারণে কিয়াস তার বৈধতা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তা শরীয়তের 'প্রবর্তন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, সম্পদ দায়হীনতা থেকে মুনাফা ভোগে পর্যবসিত হয়। কেননা উভয় অংশীদার যদি নিজ নিজ মূলধন ভিন্ন পরিমাণ মূল্যে বিক্রি করে তাহলে একজন তার শরীকদারের মালে যে অতিরিক্ত পরিমাণের হকদার হবে তা হবে ঐ সম্পদের মুনাফা যার মালিকানা তার নেই এবং যার দায় সে বহন করেনি।

দেরহাম দীনারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা দেরহাম দীনার যেহেতু নির্ধারিত হয় না সেহেতু যা সে খরিদ করবে তার মূল্য তার যিম্মায় অনির্ধারিত রূপে থেকে যাবে। সুতরাং তা ঐ মালের মুনাফা হলো যার দায় তার উপর এসেছে।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল এই যে, 'দ্রব্য সম্পদের' ক্ষেত্রে কৃত ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে বিক্রয়। পক্ষান্তরে দেরহাম দীনারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রয়। আর দুজনের একজন এই শর্তে নিজের মাল বিক্রি করা জায়েয নেই যে, অপরজন তার মূল্যের মধ্যে শরীক হবে। পক্ষান্তরে দুজনের একজন এই শর্তে নিজের মাল দ্বারা কোন কিছু খরিদ করা যে, খরিদকৃত দ্রব্যটি উভয়ের শরীকানা থাকবে– তা জায়েয আছে।

আর চালু মুদ্রা যেহেতু মুদ্রার মতই প্রচলিত সেহেতু তা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

ফকীহগণ বলেছেন যে, এটা হলো ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত। কেননা তাঁর মতে এগুলো স্বর্ণরোপ্য মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত। এমনকি তা নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না (যেমন দিরহাম দীনার)। একটির নির্ধারিত বিনিময়ে দুটি বিক্রি করা বৈধ নয়, যেমন আগে আলোচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র) এর মতে প্রচলিত অন্য ধাতব মুদ্রা-দ্বারা অংশীদারি ব্যবসা ও মোদারাবা বৈধ নয়। কেননা এর মূল্যমান সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং কখনো পণ্যে রূপান্তরিত হয়।

আর ঈমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে ইমাম মুহম্মদ (র) এর অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিকতর কিয়াস সম্মত ও প্রকাশিত। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে ধাতব মুদ্রা দ্বারা মোদারাবাহ বৈধ হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এছাড়া অন্য কোন জিনস দ্বারা শিরকাতুল মুফাবাযাহ বৈধ নয়। তবে যদি লোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত দ্বারা বা গলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা লেনদেন করে তবে এগুলো দ্বারা শিরকাতু মোফাবাযাহ বৈধ হবে।

কুদূরী (র) কিতাবে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

আর জামে ছাগীরে রয়েছে স্বর্ণ বা রৌপ্য মিছকাল দ্বারা শিরকাতকুল মোফাবাযাহ হবে না।

তাঁর উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত। সুতরাং এই বর্ণনা মতে স্বর্ণ-রৌপ্য পাত হচ্ছে পণ্য যা নির্ধারণ করলে নির্ধারণ হয়ে যায়। সুতরাং তা মোদারাবাহ বা শিরকাতুল মোফাবাদাহ-এর মূলধন হওয়ার যোগ্য নয়।

জামে ছাগীরের كتاب الصرف অধ্যায়ে ইমাম মোহাম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, গলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, এমন কি সমর্পণের আগে বিনষ্ট হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয় না।

সুতরাং كتاب الصرف এর বর্ণনা মতে উভয় ক্ষেত্রেই এটা মূলধন হওয়ার যোগ্য। আর এ কারণে যে, আগেই আলোচিত হয়েছে যে, মূলতঃই এ দুটোকে (স্বর্ণ রৌপ্যকে) মূল্যধাতু রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (পণ্যধাতুরূপে নয়)।

তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা যদিও এটাকে মূলতঃ 'বাণিজ্য মাধ্যম' রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে তবে তার 'মূল্যগুণ' বিশেষভাবে 'মোহরাঙ্কিত' মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট কেননা স্পষ্টতই তখন এটাকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না, অবশ্য যদি না ঐ পাত বা পিণ্ডকে মূল্যধাতু রূপে ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেনের প্রচলন শুরু হয়ে যায়। তখন প্রচলনকেই মোহরাঙ্কিত মুদ্রার স্থলবর্তী ধরা হবে। ফলে তা 'মূল্য' রূপে বিবেচিত হবে এবং মূলধন হওয়ার যোগ্য হবে।

'অন্য কোন জিনিস দ্বারা জায়েয হবে না'– ইমাম কুদূরী (র) এর বক্তব্য মাপ ও ওজনকৃত দ্রব্য এবং সংখ্যা দ্বারা গণনাকৃত প্রায় সদৃশ বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। মিশ্রণ ঘটানোর পূর্ব পর্যায়ে হলে এটার অবৈধতা সম্পর্কে আমাদের ইমামদের মাঝে কোন মতভিন্নতা নেই। উভয়ের প্রত্যেকের জন্যই নিজ নিজ পণ্যের মুনাফা হাসিল হবে এবং লোকসানও যার যার উপর আরোপিত হবে।

আর যদি উভয় সম্পদের মিশ্রণ ঘটানোর পর দু'জনে অংশীদারি চুক্তি করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে একই বিধান হবে। তবে এটা হবে মালিকানার অংশীদারিত্ব, চুক্তির অংশীদারিত্ব নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে চুক্তির অংশীদারি বৈধ হবে।

মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে উভয়ের মাল সমান হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুনাফার তারতম্যের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) যা বলেছেন তা হলো যাহিরে রেওয়ায়েত।

কেননা (উপরোক্ত তিন প্রকার বস্তু) মিশ্রণের পূর্বে যেমন (নির্ধারণের দ্বারা) নির্ধারিত হয় তেমনি মিশ্রণের পরও নির্ধারিত হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর দলীল এই যে, একদিক থেকে এগুলো 'মূল্য' (পণ্য নয়) তাই তো (বস্তুগতভাবে) অনির্ধারিত রেখে এগুলোর বিনিময়ে কোন কিছু বিক্রি করা জায়েয হয়। অন্যদিক থেকে এগুলো 'বিক্রয়পণ্য'। তাই তো নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই (বিধানের ক্ষেত্রে) আমরা মিশ্রণপূর্ব ও মিশ্রণ পরবর্তী উভয় অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে উভয় সাদৃশ্যকে কার্যকরী করেছি।

অন্যান্য সাধারণ পণ্যদ্রব্যের অবস্থা ভিন্ন। কেননা এগুলো কোন অবস্থায় 'মূল্য' রূপে বিবেচিত হয় না।

আর যদি উভয় দ্রব্য জাতিগতভাবে ভিন্ন হয়। যেমন গম ও যব এবং তেল ও ঘি আর সেগুলোকে তারা মিশ্রিত করে। তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দ্বারা অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হবে না। (জাতিগত ভিন্নতা ও অভিন্নতার মাঝে) পার্থক্যের কারণ ইমাম মুহম্মদ (র) এর নিকট এ যে, এক জাতীয় মিশ্রিত বস্তু (গুণগতভাবে) সদৃশ বস্তুর (ذوات الامثال) অন্তর্ভুক্ত। আর দুই জাতীয় মিশ্রিত বস্তু মূল্য নির্ভর বস্তুর[১] অন্তর্ভুক্ত। (ذوات القيم) ফলে অজ্ঞতা প্রকট হয়, যেমন সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে।

১। কেননা বন্টনকালে উভয়ের প্রত্যেকে উক্ত বস্তুর সদৃশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ নিজ মূলধন নিয়ে নিতে পারে, ফলে এক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রকট হয় না।

যখন অংশীদারিত্ব বৈধ হলো না তখন মিশ্রণের বিধান কী হবে তা আমরা كتاب القضاء। অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যখন সাধারণ পণ্যদ্রব্যের দ্বারা অংশীদারিত্বসম্পন্ন করতে চাইবে তখন উভয়ের প্রত্যেকে নিজের অর্ধেক মাল অপরের অর্ধেক মালের বিনিময়ে বিক্রি করবে। অতঃপর অংশীদারি চুক্তি সম্পন্ন করবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো মালিকানার অংশীদারিত্ব। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, সাধারণ 'পণ্যদ্রব্য' অংশীদারির 'মূলধন' হতে পারে না। সুতরাং ইমাম কুদূরী (র) এখানে যা উল্লেখ করেছেন তার ব্যাখ্যা এই যে, উভয়ের পণ্যের মূল্য যদি সমান হয়। পক্ষান্তরে উভয় পণ্যের মাঝে যদি মূল্যগত তারতম্য হয়, তাহলে কম মূল্য সম্পন্ন মালের মালিক ঐ পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করবে যা দ্বারা অংশীদারি সিদ্ধ হতে পারে।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর শিরকাতুল আনান এই ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিনিধি বা ওয়াকীল হবে, কিন্তু কাফীল বা দায় বহনকারী হবে না। এর রূপ এই যে, দুজন ব্যক্তি বিশেষ কোন প্রকারের বস্ত্র বা খাদ্যদ্রব্যে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করবে কিংবা সাধারণ বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করবে, তবে কাফালাত (একে অপরের দায়বহনের কথা) উল্লেখ করবে না।

ওয়াকালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়ার কারণ এ জন্য যে, যাতে অংশীদারিত্বে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। যেমন– পূর্বে আমরা বলে এসেছি।

আর কাফালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত না হওয়ার কারণ এই যে عنان শব্দটি অর্থগত দিক থেকেই কাফালাতের অর্থ ধারণ করে না। কেননা এর অর্থ হলো এড়িয়ে যাওয়া। আর এর দ্বারা কাফালাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যে কোন কর্মের বিধান শব্দের অর্থগত চাহিদার বিপরীতে সাব্যস্ত হবে না।

আর উভয়ের যৌথ সম্পদের পরিমাণে তারতম্য হওয়া বৈধ।

কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। আর সম্পদের সমতা عنان শব্দের অর্থগত চাহিদা ও দাবী নয়।

সম্পদের পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হওয়া এবং মুনাফার ক্ষেত্রে বেশ কম হওয়াও বৈধ।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা বৈধ নয়। কেননা, এক্ষেত্রে তারতমা এমন সম্পদের মুনাফা গ্রহণ কে অনিবার্য করবে, যার দায় সে বহন করেনি। কেননা সম্পদ যখন সমান দুই ভাগ হবে আর মুনাফা (উদাহরণ স্বরূপ) তিন ভাগ হবে তখন অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণকারী সম্পদের দায় বহন ছাড়াই অতিরিক্ত মুনাফা ভোগকারী হবে। কেননা দায় তো মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে হয়ে থাকে।

১। উদাহরণতঃ একজনের পণ্যের মুদ্রা মূল্য যদি হয় চারশ দিরহাম আর অপর জনেরটা হয় একশ দিরহাম, তাহলে কম মূল্যের পণ্যের মালিক তার পণ্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগ অপর জনের এক পঞ্চমাংশের বিনিময়ে বিক্রি করবে। ফলে যৌথ সম্পদ 'পাঁচ ভাগ' হিসাবে বন্টিত হবে এবং উভয়ের সম্পদের পরিমাণ হিসাবে লভ্যাংশ বন্টিত হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মূলধনে অংশীদারিত্বের কারণে মুনাফার অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই তাঁরা উভয়ের সম্পদের মিশ্রণের শর্ত আরোপ করেন। সুতরাং সম্পদের মুনাফা মূলতঃ মূল সম্পদের (সত্তাগত) বৃদ্ধির সমপর্যায়ের হলো। কাজেই সে মূলধনের মালিকানার পরিমাণে হকদার হবে।

আমাদের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين

ربح বা মুনাফা সাব্যস্ত হবে উভয়ের নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে, পক্ষান্তরে وضيعة বা লোকসান সাব্যস্ত হবে উভয় মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে। এখানে তিনি (মুনাফার সমতা ও তারতম্যের মাঝে) কোন পার্থক্য করেননি।

তাছাড়া দলীল এই যে, (বিনিয়োগকৃত) সম্পদের বিনিময়ে যেমন মুনাফার হকদার হওয়া যায় তেমনি শ্রম ও কর্মের বিনিময়েও হকদার হওয়া যায়। যেমন মোদারাবার ক্ষেত্রে। আর কখনো দুই শরীকের একজন অধিকতর দক্ষ, পরিপক্ক, কর্মপটু ও সামর্থ্যবান হতে পারে তখন স্বভাবতঃই সে সমান মুনাফায় সম্মত হবে না। তাই মুনাফার তারতম্য করার প্রয়োজন দেখা দেবে।

পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মুনাফা দুজনের একজনের জন্য শর্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে করে কৃত চুক্তিটি অংশীদারিত্ব থেকে এবং মোদারাবা থেকেও বের হয়ে যায়। এবং সম্পূর্ণ মুনাফা শ্রমদাতার অনুকূলে শর্ত করলে চুক্তিটি ঋণ প্রদানের চুক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর মূলধন দাতার অনুকূলে শর্ত আরোপ করলে 'শিরকাত 'বাদাআ'তে রূপান্তরিত হয়।

তাছাড়া এই চুক্তিটি এদিক থেকে মোদারাবা এর সদৃশ যে সে অপর শরীকদারের মূলধনে পরিশ্রম করে। পক্ষান্তরে নামগভ দিক থেকে এবং কর্মগত দিক থেকে তা 'শিরকাতুল মোফাবাদাহ'-এর সদৃশ। কেননা (উভয়টিকে শিরকাত বা অংশীদারিত্ব বলা হয়। আর) উভয়ে পরিশ্রম করে। তাই আমরা মোদারাবার সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টি বিবেচনায় এনে 'দায়বহন' ব্যতিরেকে মুনাফার শর্ত আরোপ বৈধ হওয়ার কথা বলেছি। আবার শিরকাতুল মোফাবাযাহর সাথে যেহেতু সাদৃশ্য রাখে সেহেতু উভয়ের শ্রমদানের শর্ত আরোপ করাতে তা বাতিল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, উভয়ের প্রত্যেকে তার সম্পদের একাংশ বাদ দিয়ে অন্য অংশ দ্বারা এই অংশীদারি চুক্তি সম্পাদন করতে পারে।

কেননা عنان শব্দটি যেহেতু শব্দগতভাবে সমতা দাবী করে না, সেহেতু সম্পদের সমতা তাতে শর্ত হবে না।

আর যে সকল সম্পদ দ্বারা শিরকাতুল মোফাবাদা সম্পাদন করা শুদ্ধ হয় বলে আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলো দ্বারাই শুধু শিরকাতুল আনান সম্পাদন করা শুদ্ধ হবে।

কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। **একপক্ষে দীনার এবং অন্যপক্ষে দেরহাম, তদ্রূপ একপক্ষে নিখাদ দেরহাম আর অপর পক্ষে একশ দেরহাম হলেও উভয়ে অংশীদারি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।**

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তা জায়েয নয়।

এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো সংমিশ্রণের শর্ত থাকা না থাকার উপর। তাঁদের মতে উভয় সম্পদের মাঝে সংমিশ্রণের শর্ত রয়েছে আর তা দুই ভিন্ন জাতীয় সম্পদের মাঝে সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এটি আমরা বর্ণনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উভয়ের প্রত্যেকে যা কিছু খরিদ করবে মূল্যের ব্যাপারে তার কাছেই তাগাদা করা হবে, অপরজনের কাছে নয়।

কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, 'ইনান' চুক্তি ওয়াকালাত (বা প্রতিনিধিত্ব)কে অন্তর্ভুক্ত করে, কাফালাত (বা দায়বহন)কে অন্তর্ভুক্ত করে না।

আর যাবতীয় হক ও দেনা পাওনার তাগাদার ক্ষেত্রে ওকীলই হলো মূল ব্যক্তি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অতঃপর সে তার শরীকদারের কাছ থেকে ঐ জিনিসে তার হিসসা পরিমাণ মূল্য ফেরত চেয়ে নেবে।

অর্থাৎ যদি সে নিজে মাল থেকে মূল্য আদায় করে থাকে। কেননা সে তো অংশীদারের অংশ পরিমাণ ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে ওকীল। সুতরাং (প্রতিনিধিত্বের নিয়ম হিসাবে) যখন সে নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করবে তখন সে তার কাছ থেকে ঐ অংশ ফেরত নেবে।

আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, বিষয়টির সত্যাসত্য তার বক্তব্য ছাড়া অন্য কোন ভাবে জানা সম্ভব নয়[১] তাহলে তাকে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে।

কেননা সে অপরজনের দায়িত্বে মালের দায় সাব্যস্ত হওয়ার দাবী করছে। আর অপরজন অস্বীকার করছে। আর (সাক্ষ্যপ্রমাণের অনুপস্থিতিতে) 'শপথ বাক্য সহ' অস্বীকার করার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কোন কিছু ক্রয় করার পূর্বেই যদি অংশীদারি সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা দুজনের একজনের সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অংশীদারি চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা অংশীদারি চুক্তিতে চুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে মাল। এ কারণেই অংশীদারি চুক্তিতে মাল নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন হেবা ও অসিয়তের ক্ষেত্রে। আর চুক্তির ক্ষেত্র যা, তা নষ্ট হয়ে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। মোদারাবাহ এবং স্বতন্ত্র ওয়াকালাতের বিষয়টি ভিন্ন।[২] কেননা এ দুটি ক্ষেত্রে মুদ্রাদ্রব্য নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না। বরং কবযা হয়ে যাওয়ার পর নির্ধারিত হয়। যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে।

উভয় অংশীদারের মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তো বিষয়টি পরিষ্কার। দু'জনের একজনের মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কেননা সে তো নিজের মালে অপরজনের

১। যেমন বললো যে, একটি গোলাম খরিদ করেছিলাম এবং নিজে মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করেছিলাম। কিন্তু গোলামটি মারা গেছে।

২। এ কথা বলে অংশীদারি চুক্তির অনুবর্তী রূপে যে ওয়াকালাত বা প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত হয় সেটাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

শরীকদারিতে সম্মত হবে না। ফলে কোন ফায়দা না থাকার কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।

উভয়ের মধ্য থেকে যার মালই নষ্ট হোক, যদি তার নিজের হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয় তাহলে তো বিষয়টা স্পষ্ট। অপরজনের হাতে নষ্ট হলেও একই হুকুম হবে। কেননা এই মালতো তার কাছে আমানত ছিলো।

মিশ্রণের পর হুকুমটি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ অংশীদারিত্বের মধ্যেই নষ্ট হবে। সুতরাং 'নষ্ট হওয়া' উভয়ের মাল থেকেই গণ্য হবে।

যদি দু'জনের একজন নিজের মাল দ্বারা কোন কিছু খরিদ করে আর অপরের মাল খরিদ করার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উভয়ের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী খরিদকৃত দ্রব্য উভয়ের মাঝে শরীকানা হবে।

কেননা খরিদ করার কালে অংশীদারিত্ব বিদ্যমান থাকছে। কারণ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সময় উভয়ের মাঝে শরীক অবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং এরপর অপরজনের মাল নষ্ট হওয়ার কারণে হুকুম পরিবর্তিত হবে না।

অতঃপর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে এই খরিদ বস্তুর মধ্যে চুক্তিগত অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে হাসান বিন যিয়াদের মতে মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং (মুহম্মদ (র) এর মতে) দুজনের যে কেউ তা বিক্রি করলে বিক্রি সহী হবে।

কেননা খরিদ কৃত দ্রব্যের মাঝে অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তা সম্পন্ন হওয়ার পর মাল নষ্ট হওয়ার কারণে তা ভঙ্গ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর সে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের ঐ পরিমাণ অংশ অংশীদারের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেবে।

কেননা উক্ত দ্রব্যের অর্ধেক তো সে ওকীল হিসেবে খরিদ করেছে এবং মূল্য নিজের মাল থেকে পরিশোধ করেছে। এ বিধান আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এ বিধান তখন হবে যখন দুজনের একজন শরীকানায় দুই মালের একটি দ্বারা প্রথমে খরিদ করেছে এরপর অপরজনের মাল নষ্ট হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি একজনের মাল আগেই নষ্ট হয়ে যায়, তারপর অন্যজন তার মাল দ্বারা খরীদ করে তাহলে যদি অংশীদারিত্বের চুক্তির মধ্যেই ওয়াকালাতের স্পষ্ট উল্লেখ করে থাকে তাহলে উভয়ের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী খরিদ দ্রব্য উভয়ের শরীকানায় থাকবে।

কেননা অংশীদারিত্ব বাতিল হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্টরূপে উল্লেখকৃত ওয়াকালাত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ওয়াকালাতের ফলশ্রুতি রূপে খরীদা দ্রব্য উভয়ের শরীকানায় থাকবে। আর তা হয়ে যাবে মালিকানাভিত্তিক শরীকানা।

আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে সে তার শরীকদারের কাছ থেকে তার অংশের পরিমাণ মূল্য ফেরত নেবে।

আর যদি শুধু অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে থাকে, এবং ওয়াকালাতের বিষয়টি তাতে উল্লেখ না করে থাকে তাহলে খরীদা দ্রব্য বিশেষ ভাবে তারই হবে যে খরীদ করেছে।

কেননা উক্ত ক্রয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হওয়া অংশীদারি চুক্তির অন্তর্গত ওয়াকালতের ফলশ্রুতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিন্তু অংশীদারি চুক্তি যখন বাতিল হয়ে যাবে তখন তার অন্তর্গত ওয়াকালাতও বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ওয়াকালাতের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা তখন স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্যভুক্ত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন,উভয়ে যদি তাদের মাল মিশ্রিত না করে, তবুও অংশীদারি চুক্তি বৈধ হবে।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, জায়েয হবে না।

কেননা মুনাফা হচ্ছে মূলধনের অনুবর্তী। আর মূলধন অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার পরেই শুধু অনুবর্তীর ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। আর মিশ্রণের মাধ্যমেই হতে পারে।

(মুনাফা যে মূলধনের অনুবর্তী) এর কারণ এই যে, মূলধনই হচ্ছে অংশীদারিত্ব চুক্তির ক্ষেত্র। এ কারণেই চুক্তিটিকে মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তদুপরি মূলধনকে নির্ধারণ করে নেয়ার শর্ত আরোপ করা হয়।

মোদারাবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা মূলতঃ অংশীদারিত্ব নয়। কেননা সেখানে শ্রমদাতা পক্ষ মূলধন বিনিয়োগকারী পক্ষের অনুকূলে শ্রমদান করে এবং শ্রমের মজুরি রূপে মুনাফার হকদার হয়। কিন্তু এখানে বিষয়টি তার বিপরীত।

বস্তুতঃ মুনাফা হচ্ছে মূলধনের অনুবর্তী। এটি ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ কারণেই তাঁদের মতে উভয়ের মূলধনের জাতিগত অভিন্নতা অপরিহার্য। এবং উভয় মালের মিশ্রণ শর্ত। আর মূলধনের সমতার ক্ষেত্রে মুনাফার তারতম্য বৈধ নয়। আর মাল বা 'মূল্য দ্রব্য' বিদ্যমান না থাকার কারণে ফরমায়েশ ও কাজ গ্রহণের অংশীদারিত্ব বৈধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, মুনাফার অংশীদারিত্বের বিষয়টি মূলতঃ চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত, মূলধনের সাথে নয়। কেননা (মূলধনকে নয়, বরং) চুক্তিকে অংশীদারিত্ব বলা হয়। সুতরাং 'অংশীদারিত্ব' শব্দের মর্ম মুনাফাতেও প্রযুক্ত হওয়া অপরিহার্য। সুতরাং মূলধনের মিশ্রণ (এবং জাতিগত অভিন্নতা এবং মুনাফার সমতা কিছুই) শর্ত হবে না।

তাছাড়া দেরহাম ও দীনার নির্ধারিত হয় না। সুতরাং মুনাফা মূলধনের বিনিময়ে লব্ধ হয় না। বরং ব্যবহারের মাধ্যমে লব্ধ হয়। কেননা অর্ধেক মূলধনের ক্ষেত্রে সে মূল ব্যক্তি আর বাকি অর্ধেকের সে ওয়াকীল আর মূলধনের মিশ্রণ ছাড়া ব্যবহারের মাধ্যমে যখন অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হলো তখন ব্যবহারের মাধ্যমে লব্ধ মুনাফার ক্ষেত্রে মূলধনের মিশ্রণ ছাড়াই অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। আর তা মোদারাবার অনুরূপ হয়ে যাবে। সুতরাং মূলধনের

জাতিগত অভিন্নতা এবং মুনাফার সমতা শর্ত হবে না। আর ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব বৈধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিরহাম কোন একজনের অনুকূলে শর্ত করা হয় তাহলে অংশীদারিত্ব বৈধ হবে না।

কেননা এটা এমন শর্ত যা অংশীদারিত্ব চুক্তির মূল কর্তন অনিবার্য করতে পারে। এই হিসাবে যে, দুজনের একজনের জন্য নির্ধারণকৃত পরিমাণই শুধু মুনাফা হলো। এর সদৃশ বিধান বর্গা চাষের ক্ষেত্রে রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মোফাবাযা ও আনান চুক্তির শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাউকে মূলধন দিতে পারে।

কেননা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে এর প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া তার তো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করার অধিকার রয়েছে। আর পারিশ্রমিক ছাড়া বিনিয়োগ করা তার চেয়ে নিম্নস্তরের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সে তার অধিকারী হবে। তদ্রূপ তার অধিকার রয়েছে মাল আমানত রাখার। কেননা এর সাধারণ প্রচলন রয়েছে। আর সময় বিশেষে একজন ব্যবসায়ীর এ ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মুদারাবার ভিত্তিতেও কাউকে মূলধন প্রদান করতে পারে।**

কেননা এটা অংশীদারিত্ব থেকে নিম্নস্তরের। সুতরাং অংশীদারি চুক্তি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে তা বৈধ না বলে বর্ণনা রয়েছে। কেননা এটা এক ধরনের অংশীদারি চুক্তি। তবে বৈধতার মতই হলো বিশুদ্ধতম। আর তা হল মাবসূতের বর্ণনা। কেননা অংশীদারিত্বের দিকটি এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়; মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। যেমন– পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বরং এটা তার চেয়ে উত্তম। কেননা এতে নিজের উপর দায় বহন ছাড়া মুনাফা অর্জন হয়[১]।

অংশীদারিত্বের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ কারো সাথে অংশীদারি চুক্তি করার অধিকারী সে হবে না। কেননা কোন কিছু তার সমস্তরের জিনিসের অনুবর্তী হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মূলধন ব্যবহার করার জন্য কাউকে সে ওয়াকীল নিযুক্ত করতে পারে।

কেননা বেচাকেনার জন্য ওয়াকিল নিয়োগ করা ব্যবসায়েরই অনুষঙ্গ। আর ব্যাবসা করার জন্যই অংশীদারি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রয় ওয়াকিলের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ সে অন্যকে ওয়াকিল নিযুক্ত করতে পারবে না। কেননা এটা একটা বিশেষ চুক্তি যার দ্বারা তার কাছ থেকে একটা বস্তু হাসিল করার চাওয়া হয়েছে। সুতরাং এই চুক্তি সদৃশ কোন চুক্তিকে অনুবর্তী রূপে ধারণ করতে পারবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মাল তার হাতে আমানত রূপে থাকবে। কেননা এটা হলো বদল ছাড়া এবং ঋণের নিরাপত্তার যামানত মালিকের অনুমতিক্রমে মাল কবজায় আনয়ন। সুতরাং এটা গচ্ছিত দ্রব্যের মতই হলো।

১। কেননা মোদারিব বা শ্রমদাতা শ্রমব্যয় করার পর মুনাফা অর্জিত হলে মূলধনদাতার উপর পারিশ্রমিক প্রদানের কোন দায় আসে না। অথচ শ্রমিক রূপে নিযুক্ত হলে মুনাফা অর্জিত না হলেও পারিশ্রমিক প্রদানের দায় আসবে।

আর شركة الصنائع বা পেশাগত অংশীদারি যার অপর নাম شركة التقبل বা ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব। এর রূপ এই যে, **দুজন সেলাই কর্মী বা রঞ্জন কর্মী এই শর্তে অংশীদারিত্ব চুক্তি করলো যে, তারা ফরমায়েশ গ্রহণ করবে। এবং লব্ধ উপার্জন দুজনের মাঝে ভাগ হবে তবে তা জায়িয**। এ হলো আমাদের মাযহাব।

ইমাম যুফার (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) জায়েয হবে না বলেছেন। কেননা এ হল এমন অংশীদারি চুক্তি যাতে অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আর তা হচ্ছে মুনাফা অর্জন। কেননা মুনাফা অর্জনের জন্য মূলধন অনিবার্য আর তা এই জন্য যে, ইমাম যুফার (র) ও শাফেয়ী (র)-এর মূলনীতি অনুযায়ী মুনাফার অংশীদারিত্বের ভিত্তি হলো মূলধনে অংশীদারিত্ব। যেমন– ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আমাদের দলীল এই যে, অংশীদারি চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। আর তা একে অপরকে ওয়াকিল নিয়োগ করার মাধ্যমে সম্ভব। কেননা সে যখন অর্ধেকের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি এবং বাকী অর্ধেকের ক্ষেত্রে ওয়কিল হবে তখন লব্ধ মালের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর সে ক্ষেত্রে কাজে ও স্থানের অভিন্নতাও শর্ত নয়। এ দুই ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র) ও ইমাম যুফার (র) ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, অংশীদারি চুক্তি বৈধতা দানকারী যে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি তা এই কারণে বিঘ্নিত হয় না।

যদি কর্ম অর্ধেক অর্ধেক আর মুনাফা তিন ভাগ করার শর্ত করে তাহলে জায়েয হবে।

কিয়াস অনুযায়ী জায়েয হয় না। কেননা দায় বহন হচ্ছে কাজ পরিমাণ। সুতরাং তার অতিরিক্তটুকু হবে এমন জিনিসের মুনাফা, যার দায় সে বহন করেনি। সুতরাং চুক্তিটি এতে উপনীত হওয়ার কারণে বৈধ হবে না। এবং তা شركة الوجوه বা পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারির ন্যায় হবে। তবে আমরা বলি যে, যা সে নিচ্ছে তা মুনাফা হিসাবে নিচ্ছে না। কেননা মুনাফা হয় জাতিগত অভিন্নতার ক্ষেত্রে। অথচ এখানে জাতিগত ভিন্নতা রয়েছে। কেননা মূলধন হচ্ছে কর্ম, আর মুনাফা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং এটা হবে কর্ম ও বিনিময়। আর কর্ম মূল্য দ্বারা মূল্যায়িত করা যায়। সুতরাং উভয় পক্ষের সম্মতিতে যে পরিমাণ দ্বারা মূল্যায়িত করা হবে সেই পরিমাণ দ্বারা পরিমাণিত হবে এবং তা হারাম হবে না। পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের যিম্মায় যে 'অর্থদ্রব্য' অবশ্য সাব্যস্ত হবে তা অভিন্ন। এক জাতিগত অভিন্নতার ক্ষেত্রে মুনাফা সাব্যস্ত হয়। আর মোদারাবা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে যে জিনিসের দায় বহন করা হয় না তার মুনাফা ভোগ করা বৈধ নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, দুজনের যে কেউ যে কাজ (বা ফরমায়েশ) গ্রহণ করবে তা সম্পন্ন করা তার জন্য এবং তার শরীকের জন্য জরুরী হবে।

সুতরাং উভয়ের প্রত্যেকের কাছে কাজের তাগাদা দেয়া যাবে এবং উভয়ের প্রত্যেকেই পারিশ্রমিকের তাগাদা করতে পারবে। আর পরিশোধকারী যার কাছেই পরিশোধ করুক দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এই পেশাগত অংশীদারিত্ব যদি মোফাবাদা শ্রেণীর হয় তাহলে উক্ত বিধানের যৌক্তিকতা সুপ্রকাশিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রে এ বিধান হলো সূক্ষ্ম কিয়াস ভিত্তিক। সাধারণ কিয়াসের দাবি অবশ্য ভিন্ন।

কেননা এখানে অংশীদারির চুক্তিটি (কাফালাত বা দায়গ্রহণ সম্পর্কে) নিঃশর্ত রূপে সংঘটিত হয়েছে। আর কাফালত হচ্ছে মোফাবাদা-এর অনিবার্য দাবি।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, এই পেশাগত অংশীদারি চুক্তি দায়গ্রহণকে অনিবার্য করে। তাইতো দুজনের একজন যে কাজ গ্রহণ করে অন্যের উপরও তা দায়যুক্ত হয়। আর যেহেতু অপরের ফরমায়েশ গ্রহণ তার উপরও কার্যকর সেহেতু সে পারিশ্রমিকের হকদার হয়; সুতরাং কাজের দায়গ্রহণ এবং বিনিময় অনিবার্য হওয়ার ক্ষেত্রে তা মোফাবাদা-এর স্থলবর্তী হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারির রূপ এই যে, মূলধন নেই এমন দু'জন এই শর্তে অংশীদারি চুক্তি করলো যে, তারা নিজেদের পরিচয় (ও আস্থা) কে কাজে লাগিয়ে ক্রয় ও বিক্রয় করবে। এই ভিত্তিতে অংশীদারি বৈধ হবে।

এই চুক্তির شركة الوجوه নামকরণের কারণ এই যে, এমন ব্যক্তিই বাকিতে ক্রয় করতে পারে মানুষের কাছে যার মর্যাদা রয়েছে। তবে তা মোফাবাদা হবে। কেননা 'অর্থ দ্রব্য' ও পণ্য দ্রব্য উভয় প্রকার বিনিময়ের ক্ষেত্রে কাফালাত ও ওয়াকালাত সাব্যস্ত হওয়া সম্ভবপর।

আর যদি চুক্তিকে নিঃশর্ত রাখা হয় তাহলে তা شركة العنان হবে। কেননা চুক্তি নিঃশর্ত হলে সেদিকে তা প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর আমাদের নিকট তার বৈধতা রয়েছে; ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। আর উভয় পক্ষের যুক্তি তাই যা আমরা 'ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্বের' ক্ষেত্রে উল্লেখ করে এসেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যা কিছু তারা খরীদ করবে সে ক্ষেত্রে সে বিষয়ে তাদের প্রত্যেকে অপরের ওয়াকিল হবে।

কেননা ওয়াকীল হওয়া বা অভিভাবকত্ব ছাড়া অন্যের উপর প্রয়োগ বৈধ হয় না। আর এখানে তো অভিভাবকত্বই নেই। সুতরাং ওয়াকীল হওয়াই নির্ধারিত হয়ে গেলো।

যদি তারা এই শর্ত করে থাকে যে, খরীদকৃত বস্তু তাদের অর্ধেক অর্ধেক হবে এবং মুনাফাও অনুরূপ হবে তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু মুনাফায় বেশ-কম শর্ত করা জায়েয হবে না। আর যদি শর্ত করে যে, খরীদা দ্রব্য উভয়ের মাঝে তিন ভাগে বন্টিত হবে তাহলে মুনাফাও সেভাবে বন্টিত হবে।

সমতার অনিবার্যতা এ কারণে যে, মূলধন কিংবা শ্রম কিংবা দায়বহন ব্যতীত মুনাফার অধিকার হয় না। সুতরাং মূলধন বিনিয়োগকারী মূলধনের বিপরীতে মুনাফার অধিকারী হয়। আর মুদারিব শ্রমের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হয়।

ওস্তাদ কারিগর যে অর্ধেক (বা কম-বেশি) মুনাফার শর্তে শাগরিদ কারিগর দিয়ে কাজ করায় সে দায়বহনের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হয়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে মুনাফার হকদার হওয়া যাবে না।

তুমি কি লক্ষ্য করছনা যে, কেউ যদি অন্যকে বলে, তুমি তোমার মূলধন এই শর্তে পরিচালনা করো যে তার মুনাফা আমার হবে, তাহলে এই তিনটি কারণের কোন একটি না থাকায় তা বৈধ হয় না।

আর পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারি চুক্তিতে দায়বহনের বিনিময়ে মুনাফার অধিকার হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর দায়বহন তো হবে খরীদা বস্তুতে মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে। সুতরাং মালিকানার পরিমাণের অতিরিক্ত যে মুনাফা, তা হবে যে মালের দায়ভার বহন করেনি, তার মুনাফা। সুতরাং মোদারাবা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করা বৈধ হবে না। আর পরিচয়ভিত্তিক অংশীদারি মোদারাবার সদৃশ নয়। 'আনান'-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এই দিক থেকে তা মোদারাবার সদৃশ যে, উভয়ের প্রত্যেকে অপরের মূলধনের মধ্যে ব্যবহার করে। সুতরাং তা মোদারাবার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আল্লাহ অধিক অবগত।

অনুচ্ছেদ ঃ অশুদ্ধ অংশীদারি সম্পর্কে

কাঠকাটা ও শিকার করার ক্ষেত্রে অংশীদারি চুক্তি বৈধ হবে না। বরং উভয়ের প্রত্যেকে যা শিকার করবে এবং যে কাঠ সংগ্রহ করবে তা তারই হবে, অপর জনের হবে না।

যে কোন প্রাকৃতিক বৈধ জিনিস সংগ্রহে অংশীদারি চুক্তির ক্ষেত্রে একই বিধান রয়েছে। কেননা অংশীদারিত্বের মধ্যে ওয়াকালাতের মর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর (প্রাকৃতিকভাবে সবার জন্য) বৈধ কোন বস্তু অর্জনের ক্ষেত্রে ওয়াকীল নিযুক্ত করা বাতিল। কেননা তা অর্জনের ব্যাপারে মুওয়াক্কিলের আদেশ প্রদান বৈধ নয়। বরং তার আদেশ ছাড়াই ওয়াকীল তার মালিক হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে সে মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী হতে পারে না।

আর বৈধ জিনিসটি অর্জন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। যদি উভয়ে একসঙ্গে তা সংগ্রহ করে তাহলে হকদারির কারণের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হওয়ার কারণে বস্তুটি উভয়ের মাঝে অর্ধাঅর্ধি হবে।

আর যদি একজন সংগ্রহ করে থাকে এবং অপর জন কোন কাজ না করে থাকে তাহলে তা কর্মকর্তারই হবে। আর যদি একজন কাজ করে থাকে আর অপরজন তার কাজে সাহায্য করে থাকে; যেমন একজন শিকড় উপড়ালো আর অপরজন তা জমা করলো। কিংবা একজন উপড়ালো ও জমা করলো আর অপরজন বহন করলো, তাহলে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে সাহায্যকারী প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে, পরিমাণে তা যাই হোক।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে পারিশ্রমিক ঐ বস্তুর অর্ধেকের মূল্য অতিক্রম করতে পারবে না। আর তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, এক জনের খাবার অপর জনের পানির মশক আছে— এমন দুজন যদি অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় আর এই শর্ত করে যে, এ দুটি দ্বারা পানি বহন করে সেচ দেবে এরপর উপার্জিত অর্থ উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে, তাহলে এ অংশীদারিত্ব বৈধ হবে না। বরং সম্পূর্ণ উপার্জিত অর্থ সেই পাবে, যে সেচ দিয়েছে; গাধার মালিক যদি শ্রমদাতা হয় তাহলে তার উপর মোশকের প্রচলিত ভাড়া সাব্যস্ত হবে। আর যদি মোশকওয়ালা শ্রমদাতা হয় তাহলে তার উপর খচ্চর প্রচলিত ভাড়া সাব্যস্ত হবে।

চুক্তিটি ফাসিদ হওয়ার কারণ এই যে, প্রাকৃতিকভাবে বৈধ একটি বস্তু তথা পানি সংরক্ষণের উপর চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। আর ভাড়া সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, বৈধ বস্তুটি যখন সংরক্ষণকারী তথা পানি সরবরাহকারীর মালিকানায় এসে গেলো তখন এই দাঁড়ালো যে, অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর তথা খচ্চর কিংবা মশকের ফায়দা সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা সে করেছে একটি অশুদ্ধ চুক্তির মাধ্যমে। সুতরাং তার উপর ঐ বস্তুর ভাড়া সাব্যস্ত হবে।

আর যে কোন অবৈধ চুক্তির মুনাফা মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে বন্টিত হবে। এবং বেশকমের শর্ত বাতিল হবে।

কেননা অংশীদারি চুক্তিতে মুনাফা হচ্ছে মূলধনের অনুবর্তী। সুতরাং তার পরিমাণ দ্বারাই তা পরিমাণিত হবে। যেমন ভাগ চাষের ক্ষেত্রে নির্গত অঙ্কুর বীজের অনুবর্তী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পরিমাণের হকদার হয় আলাদা উল্লেখের কারণে। কিন্তু এখানে সেই উল্লেখ অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এখন মূলধনের পরিমাণে মুনাফার হকদারিত্ব বাকি থাকলো।

দুই শরীকের একজন যদি মারা যায় কিংবা মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে অংশীদারি চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা তাতে ওয়াকালাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ওয়াকালতের বিদ্যমান থাকতে হবে। অথচ মৃত্যুর কারণে, তেমনি মোরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যাওয়ায় ওয়াকালাত বাতিল হয়ে যায়; অবশ্য কাযী যদি তার দারুল হরবে চলে যাওয়ার ঘোষণা জারি করেন। কেননা এটি মৃত্যু সমতুল্য, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

শরীকদার তার শরীকের মৃত্যুর কথা জানলো, কি জানলো না, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা এটা হলো বিধানগত অপসারণ। সুতরাং ওয়াকালাত যখন বাতিল হয়ে গেলো তখন অংশীদারিত্বও বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে দুই শরীকদারের একজন যদি অংশীদারি চুক্তি বাতিল করে দেয় তাহলে অপর জানের অবগতির উপর তা নির্ভর করবে। কেননা এটা হলো স্বেচ্ছায় অপসারণ। আল্লাহই অধিক অবগত।

অনুচ্ছেদ ঃ

শরীকদ্বয়ের কারো অপরজনের অনুমতি ছাড়া তার মালের যাকাত আদায় করার অধিকার নেই। কেননা যাকাত আদায় করা বাণিজ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে যদি উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনকে যাকাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করে এবং প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে আদায় করে তাহলে দ্বিতীয় জন দায়বহনকারী হবে; প্রথম জনের আদায় করা সম্পর্কে অবগত হোক বা না হোক।

তবে যদি উভয়ের প্রত্যেকে অপর জনকে যাকাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করে এবং প্রত্যেকে অপর জনের পক্ষ থেকে আদায় করে, তাহলে দ্বিতীয় জন দায়বহনকারী হবে; প্রথম জনের আদায় করা সম্পর্কে অবগত হোক বা না হোক।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন বলেন, যদি অবগত না হয় তাহলে দায়বহনকারী হবে না।

(দ্বিতীয় জন ক্ষতিপূরণ আদায় করবে) এ হলো তখন, যখন উভয়ে আগে পিছে করে আদায় করে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ে এক সাথে আদায় করে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনের হিস্সার দায় বহন করবে।

একই মতপার্থক্য হবে যদি যাকাত আদায়ে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদাতা নিজেই আদায় করার পর কোন দরিদ্রকে (ঐ পরিমাণ মাল) যাকাত দান করে।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, সে তো দরিদ্রকে মালিক বানানোর ব্যাপারে আদিষ্ট। আর সে তাই করেছে। সুতরাং মুআক্কিলের অনুকূলে দায়বহন করবে না। তা এজন্য যে, মালিক বানানোই তার সাধ্যে ছিলো। যাকাতরূপে পরিগণিত হওয়া তার সাধ্যে নেই। কেননা এটা মুআক্কিলের নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তার সাধ্যায়ত্ত বিষয়ই তার কাছে দাবী করা যাবে। বিষয়টা এমন হলো যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ হতে দম দেওয়ার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি অবরুদ্ধতা বিলুপ্ত হওয়ার এবং আদেশ দাতা (অর্থাৎ অবরুদ্ধ ব্যক্তি) হজ্জ পালন করার পর যবাই করে তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না। বিষয়টা সে অবগত হোক বা না হোক।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দলীল এই যে, সেতো যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট। অথচ আদায়কৃত মাল যাকাত হিসেবে গণ্য হয়নি। সুতরাং সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী হলো।

এটা এজন্য যে, আদেশের উদ্দেশ্য ছিলো নিজেকে অবশ্য পালনীয় বিধানের দায় থেকে বের করে আনা। কেননা স্বাভাবিক বিষয় এই যে, একটা ক্ষতি রোধ করার জন্যই সে আরেকটা ক্ষতি মেনে নেবে। আর এই উদ্দেশ্য তার নিজে আদায় করার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আদিষ্ট ব্যক্তির আদায় এই উদ্দেশ্য থেকে খালি। সুতরাং সে অপসারিত হবে, অবগত হোক বা না হোক। কেননা এ হলো বিধানগত অপসারণ।

আর অবরুদ্ধতার দম সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, কারো কারো এ ক্ষেত্রে মতভিন্নতা রয়েছে। আর কারো কারো মতে উভয় ক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সেটা এই যে, মূলতঃ অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর তো দম ওয়াজিব নয়। কেননা, তার পক্ষে সম্ভব ছিলো অবরুদ্ধতা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য যাকাতের মাসআলায় যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং কর্তব্য দায় রহিত করার বিষয়টি এখানে উদ্দেশ্য রূপে বিবেচ্য। আর অবরুদ্ধতার দমের বিষয়টি তা নয়।

ইমাম মোহম্মদ (র) বলেন, শিরকাতুল মোফাবাদা-এর শরীকদ্বয়ের একজন যদি অপরজনকে একটি দাসী ক্রয় করে তার সাথে সহবাস করার অনুমতি প্রদান করে আর সে তা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে কোন আর্থিক দায় ছাড়াই দাসী তার হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবায়ন বলেন, অনুমতিদাতা অপর জন থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত নেবে।

কেননা সে একান্তভাবে তার উপর সাব্যস্ত ঋণ শরীকানা মাল থেকে পরিশোধ করেছে। সুতরাং অপর শরীকদার তার কাছ থেকে নিজের হিসসা ফেরত নেবে। যেমন খাদ্য ও পোষাক ক্রয় করার ক্ষেত্রে।

এটা এই কারণে যে, দাসীর মালিকানা একান্তভাবে তার অনুকূলে সম্পন্ন হয়েছে। আর মালিকানার বিপরীতেই মূল্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল এই যে, অংশীদারিত্বের দাবী মতে দাসীটি নিশ্চিত রূপেই অংশীদারি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেননা তারা তো চুক্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করার অধিকারী নয়। সুতরাং (মূল্য ফেরত না নেয়ার ক্ষেত্রে) এটা অনুমতি প্রদান না করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো। তবে অনুমতিটা নিজের অংশ হেবা করে দেয়ার দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা মালিকানা ছাড়া সহবাস বৈধ হয় না। আর বিক্রয়ের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করার কোন কারণ নেই। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা অংশীদারিত্বের দাবীর বিরোধী। তাই আমরা অনুমতির অন্তর্গতরূপে সাব্যস্ত হেবার মাধ্যমে কথিত মালিকানা সাব্যস্ত করি।

খাদ্য ও পোষাকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অনিবার্য প্রয়োজন বিবেচনায় সেটাকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে। সুতরাং মূল চুক্তি বলেই তা তার একান্ত মালিকানায় এসে যাবে। ফলে সে অংশীদারি মাল থেকে নিজস্ব ঋণ আদায়কারী হবে।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় আমাদের কথিত কারণে উভয়ের উপর সাব্যস্ত ঋণ আদায়কারী হবে।

বিক্রেতা সর্বসম্মতিক্রমেই দুজনের যে কারো কাছ থেকে মূল্য 'গ্রহণ' করতে পারবে।

কেননা এটা হলো বাণিজ্যগত কারণে সাব্যস্ত ঋণ। আর মোফাবাদা চুক্তি কাফালাত এর দিকটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তা খাদ্য ও পোষাক ক্রয়ের মত হয়ে গেলো।

كتاب الوقف

ওয়াকফ অধ্যায়

ওয়াকফ অধ্যায়

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হবে না, যদি না শাসক তার মালিকানা বিলোপের ঘোষণা প্রদান করেন। কিংবা সে নিজে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যে, আমার যখন মৃত্যু হবে তখন থেকে আমি আমার বাড়ি এ কাজের জন্য ওয়াকফ করলাম।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, ওয়াকফের ঘোষণা দেওয়া মাত্র তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পত্তির জন্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগ এবং তার কাছে অর্পণের পূর্ব পর্যন্ত মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, আভিধানিক ভাবে ওয়াকফ (وقف) অর্থ আবদ্ধ করা। যেমন অভিন্ন অর্থে বলা হয় وقفت الدابة واوقفتها আমি সওয়ার থামালাম।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফ অর্থ কোন বস্তুকে মালিকের মালিকানায় আবদ্ধ করে দেয়া এবং তার মুনাফা ছাদাকা করে দেয়া; আরিয়াতে (অর্থাৎ মুনাফা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য) কোন কিছু দেওয়ার মত।

অতঃপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, বস্তুর মুনাফা তো অস্তিত্বহীন বিষয়। আর অস্তিত্বহীন বিষয়কে ছাদাকা করা বৈধ নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ওয়াকফ মূলতঃই জায়েয না হওয়ার কথা। আর মাবসূতে তা বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতেও ওয়াকফ করা বৈধ। তবে আরিয়াত (মুনাফা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য) প্রদানের মত এটাও বাধ্যতামূলক নয়।

সাহেবায়নের মতে ওয়াকফ অর্থ আল্লাহর মালিকানার বিধানের ভিত্তিতে বস্তুকে আবদ্ধ করা। সুতরাং ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মালিকানা ওয়াকফকারী থেকে রহিত হয়ে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে চলে যায় যে, তার মুনাফা বান্দাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

সুতরাং তা বাধ্যতামূলক হবে এবং তা বিক্রি করা, হেবা করা এবং মীরাছ রূপে বন্টন করা যাবে না।

وقف শব্দটি অবশ্য উভয় অর্থেরই অবকাশ রাখে। তবে প্রমাণের দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সাহেবায়নের দলীল এই যে, হযরত ওমর (রা) যখন তার মালিকানাধীন ছামাগ নামক ভূমি সাদাকা করতে মনস্থ করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন,

تصدق باصلها لايباع ولايورث ولايوهب

মূল ভূমিকে ছাদাকা করো, যা কখনো বিক্রি করা যাবে না, মীরাছ রূপে বন্টন করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না।

তাছাড়া এই কারণ যে, তার দিক থেকে ওয়াকফ বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে সর্বক্ষণ এর ছাওয়াব তার দিকে পৌছতে থাকে। আর মালিকানা রহিত করতঃ আল্লাহর দিকে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে তার প্রয়োজনকে পূর্ণ করা সম্ভব। কেননা শরীয়তে এর নজীর রয়েছে। যেমন মসজিদ। সুতরাং এটাকেও সেরূপ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী لا حبس عن فرائض الله تعالى অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফারায়েয থেকে কোন মাল আবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই।

আর শোরায়হ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওয়াকফের মাধ্যমে) আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রির বৈধতা নিয়ে এসেছেন।

তাছাড়া এই কারণে, বান্দার মালিকানা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই চাষাবাদ, বসবাস ও অন্যান্য উপায়ে তার থেকে ফায়দা গ্রহণ করার বৈধতা রয়েছে। আর তাতে মালিকানা হচ্ছে ওয়াকফকারীর। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, ওয়াকফকৃত সমম্পত্তির আয় যথার্থ ক্ষেত্রগুলোতে খরচ করার বিষয়টি পরিচালনা করার কর্তৃত্ব হলো তার। আর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করার অধিকারও তার। তবে ওয়াকফকারীর সম্পত্তির মুনাফা ছাদাকা করবে। সুতরাং এটা কোন বস্তুকে আরিয়াত প্রদানের সদৃশ হলো।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, (সম্পত্তির) আয় ছাদাকা করার প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে। অথচ সম্পত্তিটি তার মালিকানায় না থাকলে তার পক্ষ থেকে ছাদাকা হবে না।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন মালিকানায় ন্যস্তকরণ ছাড়া তার মালিকানা বিলুপ্ত করার সম্ভাবনা নেই। কেননা মালিকানা গ্রহণের গুণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন (মান্নত করে) ছেড়ে দেয়া পশু। আযাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো মালিকানা রহিত করা।

মসজিদের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে। এ কারণেই তা থেকে কোনভাবেই উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। পক্ষান্তরে এখানে ওয়াকফের সম্পত্তি থেকে বান্দার হক রহিত হয় না। সুতরাং সেটা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হল না।হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী তার কিতাবে বলেছেনঃ "ওয়াকাফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে না; যদি না শাসক তার মালিকানা রহিত হওয়ার ঘোষণা দেন কিংবা সে নিজের মৃত্যুর সাথে ওয়াকফকে সম্পৃক্ত না রাখে।"

শাসকের ফায়সালার ক্ষেত্রে তো এটা সঠিক কথা। কেননা এটা হলো ইজতিহাদী বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত রাখার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত এই যে, তাতে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হবে না। তবে এটা হলো চিরস্থায়ীভাবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মুনাফা ছাদকা করে দেয়া। সুতরাং এটা স্থায়ীভাবে কোন কিছুর মুনাফা সম্পর্কে ওয়াছিয়াতের সমতুল্য হলো। সুতরাং (আবূ হানীফা (র) এর মতে) তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর শাসক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শাসক কর্তৃক বিচার কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি। পক্ষান্তরে দুই পক্ষের সম্পত্তিতে নিযুক্ত 'সালিশের' ঘোষণা সম্পর্কে মাশায়েখগণ মতভিন্নতা পোষণ করেন।

যদি মৃত্যুশয্যায় ওয়াকফ করে তাহলে ইমাম তাহাবী (র) বলেন যে, এটা মৃত্যু পরবর্তী অসীয়তের পর্যায়ে হবে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, আবূ হানীফা (র) এর মতে এই ওয়াকফ

তার উপর বাধ্যতামূলক হবে না। আর সাহেবায়নের মতে বাধ্যতামূলক হবে। তবে তা এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থায় ওয়াকফ করলে সমগ্র সম্পত্তি থেকে বিবেচ্য হবে।

আর সাহেবায়ন-এর মতে যখন মালিকানা বিলুপ্ত হয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে ওয়াকফের বক্তব্য উচ্চারণ মাত্র বিলুপ্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) এরও একই মত। যেমন আযাদ করার ব্যাপারে। কেননা এটাও মালিকানা রহিতকরণমূলক বক্তব্য।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা অপরিহার্য। কারণ এটা হলো আল্লাহর হক, যা (তত্ত্বাবধায়ক) বান্দার হাতে অর্পণের মধ্য দিয়ে ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হয়।

কেননা আল্লাহ যেহেতু সকল বস্তুর মালিক সেহেতু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহকে মালিক বানানো সাব্যস্ত হতে পারে না। তবে অন্যকে মালিক বানানোর অনুবর্তী রূপে সাব্যস্ত হতে পারে। তখন তাকে মালিক বানানোর হুকুম সাব্যস্ত হবে।

এবং এটা যাকাত ও ছাদাকায় পর্যবসিত হবে।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমামগণের মতপার্থক্য অনুযায়ী যখন ওয়াকফ ছহী হয়ে যাবে তখন তা ওয়াকফ্কারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে; কিন্তু যার নামে ওয়াকফ করা হয়েছে তার মালিকানায় প্রবেশ করবে না।

কেননা যদি তার মালিকানায় প্রবেশ করে তাহলে তো তার কাছে এটা 'স্থিত' হয়ে থাকবে না। বরং তার মালিকানার অন্য সব সম্পত্তির মত এটাতে তার বিক্রয় কার্যকর হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি সে এটার মালিক হয়ে যায় তাহলে তো প্রথম মালিক (ওয়াকফকারী) এর শর্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে তার থেকে হস্তান্তরিত হতে পারবে না, যেমন তার অন্যান্য সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় না।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী (র) যে বলেছেন, "ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে"। এক্ষেত্রে সাহেবায়নের মত তেমনই হওয়ার কথা, যা মতপার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আবূ ইউসুফ (র) এর মতে এজমালী সম্পত্তি ওয়াকফ করা জায়েয রয়েছে। কেননা বন্টন **হচ্ছে দখল** বুঝে নেয়ার পূর্ণাঙ্গ পর্যায় আর তার মতে দখল শর্ত নয়। সুতরাং তার পূর্ণাঙ্গ পর্যায় যেটা, সেটাও শর্ত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, এটা জায়েয নয়। কেননা মূল দখল বুঝে নেওয়া তাঁর মতে শর্ত। সুতরাং যা দ্বারা দখল পূর্ণাঙ্গ হয় (অর্থাৎ বন্টন) সেটাও শর্ত হবে।

এই মতপার্থক্য হলো সেই ক্ষেত্রে, যা বন্টনযোগ্য। পক্ষান্তরে যা বন্টনযোগ্য নয় সেক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতেও এজমালী অবস্থায়ই ওয়াকফ বৈধ হবে। কেননা এটাকে তিনি হেবার সাথে এবং কার্যকর ছাদাকার সাথে কিয়াস করেন[২]।

১। সেখানেও দরিদ্রকে মালিক বানানোর অনুবর্তী রূপে আল্লাহকে মালিক বানানো সাব্যস্ত হয়।

২। অর্থাৎ যে ছাদাকা দরিদ্রের হাতে অর্পণ করা হয়ে গেছে এবং তার মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে।

মসজিদ ও কবরস্থানের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে বন্টনযোগ্যতা না থাকার ক্ষেত্রেও এজমালী অবস্থায় ওয়াকফসম্পন্ন হবে না।

কেননা শরীকানায় বিদ্যমানতা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক।

তাছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে পালাক্রম প্রয়োগ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য। যেমন এক বছর কবরস্থান রূপে মৃতকে দাফন করা। এরপর আবার এক বছর ফসল করা। কিংবা এক বছর মসজিদ রূপে ব্যবহার করা, আবার একবছর আস্তবল রূপে ব্যবহার করা।

(এ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এজমালী সম্পত্তি) ওয়াকফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটাকে কাজে লাগানো এবং উৎপাদন বন্টন করা সম্ভব।

যদি সবটুকু সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়, তারপর তার একাংশে কোন হকদার প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে অবশিষ্টাআংশেও ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সম্পত্তিটি ওয়াকফ করার সময় তাতে এজমালীত্ব বিদ্যমান ছিলো। যেমন হেবার ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে হেবাকারী যদি আংশিক হেবা প্রত্যাহার করে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যাহার করে আর অবস্থা এই যে, মৃত্যুশয্যায় সে হেবা করে ছিল বা ওয়াকফ করে ছিল। আর সম্পত্তিতে সংকীর্ণতা রয়েছে (অর্থাৎ আর কোন সম্পত্তি নেই।) তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা এই 'এজমালিত্ব' হচ্ছে পরবর্তীতে উদ্ভূত। আর যদি পৃথক করা সম্ভব এমন নির্ধারিত কোন অংশের হকদার বের হয়ে আসে তাহলে অবশিষ্টাংশে ওয়াকফ বাতিল হবে না। কেননা এখানে এজমালিত্ব নেই। এ কারণেই তো প্রাথমিক অবস্থায় আংশিক ওয়াকফ করা বৈধ ছিলো।

হেবা ও মালিকানায় দিয়ে দেওয়া ছাদাকা সম্পর্কেও একই কথা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানিফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে ওয়াকফ পূর্ণতা লাভ করবে না যদি তার শেষে চিরস্থায়ী কোন দিক উল্লেখ না করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, অস্থায়ী কোন খাত উল্লেখ করলেও ওয়াকফ জায়েয হয়ে যাবে। অতঃপর (ঐ খাত বন্ধ হয়ে গেলে) তা গরীব-মিসকীনদের জন্য হয়ে যাবে। যদিও (ওয়াকফ করার সময়) তাদের নামোল্লেখ না করে থাকে।

তারফায়নের দলীল এই যে, ওয়াকফের ফলশ্রুতি হলো নতুন কোন মালিকানায় অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই মালিকানা বিলুপ্তি। আর তা চিরস্থায়ী হয়। যেমন দাস মুক্তির বিষয়টি। সুতরাং উল্লেখকৃত খাতটি যদি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তাহলে সেখানে ওয়াকফের দাবী পূর্ণ হয় না। এ কারণেই সাময়িক বিক্রির মত সাময়িক ওয়াকফও বাতিল বলে গণ্য হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল এই যে, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর তা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ কখনো অস্থায়ী খাতে ওয়াকফ করার মাধ্যমে হয় আর কখনো স্থায়ী খাতে ওয়াকফ করার মাধ্যমে হয়। সুতরাং ওয়াকফের দুই সূরতই বৈধ হবে।

আর কেউ কেউ বলেন, চিরস্থায়ী খাতে য়াকফ করা সর্বসম্মতভাবেই শর্ত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে চিরস্থায়ী শব্দ উল্লেখ করা শর্ত নয়। কেননা ওয়াকফ ও ছাদাকার শব্দই চিরস্থায়ীত্বের দিক নির্দেশ করে। কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, দাস মুক্তির ন্যায় এটাও হচ্ছে মালিকানায় অর্পণ ব্যতীত বিদ্যমান মালিকানা রহিতকরণ। এ কারণেই কুদূরী কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মত বর্ণনা কালে বলা হয়েছে যে, উল্লেখ না করা হলেও পরবর্তীতে তা গরীব মিসকীনদের জন্য হয়ে যাবে। আর এ হলো বিশুদ্ধ মত।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে চিরস্থায়ীত্বের দিক উল্লেখ করা শর্ত। কেননা ওয়াকফ হচ্ছে মুনাফা বা ফসল ছাদাকা করা। আর তা সাময়িক হতে পারে এবং স্থায়ী হতে পারে। সুতরাং নিঃশর্ত ওয়াকফকে স্থায়ী ওয়াকফের অভিমুখী করে দেয়া সম্ভব নয়। তাই স্থায়িত্বের বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করা অপরিহার্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ভূ-সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ।

কেননা সাহাবা কেরামের এক জামাত তা করেছেন। **স্থানান্তরযোগ্য ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা জায়েয নেই।**

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, সর্বাবস্থায় এটা না জায়েয হওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মত। **পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন যে, যদি কোন ভূ-সম্পত্তি হালের বলদ ও ভূমিকম্প চাষীদের ওয়াকফ করে তাহলে তা বৈধ হয়।**

চাষবাসের অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কেও একই কথা। কেননা জমির উদ্দেশ্য তথা ফসল অর্জন করার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে ভূমির অনুবর্তী। আর অনুবর্তীরূপে এমন সকল বিধান সাব্যস্ত হয়, যা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হয় না।

যেমন বিক্রির ক্ষেত্রে সেচ অধিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ওয়াকাফের ক্ষেত্রে ভবন অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর অনুগামী। কেননা তাঁর মতে কিছু কিছু স্থানান্তরযোগ্য বস্তু যখন স্বতন্ত্রভাবে ওয়াকফ করা বৈধ তখন অনুগামী রূপে ওয়াকফ করা আরো স্বাভাবিক ভাবেই বৈধ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, অস্ত্র ও ঘোড়া ওয়াকফ করা জায়েয রয়েছে। এর অর্থ হল ফী সাবিল্লাহ ওয়াকফ করা। মাশায়েখগণের বর্ণনা মতে এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। আর এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো জায়েয না হওয়া। কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে এ সম্পর্কিত মশহুর হাদীস সমূহ। তন্মধ্যে একটি এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

واما خالد فقد حبس أدرعا وافراسا له في سبيل الله تعالى

আর খালেদ তো তার কিছু বর্ম ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ (বা ওয়াকফ) করেছেন। আর তালহা তাঁর বর্ম সমূহ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেছেন।

উট ও অশ্বের বিধানভুক্ত হবে। কেননা আরবা জিহাদে উট ব্যবহার করে। তদ্রূপ তাতে অস্ত্র বহন করা হয়। ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যে সকল স্থানান্তরযোগ্য বস্তু

ওয়াকফ করার প্রচলন রয়েছে, সেগুলো ওয়াকফ করা জায়েয হবে। যেমন, কুড়াল, বেলচা, বাটালি, করাত, জানাযার খাটিয়া ও তার পর্দা ডেগ-ডেগচি, কুরআন শরীফ (ইত্যাদি)।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে তা জায়েয নয়। কেননা কিয়াস বর্জন করা হয় নাছ বা শরীয়তের প্রত্যক্ষ বাণীর কারণে। আর নাছ শুধু অস্ত্র ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর জবাব এই যে, লোক প্রচলনের কারণেও কিয়াস পরিত্যাগ করা হয়। যেমন মাল তৈরির ফরমায়েশ করার ক্ষেত্রে।

আর উপরোক্ত জিনিসগুলো ওয়াকফ করার ব্যাপারে লোক প্রচলন পাওয়া যায়।

আর নছীর বিন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি কোরআন শরীফের পর্যায়ভুক্ত ধরে তাঁর কিতাবগুলো ওয়াকফ করেছেন। ইহা শুদ্ধ। কেননা (কোরআন ও কিতাব) এর প্রত্যেকটি শিক্ষা দান, শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে দ্বীন হাসিলের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। দেশের অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতের সমর্থক।

আর যেগুলোতে লোক প্রচলন নেই সেগুলোকে ওয়াকফ করা আমাদের মতে জায়েয নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যে সকল বস্তুর মূল সত্তাকে বিদ্যমান রেখে উপকার লাভ করা যায় এবং তা বিক্রি করা বৈধ; সেগুলো ওয়াকফ করাও বৈধ। কেননা উপকার যোগ্যতার দিক থেকে এগুলো অস্ত্র, অশ্ব ও ভূমির সম পর্যায়ভুক্ত।

আমাদের দলীল এই যে, এগুলোকে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে চিরস্থায়িত্বের দিক নেই। অথচ আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এহলো শর্ত।

সুতরাং এগুলো দেরহাম দীনারের মত হয়ে গেলো। ভূ-সম্পত্তির বিষয়টি ভিন্ন। আর এক্ষেত্রে শরীয়তের কোন বিরুদ্ধ বাণী নেই এবং লোক প্রচলনের দিক থেকেও কোন বিরুদ্ধ প্রচলন নেই। সুতরাং এগুলো মূল কিয়াসের উপরই বহাল থাকবে। আর তা এইজন্য যে, ভূ-সম্পত্তি স্থায়ী হয়। আর জেহাদ হলো দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সুতরাং তাতে ইবাদতের দিকটি অধিকতর শক্তিশালী। কাজেই অন্যগুলো এ দুটোর সমপর্যায়ভুক্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়াকফ যখন শুদ্ধ হয় (ও বাধ্যতামূলক) তখন তা বিক্রি করা বা কারো মালিকানায় প্রদান করা জায়েয হবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে যদি এজমালী সম্পত্তি হয় আর শরীকদার বন্টন দাবী করে তখন বন্টন করা বৈধ হবে।

অপর কাউকে মালিক বানানোর নিষিদ্ধতার দলীল আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর বন্টনের বৈধতার কারণ এই যে, বন্টন অর্থ হলো পৃথকীকরণ ও আলাদাকরণ। বেশির চেয়ে বেশি এই হবে যে, মাপ ওজনের বস্তু ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে বিনিময়ের দিকটি প্রধান,[১] কিন্তু ওয়াকফের ক্ষেত্রে ওয়াককের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথকীকরণের দিকটাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং মূলতঃ এটি বিক্রি বা অন্যকে মালিক বানানো নয়।

১। বিষয়টি এই যে, বন্টন অর্থ প্রত্যেকে যে অংশটার কর্তৃত্বভার লাভ করছে সেটা চিহ্নিত করা। আর এটা পৃথকীকরণ ও বিনিময় করণের গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে। পৃথকীকরণের বিষয়টি পরিষ্কার। আর বিনিময়ের গুণ এদিক থেকে যে, প্রত্যেকের ভাগে যে অংশটা এসেছে তার কিছু অংশ তার ছিলো; কিন্তু আর কিছু অংশ অন্যের ছিলো। তবে পাত্র পরিমাপিত এবং পাল্লা পরিমাপিত এবং প্রায় সমগণনাভুক্ত বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে নিছক পৃথকীকরণের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। কেননা এগুলোর বিভিন্ন অংশে তারতম্য ও পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে অদৃশ্য বস্তু তথা ভূসম্পত্তি এবং অসম আকারের স্থাবর বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে বিনিময়ের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

অতঃপর (কুদূরীর মূল বক্তব্যের প্রেক্ষিতে) লোকটি যদি এজমালী ভূ-সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ ওয়াকফ করে তাহলে সে নিজেই তার শরীকদারের সাথে বন্টন করবে। কেননা এ কর্তৃত্ব ওয়াকফকারীর হাতে এবং তার মৃত্যুর পরে তার নিযুক্ত অছীর হাতে অর্পিত।

আর যদি নিজের একক মালিকানার ভূ-সম্পত্তির অর্ধেক ওয়াকফ করে তাহলে কাযী তা বন্টন করে দেবেন। কিংবা নিজের অবশিষ্টাংশ কোন লোকের কাছে বিক্রি করবে। অতঃপর ক্রেতা তা বন্টন করে নিবে। এরপর ওয়াকফকারী ক্রেতা থেকে তা পুনঃক্রয় করে নেবে।

কেননা একই ব্যক্তি বন্টন দাবিকারী এবং বন্টন গ্রহণকারী হতে পারে না।

আর বন্টনের ক্ষেত্রে যদি কিছু দিরহাম উদ্বৃত্ত থাকে আর ক্রেতা সেটা ওয়াকফকারীকে প্রদান করে তাহলে তা জায়েয হবে না। কেননা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ওয়াকফকারী যদি উদ্বৃত্ত দিরহাম দিয়ে দেয় তাহলে জায়েয হবে এবং ঐ দিরহাম পরিমাণ ক্রয় সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় প্রাথমিক ব্যয় করবে ওয়াকফের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে। ওয়াকফকারী এই শর্ত আরোপ করুক কিংবা না করুক।

কেননা ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য হলো স্থায়ীভাবে উৎপাদন ব্যয় করা আর উন্নয়ন ছাড়া তার স্থায়িত্ব বহাল থাকবে না। সুতরাং অনিবার্য দাবি হিসাবে উন্নয়নের শর্ত যুক্ত হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, দায় বহনের বিনিময়েই ফলভোগের অধিকার হয়। সুতরাং এটা ঐ গোলামের ভরণ পোষণের মত হলো, যার খিদমত সম্পর্কে কারো অনুকূলে অছিয়ত করা হয়েছে, তা খিদমতের জন্য অছিয়তকৃত ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।

আবার যদি দরিদ্রদের অনুকূলে ওয়াকফ করা হয়ে থাকে; কিন্তু তাদের সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছেন। এবং ওয়াকফ থেকে লব্ধ আয়ই হলো তাদের সহজলভ্য মাল। সুতরাং তা থেকেই উন্নয়ন ব্যয় সাব্যস্ত হবে।

আর যদি নির্দিষ্ট কোন লোকের নামে ওয়াকফ করে কিন্তু ওয়াকফের পরিণতি গরীব মিসকীনদের জন্য হয় তাহলে উন্নয়ন ব্যয় ঐ লোকটির জীবদ্দশায় তার সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হবে। সে নিজের যে কোন সম্পত্তি থেকে ইচ্ছা তা আদায় করতে পারে, এবং তা ওয়াকফকৃত আয় থেকে নেয়া যাবে না।

কেননা যার অনুকূলে ওয়াকফ করা হয়েছে, সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট। সুতরাং তার কাছে দাবি উত্থাপন সম্ভব। অবশ্য তার প্রতিকূলে ঐ পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় অবশ্য সাব্যস্ত হবে, যা দ্বারা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফকালীন অবস্থার উপর বহাল থাকতে পারে।

আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঐ গুণ অনুযায়ী তাকে পুনঃনির্মাণ করতে হবে। কেননা এই গুণ সহই তার আয় ওয়াকফ প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে ওয়াকফ করা হয়েছে এর অতিরিক্ত কোন পরিমাণের হকদারি তার উপর নাই এবং ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় তার প্রাপ্য। সুতরাং তার সম্মতি ছাড়া অন্য কোন খাতে তা ব্যয় করা যাবে না।

আর যদি গরীব মিসকীনদের নামে ওয়াকফ করে তাহলে কোন কোন মতে একই বিধান হবে। আর অনেকের মতে তা জায়েয হবে। তবে প্রথমোক্ত মত অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা উন্নয়নকাজে ব্যয় করা হলো ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। আর অতিরিক্ত পরিমাণে সে প্রয়োজন নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, যদি নিজের সন্তানের বাবাদের জন্য কোন বাড়ি ওয়াকফ করে তাহলে বসবাস যার হবে উন্নয়ন ব্যয়ও তার উপরে বর্তাবে।

কেননা আগেই বলা হয়েছে যে, দায়বহনের বিনিময়ে ফল ভোগের অধিকার হবে। সুতরাং এটা ঐ গোলামের খরচ বহনের মত হলো, যার খেদমতের ওয়াছিয়ত করা হয়েছে কারো অনুকূলে।

যদি সে তা প্রদানে বিরত থাকে কিংবা সে দরিদ্র হয় তাহলে শাসক (ও বিচারক) তা ভাড়ায় দেবেন এবং ভাড়ার আয় দিয়ে তার উন্নয়ন করবেন। অতঃপর যার বসবাসের অধিকার তার কাছে প্রত্যর্পণ করবেন।

কেননা এতে ওয়াকফকারীর হক এবং ব্যবসাকারীর হক, উভয় হকের রেযায়েত করা হয়। কারণ সেটা উন্নয়ন সাধন না করলে মূলতঃই বসবাস যোগ্যতা রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং উন্নয়ন সাধনই উত্তম হবে।

আর ওয়াকফ করা থেকে যে বিরত থাকতে চায় তাকে উন্নয়ন কাজে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এতে মাল নষ্ট করা (ইচ্ছার বিরুদ্ধে খরচ করানো) হয়। সুতরাং ভাগ চাষের ক্ষেত্রে বীজ দাতার বীজদান থেকে বিরত থাকার সদৃশ হলো। ফলে তার বিরত থাকা নিজের হক বাতিল হওয়ার ব্যাপারে তার সম্মতির পরিচায়ক হবে না। কেননা সে দ্বিধাগ্রস্ততার পর্যায়ে রয়েছে।[১] বসবাসের অধিকার যার তার পক্ষ থেকে ভাড়ায় প্রদান বৈধ নয়। কেননা সেতো মালিক নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়াকফের যে ভবন ধ্বসে পড়েছে এবং যে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে শাসক (বা বিচারক) ওয়াকফকৃত সম্পত্তির উন্নয়নের কাজে সেগুলোকে ব্যবহার করবে। যদি প্রয়োজন হয়, আর যদি তখন প্রয়োজন না হয় তাহলে সংরক্ষণ করে রেখে দেবে। যখন উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন সেগুলোকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করবে।

কেননা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি যেন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে এবং ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেজন্য উন্নয়ন ও সংস্কার অপরিহার্য।

সুতরাং যদি তৎক্ষণাৎ সেগুলোর প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলোকে সংস্কার কাজে ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে যদি তৎক্ষাণাৎ প্রয়োজন না হয় তাহলে সংরক্ষণ করে রেখে দেবে, যাতে প্রয়োজনের সময় যোগাড় করা কষ্টকর না হয় এবং ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য নষ্ট না হয়।

আর যদি সেগুলোকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপন সম্ভব না হয় তাহলে বিক্রি করে সেগুলোর মূল্য মেরামত কাজে ব্যয় করবে। এটা হবে মূলকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তীকে ব্যবহার করা।

ওয়াকফকৃত সম্পত্তির হকদারদের মাঝে ভগ্নাবশেষগুলো বন্টন করা জায়েয হবে না।

কেননা এটা হলো ওয়াকফকৃত বস্তু সত্তার অংশ; আর যাদের নামে ওয়াকফ করা হয়েছে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির বস্তুসত্তায় তাদের হক নেই। তাদের হক হলো শুধু মুনাফার মধ্যে। বস্তু সত্তা হলো আল্লাহর হক। সুতরাং যা তাদের হক নয়, তা তাদের খাতে ব্যয় করা যাবে না।

১। অর্থাৎ হতে পারে যে, নিজের হক বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সম্মতির কারণেই সে বিরত হয়েছে। আবার হয়ত সামর্থ্যের অভাবে বিরত রয়েছে। কিংবা এ আশায় যে, কাযী মেরামত করে দেবেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফের আয় নিজের নামে নির্ধারিত করে কিংবা তার পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে তা জায়েয রয়েছে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ ওয়াকফের আয় নিজের নামে শর্ত করা। দ্বিতীয়তঃ পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখা।

প্রথমটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে বৈধ; কিন্তু ইমাম মুহম্মদ (র) এর বক্তব্যের কিয়াসে তা বৈধ নয়। হিলালে রাজীরও এই মত। ইমাম শাফেয়ীও তাই বলেন।

কোন কোন মতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়কের দখল বুঝে নেয়া এবং পৃথক করে নেয়ার শর্ত আরোপের ব্যাপারে মত পার্থক্য।[১]

আর কোন কোন মতে এটা স্বতন্ত্র মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা।

নিজের জীবদ্দশায় কিছু অংশ নিজের জন্য বরাদ্দ করার শর্ত আরোপ করার এবং মৃত্যুর পর গরীব মিসকীনদের নামে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এবং জীবদ্দশায় সর্বাংশ নিজের জন্য আর মৃত্যুর পর গরীব মিসকীনদের নামে করার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে মতভিন্নতা একই রকম।

আর যদি এই শর্তে ওয়াকফ করে যে, আয়ের অংশ বিশেষ কিংবা সর্বাংশ তার উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারদের জন্য হবে যতদিন তারা জীবিত থাকে। এর পর যখন তারা মারা যাবে তখন তা গরীব মিসকীনদের জন্য হবে তাহলে কোন কোন মতে সর্বসম্মতিক্রমে তা বৈধ আর কোন কোন মতে এটাও মতপার্থক্যপূর্ণ। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা নিজের জীবদ্দশায় তাদের জন্য বরাদ্দের শর্ত করা এবং নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত করা একই কথা।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতামতের কারণ এই যে, ওয়াকফ অর্থ হলো আমরা যে পন্থা উল্লেখ করেছি সে পন্থায় (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) মালিকানা প্রদানের ভিত্তিতে সেচ্ছাদান করা। সুতরাং অংশবিশেষ কিংবা সর্বাংশ নিজের জন্য শর্ত করা ওয়াকফ বাতিল করে দেয়। কেননা নিজের মালিকানা থেকে নিজেকে মালিকানা প্রদান সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এটা কার্যকর ছাদাকার অংশ বিশেষ নিজের জন্য বরাদ্দ করার মত এবং মসজিদের অংশবিশেষ নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত করার মত হলো।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দলীল হলো এই বর্ণনা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ছাদাকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন।

আর এখানে ছাদাকার অর্থ হলো ওয়াকফকৃত ছাদাকা। অথচ নিজের জন্য শর্তারোপ ছাড়া তা থেকে আহার করা হালাল নয়। সুতরাং বর্ণনাটি এ রকম শর্তারোপের বৈধতা প্রমাণ করে।

তাছাড়া এই কারণে যে, ওয়াকফ হল ছাওয়াবের নিয়তে নিজের মালিকানা রহিত করে আল্লাহর নামে সাব্যস্ত করা। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং যখন অংশবিশেষ

১। আবূ ইউসুফ (র) এর মতে ওয়াকফ বৈধ হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয়। সুতরাং আয় নিজের জন্য নির্ধারণ করাতে বাধা নেই। কেননা তখন একই ব্যক্তি অর্পণকারী ও কাব্যকারী হয় না। মুহম্মদ (র) এর মতে ওয়াকফ বৈধ হওয়ার জন্য দখল ও কবজা যেহেতু শর্ত, সেহেতু এ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি অর্পণকারী ও দখলকারী হয়, তাই তা বৈধ নয়।

বা সর্বাংশ নিজের জন্য বরাদ্দের শর্ত আরোপ করবে তখন যা আল্লাহর মালিকানাধীন হয়ে গেছে তা নিজের মালিকানায় আনয়ন করা হবে। নিজস্ব মালিকানাধীন বস্তুকে নিজের মালিকানায় আনায়ন নয়। আর এটার বৈধতা রয়েছে, যেমন কোন সরাইখানা কিংবা পানি পান উৎস স্থাপন করলো কিংবা নিজের জমিকে কবরস্থান বানালো আর এই শর্ত আরোপ করলো যে, সরাইখানায় সে অবস্থান করবে কিংবা পান উৎস থেকে পানি পান করবে কিংবা সে কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

তাছাড়া এই কারণে যে তার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ছাওয়াব লাভ করা। আর নিজের জন্য ব্যয় করাতে ছাওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- نفقة الرجل على نفسه صدقة। মানুষের নিজের জন্য খরচ করাটাও ছাদাকা।

ওয়াকফকারী যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, যখন সে ইচ্ছা করবে ওয়াকফী ভূমিকে অন্য ভূমি দ্বারা বদল করতে পারবে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে এই শর্তারোপ বৈধ। আর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে ওয়াকফ জায়েয কিন্তু শর্ত বাতিল।

আর যদি ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য তিন দিনের ইচ্ছাধিকার শর্ত আরোপ করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে ওয়াকফ ও শর্ত দুটোই বৈধ। আর ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে।

এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্ণিত মাসআলার ভিত্তিতে (যেহেতু আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে জীবদ্দশায় নিজের জন্য ওয়াকফের আয় ব্যতিক্রমরূপে সাব্যস্ত করতে পারে, সেহেতু ইচ্ছাধিকার শর্তও আরোপ করতে পারে)।

আর পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখার বিষয়টিকে কুদূরী (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মত বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এটি শায়খ হেলাল (র) এরও মত এবং এটাই প্রকাশিত মাযহাব।

শায়খ হিলাল তাঁর কিতাবের ওয়াকফ অধ্যায়ে বলেছেন, একদল মাশায়েখ মত প্রকাশ করেছেন যে, ওয়াকফকারী যদি নিজের জন্য পরিচালনা কর্তৃত্বের শর্ত আরোপ করে তাহলে এ অধিকার তারই হবে। আর যদি শর্ত আরোপ না করে তাহলে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটাই অধিকতর যুক্তিসম্মত যে, এটা মুহম্মদ(র) এর মত।

কেননা তাঁর মূলনীতি এই যে, ওয়াকফ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করা। আর যখন অর্পণ করবে তখন তাতে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

আমাদের দলীল এই যে, নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক তারই পক্ষ হতে তারই আরোপিত শর্তের কারণে কর্তৃত্বভার লাভ করে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, অন্য লোক তার পক্ষ হতে কর্তৃত্ব লাভ করবে; অথচ তার নিজের জন্য কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হতে পারবে না।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল এই যে, সেই হচ্ছে এই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির নিকটতম ব্যক্তি। সুতরাং এর পরিচালনা কর্তৃত্বের ব্যাপারে সেই হবে অধিকতর হকদার। যেমন- কেউ যদি মসজিদ বানায় তাহলে তার উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যাপারে এবং তাতে মুয়ায্যিন নিয়োগের ব্যাপারে সেই অধিক হকদার হয়। তেমনি যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করল তার 'ওয়ালা' (উত্তরাধিকারী) তারই হয়ে থাকে। কেননা আযাদকারীই হচ্ছে তার নিকটতম ব্যক্তি।

যদি এমন হয় যে, ওয়াকফকারী পরিচালনা ভার নিজের হাতে রাখার শর্ত আরোপ করলো। কিন্তু ওয়াকফের সম্পত্তি হেফাজতের ব্যাপারে সে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে কাযীর অধিকার রয়েছে গরীব মিসকীনদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তার হাত থেকে তা নিয়ে নেওয়া। যেমন তার অধিকার রয়েছে ছোট বাচ্চাদের স্বার্থ রক্ষার্থে ওয়াছীকে সম্পত্তির পরিচালনা থেকে বের করে দেওয়া।

তদ্রূপ যদি সে শর্ত করে যে, কোন শাসকের বা বিচারকের অধিকার হবেনা যে, তা তার কবজা থেকে নিয়ে অন্য কাউকে এর মুতওয়াল্লী বানাবে। কেননা এটা শরীয়তের বিধান বিরোধী শর্ত। সুতরাং তা বাতিল হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ

কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত যথাযথভাবে সেটাকে নিজের মালিকানা থেকে পৃথক না করবে এবং লোকদের সেখানে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান না করবে ততক্ষণ তা তার মালিকানা থেকে বের হবে না। তবে (তার অনুমতিক্রমে) যখনই একজন মানুষ সেখানে সালাত আদায় করবে তখনই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে।

পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, এ ছাড়া জিনিসটা আল্লাহর জন্য খালেস হতে পারে না।

আর এতে সালাত আদায়ের প্রয়োজনীয়তা এজন্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে (ওয়াকফ স্বীকৃত হওয়ার জন্য) অর্পণ অপরিহার্য। আর প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর অর্পণ হলো শর্ত। আর মসজিদের ক্ষেত্রে এ অর্পণ সম্পন্ন হবে তাতে সালাত আদায় করা দ্বারা।

কিংবা এ কারণে যে, এখানে যেহেতু কবজা করার বাহ্যিক রূপ সম্ভব নয় (কেননা প্রকৃত কব্‌জা বা দখল তো হলো আল্লাহর) সেহেতু উদ্দেশ্যকে কবজার স্থলবর্তী করা হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনা মতে এতে এক জনের সালাত আদায়ই যথেষ্ট। ইমাম মুহম্মদ (র) থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

কেননা সালাতের (সংখ্যাগত সমগ্র) পূর্ণ জাতিসত্তার সাব্যস্তকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং তার সর্বনিম্ন পরিমাণ শর্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা শর্ত হবে। কেননা সাধারণভাবে সেজন্যই মসজিদ নির্মিত রয়েছে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, 'এ কে মসজিদ করলাম'— বলা দ্বারাই তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

কেননা তাঁর মতে ওয়াকফ যেহেতু বান্দার মালিকানা রহিত করার নাম, সেহেতু তত্ত্বাবধায়কের নিকট অর্পণ করা শর্ত নয়। সুতরাং বান্দার হক রহিত করা দ্বারাই সেটা আল্লাহর জন্য খালিছ হয়ে যাবে। আর তা হয়ে গেল (মালিকানা আযাদ করার মত)। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) (জামে ছাগীর কিতাবে) বলেন, কেউ যদি এমন মসজিদ তৈরি করে যার নীচে (ভূগর্ভস্থ) কক্ষ রয়েছে। কিংবা যার উপরে (বিভিন্ন তালা বা) ঘর রয়েছে আর মসজিদের দরজা (বা প্রবেশ পথ) রাস্তার দিকে খুলে দেয় অতঃপর সেটাকে সে নিজের মালিকানা থেকে পৃথক করে দেয় তাহলে তা সে বিক্রি করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারভুক্ত হবে।

কেননা তার সাথে বান্দার হক যুক্ত থাকার কারণে সেটা আল্লাহর জন্য খালিছ হয়নি।

আর যদি ভূগর্ভস্থ কক্ষ মসজিদের প্রয়োজনের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে ওয়াকফ জায়েয হবে। যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে রয়েছে।

হাসান বিন যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নীচের অংশকে মসজিদ এবং তার উপরের অংশকে যদি বাসস্থান রূপে নির্ধারিত করে তাহলে তা মসজিদ রূপে গণ্য হবে।

কেননা মসজিদ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে আর তা নিচের থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে; উপরের থেকে নয়।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। কেননা মসজিদ তাজীমযোগ্য ঘর। কিন্তু তার উপরে যদি বাসস্থান থাকে কিংবা ভাড়ার ঘর থাকে তাহলে তাজীম রক্ষা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বাগদাদে এসে বাড়িঘরের স্থান সঙ্কুচিত দেখে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি মসজিদ রূপে অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ যেন তিনি প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেছেন।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন 'রায়' শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি আমাদের কথিত 'প্রয়োজন'-এর প্রেক্ষিতে উক্ত সবকটি সূরতকেই বৈধ বলেছেন।

(জামে ছাগীর কিতাবে) ইমাম মোহাম্মদ (র) বলেন, (একই বিধান হবে)

অদ্রূপ যদি নিজের বাড়ির মধ্যস্থলে মসজিদ বানায় এবং মানুষকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

অর্থাৎ তার বিক্রি করার অধিকার থাকবে এবং সেটা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারী হবে।

কেননা মসজিদ এমন স্থান ও ভবনকে বলে, যেখানে কারো (কাউকে) বাধাদানের অধিকার না থাকে। অথচ তার মালিকানাধীন ভূমি যদি ঐ মসজিদের চতুর্দিক বেষ্টন করে থাকে তখন তার বাধা দানের অধিকার থাকবে। সুতরাং তা মসজিদ হলো না। কেননা সে নিজের জন্য রাস্তা রেখে দিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্য খালিছ হলো না। আর ইমাম মুহম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বিক্রি করা যাবেনা, তাতে উত্তরাধিকারীও জারী হবেনা এবং তা হেবা করা যাবে না।

এটাকে তিনি মসজিদ গণ্য করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে যে, তা মসজিদ হয়ে যাবে। কেননা যখন সে সেটাকে মসজিদ বানাতে রাজি হয়েছে; আর রাস্তা ছাড়া মসজিদ হতে পারেনা, তখন রাস্তা তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এবং তা (মসজিদের) প্রাপ্য রূপে গণ্য হবে। যেমন বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ ছাড়াই রাস্তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি নিজের জমিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলে তাহলে সেটা ফেরত নেয়ার এবং বিক্রি করার অধিকার তার থাকে না। এবং তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারী হবে না।

কেননা তা বান্দার হক থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য খালিছ হয়ে গেছে।

এটা এজন্য যে, যাবতীয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মালিকানাধীন। আর বান্দার যে হক সাব্যস্ত হয়েছিলো, তা যখন সে রহিত করে দিলো তখন তা প্রকৃত অবস্থায় ফিরে যাবে এবং তাতে তার হস্তক্ষেপের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। যেমন গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে।

মসজিদের আশপাশ এলাকা যদি বে-আবাদ হয়ে যায় এবং ঐ মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে তা মসজিদ রূপেই বহাল থাকবে।

কেননা এটা হলো বান্দার পক্ষ থেকে মালিকানা রহিত করণ। সুতরাং তার মালিকানার দিকে আর ফিরে আসতে পারেনা।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে প্রতিষ্ঠাতার কিংবা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসের মারিকানায় ফিরে যাবে।

কেননা এটাকে সে বিশেষ প্রকার সওয়াবের কাজের জন্য নির্ধারিত করেছিলো আর তা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা মসজিদের অপ্রয়োজনীয় চাটাই ও মাদুরের মত হলো। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) চাটাই ও মাদুর সম্পর্কে বলেন যে, এগুলো অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি মুসলমানদের জন্য প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করে কিংবা মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য সরাইখানা কিংবা মুসাফিরখানা তৈরি করে কিংবা নিজের জমিকে কবরস্থান বানায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে শাসকের আদেশের পূর্ব পর্যন্ত তা থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না।

কেননা সেটা বান্দার হক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। দেখুন না, তা থেকেই উপকৃত হওয়ার অর্থাৎ সরাইখানায় বাস করা এবং মুসাফির খানায় অবস্থান করার এবং পানকেন্দ্র থেকে পান করার এবং কবরস্থানে সমাধিস্থ করার অধিকার তার রয়েছে। সুতরাং শর্ত থাকবে যে, বিচারক আদেশ দিবেন; কিংবা মৃত্যু পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করবে। যেমন– গরীব মিসকীনদের নামে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে। মসজিদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার তার নেই। সুতরাং বিচারকের আদেশ ছাড়াই তা আল্লাহ তা'আলার জন্য খালিছ হয়ে গেল।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বক্তব্য উচ্চারণ করা মাত্র তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

এটাই তাঁর মূলনীতি। কেননা তাঁর মতে তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করা (ওয়াকফ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) শর্ত নয়। এবং ওয়াকফ হল বাধ্যতামূলক।

আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে মানুষ যখন পান কেন্দ্র থেকে পান করবে এবং সরাইখানা ও মুসাফির খানায় অবস্থান করবে এবং কবরস্থানে দাফন করবে তখন (ওয়াকফকারীর) মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

কেননা তাঁর মতে (মুত্তাওয়াল্লীর হাতে) অর্পণ করা শর্ত। আর এ শর্ত পূর্ণ হবে ওয়াকফকৃত প্রত্যেক প্রকার বস্তুর যথাযথ অর্পণের মাধ্যমে। আর সেটা আমাদের বর্ণিত কার্যাবলী দ্বারাই হবে। তবে একজনের ব্যবহারের দ্বারা অর্পণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা সমগ্র জাতিসত্তার ব্যবহার সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

ওয়াকফকৃত কূয়া ও হাউজ সম্পর্কেও একই হুকুম। আর যদি তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করে দেয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে অর্পণ শুদ্ধ হবে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক হলো যাদের নামে ওয়াকফ করা হয়েছে, তাদের নায়েব আর নায়েবের কর্ম মূল ব্যক্তির কর্মের ন্যায়।

আর মসজিদ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাতে অর্পণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা মসজিদের বিষয়ে তার কোন ভূমিকা নেই।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তা অর্পণ বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার এবং দরজা জানালা বন্ধ করার লোকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তার হাতে অর্পণ করলে অর্পণ করা সিদ্ধ হবে।

কোন কোন মতে এক্ষেত্রে কবরস্থান মসজিদের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, লোক প্রচলন হিসাবে এর কোন মোতাওয়াল্লী থাকে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি পানকেন্দ্র ও সরাইখানার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং মোতওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করা সিদ্ধ হবে। কেননা সাধারণ রীতি না হলেও যদি মোতওয়াল্লী নিয়োগ করা হয় তাহলে তা বৈধ হয়।

যদি মক্কাস্থ নিজের বাড়িকে হাজী ও ওমরা কারীদের বাসস্থান বানিয়ে দেয়, কিংবা মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও নিজের বাড়িকে গরীব-মিসকীনদের আশ্রয় কেন্দ্র বানিয়ে দেয় কিংবা সীমান্ত এলাকায় কোন বাড়িকে মুজাহিদ ও সীমান্ত প্রহরীদের জন্য বাসস্থান বানিয়ে দেয় কিংবা নিজের জমির ফসলকে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য ওয়াকফ করে এবং তা প্রশাসকের হাতে অর্পণ করে, যিনি তার ত্ত্বাবধান করবেন; তাহলে তা জায়েয হবে। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে তা ফেরত নেওয়া যাবে না। তবে ফসলের ক্ষেত্রে গরীবদের জন্য তা ব্যবহার করা হালাল হবে; ধনীদের জন্য নয়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সরাইখানায় অবস্থান করা, কূয়া ও পানকেন্দ্র থেকে পান করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধনী ও গরীব সমান। উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্যকারী হলো লোক প্রচলন।

কেননা লোক সমাজ ফসলের ক্ষেত্রে গরীবদের উশ্যে করে থাকে। পক্ষান্তরে অন্য সকল ক্ষেত্রে গরীব-ধনী সবার মাঝে অভিন্নতা বিবেচিত হয়।

তাছাড়া পান করা ও না করার ক্ষেত্রে তো প্রয়োজন ধনী-গরীব উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে সচ্ছলতার কারণে ধনী ব্যক্তির এই ধরনের আয় ভোগ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

ইফাবা. (উ.) ১৯৯৯-২০০০/অঃ সঃ/৩৩৬৬ - ৩২৫০